মাসিক সমালোচক।

অনুষ্ঠান।

বৎসরাধিক অতীত হইল একবার এই উদ্যোগ হইয়াছিল। এবারে যাঁহাদের উদ্যোগে মাসিক সমালোচকের জন্ম হইল, সেবারেও তাঁহারাই উদ্যোগী ছিলেন। সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিতে আমাকে তাঁহারা অনুরোধ করেন। যে কারণেই হউক, আমি তখন সম্মত হই নাই বলিয়াই উদ্যোগীদিগের উদ্যম সফল হয় নাই——মাসিক পত্রের সংকল্প সংকল্পেই থাকিয়া গিয়াছিল, কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এত দিনে হইল। এতদিনে সেই বৎসরাধিকলালিত সঙ্কল্পতরুর ফুল ফুটিল। ফল কত দিনে দেখা দিবে, তাহা ঈশ্বর জানেন। ফল কেমন হইবে, তাহা ভবিষ্যতে দ্রষ্টব্য। মনুষ্য কেবল উদ্যোগ করিতে পারে; মনুষ্য ফলবিধাতা নহে। ফলং পুনস্তদেবস্থ্যাদ্ যদ্বিধের্মনসি স্থিতং।

যাহা নূতন, তাহার পরিচয় আবশ্যক। প্রকৃতি কেমন, উদ্দেশ্য কি, কার্য্যমূলা শক্তি সকল কোন্ কোন্ নীতিসূত্র দ্বারা শাসিত, এ সকল না জানিয়া কাহারও সহিত ঘনিষ্টতা করা যায় না—— অজ্ঞাত-কুলশীলকে কেহই প্রায় স্থান দেয় না। সেই জন্য একটু পরিচয়ের প্রয়োজন।

বঙ্গদেশের মঙ্গল ব্যতীত মাসিক সমালোচকের অন্য কোন উদ্দেশ্য

নাই। যে আচরণ, যে মত, যে স্ফূর্ত্তি বঙ্গসমাজের শুভসাধনোপযো
বলিয়া প্রতীত হইবে, মাসিক সমালোচক তাহার প্রশংসা করি
আদর করিবে, উৎসাহ দিবে। যে প্রথা, যে বিশ্বাস, যে বেগ বঙ্গে
ভগ্নদশা আরও ভাঙ্গিবে বলিয়া অনুমিত হইবে, মাসিক সমালোচক
তাহার নিন্দা করিবে, উন্মূলনপ্রয়াস করিবে, প্রতিকূল বেগপ্রতিষ্ঠার
যত্ন করিবে। কতদূর কৃতকার্য্য হইবে, সে অন্য কথা—সাধ্যা-
নুসারে যত্নের ত্রুটি করিবে না, এবং যত্ন মাত্রেই প্রশংসনীয়। যত্ন
করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেও পরিশ্রমের সার্থ-
কতা অনুভব করিবে এবং অদৃষ্টকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিবে।
যত্ন বিফল হয়, যত্ন করিয়াছি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিবে।

মাসিক সমালোচক বঙ্গদেশের মঙ্গল দেখিবে—ভারতবর্ষের মঙ্গল
কি দেখিবে না? বঙ্গের মঙ্গলের কথা বলা হইল—ভারতবর্ষের
নামোল্লেখ হইল না কেন? ইহার ভিতর একটু কথা আছে। প্রথমতঃ,
মাসিক সমালোচক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। বাঙ্গালা যদি সমগ্র
ভারতের ভাষা হইত, তাহা হইলে মাসিক সমালোচক ভারতবর্ষের
মঙ্গল সাধনের আশা এক দিন করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু
তাহা ত নহে। বাঙ্গালা, ভারতবর্ষের প্রদেশ বিশেষের ভাষা। সেই
প্রদেশ ব্যতীত অন্য প্রদেশস্থ প্রকৃতিপুঞ্জ ইহা বুঝে না, ইহাতে
রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করে না, ইহাতে লিখিত রচনা প্রবন্ধাদি লইয়া
আন্দোলন বা আলোচনা করে না। যে ভাষা যাহার অজ্ঞাত,
সে ভাষায় প্রকাশিত মতামতের দ্বারা তাহার উপকার হইবে কি
রূপে? যদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সাময়িক পত্রের দ্বারা ভারতবর্ষের
উন্নতি হইতে পারে, তাহা হইলে গ্রীক্ বা হিব্রু ভাষায় প্রচারিত
মতামতের দ্বারাও ভারতের উন্নতি হইতে পারে—তাহা হইলে,
ফ্রান্স বা জর্ম্মনি দেশে প্রচারিত জগন্মান্য সাময়িক পত্রাদির দ্বারা

ভারত এত দিন উন্নত হইত।

তবে, সাহচর্য্যে কতকটা ফল ফলে; নৈকট্যবশতঃ কতকটা দোষ-গুণ সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু ইহারও মূল, সহানুভূতি এবং ভক্তি। যে স্থলে এতদুভয়ের একটিও নাই, সে স্থলে নৈকট্যনিবন্ধন দোষ-গুণের সম্প্রসারণ ঘটে না। অনেক দিন হইতে ইংরেজ এবং বাঙ্গালি পরস্পরের অতি নিকটে বাস করিতেছে, কিন্তু ইংরেজ এত দিনেও বাঙ্গালির একটিও দোষ বা গুণ শিক্ষা করে নাই। ইহার কারণ, আমাদের সহিত ইংরেজর সহানুভূতি, আমাদের প্রতি ইংরেজের ভক্তি নাই। ইংরেজ আমাদের কিছু শিখে নাই বটে, কিন্তু আমরা ইংরেজের অনেক দোষগুণ ইহারই মধ্যে শিখিয়াছি, কেননা, আমরা ইংরেজকে ভক্তি করি। মুখে স্বীকার করি বা না করি, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ইংরেজকে উন্নততর জীব বলিয়া মানি—ইংরেজ হাসিয়া কথা কহিলে অহ্লাদে গলিয়া যাই, ইংরেজ মুখ তুলিয়া চাহিলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করি, ইংরেজ সম্মান করিলে হাতে স্বর্গ পাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসী এবং বাঙ্গালির মধ্যে এ রূপ সহানুভূতি বা ভক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিদিগের নিকট আমরা নানা কারণে ঘৃণিত,— আমরা অখাদ্য খাদক, অপেয় পায়ী, আচারভ্রষ্ট, ইংরেজভক্ত, দুর্ব্বল, ফন্দিবাজ— নানা কারণে আমরা ঘৃণার পাত্র। এরূপ অবস্থায় নৈকট্যের ফল [ফলে না। সেই জন্য ভারতের মঙ্গলের ধুয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে সকল ভারতোদ্ধার-কারীগণ বক্তৃতায়, লেকচরে, প্রবন্ধে, পুস্তকে, ভারত মাতা ভারত মাতা করিয়া হাট বাধাইয়া থাকেন, আমাদের একান্ত ইচ্ছা, তাঁহারা এই কথাগুলি এক একবার মনে করেন। তাহা হইলে তাঁহাদেরও মঙ্গল, দেশেরও মঙ্গল।

বঙ্গের মঙ্গল মাসিক সমালোচকের লক্ষ্য বটে, কিন্তু তাহা সংসিদ্ধ

হইবার উপায় কি? কেমন উন্নতি বাঞ্ছনীয়? কি রূপে তাহা আয়ত্ত করা যায়? ইতিহাস পাঠে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের এই রূপ প্রতীতি হইয়াছে যে, যে উন্নতি দেশীয় জনসাধারণগত, তাহাই প্রকৃত উন্নতি, তাহাই স্থায়ী— সাম্প্রদায়িক উন্নতি স্থায়ী হয় না। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই রূপ সাম্প্রদায়িক উন্নতি হইয়াছিল। কারণ সকল নির্দ্দেশ করিবার এ স্থান নহে, কিন্তু কতকগুলি অনিবার্য্য কারণ বশতঃ প্রাচীন ভারতে অর্থসঞ্চয় যেমন সুন্দর হইয়াছিল, অর্থবিভাগ তেমন সুন্দর হয় নাই; জ্ঞানসঞ্চয় যেমন সুন্দর হইয়াছিল, জ্ঞানপ্রচার তেমন হয় নাই। সেই জন্য জাতীয় উন্নতির ফল কেবল সম্প্রদায় বিশেষের ভোগ্য ছিল। উচ্চশ্রেণী যাহা বলিতেন, নিম্নশ্রেণী বিনাবাক্যব্যয়ে তাহাই বিশ্বাস করিত। উচ্চশ্রেণী যাহা অনুগ্রহ করিয়া দিতেন, নিম্নশ্রেণী তাহাতেই উদর পোষণ করিয়া কোন ক্রমে জীবিত থাকিত— ভারতের পূর্ব্বোন্নতির ফল ইহারা পায় নাই। উন্নতি সর্ব্বজনগত হইতে পায় নাই। সুতরাং যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহার মূল অতি সংকীর্ণ ছিল বলিতে হইবে। সংকীর্ণ মূলের উপর বিপুল গাঁথনি,— যে দিন প্রতিকূল বায়ু বহিল, অমনি সেই গগণস্পর্শী প্রাসাদ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল। পারস্যে, রাজভক্তির হ্রস্বতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বলবীর্য্যের হ্রস্বতা অনুভূত হইয়াছিল। মিসরে, রাজবংশের নাশ হইলে মিসরবাসীদিগের পক্ষে রাজ্য পুনর্নির্ম্মান করা অসাধ্য হইয়া পড়িল। ইউরোপীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ঠিক ইহার বিপরীত চিত্র দেখিতে পাইবে, কেননা ইউরোপের উন্নতি সাম্প্রদায়িক নহে। সেই জন্য মাসিক সমালোচক জনসাধারণের উপর দৃষ্টি রাখিবে—— দেশীয় কৃতবিদ্যমণ্ডলীর মুখপত্র স্বরূপ হইতে যেরূপ যত্ন করিবে, জনসাধারণের পাঠ্য ও আলোচ্য হইবার জন্যও সেইরূপ যত্ন করিবে।

সে জন্যও বটে, আরও একটা কথা আছে। কোমৎ* বলিয়াছেন বটে, যে মতামতের দ্বারাই সমাজ শাসিত এবং বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে—যে মতামতই সমাজ যন্ত্রের মূল অবলম্বন—যে রাজনৈতিক বিপ্লবাদি যাহা ঘটে, আধ্যাত্মিক অরাজকতাই তাহার কারণ।* বাস্তবিক ইহা সত্য নহে। প্রকৃতপক্ষে, সমাজ শাসিত হয় অনুভূতির দ্বারা,—মতামত পথ প্রদর্শক মাত্র। সমাজ বিপ্লবের মূল কারণ নৈতিক প্রতিযোগিতা, অনুভূতিবিরোধ—আধ্যাত্মিক অরাজকতা নহে। প্রত্যেক সামাজিক ঘটনা, সামাজিক ব্যক্তি সমূহের প্রবৃত্তি এবং বিশ্বাস সমষ্টির ফল। ইহার মধ্যে প্রবৃত্তিনিচয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকৃত এবং বিশ্বাস সমূহ প্রধানতঃ স্বোপার্জ্জিত ও তৎকালবর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা দ্বারা স্থিরীকৃত। এই সামাজিক অবস্থা প্রবৃত্তিসৃষ্ট। সামাজিক অবস্থার, অর্থাৎ সামাজিক জনগণের প্রবৃত্তির উপযোগী না হইলে কোন মত সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় না। রূশো, ভল্‌তেয়র প্রভৃতির রচনা দ্বারা ফরাশী রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিশ্বাসের আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। তাৎকালিক ফরাশী সমাজ সেই সকল মত গ্রহণে প্রস্তুত ছিল বলিয়াই সে সকল মত প্রচারিত এবং অবলম্বিত হইয়াছিল। জ্বালায় জ্বালায় তৎকালীন ফরাশী সমাজ বারুদের ন্যায় জ্বলনপ্রবণ হইয়াছিল, রূশো ভল্‌তেয়র প্রভৃতি আসিয়া

* Ce n'est pas aux lecteurs de cet ouvrage que je croirai jamais devoir prouver que les idees gouvernent et bouleversent le monde, ou, en d'autres termes, que tout le mecanisme social repose finalement sur des opinions. Ils savent surtout que la grande crise politique et morale des societes actuelles tient, en derniere analyse, a l' anarchie intellectuelle.

Auguste Comte.

যেমন তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন, অমনি কালানলশিখা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ফরাশী সমাজ প্রস্তুত না থাকিলে রুশো প্রভৃতি যত কেন লিখুন না, সব অরণ্যে রোদন হইত। যে সকল মত ফরাশী সমাজকে আমূল আলোড়িত করিয়াছিল, সেই সকল মত তেমনই করিয়া একবার বঙ্গদেশে প্রচার কর, দেখিবে বাঙ্গালির এক গাছি কেশও নড়িবে না, এক বিন্দুও শোনিত উষ্ণতর হইবে না, এ অসাড় দেহে এত টুকুও জীবনী সঞ্চারিত হইবে না। মার্টিন লুথ-রের পূর্ব্বে কয়েকবার সংস্কৃত খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ফল ফলিল না, কেননা তখন সময় হয় নাই। সময় হয় নাই বলিয়া, জনসাধারণ সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রহণে প্রস্তুত ছিল না বলিয়া, উইক্লিফ্ কিছু করিতে পারিলেন না, জন হশ্ কিছু করিতে পারিলেন না। উন্নত মত সকল সমাজ মধ্যে সংস্থিত হইলে সামাজিক উন্নতির সাহায্য করে বটে, কিন্তু সমাজ উন্নত মত সকল গ্রহণের উপযোগী না হইলে, উন্নত মত সমাজে সংস্থিত হইতে পায় না। কার্য্যতঃ মতামতের প্রচলন, সামাজিক অবস্থা এবং সামাজিকগণের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। হর্বার্ট স্পেন্সর্ যে বলিয়াছেন, যে সামাজিক জীব-নের ধারাবাহিক ও কালসামবয়িক শাসনজনিত প্রকৃতিপুঞ্জের নৈতিক সত্ত্বার পরিবর্ত্তনই সামাজিক উন্নতির মুখ্য ও অব্যবহিত কারণ, এ কথা স্বীকার্য্য †। অতএব জনসাধারণের নৈতিক পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। যাহাতে সামাজিক রুচির সংস্কার হয়, সামাজিক প্রবৃত্তিনিচয় সাধুতর হয়, সামাজিক জ্ঞান বিস্তৃত হয়, সামাজিক দৃষ্টি দূরপ্রসারিণী হয়, তৎপক্ষে যত্ন করা চাই। মাসিক সমালোচক সে যত্ন করিবে, এবং

যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কো ঽত্র দোষঃ ?

---

† Social Statics, Chap XXX.

মাসিক সমালোচক কোন সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষপাতী নহে, কোন বিশেষ ধর্ম্মপ্রণালির অন্ধ অনুবর্ত্তী নহে—কোন সম্প্রদায় বা ধর্ম্মবিশেষের মতামত বা রীতিপদ্ধতি সমর্থন করিবার জন্য ইহার জন্ম নহে। সকল সম্প্রদায়ের লোকেই ইহাকে উক্তিপত্র রূপে ব্যবহার করিতে পারেন—সত্য ভিন্ন মাসিক সমালোচকের অন্য কোন ধর্ম্ম নাই; এবং যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সব সত্যের অন্তর্গত—যে মুহূর্ত্তে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে উহা অধর্ম্ম। সকল প্রকার মতামত মাসিক সমালোচকে প্রকাশিত হইতে পারে,—স্বাধীন সমালোচনা ব্যতীত উন্নতি নাই—স্বাধীন সমালোচন ব্যতীত সত্য নির্ণয় হয় না। কিন্তু এরূপও অনেক সময়ে দেখা যায়, যে সত্য-নির্ণয়ের দোহাই দিয়া অনেক কুপ্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, অনেক কুভাষা ব্যবহৃত হয়। অনেক প্রবন্ধ লিখিত হয়, যাহার উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক বচসা এবং প্রতিযোগী সম্প্রদায় বিশেষের অবমাননা—সত্যনির্ণয় নহে। এরূপ প্রবন্ধ মাসিক সমালোচক প্রকাশ করিবে না—ইহা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। কিন্তু সত্যনির্ণয় এবং সত্যপ্রচার উদ্দেশে যে প্রবন্ধ রচিত, তৎপ্রকাশিত মতনিচয় বা যুক্তিপরম্পরা বিরুদ্ধ বা অপ্রীতিকর হইলেও, মাসিক সমালোচক তাহা সাদরে গ্রহন করিবে—যাহা অপ্রীতিকর এবং আপাতবিরুদ্ধ, তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে এবং অনেক সময় হইতেও দেখা যায়। অতএব সকল প্রকার মতামতই মাসিক সমালোচকে স্থান পাইবে। আর সেই জন্য বলিয়া রাখা উচিত যে, যে সকল মত ইহাতে প্রকাশিত হইবে তাহাই সম্পাদকের মত, এরূপ কেহ না মনে করেন।

অনেক সময়ে যুক্তি অপেক্ষা ব্যঙ্গ ফলপ্রদ। ভলতের এবং ইরাস্মসের সমসাময়িক ঘটনাবলী যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ ও সমর্থন প্রাপ্ত হইয়া-

ছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস হইতেও ইহার সমর্থন দেওয়া যায়। পনর বিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের কিরূপ দুর্গতি এবং সাধারণ বাঙ্গালি গ্রন্থকারদিগের রুচি কি রূপ জঘন্য ছিল. তাহার নুতন করিয়া পরিচয় দিবার বোধ হয় আবশ্যক নাই। অনঙ্গমোহন, রসিকরঞ্জন, জীবনযামিনী, কামিনীকুমার, দাশরথী রায়ের পাঁচালী প্রভৃতি কদর্য্য পুস্তকের কি রূপ সমাদর ছিল, কি রূপ আগ্রহের সহিত এই সকল গ্রন্থ পঠিত হইত, কি রূপ সত্বরতার সহিত এই প্রণালির গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধি পাইত, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এক্ষণে আর সে সকল দৃশ্য বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালি গ্রন্থকারদিগের মধ্যে যাহারা সুশিক্ষিত বা মার্জ্জিতরুচি নহে, তাহারাও আর সে রূপ অনাবৃত অশ্লীলতাপ্রিয় নাই। এই রুচি পরিবর্ত্তনের প্রশংসায় বঙ্গদর্শনের অনেকটা দাবি আছে। পূর্ব্বতন বঙ্গদর্শনের লেখকগণ ইহার জন্য চিরকাল বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু এই রুচিপরিবর্ত্তনের কারণ, বঙ্গদর্শনের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাবলী নহে। ইহার প্রকৃত কারণ, বঙ্গদর্শনের তীব্র সমালোচনা, সরস অথচ মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গ এবং অগ্নিময় উপহাস। যুক্তি অপেক্ষা ব্যঙ্গ অনেক সময়ে অধিকতর ফলপ্রদ। এই কারণে মাসিক সমালোচকও সময়ে সময়ে ব্যঙ্গ প্রধান প্রবন্ধ প্রকটিত করিবে—যে সকল বিষয় ব্যঙ্গের উপযোগী, তাহাই লইয়া ব্যঙ্গ করিবে। এমন অনেক উন্নত বিষয় আছে. যাহা ব্যঙ্গের অতীত; এমন অনেক পবিত্র বিষয় আছে, ব্যঙ্গ যাহাকে স্পর্শ করিবার উপযুক্ত নহে,—সে সকল বিষয় লইয়া মাসিক সমালোচক কখন উপহাস করিবে না।

মাসিক সমালোচকের যথাযথ পরিচয় দেওয়া হইল. এ কথা বলা যায় না। বাস্তবিক প্রথম দেখা সাক্ষাতে. প্রথম সম্ভাষণে তাহা অসম্ভব। প্রকৃত পরিচয়. পরবর্ত্তী ঘনিষ্টতা এবং সাহচর্য্যে। অনুষ্ঠা-

তৃবর্গের ভরসা, জনসাধারণ সে পরিচয় লইবেন। আর ভরসা, বঙ্গীয়-কৃতবিদ্যগণ মাসিক সমালোচককে আপনাদের সাধারণ উক্তিপত্র রূপে ব্যবহার করিবেন। মাসিক সমালোচক যাহাতে এ সম্মান-লাভের উপযুক্ত হয়, তৎপক্ষে যত্নের ক্রটি হইবে না।

—*—

ব্রাহ্মণ।

ভাগ্য-দেবের চিত্রপটে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ তাহার একটী প্রধান অঙ্গ। এই চিত্রের ছায়া ও বর্ণপ্রভার এক মাত্র মূল ব্রাহ্মণ জাতি, ইহা তিরোহিত হইলে চিত্রের মাধুরীও বিলুপ্ত হইবে। মাধুরী অনেক প্রকার হইতে পারে,—যে ইন্দ্রজাল প্রভাবে টিটানের "গ্লোরিয়া" দর্শকের নয়ন ও মন আকৃষ্ট করে তাহাও মাধুরী, আবার যে মোহিনী শক্তির গুণে রাফেলের "ক্রসিফিকৃশন্" খৃষ্টান ও পৌত্তলিকের নয়ন অশ্রুপূর্ণ করে তাহাও মাধুরী, কিন্তু দুইটী যে ভিন্ন মূলক তাহা বলা বাহুল্য। ভাগ্য-পটে ভারত চিত্রের মাধুরী শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত; দর্শকের আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হয় না, হৃদয় ভেদ করিয়া শোকপ্রস্রবণ উথলিয়া উঠে। ভারত এখন শ্মশান। যদি কোন চিত্রকর শ্মশানের সলিল-ধৌত সৈকতে শোকাকুল বান্ধববেষ্ঠিত শব, অদূরসজ্জিত চিতা, ভগ্নহৃদয় ধরণীলুণ্ঠিত অগ্নিদানোন্মুখ পুত্র, শ্মশানের সেই হৃদয় ভেদী প্রতিমূর্ত্তি, লোকের চক্ষুর সমীপে তাঁহার কালজয়ী তুলিকা বলে উপস্থিত করিতে পারেন, তাঁহার চিত্র যে মাধুরী-হীন, একথা কেহই বলিবেন না, তবে এ মাধুরী বিকট, মর্ম্মভেদী,—আনন্দপ্রদ নহে।

ভারতের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহার মূল একমাত্র ব্রাহ্মণ। আবার ভারতের যে অধোগতি হইয়াছে, তাহারও একমাত্র কারণ ব্রাহ্মণ। দেশ মধ্যে এক মাত্র পূজ্য বলিয়া ব্রাহ্মণের মস্তকে মুকুট পরাইয়া দেও,

আবার দেশের একমাত্র সর্ব্বনাশক বলিয়া তাঁহারই গণ্ডে চূণ কালী লেপন কর। যদি ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত থাকিত, যদি কোন ঋষি বিজন অরণ্যে বসিয়া আমাদের অনুগতির জন্য ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, অভ্যুদয়, ও অবনতির কাহিনী পুস্তকবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে আমরা দেখিতাম যে ব্রাহ্মণের সহিত ভারতবাসী আর্য্য জাতির উন্নতি ও অবনতির কত নিকট সম্বন্ধ। পুরাবৃত্তের উপকরণ যে হিন্দু জাতির ছিল না, তাহা কেহই বলিবে না। কবি বলিয়াছেন—

নরজাতি যত হের ধরা মাঝে,
সকলেরই চিহ্ন কাল বক্ষে সাজে;
নিরখিলে তায় হৃদি তন্ত্রী বাজে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় পাশরি।
এ ছার জাতির কি আছে তেমন,
কালের কপালে সঙ্কেত লিখন?
অপূর্ব্ব কিম্বা যে নূতন কেতন
উড়িছে ভবিষ্য উপরি?

আমরা ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করি। কালের কপালে এ ছার জাতির সঙ্কেত লিখন কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবাসী আর্য্যজাতি অনেক লিখন লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে. কেহ রক্ষা করে নাই বলিয়াই লোপ পাইয়াছে। যে দুই একটি সঙ্কেত এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা যখন কাল সহকারে সঙ্কলিত হইবে, তখন কবি যে অপূর্ব্ব নূতন কেতনের জন্য রোদন করিয়াছেন, তাহা আবার উড্ডীন হইবে। ইউরোপে রোম ও গ্রীস যে প্রকার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, কালে ভারতবর্ষের আধিপত্যও সেইরূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে, ইহা নিশ্চিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার যত আলোচনা করিতেছেন, আপনাদের অসীম বুদ্ধিশক্তি প্রভাবে পুরাতন আর্য্য-

জাতির বিলুপ্তপ্রায় পুরাবৃত্ত যত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, ততই তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে ভারতের সুমহৎ ভবিষ্যতের কথা ঘোষণা করিতেছেন।

ভারতবর্ষে একমাত্র যে জাতি ভারত-পুরাবৃত্ত লিখিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পুরাবৃত্তের প্রতি উদাসীন ছিলেন। ব্রাহ্মণ পার্থিব বিষয়ে আস্থাশূন্য। এই ভব সাগরের যে জল-বুদ্-বুদ্ উঠিয়া সাগরবক্ষে মিশিয়াছে, তাহার ত কথাই নাই; যাহা সৌর-কিরণে রঞ্জিত হইয়া লহরী লীলায় নাচিয়া বেড়াইত, তাহাও ব্রাহ্মণ দেখিতেন না, অতীত অথবা বর্ত্তমানের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। ব্রাহ্মণ বিশেষ রূপে জানিতেন, যে এই পৃথিবী তাঁহার বাসস্থান নহে, তিনি কালের অনন্ত পথের পথিক, ভব-পান্থশালায় আতীথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, রজনী প্রভাত হইলেই গন্তব্য পথে প্রস্থান করিবেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ পান্থশালার গোলযোগে মিশিতেন না। যাহার সহিত পারলৌকিক ভবিষ্যতের কোন সম্পর্ক নাই, যাহার অনু-ধাবনে তাঁহার মোক্ষ প্রাপ্তির সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক্, বরং তাঁহার অনিষ্ট হইবে, তাহা ব্রাহ্মণের বিশ্বাস মতে ত্যজ্য। হিন্দু জাতির যে গ্রন্থ পাঠ করিবে তাহাতেই ইহার শত শত দৃষ্টান্ত পাইবে। আধু-নিক বাঙ্গালি হয়ত নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন "আমরা অসার উপন্যাসে বিশ্বাস করি না।" আমরা তাঁহাদিগকে বলি যে, উপন্যাস অসার হইতে পারে, বিশ্বাস করিও না, কিন্তু উপন্যাস হইতে তদ্বর্ণিত লোক ও কালের মনোভাব ও অবস্থা বোধগম্য হয় না কি? যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে,—

ঋত্বিগ্‌ভ্যো হি দদৌ রাজা ধরাং তাং কুল বর্দ্ধনঃ।

*　　*　　*　　*

ঋত্বিজস্ত্বব্রুবন্ সর্ব্বে রাজানং গত কিল্বিষং।

ভবানেব মহীং কৃৎস্নামেকা রক্ষিতুমর্হতি।
ন ভূম্যা কার্য্যমস্মাকং নহি শক্তাঃ স্ম পালনে॥
রতাঃ স্বাধ্যায় করণে বয়ং নিত্যং হি ভূমিপ।
নিষ্ক্রয়ং কিঞ্চিদেবেহ প্রযচ্ছতু ভবানিতি॥
মণিরত্নং সুবর্ণং বা গাবো বস্ত্রা সমুদ্যতং।
তৎপ্রযচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ ধরণ্যা ন প্রয়োজনং॥

যে ধরণীর জীব নহে, তাহার ধরনী লইয়া কি প্রয়োজন? সে মহা ফাঁপরে পড়িয়া বলিল, রাজন্ আমি পৃথিবী পালন করিতে পারিব না, আপনি আমাকে তদ্বিনিময়ে যাহা কিছু উপস্থিত আছে দান করুন্, পৃথিবী আপনারই শাস্যা, আমি পৃথিবী লইব না। ইহা উপন্যাস হইতে পারে, কিন্তু এই উপন্যাস হইতে যিনি অন্য কোন সার সংগ্রহ করিতে না পারেন, তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন।

ব্রাহ্মণ পার্থিব সমুদয় পদার্থকে নশ্বর বলিয়া জানিতেন। কেবল জানিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, সেই বিশ্বাস মত কার্য্য করিতেন। তুমি আমি অনেক বিষয় সত্য বলিয়া জানি, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করি না। করিলে, নিঃসন্দেহ এই পৃথিবীতে মহা গণ্ডগোল বাধাইতে পারিতাম। যাহার সহিত অনাদি অনন্তের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহা কেবল নশ্বর ও পার্থিব মাত্র, যাহাতে ব্রাহ্মণের সুগভীর ভক্তি সমুদ্র আমূল আন্দোলিত করিয়া উত্তাল তরঙ্গে অন্যান্য মনোবৃত্তি প্লাবিত ও অকর্ম্মণ্য করিতে না পারিত, তৎপ্রতি তাঁহার মনোভিনিবেশ হইত না। যদ্দারা ব্রাহ্মণের ইন্দ্রিয়-সংযম ও ধর্ম্ম প্রভৃতি চরিতার্থতার কোন সাহায্য না হইত, তৎপ্রতি ব্রাহ্মণ উদাসীন। তিনি দূর তপোবনে শিখরচ্যুত-কলনাদিনির্ঝরধৌত যোজন-ব্যাপী তরুমূলে মুদিতনেত্রে অগম্য অপার পুরুষের ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, লোকালয়ের ঘটনা তাঁহার অনুসন্ধেয় ছিল না। এই কারণে যে ব্রাহ্মণ প্রাচীন জাতিগণের মধ্যে চিন্তা-

শীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন; আধুনিক সভ্য সমাজে যে সকল বিষয় এখন মনীষিতার সর্ব্বোচ্চ পরিচয় স্থল, যে ব্রাহ্মণ তন্ন তন্ন করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন, পুরাবৃত্তে তাঁহার দৃষ্টি কোন কালেই পতিত হয় নাই; সুতরাং সেখানে কেবল মাত্র মরুভূমি ধু ধু করিতেছে, যে দিকে চক্ষু ফিরাও দেখিবে, শুষ্ক বালুকারাশি, ও গভীর অন্ধকারময় কূপ, বিন্দু মাত্র জল নাই।

ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় ধিক্কার,
নরজাতি বুঝি হেন নাহি আর,
ধূ ধূ করে শূন্য পুরাবৃত্ত যার—
হেরে উঠে প্রাণ শিহরি।

ব্রাহ্মণের অবস্থা অবগত হইবার সর্ব্বপ্রধান উপায় মনুসংহিতা; অন্যান্য যাহা কিছু আছে, তাহা ইহার আনুষঙ্গিক মাত্র। ইহাতে ভূমিষ্ঠ হওনাবধি আমরণ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্ধারিত আছে। কিন্তু ইহা অষ্টাদশ মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের একাংশমাত্র। বেদের সূত্র শ্রেণীর সময়াচারিক অংশ অবলম্বন করিয়া এই মানবধর্ম্মশাস্ত্র লিখিত হইয়াছে, সুতরাং ইহাদিগকে বহুকাল-প্রচলিত রীতি পদ্ধতির সঙ্কলনমাত্র বলা যাইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য, অঙ্গিরা, অত্রি প্রভৃতির স্মৃতি আমাদের দেশমান্য, কিন্তু মনুসংহিতায় আর্য্যজতির আচার পদ্ধতি যে প্রকার বিশদ ও বহুলরূপে বিবৃত হইয়াছে, অন্যান্য স্মৃতিতে তাহা দৃষ্ট হয় না, সেই জন্য মনুর এত আদর, ও ভারতবাসী সকল কথাতেই মনুর দোহাই দিয়া থাকেন। কিন্তু মনুসংহিতা সঙ্কলিত হইবার বহু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের অবনতি হইয়াছিল,—তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত ভোগবাসনা ও তন্মূলক স্বার্থপরতা মিশ্রিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা এই উন্নতি ও অবনতির বিষয় আলোচনা করিব। ব্যাপারটি বড়ই দুরূহ, এবং সম্যকরূপে ইহার অনুসন্ধান

করিতে হইলে অনেক কাট খড়ের আবশ্যক। তাহা আমাদের সকল নাই। কিন্তু চেষ্টা করিতে দোষ কি? যদি কেহ এ বিষয় ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে পারেন, আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইব। আমরা শিখিতে অনিচ্ছুক নহি।

আমরা প্রারম্ভেই বলিয়া রাখিতেছি, যে মনুসংহিতা মনুনামধারী কোন লোকের লেখা নহে। অথবা ইহার রচয়িতার স্থিরতা নাই। রামায়ণ যে প্রকার রামের সভাস্থলে মুনিবেশধারী কুশীলব দ্বারা গীত হইয়াছিল, নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিমণ্ডলির সমীপে সৌতি যে প্রকার মহাভারত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই রূপ প্রথম অধ্যায়ের ৫৯স শ্লোকের পর হইতে সমগ্র মনুসংহিতা মহর্ষি ভৃগু কর্ত্তৃক মুনিগণের সমীপে কীর্ত্তিত হইয়াছিল। ভৃগু স্বয়ং মনুর নিকট ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এতদ্বোঽয়ং ভৃগু শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ।
এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্ব্বমেষোঽখিলং মুনিঃ॥

মনু সং। ১ম অ। ৫৯ শ্লোঃ।

"ভৃগু এই শাস্ত্র আদ্যোপান্ত তোমাদিগকে শ্রবণ করাইবেন; যে হেতু তিনি আমার নিকট হইতে এই শাস্ত্র সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন।" এই স্থলে মনু মৌনাবলম্বন করিলে, ভৃগু সমবেত ঋষিমণ্ডলিকে সম্বোধন পূর্ব্বক শ্রূয়তামিতি বলিয়া আরম্ভ করিলেন—

ততস্তথা স তেনোক্তোমহর্ষির্মনুনা ভৃগুঃ।
তানব্রবীদৃষীন্ সর্ব্বান্ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি॥

মনু সং। ১ম অ। ৬০ শ্লো।

"অনন্তর মহর্ষি ভৃগু ভগবান মনু কর্ত্তৃক সেই প্রকার কথিত হইয়া

শ্রবণ করুন বলিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন।* মনুসংহিতা কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই। সার উইলিয়ম জোন্সের মতে ইহা খৃঃ শতাব্দির বার শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের মূল যাহা, পাঠক তাহা জ্ঞাত আছেন। বেদের ভাষার সহিত সংহিতার ভাষাগত পার্থক্য দেখিয়া এই সময় নিরূপিত হয়। আর এক দল পণ্ডিতেরা বলেন খৃঃ শতাব্দির নয় শত বৎসর পূর্ব্বে মনুসংহিতা লিখিত হইয়াছিল। ভারতবাসীদের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার, আলেকজন্দরের অনুচরগণের বর্ণিত বৃত্তান্ত ও সংহিতার লিখিত আচার পদ্ধতির পরস্পর তুলনা করিয়া এই সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু নির্দ্ধারণকারীরা সরল ভাবে স্বীকার করিয়াছেন-যে, ইহা অনিশ্চিত ও সম্ভবতঃ ভ্রান্তিমূলক। ইংলণ্ডের সভ্যতার ইতিহাস লেখক বকল্ সাহেব এই মতের অনুগামী। কাউয়েল্ সাহেব প্রভৃতি বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের মতে মনুসংহিতা খৃঃ শতাব্দির তিন শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।

সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা বলেন, তাহাই শোভা পায়। যদি নবদ্বীপ কিম্বা বারাণসির টোলের বেদস্মৃতি অধ্যায়ী কোন ছাত্র সার উইলিয়ম জোন্সের ন্যায় মনুসংহিতার সময় নির্দ্ধারণ করিতেন, অধ্যাপক নিশ্চয়ই তাহাকে কর্ণমর্দ্দিত করিয়া টোল হইতে নিষ্কাসিত করিতেন। বৌদ্ধগ্রন্থ ললিত-বিস্তরের সময় নির্দ্ধা-

* পূজ্যপাদ মৃত ভরত চন্দ্র শিরোমণি কৃত মনুসংহিতার বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে আমরা উপরোক্ত অনুবাদ গ্রহণ করিলাম। কিন্তু শিরোমণি কৃত অনুবাদ সকল স্থলে বোধগম্য নহে। তিনি বাস্তবিক কুল্লুক ভট্টকৃত টীকার অনুবাদ করিয়াছিলেন, মূলের প্রতি বড় একটা লক্ষ্য ছিল না। আমরা যতদূর পারি এই অনুবাদ অবলম্বন করিয়া চলিব।

রণ সম্বন্ধে যে হাস্যকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা মনুসংহিতায় সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। এক খান সংস্কৃত পুস্তক পাইলেই তাহার সময় নিরূপণ করা আবশ্যক, অতএব ললিত বিস্তরের ভাষা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষার সহিত তুলনা করিয়া সাহেব মহলে স্থির হইল যে, খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দিতে ইহা লিখিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে কখনই নহে, কারণ তাহার ভাষা আধুনিক পুরাণ সমূহের ভাষার অনুরূপ। এই সিদ্ধান্তের কিছু কাল পরে মসো জুলিয়েন্ চীন পরিব্রাজক হুয়েং সাংএর ভ্রমন বৃত্তান্ত অনুবাদ করিলেন, ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ দলে তাহা লইয়া মহা আন্দোলন উঠিল। এই গ্রন্থে হুয়েং সাং স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধদিগের মঠে বাস কালে তিনি ললিত-বিস্তর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ৬২৯ খৃঃ অব্দে হুয়েং সাং ভারতবর্ষে আগমন করেন।

মনুসংহিতার সময় নিরূপণ সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে চাহি না, কারণ ইহার কিছুই নিশ্চয় নাই। উপরোক্ত তিনটি মতের একটিও আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আজও ইহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কালে সংস্কৃত ভাষা সম্যক্‌রূপে আলোচিত হইলে কি হইবে, জানি না। গ্রন্থের ভাষাগত পার্থক্য দর্শনে অথবা তদ্বর্ণিত আচার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারণে গ্রন্থের সময় নিরূপণ হওয়া দুষ্কর। রামায়ণ যে শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই, অথচ বাল্মীকি বলিয়া গিয়াছেন যে, দশরথের যজ্ঞস্থলে—

ব্রাহ্মণা ভুঞ্জতে নিত্যং নাথবন্তশ্চ ভুঞ্জতে।
তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভুঞ্জতে।

বালকাণ্ড। ১৪শ স। ১২ শ্লো।

রামানুজ টীকায় বলিলেন, "শ্রমণাঃ বৌদ্ধ সংন্যাসীনঃ।" আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা যে কিরূপ গোলযোগ বাধাইবেন, তাহা রামানুজ স্বপ্নেও মনে করেন নাই। কিম্বা হয়ত আশঙ্কা করিয়াই পরে বলিয়াছেন, "যদ্বা শ্রমণ পদং সন্ন্যাস্যুপলক্ষণং।" তোমার যাহা খুসি লইতে পার।

এখনও সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু মাত্র অনুসন্ধান হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যত মনোযোগ করিবেন, ততই নুতন নুতন বিষয় আবিষ্কৃত হইবে, এবং তখন খৃঃ শতাব্দির তিন শত, নয় শত অথবা এগার শত বৎসরের পূর্ব্ব সময় মনুসংহিতার রচনাকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে না। তখন কোন নূতন হুয়েং সাং আসিয়া এই মত উল্টাইয়া দিবেন।

যে মনোবৃত্তির প্রভাবে ভারতবর্ষে বর্ণবিভেদ হইয়াছে, উপস্থিত প্রস্তাবে তাহার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; অতএব আমরা ব্রাহ্মণ জাতির তত্ত্বানুসন্ধানের পূর্ব্বে তৎ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মানুষ স্বভাবত ভক্তিপরায়ণ। ভক্তি বৃত্তির চরম সীমা ঈশ্বর,—মধ্যে অনেক গুলি ক্ষুদ্র বিভাগ আছে। যে কারণে কলিকাতার গড়ের মাঠে বায়ুবেগগামী ঘোড়া দেখিয়া আমরা আনন্দে করতালি দেই, দুর্গোৎসবের অষ্টমী পূজার দিনে প্রতিমার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে গগনভেদী বাদ্যধ্বনি-উত্তেজিত সমবেত লোকমণ্ডলির "মা" "মা" শব্দে সেই কারণেই আমাদের সমুদয় কেশ শিহরিয়া উঠে, এবং যতই কেন পাশ্চাত্য সভ্যতানুরাগী হও না, সেই মাধুর্য্যহীন মানসোন্মাদি শব্দে তোমার হৃদয় গুরু গুরু করিবে। অসাধারণ ক্ষমতার দর্শন ও চিন্তায় মানুষ আত্মবশহীন হইয়া পড়ে, ও তন্মূলক এই সকল লক্ষণের প্রাদুর্ভাব হয়। ঘোড়দৌড় স্থলে কিম্বা রায় চৌধুরীদের পূজার

বাটিতে, যেখানেই বল, মানুষ এই মনোবৃত্তির দাস। তিনি মিল্, কোমৎ, রুশো প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থ, চার্ব্বাক দর্শন, সাংখ্য দর্শন ও ভারতস্থ সমুদয় দর্শন পাঠ করিয়া হয় ত স্থির করিয়াছেন, যে তিনি নাস্তিক, বিশ্বের বৈচিত্র এবং মহান্ ভাব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার মানসে ভক্তির তরঙ্গ উঠে না; ধর্ম্ম সংসৃষ্ট কোন বিষয় দ্বারা তাঁহার হৃদয় রূপ প্রশান্ত মহাসাগর কখন আন্দোলিত হয় না; যে ঘটনায় সমাজের সুগভীর তলস্থ বারিরাশি উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে, তদ্দর্শনে তাঁহার নাসাগ্র কুঞ্চিত হইয়া ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যের আবির্ভাব হয়,— যিনি মনে মনে আপনাকে এ প্রকার মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি বাস্তবিক মহাপুরুষ নহেন,। তিনি অতি ক্ষুদ্র পুরুষ—সংসার স্কুলেগাধার টুপি পরাইয়া তাহাকে বেঞ্চের উপর তুলিয়া দেও, আমাদের কোন আপত্তি নাই, কারণ তিনি নির্দ্দিষ্ট পাঠ অভ্যাস করেন নাই। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রদীপের তৈল পোড়াইয়াছেন, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট, দেহ কঙ্কাল সার ও মস্তক কেশশূন্য হইয়াছে, অথচ নির্দ্দিষ্ট পাঠ কিছুমাত্র অভ্যাস হয় নাই। মানব মনোচিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক প্রদেশে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয় নাই। যে সকল বন্ধনে সমাজ অলক্ষ্যভাবে আবদ্ধ, যাহার একটি ছিন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ সমাজবিপ্লব উপস্থিত হয়, যাহাদের সমষ্টি আমাদের সুখ দুঃখের এক মাত্র মূল, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বন্ধনির বিষয় তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভক্তি, মানবসমাজস্থায়িত্বের একটি প্রধান অঙ্গ। মানব মনোচিত্র হইতে এই বৃত্তি মুছিয়া ফেল, চিত্র এককালে নষ্ট হইবে। যে ইন্দ্রজাল প্রভাবে তৎপ্রতি দর্শকের নয়নাকৃষ্ট হইত, তাহার লোপ হইয়া কেবল মাত্র বস্ত্র ও কাষ্ঠ ফলক অবশিষ্ট থাকিবে।

সাধারণত ভক্তি বলিলেই ঈশ্বরভক্তি বুঝায়। যিনি এই সুবিশাল বিশ্বে কেবল মাত্র স্রষ্টার কৌশল, করুণা ও মহিমা দেখেন, ও

তদ্দর্শনে পুলকিত চিত্তে তাঁহার প্রেমসাগরে ক্রমশঃ নিমগ্ন হইতে থাকেন, লোকের নিকট তিনিই ভক্ত বলিয়া পরিচিত। এই সাধারণ বিশ্বাস এক্ষণে দিন দিন ভ্রম মূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বুঝিতেছেন যে, যে মনোবৃত্তি তৃপ্তির জন্য চৈতন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, যাহার উত্তেজনায় য়ীহুদাদেশে মহর্ষি ঈশা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল এক মাত্র ঈশ্বরে আবদ্ধ নহে। তাঁহারা দেখিতেছেন, যে এই তরুর শাখানিচয় যেমন ঊর্দ্ধে গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তেমনি ইহার মূল সকল মানব সমাজের গূঢ়তম স্থলে প্রবেশ করিয়াছে। এই বৃত্তির প্রভাবে সমাজের সৃষ্টি হইতে অদ্যাবধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সামাজিক পদবিভেদ হইতেছে। দিল্লির মোগল সম্রাট্ ইহারই সাহায্যে ময়ূর তক্তে বসিয়া ভারত শাসন করিতেন, ইহারই উত্তেজনায় ফরাসিস্ জাতি নেপোলিয়নের পদে ধন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র সৃষ্টি এই বৃত্তি-মূলক।

ক্ষমতা দুই প্রকার, বুদ্ধিমূলক ও অর্থমূলক,—দৈহিক শক্তিও ক্ষমতার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, এবং তাহাও ভক্তি বৃত্তির উত্তেজক, সুতরাং ক্ষমতা তিন প্রকার বলিলেও ক্ষতি নাই। মানব বুদ্ধি যতদিন মার্জ্জিত না হয়, তত দিন দৈহিক ও আর্থিক ক্ষমতা সমাজে প্রাধান্য লাভ করে। আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলেও সমাজে দৈহিক ক্ষমতার গৌরবহানি হয় না, কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তির উৎকর্ষের সহিত এই উভয়বিধ ক্ষমতাই ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। দৈহিক ক্ষমতাকে পাশব ক্ষমতা বলিলেও চলিতে পারে। সমাজে বুদ্ধিমূলক ক্ষমতার অভ্যুদয়ে আর্থিক ক্ষমতা কার্য্যকর হয় না, অর্থাৎ তখন আর্থিক ক্ষমতা সমাজে কোন স্থায়ী ফল উৎপন্ন করিতে পারে না। আর্থিক ক্ষমতার দ্বারা বুদ্ধিমূলক ক্ষমতার সাহায্য হইতে পারে সত্য, কিন্তু তদুদ্ভূত কার্য্যের

এক মাত্র কারণ বলিয়া শেষোক্ত ক্ষমতাকেই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আর্থিক সাহায্য না পাইলে হয় ত অনেক ধীমান ব্যক্তি আপনাদের বিস্ময়কর বুদ্ধিবলের পরিচয় দিতে পারিতেন না,—কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কৃত হইত না, এবং টাইকোব্রেহী উরাণিবর্গের মানমন্দিরে নিশ্চিন্ত মনে জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চা করিতে পারিতেন না। কিন্তু আর্থিক সাহায্য না পাইলে বুদ্ধিবৃত্তি চিরকাল অপরিস্ফুট থাকে না, বিলম্ব হয় মাত্র। গিরিকন্দর ভেদ করিয়া যে কলনাদি প্রস্রবণ নির্গত হয়, তাহার গতিরোধ চেষ্টা বিফল,— যে করে সে প্রাকৃতিক নিয়মের গূঢ় তত্ত্বের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রধাবিত বারিরাশির গতিপথে যত ইচ্ছা প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ কর, তাহার গতিরোধ হইবে না,—তোমার প্রস্তর ছাপাইয়া ফেণচূড় তরঙ্গমালা কলরবে নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইবে, প্রস্তর অতল তলে ডুবিবে। কোন স্বাভাবিক ঘটনার গতিরোধের জন্য আয়োজনের তত আধিক্য, তাহার প্রতি পদে বাধাস্থাপন করিতে যত অধিক প্রয়াস, সেই গতি সেই পরিমাণে তত অনিবার্য্য। কন্দর নিঃসৃত প্রস্রবণের পথ হইতে বৃহদুপলখণ্ড সরাইয়া রাখ, বন্ধুর ভূমি সমতল করিয়া দেও, যদি ক্ষমতা থাকে, প্রস্তরময় সুয়েজ কাটিয়া উভয় সমুদ্রের মিলনপথ পরিষ্কার কর, দেখিবে, কেমন কলরবে স্বচ্ছ সলিল বহিয়া যাইবে, প্রবাহিনীর তটদ্বয় প্রকৃতির হরিত বসনাবৃত হইবে, পাখীরা ঝঙ্কার করিবে, যাহা শুষ্ক বিজন মরুভূমি ছিল, তাহা রত্নপ্রসূ জনপূর্ণ প্রদেশ হইয়া উঠিবে। আর তাহার পথ বন্ধুর কর, অভ্রভেদী গিরিশঙ্কট আনিয়া তাহার পথে রাখ, দেখিবে, প্রকৃতিতাড়িত সেই জলরাশি কি লোমহর্ষক ব্যাপার উপস্থিত করে, সহস্র বজ্রনাদে নায়াগারার জলপ্রপাত পৃথিবী ভেদ করিয়া পতিত হইবে, তুমি তাহার পথে দাঁড়াও, চূর্ণ হইয়া যাইবে, স্রোতের গতিরোধ হইবে না। গঙ্গার আগমনে সগর কুল উদ্ধার হইল, আর

ভগিরথোঽপি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ।
প্রায়াদগ্রে মহাতেজা গঙ্গা তং চাপ্যনুব্রজেৎ॥
গগনাচ্ছঙ্করশিরস্ততো ধরণিমাগতা।

এই জন্য ভগিরথ ধন্য হইলেন। কিন্তু ঐরাবত তাহার কি দশা হইয়াছিল? বলদর্পী দেবহস্তী তরঙ্গ হইতে অতিকষ্টে প্রাণ বাঁচাইরা প্রতিজ্ঞা করিল, যে সে আর কখন নদীর গতিরোধ করিবে না। কাল-বারিসিক্ত ভক্তর প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুম তোমার অনলকণাবর্ষী সূর্য্য শুকাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

—*—

উত্তরে সখীর প্রতি।

(১)

নিছে কেন বল সখি ব্যাকুলিতা আমারে,
মিছে কেন হ'য়ে ভ্রান্ত আমারে করিছ শান্ত,
নির্দয় নিঠুর কান্তে বলিছ বারে বারে?
সখিরে আর না ভুলে, বলোনা এ শ্রুতি মুলে,
হেন নিদারুণ বাণী আমার সে তাহারে,
কোমল সে ফুলসম, প্রাণকান্ত প্রাণ মম
কঠিন বলিলে বাজে এ হৃদয় মাঝারে।
সত্য বটে কথা ঠিক, আমার সে প্রাণাধিক,
গত হ'লো কত দিন এ আবাসে আসে না,
তাই কি ভেবেছ সই, আমি আর তার নই,
তাই কি প্রাণ তারে আর ভাল বাসে না?
সখিরে সোহাগে যারে, সাজায়েছি প্রেম হারে,
প্রেম খতে মন প্রাণ বাঁধা দিয়ে জীবনে,

তাঁরে কিলো পুনরায়, এ জনমে ভোলা যায়,
নিশীথে নিদ্রায় তায় নিরখি এ নয়নে।
ওইযে লো মধ্যস্থলে, সরসীর স্বচ্ছ জলে,
শরৎ চাঁদের ছায়া পড়িয়াছে যেমতি,
স্থির শান্ত প্রেম সরে, সখি এ হৃদি অন্তরে,
তার সে মধুর মূর্ত্তি আঁকা আছে তেমতি।
দিবা নিশি হেরি তারে, কি আলো কি অন্ধকারে,
এ সরেতে চির হাসি পৌর্ণমাসী রজনী,
আসে বা না আসে কাছে, সেই ভাল ভাল আছে
আমার ত স্মৃতি আছে, কি ভাবনা স্বজনি?
সখি কি বলিব তোরে, বড়ই কপাল জোরে,
সে হেন রতনে প্রাণ সপিবারে পেয়েছি,
রূপে স্নিগ্ধ দরশন, গুণেতে বিভোর মন,
একাধারে প্রেমাধারে পেয়েছি যা চেয়েছি।

(২)

এক দিন (ও) সহচরি এ রমণী জনমে,
আহা মরি ভাগ্যবতী, কে আছে এমন সতী,
এ নারী জনমে সখি এক দিন (ও) তরেলো,
আমারে আমার বলি, প্রণয় আবেশে ঢলি,
রেখেছিল প্রাণ সখা হৃদি মাঝে ধরেলো!
এক দিন (ও) অনুরাগে, নিষ্কাম প্রেমের যাগে,
যাপিয়াছি মধুমাসে মধুমাখা যামিনী,
কুসুমিত উপবনে, এক দিন (ও) প্রিয় সনে,
দেখিয়াছি কুঞ্জবনে জলধরে দামিনী।

শোন্ তবে সহচরি এরমণী জনমে,
করেছিলো অভিমান, প্রাণেশ আকুল প্রাণ,
বিনয়ে ভাঙ্গিল মান উহুমরি সরমে!
এ নারী জনমে সখি এক দিন (ও) তরেলো,
করেছি মোহন বেশ, প্রীতি মুগ্ধ হৃদয়েশ
মন্ত্রমুগ্ধা অধীনীর ধরি দুটি করেলো—
লক্ষ্য করি অলঙ্কার, বলেছে "একি বাহার
"প্রিয়তমে আজি মোর সুপ্রসন্ন কপালে
"চাঁদেতে ফুটেছে ফুল, এরূপের নাহি মূল"
"সুন্দরে সুন্দর দিয়ে কি সুন্দর ঘটালে"
প্রতিদানে ভালবাসা সখিরে না করি আশা
যাহারে বাসিয়া ভাল সদা পাই সুখ লো,
একদিন (ও) একদিন, সে ত হ'য়ে প্রেমাধীন,
আমারে ভুলেছে সখি সুখের কি সুখ লো।
সার্থক পূজেছি হরে, তাই লো দেবের বরে,
সে হেন রতনে প্রাণ সপিবারে পেয়েছি,
রূপে স্নিগ্ধ দরশন গুণেতে বিভোর মন
একাধারে প্রেমাধারে পেয়েছি যা চেয়েছি।

(৩)

কেমন সে ভালবাসা জিজ্ঞাসিছ আমারে?
হায় সখি নাহি জানি, ধরাতলে কোন বাণী
কি আছে এমন ভাষা কহিবে তা তোমারে।
সখিরে আপনা ভুলি কেমনে ধরিব তুলি
অনন্ত আকাশ ছবি চিত্রপটে আঁকিতে,

রঞ্জিয়া আপন হৃদি বঞ্চি নাথে প্রেমনিধি
কি ছার প্রতিমা দিব প্রেম মূর্ত্তি লিখিতে।
কোন্ পটু চিত্রকরে কোন্ দেবতার বরে
নরলোকে সে মুরতি চিত্র করে রেখেছে।
যশোদার স্নেহভাব গোপিকার অনুরাগ
রাধার পিরীতি দিয়ে কেবা ভাল বেসেছে?
কত ভালবাসি তারে বলিব তা কেমনে?
কলসী করিয়া হায় কভু কি দেখান যায়
মহাসাগরেতে কত বারি আছে ভুবনে?
কত ভাল বাসি তারে আমিই সে জানিনারে
তোমারে সঙ্গিনি আমি জানাব তা কেমনে!
তবে সখি বরষায় যেমন নদীর কায়
উথলিলে দুই কুলে বারি ধায় বিহরি
যখনি সে মনে জাগে— কখনি বা নাহি জাগে?-
ছাপাইয়া হৃদি, উঠে কি সুখের লহরী।

(৪)

কত ভালবাসি তারে বলিব তা কেমনে,
কলসী করিয়া হায়, কভু কি দেখান যায়,
মহাসাগরেতে কত বারি আছে ভুবনে?
সখি কি বলিব তোরে, বড়ই কপাল জোরে,
সে হেন রতনে প্রাণ সপিবারে পেয়েছি,
রূপে স্নিগ্ধ দরশন, গুণেতে বিভোর মন,
একাধারে প্রেমাধারে পেয়েছি যা চেয়েছি।

———

বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা।

আজকাল বাঙ্গালার অবস্থা লইয়া অনেকেই গণ্ডগোল করিয়া থাকেন। কৃতবিদ্য, অর্দ্ধশিক্ষিত অথবা মূর্খ, যাহাকেই শুধাইবে, সেই নিজের মত প্রকাশ করিবে,—এ বিষয়ে উদাসীন অথবা মতহীন কেহই নাই। সাধারণতঃ বিশ্বাস এই যে, ব্রিটিশ শাসনাধীনে বাঙ্গালার অধোগতি হইতেছে, এখন বাঙ্গালী পূর্ব্বের ন্যায় সুখী নহে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে, গৃহস্থগণ বিনা আয়াসে যে সকল সুখ ভোগ করিতে পারিতেন, এখন সে সকল সুখে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন। গৃহস্থের আলস্যপরতন্ত্রতা ইহার কারণ নহে। তিনি পূর্ব্বে যে রূপ পরিশ্রম করিতেন, এখন তাহার শত গুণ অধিক খাটিতেছেন,—প্রাতে দশটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত কেরাণীর ডেক্সে বসিয়া কলম পিসিতেছেন, সমস্ত দিন মাঠে পড়িয়া, রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, পেটের জ্বালায় দিবারাত্রি ক্ষিপ্ত কুকুরের মত দৌড়িয়া বেড়াইতেছেন, তথাপি তাঁহার অন্নের সংস্থান হয় না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বিষণ্ণ বদনে মৃদুস্বরে বলিবেন যে, "এই পৃথিবীতে যাহাদের ভালবাসি, যাহাদের বক্ষে ধারণ করিয়া শরীর জুড়ায় ও সংসারের এই দারুণ অন্নের জ্বালাও ভুলিয়া যাই, যদি তাহাদের সুখী করিতে না পারিলাম, নিজে রৌদ্রে পুড়িয়া যদি তাহাদিগকে শীতল ছায়াতলে বসাইয়া রাখিতে না পারিলাম, তবে আমার বাঁচিয়া কি সুখ? সকলে বলে, ইংরাজের রাজত্বে সুখ বাড়িয়াছে,—দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে, মারিভয় দেশছাড়া হইয়াছে, প্রকৃতির যে বিষদন্তাঘাতে বাঙ্গালির জীবন নাশ হইত, তাহা সমূলোৎপাটিত হইয়াছে, বঙ্গলক্ষ্মী আবার মস্তক তুলিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু আমি ত ইহার কিছুই সত্য মনে করি না। দেশে শান্তি ও স্বাস্থ্য বিরাজ করিলে আমার ত কোন লাভ নাই, আমি যে অন্নের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি। দেশে বণি

আসুক, মোগল পাঠান আসুক, দেশ ছিন্ন ভিন্ন দগ্ধ হউক গৌরের মারিভয় ফিরিয়া আসিয়া সমুদায় দেশে ব্যাপ্ত হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? করুণাশূন্য, পরস্বাপহারী, যোদ্ধানামকলঙ্ক মহারাষ্ট্র অশ্বারোহীর খড়্গাঘাতে অথবা সিন্ধুপারবাসী হিন্দুশোণিতপিপাসু যবনের তীক্ষ্ণ অসিধারে প্রাণ যায় যাকৃ,—এ প্রকার বিন্দু বিন্দু করিয়া মরার অপেক্ষা একেবারে মরা সহস্র গুণে ভাল। সংসারে আমার সুখ হইল না, ইংরাজের রাজত্ব ভাল হয়, উত্তম, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না,—এখন জননীর করাল ছায়াময় ক্রোড়ে ঘুমাইব, শরীর অবশ হইয়াছে, আর চরণ চলে না।”

আর এক শ্রেণীর গৃহস্থ আছেন, তাঁহারা বলেন, “কায়ক্লেশে আমাদের অন্নের সংস্থান হয় সত্য, কিন্তু আমাদের সংসারে আশা তাহাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সংসারে যে মানুষ মানুষতা করিব, সে উপায় আমাদের নাই,—পূর্ব্বে স্বর্গীয় কর্ত্তাদের আমলে ছিল, এখন ইংরাজের রাজত্বে তাহা শেষ হইয়াছে। লোকের নিকট ভদ্র বলিয়া মান বজায় রাখিতেই আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, পৈতৃক ক্রিয়া কলাপ বজায় রাখিবার ক্ষমতা আমাদের কিছুমাত্র নাই। কর্ত্তারা অল্প বেতনে রাজসরকারে চাকরি করিতেন সত্য, কিন্তু বারমাসে তের পার্ব্বণের একটিও ফাঁক যাইত না, ও প্রতি কার্য্যে হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। কেবল তাহাই নহে, সেই ২০। ২৫ টাকা বেতনের চাকরির আয়ে দোল দুর্গোৎসব করিয়া আবার সম্পত্তি ক্রয় করিতেও সক্ষম হইতেন। আমরা তাঁহাদের বেতনের অপেক্ষা দশপনের গুণ অধিক বেতন পাইতেছি, তথাপি অন্ন বস্ত্রের সংযোটন করিতেই প্রাণান্ত হয়।”

এই দুই শ্রেণীর আর্ত্তনাদের সহিত বাঙ্গালার রাইয়ত শ্রেণীর অশ্রুধারা নীরবে প্রবাহিত হইতেছে। ঈশ্বর রাইয়তদিগকে আর্ত্তনাদের শক্তি প্রদান করেন নাই, কিম্বা আর্ত্তনাদের শক্তি পাইয়াও

তাহারা সে শক্তির ব্যবহার করিতে জানে না। পুরুষানুক্রমে ইহারা অন্নহীন, সুতরাং অন্নাভাবে এক প্রকার অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। মানব-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া মনুষ্যের ভোগ্য বস্তু ইহারা চিনে না,—উপবাস করিতে আসিয়াছে, উপবাস করিয়া যাইবে। যে করুণাময়ী জননী তোমার আমার জন্য এই সংসার সুখপূর্ণ করিয়াছেন, রাইয়তের অবস্থা দেখিলে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, যে তিনি তাহার কথা বিস্মৃত হইয়া-ছেন। রাইয়ত নীরবে পদদলিত হইতেছে, অধিক বাড়াবাড়ি হইলে নয়ন জলেই সে আধিক্য ধৌত করিয়া ফেলে ও ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া মনে ভাবে "আর কত দিন?" কিরূপে কষ্টের কথা প্রকাশ করিতে হয়, তাহা শিখে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া রাইয়তের কষ্টের অস্তিত্ব লোপ হয় নাই। জরায়ু হইতে ভূপতিত হওয়া অবধি শ্মশানে চিতায় শয়ন পর্য্যন্ত রাইয়ত অন্নের জ্বালায় কাতর। সূর্য্যোদয় হইল, অমনি হলস্কন্ধে শামসেখ বলদ লইয়া মাঠে চলিল, সমস্ত দিন ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া রৌদ্রে সিদ্ধ হইল,— রৌদ্র বড় একটা লাগে না,. চামড়া পুড়িয়া অসাড় হই-য়াছে। অবশেষে সন্ধ্যার সময় শামসেখ বাটী ফিরিয়া আসিল। বাটী আসিয়া স্কন্ধের হল না নামাইতেই তিন বৎসর বয়স্ক শিশু, মৃদু আধ আধ স্বরে শামসেখের জানুদ্বয় ধরিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "বাবা, ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দে।" অদূরে ভগ্ন কুটী-রের পিঁড়ায় বসিয়া শামের গৃহিণী রোদন করিতেছে, নিকটে বড় ছেলেটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে ঘুমাইয়াছে, অভাগিনী এক এক বার তাহার উপবাসমলিন মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে, আর চক্ষুর জল শত-স্রোতঃ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। সমস্ত দিন শামের নাম করিয়া ছেলেদের ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, এখন শাম আসিয়াছে দেখিয়া ছোটটি বলিল "মা, বাবা ত এয়েছে, ভাত দে।" বড় ছেলে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল "মা, ভাত হয়েছে কি?" শামের শ্রান্তিদূর হইল,

চিকীৎসা হোমিওপেথি মতে নিষ্পন্ন।—বিষে বিষ ক্ষয়। লাঙ্গল নামাইয়া, শাম ছেলে দুটিকে বুকে করিয়া লইল, বলিল "তোরা এখনও খাসনি, কেন সেজ ঠাকুর ধান দেবে বলেছিল যে ?" গৃহিনী অগ্রসর হইয়া বলিল, সে ধান আনিতে গিয়াছিল, কিন্তু সেজ ঠাকুর গত সনের হিসাব দেখে বলিল, আর সনের দরুণ ধান বাঁকি আছে, বকেয়া শোধ না হইলে নুতন দাদন দিবে না, সুতরাং ধান পায় নাই। পাড়ার লোকেও ধার দিতে সম্মত নহে। কাজেই সারাদিন খাওয়া হয় নি। শ্যামের মনে যে ভাবের উদয় হইল, তাহা ভগবানই জানেন. তুমি আমি বড় একটা জানি না, জানিলেও কেবলমাত্র এক "আহা !" দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি করি।

উপরোক্ত প্রথম দুই শ্রেণীর সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতে অত্যুক্তি নাই। রাইয়ত শ্রেণীর কথাও আমরা অত্যুক্তি বলিয়া স্বীকার করি না। এখন অনেকে মনে করেন, যে বাঙ্গালার কৃষক দলের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে, আমরা ইহা কিয়ৎপরিমাণে সত্য বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু কৃষকদিগের মধ্যে অনেক লোক আছে, তাহারা কৃষক নহে, অপরের ক্ষেত্রে দৈনিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। আমাদের উপরোক্ত শামসেখ শেষোক্ত শ্রেণীর লোক। তাহাদের সমস্ত দিনে এক সন্ধ্যার অধিক অন্ন জোটে না। সপরিবারে সমস্ত দিবস শুকাইয়া দিনান্তে একবার মাত্র ভোজন করে, তাহাও আবার পেট ভরা হয় না। কি করিয়াই বা হইবে ? শামসেখ ম্যাল্‌থসের প্রজাবৃদ্ধির নিয়ম অথবা মিল্ সাহেবের অর্থব্যবহার পাঠ করে নাই। দশ বৎসর বয়স না হইতেই, পিতা হসনু সেখ, শামের গর্ভধারিণীর অনুরোধে, দুইটা বুড়া গাই বেচিয়া শামের বিবাহ দিয়াছিল, এখন তাহার ফল ধরিয়াছে,—একটি দুইটি করিয়া অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে, শামের গৃহিনী বলে, "খোদা আমারে এই গুঁড়া কয়টি

দিয়াছেন, বেঁচে থাক্।” উত্তম, রক্তমাংসের শরীর হইতে যে এই রূপ গুঁড়া বাহির হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে৷ কিন্তু গুঁড়ারা খাইবে কি? পরিবারের মধ্যে এক মাত্র উপার্জ্জক শ্যাম, মজুর খাটিয়া সমস্ত দিনে দুই আনা মাত্র উপার্জ্জন করিতে পারে। এই দুই আনায় যে চাউল ক্রয় করা যায় তাহার অন্নে দুই জনের পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা সাত জনের প্রাণধারণ করিতে হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা, মানুষে দুই সন্ধ্যা খাইতে পায়, ইহা বিশ্বাস করে না, সুতরাং আপনাদের জীবনব্যাপী উপবাস লইয়া গোলযোগও করে না।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান অন্নকষ্টের তথ্যানুসন্ধান করিতে সকলেই ব্যগ্র। আমরাও বর্ত্তমান প্রস্তাবে ইহার তথ্যানুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব। সাধারণতঃ সকলে, দেশের লোকসংখ্যাবৃদ্ধি এই কষ্টের এক মাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ইহার একটি কারণ হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র কারণ নহে। আরও অনেক কারণ আছে, ও তাহার সমষ্টির ফল, বর্ত্তমান অন্নকষ্ট। আমরা একে একে এই কারণ গুলি বিবৃত করিব।

লোক সংখ্যা। গত ১৮৭২ সালের লোকসংখ্যা নিরূপণের পূর্ব্বে বাঙ্গালার লোকসংখ্যা কত ছিল, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে অনেক খ্যাতনামা লোক স্ব স্ব মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে তাঁহাদের প্রচারিত সংখ্যার একটিও সত্য নহে। তাঁহারা স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি অঙ্ক মাত্র কাগজে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, দেশের লোকসংখ্যার সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে, কোম্পানি বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার দেওয়ানি পাওয়ার পরে, এই কয়েক দেশের লোকসংখ্যা এক কোটি নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু এই নির্দ্ধারণের পরে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অনুসন্ধানের দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন, যে এই সংখ্যা

প্রকৃত নহে, তাহা অনেক অধিক হওয়া উচিত। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে সার উইলিয়ম জোন্স, বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা ও বারাণসি প্রদেশের লোক সংখ্যা দুই কোটী চল্লিশ লক্ষ অনুমান করেন। ১৮৭২ সালের লোক সংখ্যার সহিত ইহার পরিমাণ ধরিলে, তৎকালে বাঙ্গালায় এক কোটি লোকের অধিক ছিল এমন বোধ হয় না। কিন্তু ইহা সার উইলিয়ম জোন্সের অনুমান মাত্র. এই অঙ্ক নির্দ্ধারণের মূল, তাঁহার কল্পনা শক্তি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। * ১৮০১ সালে কোলব্রুক সাহেব এই কয় প্রদেশের লোকসংখ্যা তিন কোটি বলিয়া স্থির করেন। তৎকালে লর্ড ওয়েলেসলি আমাদের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। লোক সংখ্যা স্থির করিবার জন্য জেলার কালেক্টর ও জজগণের নিকট হইতে তালিকা তলব করা হয়, ও তাঁহারা যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তদনুসারে উপরোক্ত লোক সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৩৫ সালে, রংপুরের মাজিষ্ট্রেট আডাম সাহেব এই তালিকার লিখিত সংখ্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে ইহা কেবল আমলাগণের কথার উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, সুতরাং ইহা ভ্রমপূর্ণ ও বিশ্বাসের অযোগ্য *। ১৮১২ সালে, পার্লিয়ামেণ্টের সিলেক্ট কমিটি তাঁহাদের যে পঞ্চম রিপোর্ট পার্লিয়ামেণ্টে প্রদান করেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, যে পূর্ব্বোক্ত গণনা সকল কিছু মাত্র বিশ্বাস্য নহে *। সিলেক্ট কমিটি বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও বারাণসি প্রদেশের লোক সংখ্যা ২,৭০,০০,০০০ বলিয়া অনুমান করেন। ১৮৭২ সালের সংখ্যার সহিত পরিমাণ করিলে, তৎকালে বাঙ্গালা প্রদেশে এক কোটি লোকের অধিক ছিল না বলিয়া বোধ হয়।

* See Report on the Census of Bengal 1872. Part II, Ch. I, P. 81.

সিলেক্ট কমিটির উপরোক্ত রিপোর্টের পূর্ব্বে, ১৮০৭ সালে ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানন্ (কিম্বা হামিল্টন্) কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরের আদেশানুসারে, বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা জরিপ করিতে আরম্ভ করেন, সেই সঙ্গে লোক সংখ্যাও নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। ১৮০৭ সাল হইতে ১৮১৪ সালের মধ্যে এই জরিপ কার্য্যশেষ হয়।* বুকানন্ সাহেব কেবল মাত্র রংপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, পাটনা ও বেহার, এবং সাহাবাদ, এই কয়েক জেলার লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। ১৮৭২ সালের পূর্ব্বে বুকানন্ সাহেবের হিসাব সর্ব্বোপেক্ষা আদরণীয় ও বিশ্বাস্য। প্রতি গৃহের অধিবাসীর সংখ্যা গণনা দ্বারা এই হিসাব করা হয় নাই। বকানন্ সাহেব প্রতি গ্রামের উঠিত জমি স্থির করিয়া, লাঙ্গল প্রতি পনর কিম্বা আঠার বিঘা ধরিয়াছিলেন, † এবং প্রতি লাঙ্গলে বৃদ্ধ ও যুবা পাঁচ জন হিসাবে লোক ধরিয়া, মোট লোক সংখ্যা স্থির করেন। এই রূপ নির্দ্ধারণ যে ঠিক হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অনুমান সকল অপেক্ষা ইহা অধিকতর নিশ্চিত বলিতে হইবে। বুকানন্ সাহেব দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, ও বেহার জেলার যে লোকসংখ্যা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৭২ সালের সেন্সস্ অপেক্ষা অধিক। মোটের উপর ধরিলে ১৮০৭ সাল হইতে ১৮১৪ সালের মধ্যে যে লোক সংখ্যা ছিল, তাহা অপেক্ষা এখন শতকরা চারি জন কম হইয়াছে। এই হিসাব অনুসারে, দেশে প্রজা বৃদ্ধি না হইয়া বরং কমিয়াছে। আমরা পাঠকের অবগতির জন্য উভয় লোক সংখ্যার তালিকা দিতেছি।

---

* Census Report of 1872, P. 82.

† do. P. 83.

জেলা	১৮০৭—১৮১৪।		১৮৭২।	
	বর্গফল	লোক সংখ্যা	বর্গফল	লোক সংখ্যা
	বর্গমাইল		বর্গমাইল	
রঙ্গপুর	৭৪০০	২,৭৩৫০০০	৭৮১১	২,৯,৭০৬২৫
দিনাজপুর	৫৩৭৪	৩০০০০০০	৫০২২	১৭১৭৬৩৫
পুর্ণিয়া	৬৩৪০	২৯০৪৩৮০	৬৪০৯	২৩২৪৭০৫
ভাগলপুর	৮২২৫	২০১৯৯০০	৮৫৭৩	২৯৯০৬৯২
পাটনা ও বেহার	৫৩৫৮	৩৩৬৪৪২০	৫২২৫	৩১৬৮৭০১
সাহাবাদ	৪০৮৭	১৪১৯৫২০	৪৩৮৫	১৭২৩৯৭৪
মোট	৩৬৭৮৪।	১৫৪৪৩২২০।	৩৭৪২৫।	১৪৯২৬৩৩৭

পাঠক মহাশয় তালিকার স্তম্ভগুলি তুলনা করিয়া দেখুন যে, এই সকল জেলার বর্গফল এক্ষণে ৬৪১ বর্গ মাইল বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু লোক সংখ্যা তদনুরূপ বৃদ্ধি না হইয়া ৫,১৬,৮৮৩ জন কমিয়াছে। পরিমাণ কসিয়া দেখা যায়, যে মোটের উপর এই সকল জেলার লোক সংখ্যা এখন শতকরা চারি জন কমিয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের মতামত পরে প্রকাশ করিব।

বুকানন্ সাহেবের জরিপি জেলাগুলির বর্ত্তমান সীমা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। তাঁহার কৃত নক্সার সহিত মিলাইলে কতকটা স্থির হইতে পারে, এবং তদনুসারে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তিনি সাহাবাদ; পাটনা; বর্ত্তমান অরঙ্গাবাদ, নবীনগর, বড়চটি এবং সেরঘাটি থানা-বাদে সমস্ত গয়া; বেগুসরাই মহকুমা বাদে সমস্ত মুঙ্গের; সুপুল, মুদিপুরা এবং বুদাওন থানা বাদে সমস্ত ভাগলপুর; দেবগড ও দুম্কার প্রায় অর্দ্ধাংশবাদে সমস্ত সাঁওতাল পরগণা; পুর্ণিয়া দিনাজ-

পুর, রঙপুর; জলপাইগুড়ি; দুয়ারভূমি বাদে সমস্ত গোয়ালপাড়া; গোমস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ থানা বাদে সমস্ত মালদহ; মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমা; বগুড়ার পাঁচবিবি, খেতোয়াল ও বাদলগাছি থানা ও ময়মনসিংহের থানা দেওয়ানগঞ্জ,—এই সকল স্থান জরিপ করিয়া ইহাদের লোকসংখ্যা ১,৫৪,৪৩,২২০ জন স্থির করেন। ১৮১৪ সালের পরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সীমা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বুকানন্ সাহেবের জরিপি জেলা সকল বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে এবং উপরের তালিকায় ১৮৭২ সালের লোকসংখ্যা, এই সীমা পরিবর্ত্তন ধরিয়া ঠিক করা হইয়াছে। ইহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। *

কোর্ট অব ডাইরেক্টরের আদেশানুসারে ১৮৪৭ সালে রেবিনিউ সরবেয়ারগণের উপর তাহাদের জরিপি জেলার লোকসংখ্যা স্থির করিবার ভারার্পণ করা হয়। তাহাদের গণনা নিতান্ত অসার † । ইহা ব্যতীত থরণ্টনের গেজেটিয়র প্রভৃতি অনেক আছে, তাহার লেখকেরা বাঙ্গালার লোকসংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গণনা অমূলক বা কল্পনামূলক।

অনেকে আশা করিতে পারেন, যে লোকসংখ্যা নিরূপণের আধুনিক চেষ্টা সকল অধিকতর সফল হইবে। আমরা নিম্নে যে তালিকা দিতেছি, তদনুসারে পাঠক দেখিবেন, যে সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেলের আমলেও কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে ভ্রমমুক্ত হইতে পারেন নাই।

---

* Census Report 1872. P. 82.

† Do. PP 84, 85,

জেলা।	১৮৭০ সালের লোক সংখ্যা।	১৮৭২ সালের লোক সংখ্যা।
নদিয়া।	৫,৬৮,৭১২	১৮,১২,৭৯৫
ফরিদপুর।	১,৪৭,১২৭	১০,১২,৫৮৯
পাবনা।	৩,৩৭,৬৭৯	১২,১১,৫৯৪
কটক।	২,১৫,৮৩৫	১৪,৪৯,৭৮৪
মুঙ্গের।	৭,৫৫,৩৮৯	১৮,৪২,৯৮৬
কামরূপ।	৮০,৮৬১	৫,৬১,৬৮১
মোট	২১,০৫,৬০৩	৭৮,৯২,৯০৯

উপরোক্ত ১৮৭০ সালের সংখ্যা সকল, জেলার মাজিষ্ট্রেটগণ গবর্ণমেণ্টের আদেশমতে সঙ্কলণ করেন, এবং তাঁহাদিগকে এ জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল, * তথাচ তাঁহাদের ভয়ঙ্কর ভুলের বিষয় পাঠক মহাশয় বিবেচনা করুন। (ক্রমশঃ)

পশুপূজা।

And they painted on the grave posts
Of the graves yet unforgotten,
Each his own ancestral totem,
Each the symbol of his household;
Figures of the bear and reindeer
Of the turtle, crane, and beaver.

Longfellow.

উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা এইরূপ করিয়া থাকে। অবিস্মৃত সমাধির সমাধিদণ্ডে তাহারা আপন আপন বংশের চিহ্নস্থানীয় পশু, পক্ষী, বা পাদপমূর্ত্তি চিত্রিত করে— কেহ ভল্লুক, কেহ হরিণ, কেহ পারাবত, কেহবক, কেহ বিবর— কেহ সোমলতা, কেহ মাধবীলতা,

* Bengal Admion, Report 1871-72 Part 1. P. 26.

কেহ শাল্মলী, কেহ বট, কেহ কিছু কেহ কিছু। কেবল সমাধিদণ্ডে প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া ক্ষান্ত থাকে, এরূপ নহে— যে পশু বা পক্ষী যে বংশের আভিজাতিক নিশানা, তদ্বংশীয় মাত্রের দ্বারা সেই পশু বা পক্ষী বহুসমাদৃত। যে লতা বা পাদপ যে পরিবারের পরিচায়ক, সেই পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা সেই লতা বা পাদপ বহুসম্মানিত। তাহারা তাহাদিগের সেই অর্দ্ধসভ্য, অপরিমার্জ্জিত, কদর্য্য প্রণালীতে সেই সেই পশু বা পক্ষীর, লতা বা পাদপের অর্চ্চনা করে।

কেবল উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা বলিয়া নহে, নানা আকারে এই পূজাপদ্ধতি অনেকানেক অসভ্য এবং অর্দ্ধসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। কোন কোন সভ্য জাতির মধ্যেও আছে— দৃষ্টান্ত, ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারতপ্রচলিত পশুপূজা একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির; সেই জন্য ভারতের পশুপূজার কথা আমরা স্বতন্ত্র করিয়া আলোচনা করিব। যে সকল জাতি সভ্যতার উচ্চতম সোপানে সমারূঢ় বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগের মধ্যে এই আদিম অর্চ্চনাপদ্ধতির পূর্ব্বাস্তিত্বের এবং ক্রমবিলোপের চিহ্ন সকল লুপ্তপ্রায়, তবু একেবারে লুপ্ত নহে— এখনও অর্দ্ধ-লুকায়িত ভাবে বর্ত্তমান। কোথাও আচার ব্যবহারের অন্তঃস্থলে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছে। কোথাও ভাষাসাগরে, নিমজ্জিত শৈলের ন্যায় শৃঙ্গাগ্রভাগ মাত্র জাগাইয়া রহিয়াছে। যে সকল জাতি এককালে সুসভ্য হইতে সমর্থ হইয়াছিল; কালক্রমে, নিয়তিবশে, আপন আপন কার্য্য সমাধান করিয়া পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, তাহাদিগের পরম্পরাগত আখ্যানাবলিতেও ইহার নিশানা জাজ্বল্যমান। ম্যাকলেনান সাহেব দেখাইয়াছেন, যে মিসরবাসীদিগের মধ্যে, য়িহুদীদিগের মধ্যে, এবং রোমকদিগের মধ্যে 'ঈগল্' পক্ষী পূজিত ছিল।

কেন এরূপ হয়? সৃষ্টির উন্নততম, সর্ব্বপ্রধান, জ্ঞান-গৌরবান্বিত জীব মনুষ্য, অজ্ঞান ক্ষুদ্র পশুপদে ভক্তিভাবে নতশির— কেন এরূপ

হয়? কেন বিশেষ বিশেষ জাতি কর্ত্তৃক বিশেষ বিশেষ পশু বা পক্ষী দেবতানির্ব্বিশেষে ভক্তিভাবে পূজিত হয়? যে পশু আমরা আহারের জন্য বশ করি, চড়িবার জন্য বাহন করি, ক্রীড়ার জন্য হনন করি,— আবার কোন্ কুহকে পড়িয়া তাহাকেই পূজ্য বলিয়া অর্চ্চনা করি?

ইহার নানা প্রকার উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে। সচরাচর এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, যে কোন ভ্রান্তিসমুৎপাদক ঘটনা অথবা আদিম উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাপ্রণালীর কোন খেয়াল হইতে পশুপূজার উৎপত্তি। নতুবা স্থিরচিত্তে সজ্ঞান্ মনুষ্য অজ্ঞান পশুর প্রতি দেবভক্তি দেখাইবে, ইহা কোন রূপেই সম্ভবপর নহে।

এ প্রকার অদূরদর্শী ব্যাখ্যা আমাদের সমীচীন বলিয়া বোধ হয়না। পশুপূজা যদি ক্বচিৎ কোন স্থলে ক্বচিৎ কোন জাতির মধ্যে ক্বচিৎ কখন দৃষ্ট হইত, তাহা হইলেও একদিন বলিবার পথ থাকিত, যে উহা ভ্রান্তিমূলক। কিন্তু যখন সকল বা অনেক দেশেই পশুপূজার চিহ্ণ উপলক্ষিত হয়, তখন উহা কখনই ভ্রান্তিসমুৎপাদক ঘটনার ফল হইতে পারে না। যাহা সর্ব্বদেশব্যাপী, তাহা কখনই নিয়মের ব্যভিচার নহে— তাহাই নিয়ম। আর, আদিম অসভ্যদিগকে যে আমরা আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির জীব মনে করি, সেটা আমাদের ভুল। সত্য বটে, প্রভেদ অনেক, কিন্তু তাহা পরিমানে— প্রকারে নহে। সত্য বটে, তাহাদের ভাষা অসম্পূর্ণ, তাহাদের জ্ঞান সংকীর্ণ; কিন্তু সেই অপূর্ণ ভাষা; সেই সংকীর্ণ জ্ঞান লইয়া তাহারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, তাহাদের অবস্থায়— সেই ভাষায়, সেই জ্ঞানে— তদপেক্ষা সঙ্গততর সিদ্ধান্ত হইতেই পারে না। তাহাদের সেই শিশু ভাষা যদি আমাদের ভাষা হইত, তাহাদের সেই সংকীর্ণ জ্ঞান যদি আমাদের হইত, তাহা হইলে আমরাও যে তাহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতাম, এ বিষয়ে সন্দেহ অতি অল্প। আর একটি বিশেষ গুরুতর কথা এই যে, পশুপূজাই বল, আর দেবপূজাই বল, ভ্রান্তি কখন কোন ধর্ম্মের

মূল হইতে পারে না। ভ্রান্তি অসার, ভ্রান্তি বিষ, ভ্রান্তি মৃত্যু— ভ্রান্তি হইতে কখন জীবনী সঞ্চার হইতে পারে না। অথচ এই পশু-পূজা পৃথিবীময় একদিন জীবন্ত ধর্ম্ম ছিল— এখনও কোথাও কোথাও আছে। যে কোন ধর্ম্মই হউক, তাহাতে অনেক ভ্রম থাকিতে পারে, ভ্রমপূর্ণ হইলেও হইতেপারে,— যেখানে আলোক, সেইখানেই ছায়া— কিন্তু ভ্রম কখন কোন ধর্ম্মের জীবন হইতে পারে না, কখন কোন ধর্ম্মের মূল হইতে পারে না। এই সকল কারণে পশুপূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভ্রান্তিবাদ বা খেয়ালবাদে আমাদের আস্থা নাই।

পশুপূজার উৎপত্তি নিরূপণ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আলোক আমাদের অতি অল্পই আছে। কয়েক বৎসর অতীত হইল, ম্যাকলেনান্ সাহেব পশু ও পাদপোপাসনা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকটা অন্ধকার অপসারিত হয়। সর্ জন্ লবকের 'প্রাগৈতিহাসিক সময়" নামক গ্রন্থেও এ সম্বন্ধের দুই চারিটা কথা আছে। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডীয় 'পাক্ষিক সমালোচন" পত্রে হর্বর্ট স্পেন্সরের লিখিত পশুপূজার উৎপত্তি বিষয়ক একটী নাতিবৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই গুলির উপর নির্ভর করিয়া আমরা পশু-পূজার উৎপত্তি নির্দ্দেশের যত্ন করিব।

সর্ব্বত্রই দেখা যায়, লোকে বিশ্বাস করে, যে যখন মৃত্যু হয়, তখন দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ ঘটে, এবং দেহবিমুক্ত আত্মা অন্যত্র অবস্থান করে। মৃত ব্যক্তির আত্মা যে পৃথিবীতে দেখা দিতে আসিতে পারে এবং সময়ে সময়ে আসে, ইহাও অনেকের বিশ্বাস— অসভ্য বর্ব্বরের ত কথাই নাই, অতিসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকার অতি-শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও এই বিশ্বাসের অস্তিত্ব দেখা যায়,— প্রমাণ, প্রেততত্ত্বাবাদীগণ *। এই সকল দেহবিমুক্ত, পুনরাগত আত্মা যে প্রিয়জনের ইষ্ট এবং অপ্রিয়জনের অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম, এ বিশ্বাস

* The spiritualists.

অশিক্ষিতের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, বর্ব্বরদিগের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী— ভূতের ভয়ের অন্য কোন অর্থ নাই। যাঁহারা প্রথমা পত্নীর বিয়োগান্তে দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন যে তাঁহাদের মাতা বা ভগিনী পূর্ব্ববধূর সিন্দুরের কৌটা, কড়ির চুপড়ি, হাতের লৌহ বলয় প্রভৃতি অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে রক্ষা করেন— ভয়, পাছে পূর্ব্ববধূর প্রেতাত্মা রাগ করিয়া কোন পরিবারিক অমঙ্গল সাধন করে। দ্বিতীয়া ভার্য্যা সতীনেরে ঝালে সব করিতে পারেন (জীবিতই হউক আর মৃতই হউক, সতীন ত বটে), কিন্তু তাঁহার এমন সাহস নাই, যে সেই হাতের লোহা, কড়ির চুপড়ি, সিন্দুরের কৌটার কোন প্রকার অসম্মান করেন— এমন সাহস নাই, যে অশুচি অবস্থায় সেই সকল স্পর্শ করেন,— ভয়, পাছে সেই 'কালামুখী" রাগে পড়িয়া এই পদ্ম-মুখীর অদৃষ্টে বৈধব্য দুঃখ বিধান করে। কেবল বাঙ্গালির মেয়ে বলিয়া নহে, মানুষ মরিলেও যে তাহার সহিত সম্বন্ধ ঘুচে না, আমাদের কার্য্যের দ্বারা যে প্রেতাত্মার সুখ, আহ্লাদ বা তৃপ্তি, দুঃখ, বিষাদ বা বিরাগ সংসাধিত হইতে পারে, এ বিশ্বাস সর্ব্বত্র বিদ্যমান। অসভ্য-দিগের মধ্যে ইহা অত্যন্ত প্রবল। প্রেতাত্মার অনুকূলতা প্রতিকূলতার উপর আপনাদের সাংসারিক ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে,—পীড়ার সময়ে, শীকারে প্রবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে, এবং অন্যান্য অনেক সময়ে প্রেতাত্মাকে আহ্বান করিয়া প্রসন্ন করিবার যত্ন করে। 'বেধ" নামক অসভ্য জাতি সম্বন্ধে বেইলি সাহেব লিখিয়াছেন যে,— যখনই প্রেতাত্মার সাহায্য প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন হয়, তখনই ইহারা একটী শর লম্বভাবে মাটিতে পুঁতিয়া ধীরে ধীরে তাহার চতুর্দ্দিকে নাচিয়া বেড়ায়, এবং গায়—

"মা মিয়, মা মিই, মা দেয়া,
তোপাং কইচেথি মিথিগান ইয়ন্দা?"

"আমার দূরপ্রস্থিত বন্ধো, আমার দূরগত বন্ধো, আমার দেবতা, তুমি কোথায় ভ্রমণ করিতেছ?"

রোগাদিতে তাহারা এইরূপ করে। শীকারের পূর্ব্বে কথন কথন শীকারলভ্য মাংসের কিয়দংশ উদ্দেশে উৎসর্গ করে, এবং মনে মনে বিশ্বাস করে, যে আহূত প্রেতাত্মা স্বপ্নরূপে দেখা দিবে এবং শীকারের স্থান বলিয়া দিবে। সময়ে সময়ে আহার্য্য রন্ধন করিয়া নদীর শুষ্ক গর্ভে অথবা অন্য কোন নিভৃত স্থানে রাখিয়া দেয়, এবং মৃত পূর্ব্ব-পুরুষদিগের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলে,— "এসো, এই আহার্য্য গ্রহণ কর! জীবিতকালে যেমন করিতে, এখনও সেইরূপ গ্রাসাচ্ছাদন দাও! যেখানে থাক, এসো— বৃক্ষশিরে, গিরিশঙ্কটে, অরণ্যদুর্গমে, যেখানেই থাক, এসো!" স্থাপিত আহার্য্য বেষ্ঠন করিয়া নাচিয়া বেড়ায়, এবং উপরিলিখিত বাক্য গুলি গান করে ; সে গান,— অর্দ্ধেক গান, অর্দ্ধেক চীৎকার *।

প্রেতাত্মার অস্তিত্বে এবং আমাদিগের সহিত তাহার সম্বন্ধে বিশ্বাস, এবং প্রেতাত্মাকে প্রসন্ন করিবার ইচ্ছা, শিক্ষিত এবং সভ্য সমাজেও দৃষ্ট হয়,—দৃষ্টান্ত চীন, দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ। এই বিশ্বাস, এই ইচ্ছার জন্যই আমরা শ্রাদ্ধ করি, তর্পণ করি,— মৃতব্যক্তি মৃত্যুকালে যদি কোন সামগ্রী খাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই জিনিষ প্রতি সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধাহে যত্নে আহারণ করিয়া ব্রাহ্মণ সেবায় নিয়োগ করি— ব্রাহ্মণ খাইলেই সকলের খাওয়া হইল। যে সকল সমাজ পৃথিবীতলে অতি সভ্য, অতি উন্নত বলিয়া খ্যাত, সেখানেও এই ইচ্ছার অস্তিত্ব, যার চক্ষু আছে সে দেখিতে পায়। মৃত ব্যক্তিকে সবস্ত্র— স্থল বিশেষে, সশস্ত্র এবং সসজ্জ— সমাধিনিহিত

---

* Bailey, Trans. Eth. Soc., London. N. S., II, p. 301. Quoted by Herbert Spencer.

করিবার অর্থ কি? সমাধির উপরে পুষ্পবর্ষণ প্রথার অর্থ কি? মৃত পিতা বা মাতার, পতি বা পত্নির মৃত্যু সময়ের অভিলাষ পূর্ণ করিতে, বাক্যপালন করিতে, অনুরোধ রক্ষা করিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়,— ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার ভিতরে কোন রহস্য নাই কি?

এই সকল দেখিয়া প্রতীতি হয় যে, প্রেতসন্তোষের ইচ্ছা জগদ্ব্যাপী। তবে কি না, সভ্য এবং সুশিক্ষিতের হৃদয়ে এই ইচ্ছার অবস্থান তত পরিস্ফুট, তেমন স্পষ্টোচ্চারিত নহে— প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, অন্তঃসলিলা প্রবাহিত। অসভ্যের সবই পরিব্যক্ত, সবই উন্মুক্ত, আপনা আপনি চক্ষের উপর আসিয়া পড়ে— এস্থলেও তাই। সভ্যের সবই আচ্ছাদিত, সবই লুক্কায়িত, খুঁজি খুঁজি করিয়া দেখিতে হয়— এখানেও তাই। প্রভেদ এই, নতুবা আছে সর্ব্বত্রই।

পশুপূজার উৎপত্তি নিরূপণ সম্বন্ধে এইটী আমাদের প্রথম প্রতিজ্ঞা —— প্রেতসন্তোষের ইচ্ছা যে আকারেই হউক সর্ব্বত্র বিদ্যমান; সভ্য সমাজে এই স্রোতঃ অতি ক্ষীণ প্রবাহে প্রবাহিত, অসভ্য সমাজে কূলপ্লাবী, তরঙ্গময় এবং বেগবান। প্রতিজ্ঞাটী বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। অনেকে বলেন এই আদিম বেগবান ইচ্ছা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ এক স্থলে লিখিয়াছেন: “যেখানেই দেখা যায়, লোকে দেহবিমুক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, সেই খানেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, লোকে বিশ্বাস করে, যে দেহবিমুক্ত আত্মা সময়ে সময়ে প্রেতাকারে মনুষ্যলোকে দেখা দিতে আসে। প্রত্যুত ইহাই সম্ভব, যে দ্বিতীয় বিশ্বাস হইতেই প্রথম বিশ্বাসের উৎপত্তি। প্রেতাত্মা মনুষ্যলোকে দেখা দেয়, এ বিশ্বাস যদি তাহাদের না থাকিত, তাহা হইলে দেহধ্বংসে আত্মার ধ্বংস হয় না, এরূপ বিশ্বাস কখন আদিম অসভ্যদিগের মনে স্থান পাইত না।* অধ্যাপক হকস্‌লীও এক স্থলে এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং হর্বর্ট স্পেন্সর তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন।†

(ক্রমশঃ)

* Mill's Three Essays on Religion. P. 206.

† The Fortnightly Review. 1870.

১ম খণ্ড।]

মাসিক সমালোচক

(সর্ব্ব শাস্ত্র বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

সন ১২৮৬ সাল জ্যৈষ্ঠ।

নহে।
গলে
ানে
কল

বিষয়। পৃষ্ঠা।

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

বহরমপুর অরুণোদয় যন্ত্রে

মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা। [illegible] মূল্য [illegible] আনা।

মাসিক সমালোচক।

রসসাগর।

সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং—কোন বিষয়েই বেজায় বাড়াবাড়ি ভাল নহে। যাহা ভাল, যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা লইয়াও বাড়াবাড়ি করিতে গেলে প্রায় মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। অতি দর্পে লঙ্কার কি হইয়াছিল, অতি মানে কৌরবের কি হইয়াছিল, অতি দানে বলীর কি হইয়াছিল, সে সকল প্রাচীন কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আবার অতি অহঙ্কারে ফ্রান্সের কি হইল, অতি ব্যয়ে তুর্কির কি হইতেছে, এ সকল আধুনিক কথা কাহারও অবিদিত নাই। অথচ দর্প, অহঙ্কার, মান, দান, অর্থব্যয়, ইহার সকলগুলিই, পরিমাণবহির্ভূত না হইলে, প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাল জিনিষও অযথা পরিবর্দ্ধিত হইলে যে কুফল প্রসব করে, তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল—ধর্ম্মভাব। ধর্ম্মভাব যে ভাল জিনিষ, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। পরিণতিবাদের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা যায়, যে মনুষ্যজীবনের প্রয়োজনীচয়ের সঙ্গে ধর্ম্মভাবের উপযোগিতা আছে—মানবহৃদয়ের এমন অনেক অভাব আছে, যাহা ধর্ম্মভাব ব্যতীত অন্য কিছু দিয়া পূর্ণ করা যায় না। এই বিজ্ঞানপ্রধান, নাস্তিকতাপ্রবণ ঊনবিংশ শতাব্দীর

রসসাগর অর্থাৎ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত এবং কতিপয় পাদপূরণ। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

শেষ ভাগেও এই ধর্ম্মভাব অনেক শোকে সান্ত্বনা, অনেক বিপদে ভরসা। অনেক সাধু উদ্যমের জীবনী, অনেক সদনুষ্ঠানের মূল, অনেক পরিতাপ-তপ্ত হৃদয়ের শান্তিনিকেতন, অনেক পথভ্রান্ত জীবনপোতের ধ্রুবতারা। এ হেন ধর্ম্মভাবেও যখনই কিছু বাড়াবাড়ি ঘটিয়াছে, তখনি কুফল ফলিয়াছে। ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল, হিস্পানিয়া; উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত—ভারতবর্ষ।

ধর্ম্মভাবের অযথা পুষ্টিনিবন্ধন ভারতবর্ষে যে সকল কুফল ফলিয়াছে, তন্মধ্যে একটি এই যে, ভারতের ইতিবৃত্ত লিখিত হয় নাই, ভারতের কৃতী সন্তানদিগের জীবনবৃত্ত নাই। কেন নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মভাব অযথা বলবান হইয়া উঠিল। কিসে স্বর্গ হইবে, কিসে মুক্তি হইবে, কি করিলে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইবে, কি করিলে আর এ পৃথিবীতে আসিতে হইবে না—এই সকল চিন্তা মনকে ব্যাপৃত করিল। পরকাল পরকাল করিয়া লোকে পার্থিব বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িল। পরলোকই সর্ব্বস্ব, ইহলোক কিছুই নহে—কেবল ভোজের বাজি, কেবল মায়ার মোহ—এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। লোকে দেখিল, এ সংসারের সুখ, সুখ নহে—তাহা অসম্পূর্ণ, দুঃখবিমিশ্রিত; এ সংসারের দুঃখও দুঃখ নহে—তাহা অল্পকাল মাত্র স্থায়ী। পার্থিব জীবন বিগতপ্রমাণ, সুতরাং পার্থিব পদার্থমাত্রই—ধন, জন, গৌরব, খ্যাতি—সবই ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর, অসার, সুতরাং অশ্রদ্ধেয়। যাহার উপর শ্রদ্ধা নাই, তাহার মহিমাকীর্ত্তন কে করিয়া থাকে? সেই জন্য ভারতে ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি ছিলনা। সেই জন্য প্রাচীন কালের ঘটনাবলি নিবিড় অন্ধতমসাচ্ছন্ন।

আজকাল ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি আমরাও ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিতেছি, জীবনবৃত্ত লিখিতে শিখিতেছি। কিন্তু মূর্ত্তি গড়িব কি দিয়া? উপকরণ কৈ? যে সকল বর্ণে প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিতে হইবে, সে

সকল বর্ণ কৈ? যে আলোকে ফোটোগ্রাফ উঠিবে, সে আলোক কৈ? বিগত ঘটনার সম্বন্ধে, মৃত মহাত্মাদিগের জীবন সম্বন্ধে, কাগজ কলমে লেখাপড়া কিছু নাই। যে দুই চারিটা কথা আছে, লোকের মুখে, লোকের গল্পে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বাজে গল্প, কতকগুলি বাজারে গল্প, কতকগুলি আষাঢ়ে গল্প। যদি কিছু সত্য কথা এই গল্পরাশির মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, তাহা বাছিয়া বাহির করা সুকঠিন। সেই জন্য, এক্ষনে যাঁহারা মৃত মহাত্মাদিগের জীবনী সংকলন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারাও প্রায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না।

রসসাগরের জীবনচরিত হরিমোহন বাবু যে টুকু সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষেপ,—এত সংক্ষেপ, যে তাহা পাঠ করিয়া কাহারাও তৃপ্তি হইতে পারে না তাহার সার মর্ম্ম এই; জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী বাগোয়ানের সন্নিহিত বাড়েবাঁকা গ্রামে বাঙ্গালা ১১৯৮ সালে কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি বাল্যকালে সংস্কৃত, পারসী, উর্দ্দু, হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরে তাঁহার বিবাহ হয়, সেই সূত্রেই ভবিষ্যতে তথায় বাস। মহারাজ গিরীশচন্দ্র রায় তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সভাষদ্ নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া 'রসসাগর উপাধি প্রদান করেন। রসসাগরের এক পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান ছিল। পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শান্তিপুরে তাঁহার দুহিতার বিবাহ দেন, এবং গঙ্গাতীর বলিয়া জীবনের শেষ ভাগ জামাতৃগৃহেই অতিবাহিত করেন। এই স্থানে ১২৫১ সালে তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। হরিমোহন বাবু ইহার অধিক আর কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বরং তিনি যে হাল রীতি অনুসারে সওয়া এগার জন কালিদাস, সাড়ে তের

জন ভবভূতি প্রমাণ করিতে ব্যগ্র না হইয়া, যে দুই চারিটা কথা সংকলন করিতে পারিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রশংসা পাইবার যোগ্য। তিনি যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অধিক আর কিছু পাইবারও বোধ হয় উপায় নাই। বাবু শ্যামাধব রায় প্রকাশিত "রসসাগরের জীবন চরিতেও„ ইহার অধিক বড় কিছু নাই—'ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিতেও নাই।

হরিমোহন বাবু রসসাগরের দুই চারিটা কার্য্য আখ্যাত করিয়া শেষে লিখিয়াছেন,—"রসসাগরের এরূপ কার্য্য অনেক আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার অবতারণা করিলাম না।" এইটি বড় অন্যায় কাজ করা হইয়াছে। রসসাগরের সম্বন্ধে যত গুলি গল্প হরিমোহন বাবুর জানা আছে, সব লিপিবদ্ধ করা উচিত ছিল। যদ্দ্বারা নায়কের চরিত্র উৎকৃষ্ট রূপে লোকের হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই উৎকৃষ্ট জীবনবৃত্ত; এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে মনুষ্যচরিত্র যেমন বুঝা যায়, বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য দেখিয়া তেমন যায় না। লর্ড মেকলে এক স্থলে লিখিয়াছেন,—মহাকাব্য রচয়িতাদিগের মধ্যে যেমন হোমর, দৃশ্যকাব্য প্রণেতাদিগের মধ্যে যেমন সেক্ষপীয়র, বাগ্মীকুলে যেমন ডিমস্থিনিস্, জীবনচরিত লেখকদিগের মধ্যে তেমনি বস্ওয়েল———অতুল, অদ্বিতীয়। এ কথা সত্য, কিন্তু কেন? অনেক মহৎ লোকে জীবনবৃত্ত লিখিয়াছেন—বস্ওয়েল অতি ক্ষুদ্র লোক—অথচ কেন তিনি সর্ব্বপ্রধান? এই জন্য যে, জনসনের কথা যেখানে যেটুকু পাইয়াছেন, হাঁচি কাশি পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। রসসাগরের কার্য্যকলাপ বাহুল্যভয়ে গোপন করা, হরিমোহন বাবুর পক্ষে অতি অন্যায় কাজ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সমালোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত "পায় পায় পায় না" এবং "পায় পায় পায়" এই দুইটি সমিস্যার পূরণ সম্বন্ধে আমাদের একটা কথা আছে।

ঈশ্বরগুপ্ত বলেন, এই শ্লোকদ্বয় ভারতচন্দ্রের রচিত। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক রামগতি ন্যায়রত্নও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু হরিমোহন বাবু লিখিয়াছেন, যে "এক্ষণে আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছি, যে রসসাগরই উক্ত কবিতাদ্বয়ের প্রণেতা।" বিশেষ অনুসন্ধান, করিয়া অবগত হইয়াছেন, উত্তম; কিন্তু প্রমাণ গুলি কৈ? ঈশ্বর গুপ্ত এবং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় দুই জন লোক যখন অন্য মতাবলম্বী, তখন আমরা কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া হরিমোহন বাবুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি না। হরিমোহন বাবুর কথায় আমাদের অবিশ্বাস নাই—অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার ঐ রূপ বিশ্বাস অবশ্য হইয়াছে—কিন্তু এরূপও ত হইতে পারে যে, যে সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া উক্ত কবিতাদ্বয় রসসাগরের বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে, সেই সকল যুক্তি লইয়াই অপরে অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। কারণ গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, পাঠকদিগকে আপন আপন সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

রসসাগরের কবিত্ব সম্বন্ধে হরিমোহন বাবুর মতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নাই। রসসাগর যে প্রখর বুদ্ধিশালী লোক ছিলেন এবং তাঁহার যে অনেক জানা শুনা ছিল, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। কেবল জানা শুনা নহে, যাহা তিনি জানিতেন, তাহা বিলক্ষণ তৎ-পরতার সহিত ব্যবহার করিতে পারিতেন। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি এক, কবিত্ব আর। রসসাগরকে আমরা প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া স্বীকার করি না। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও বড় উচ্চাসন দিতে পারি না। হরিমোহন বাবু তাঁহার নায়ককে এক স্থলে থিওডোর হুকের সহিত তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, রসসাগর কোন অংশেই হুকের অপেক্ষা ন্যূন নহেন। ইহা স্বীকার করায় আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু হরিমোহন বাবু অবশ্য জানেন, যে থিওডোর হুক ইংলণ্ডে প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া

পরিগণিত নহেন, দ্বিতীয় শ্রেণীতেও তাঁহার স্থান আছে কি না, সন্দেহ——থাকিলেও তত উচ্চ নহে। তবে, কবিসুলভ কতকগুলি গুণ রসসাগরের ছিল। সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য দর্শনে তাঁহার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখরা ছিল। তিনি অসাধারণ সত্বরতার সহিত মিল রাখিয়া পদবিন্যাস করিতে পারিতেন। কিন্তু দ্রুতরচনায় যে দোষ ঘটে, তাহাও ঘটিত। হরিমোহন বাবু যে এক স্থলে বলিয়াছেন, যে দ্রুত-রচনা নিবন্ধন তাঁহার সমস্যা পূরণে ছন্দের দোষ দৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু কবিত্বের দোষ দৃষ্ট হইত না, সেটা ভুল। উদাহরণ,——

প্রশ্ন, "টুক্ টুক্ টুক্।"

রসসাগর পূরণ করিলেন,

> কৈলাশেতে বাস সদা স্থির ভগবতী।
> পৃথিবীতে আগমন তিন দিন স্থিতি॥
> যুদ্ধকালে সুর অরি পেতে দিল বুক।
> অসুরের কাঁধে পদ টুক্ টুক্ টুক্॥

এরূপ কদর্য্য কবিতার সমালোচনা করিতেও আমাদের লজ্জা হয়। কৈলাশে বাসের সঙ্গে পৃথিবীতে আগমনের কি সম্বন্ধ? যে কেহ কৈলাশে বাস করে, তাহাকেই পৃথিবীতে আসিতে হইবে, এমন কোন কথা আছে কি? যদি না থাকে, তবে পৃথিবীতে আগমনের কথায় বাসস্থানের পরিচয় দিবার কি আবশ্যক ছিল? "স্থির ভগবতী"—কৈলাশে বাস করিলেই কি স্থির হইয়া না থাকিলেই চলে না? তবে পৃথিবীতে আসা কেমন করিয়া হয়? "তিন দিন স্থিতি"—তিন দিনের অধিক থাকিবেন না, ভগবতী এরূপ কোন একড়ার লিখিয়া দিয়াছেন না কি? চরণের লৌহিত্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য—পৃথিবীতে তিন দিনই থাকুন আর তিন মাসই থাকুন, তাহাতে কি? তিন দিন থাকার কথ

না বলিলে কি চরণের লৌহিত্য মুছিয়া যাইত? "পেতে দিল বুক" – তবে কাঁধে টুক্ টুক্ কেন?

ঐ প্রশ্নেরই আর একটা পূরণ দেখ,

পথ মধ্যে দাঁড়াইয়া পরমা সুন্দরী।
ভুবনমোহন রূপ যেন বিদ্যাধরী॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ শশী জিনি মুখ।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা টুক্ টুক্ টুক্॥

পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা হইয়াছে, এই কথাটা বলা উদ্দেশ্য; কিন্তু তজ্জন্য বিদ্যাধরী হইবার কি প্রয়োজন ছিল?—কমল জিনিয়া অঙ্গ হইবার কি প্রয়োজন ছিল?—মধ্যে পথে দাঁড়াইবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? যে সুন্দরী মধ্যে পথে না দাঁড়াইবে, তার ঠোঁট পান খেয়ে রাঙ্গা হইতে পাইবে না, অলঙ্কার শাস্ত্রের এমন কোন বিধান আছে না কি? এরূপ কোন কবিপ্রসিদ্ধি আছে কি, যে যে স্ত্রীলোক মধ্যে পথে না দাঁড়াইয়া পথের ধারে দাঁড়াইবে, তার ঠোঁট পান খেলে সবুজ হবে; যে জানেলার পাশে দাঁড়াইবে, তার নীল হবে; যে ঘাটের পথে দাঁড়াইবে, তার শ্বেত হবে; যে পুকুরের ধারে দাঁড়াইবে, তার আশ্‌মানি হবে; আর যে কোথাও না দাঁড়াইয়া আপন মনে মাথা গুঁজে চলে যাবে, তার——তার কালো হওয়াই উচিত। এখনও কি হরিমোহন বাবু বলিবেন, তাঁহার নায়কের সমস্যাপূরণে কবিত্বের দোষ কোথাও দৃষ্ট হইত না?

আবার কতকগুলি পূরণ আছে, তার ভাব রসসাগরের নিজের নহে—সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত। দুই একটা উদাহরণ দেখন;

১নং। প্রশ্ন—কাট পাথরে বিশেষ কি?

রসসাগর পূরণ করিলেন,

তোমার চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো,
পরের বাড়ী হবিষ্যি।
আমার নাই লক্ষ্মী, দীন দুঃখী,
কতকগুলি কুপুষ্যি॥
যখন ঠেকুবে পা, যুচ্‌বে লা,
লা হয়ে যাবে মনিষ্যি।
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
কাট পাথরে বিশেষ কি?॥

এই পূরণ, যে কবিতার নকল, সেটা এই——

মানুষীকরণরেণুরস্তি তে পাদয়োরিতি কথা প্রথীয়সী।
ক্ষালয়ামি তব পাদপঙ্কজে নাথ! দারুদৃশদোস্তু কা ভিদা॥

"ক্ষালয়ামি তব পাদপঙ্কজে," এই কয়টি কথা একটু মনোযোগ করিয়া পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে যে, রসসাগর নকল করিতে গিয়া মূল ভাবের সৌন্দর্য্য অনেকটা বিনষ্ট করিয়াও ফেলিয়াছেন।

নং ২। প্রশ্ন—গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্গ ফেলে দিল।

রসসাগরের পূরণ,—

হেন উপকার আর না করিবে কেহু।
বিরহিনী বলেন কল্যানে থাক রাহু॥
যদি বল শশী খেয়ে মন্দানল হলো।
গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্গ ফেলে দিল॥

মূল কবিতাটী এই—

বিরহানলসন্তপ্তা তাপিনী কাপি কামিনী।
লবঙ্গানি সমুৎসৃজ্য গ্রহণে রাহবে দদৌ॥

নং ৩। প্রশ্ন——শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী?

রসসাগরের পূরণ,—

শক্তিশেলে লক্ষণ পড়িলে রণভূমি।
কান্দেন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী॥
শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ সবার আগে আমি।
শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী॥

মূল কবিতা এই——

ধনুষি নিপুণশিক্ষা বেদমন্ত্রেষু দীক্ষা
জনকনৃপতিগেহে চাগ্রতো মে বিবাহঃ।
ইদমনুচিতমস্মিন্নগ্রজে বিদ্যমানে
শমনভবনযানে যস্তুবানং

এক্ষণে রসসাগরের গুণের পরিচয় লওয়া যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রসসাগরের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাগুলি সে কথা সমর্থন করিবে।

প্রশ্ন—রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।

রসসাগর পূরণ করিলেন,

লক্ষীনারায়ণ এক চক্র পাত্রে থুয়ে।*
তাড়ন করয়ে লোক হুতাশন দিয়ে।
তৃণকাষ্ঠ পেয়ে অগ্নি প্রবল জ্বলিল।
রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল॥

প্রশ্ন—বড় দুঃখে সুখ।

রসসাগরের পূরণ,

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে।
চকা কহে চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক।
বিধি হতে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ॥

---

* লক্ষ্মী, অর্থাৎ তণ্ডুল; নারায়ণ, অর্থাৎ জল

দুই চারিটী কবিতা এরূপ আছে যে, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায়, যে রসসাগর বিলক্ষণ রসিক লোক ছিলেন। উদাহরণ,——

প্রশ্ন—তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে।

রসসাগরের পূরণ,—

করি, হরি, হরিণী, মরাল, সুধাকর।
পিক আদি তোর নামে ফরিদী বিস্তর॥
এই কথা দূতী গে জানায় শ্রীরাধারে।
তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে॥

রসসাগর যে বিলক্ষণ ব্যঙ্গপটু লোক ছিলেন, তাহারও পরিচয় আমরা বিলক্ষণ পাইয়াছি। উদাহরণ,——

প্রশ্ন—হাটের নেড়ে হুজুক চায়।

রসসাগর পূর্ণ করিলেন,—

উকীল খোজে মকদ্দমা, কোকিল বসন্ত গায়।
অগ্রদানী নিত্য গণে, কোন্ দিনে কে গঙ্গা পায়॥
সাধু খোজে পরমার্থ, লম্পট খোজে বেশ্যালয়।
গোলমালেতে রেস্ত মেলে, হাটের নেড়ে হুজুক চায়॥

প্রশ্ন—অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল।—

পূরণ,—

হারে বিধি নিদারুণ কত খেলা খেল।
সংসারের যন্ত্রনা যত হাবাতের ঘাড়ে ফেল॥
বেতো রোগী কেঁদে বলে কোন দিন বা ভাল।
অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল॥

হরিমোহন বাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, রসসাগর অবকাশ কালে যে সকল কবিতা রচনা করিতেন, তাহা সর্ব্বাংশে অতি সুন্দর হইত। সেরূপ রচনা কেবল একটী এই গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায়।

একদা রসসাগর মহারাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, শেষে নিজ স্ত্রীর উক্তিতে মহারাজের নিকট নিম্ন লিখিত শ্লোকটী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

নিবেদন করে দাসের দাসী রসসাগরের রসিকা।
করুণা ছেড়েছে নাথের নাথ, মন্দির ছেড়েছে মুষিকা॥
আভরণচয় করেছি বিক্রয়, কাঞ্চন রহিত নাশিকা।
পাইব আশায় তথাপি নাশায় ধারণ করেছি ইসিকা॥

এই রচনায় যে বিলক্ষণ কারিগরি আছে, তাহাতে সংশয় নাই। রসসাগর যে বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন লোক, তাহা আমরা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু হরিমোহন বাবু তাঁহার নায়কের পক্ষ হইতে যে রূপ কবিত্বের দাবি করিয়াছেন, সে ক্লেম আমরা মঞ্জুর করিতে পারি না। হরিমোহন বাবুর লিখিত প্রশংসা পাঠ করিতে করিতে অনেক সময়ে আমাদের বস্ওয়েলকে মনে পড়ে।

রসসাগরের অনুকূলে বলিবার একটা কথা আছে। হরিমোহন বাবু সে কথা বলেন নাই। তিনি না বলুন, আমরা তাঁহার হইয়া বলিয়া দিব। আপন কবিত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার সুবিধা বোধ হয় রসসাগরের কখন হয় নাই। কবিহৃদয়ের নিভৃত বিজনে যে সকল গভীর ভাব বিহার করিয়া বেড়ায়, তেমন ভাব যদি রসসাগরের হৃদয়েও খেলিয়া থাকে, তাহা তিনি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত যে সকল কবিতা আমরা পাইয়াছি, তাহা অন্যের ফরমায়েশ অনুসারে রচিত। এ সকল জিনিষ যে ফরমায়েশে ভাল হয় না, ইহা সকলেই জানেন। 'প্রাইজ পোয়েম" কস্মিন্ কালে উচ্চ দরের জিনিষ হয় নাই! ফরমায়েশী গান প্রায় ভাল হয় না। সেই জন্য, এমনও হইতে পারে, যে এই সকল কবিতা রসসাগরের প্রকৃত পরিচয় স্থল নহে। এই সকল কবিতায় যত খানি ক্ষমতা প্রকাশ হই-

য়াছে, হয় ত রসসাগরের প্রকৃত ক্ষমতা তদপেক্ষা অনেক অধিক। অধিক হউক, অল্প হউক, গ্রন্থখানি আমরা সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সময় বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া বোধ হইবে না।

সৌন্দর্য্য।

সৌন্দর্য্যের নমুনা ঘরে ঘরে আছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য কি? বস্তুর গুণ, না মনের বিকার? মনস্তত্ত্ববিৎদিগের মধ্যে অনেকে বলেন, সৌন্দর্য্য বস্তুর গুণ (১); আমরা বলি, সৌন্দর্য্য মনের বিকার। দ্রব্য বিশেষ দর্শনে আমাদিগের মনে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় প্রীতি জন্মে, সেই প্রীতিই সৌন্দর্য্য (২)। শুনিলে সদ্য অসঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, সৌন্দর্য্য বস্তুর গুণ নহে।

বস্তুর গুণের সহিত মনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। উহা ইন্দ্রিয়বিকারের দ্বারা মনের নিকট পরিচিত হয়। ইন্দ্রিয়বিকারই বস্তুর গুণের প্রতিনিধি এবং পরিচায়ক। সুতরাং ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ অপরিবর্ত্তিত থাকিলে, সৌন্দর্য্যও অবশ্য অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

কিন্তু কৈ, তাহা থাকে না। আমরা দেখিতে পাই, রুচিভেদে, কালভেদে, দেশভেদে, সৌন্দর্য্যভেদ হয়। আজ যে বস্তু সুন্দর দেখিলাম, কাল সেই বস্তুর আকারে বা আমার চক্ষে কোন পরিবর্ত্তন না হইলেও আমাকে সুন্দর না লাগিতে পারে। শৈশবাবস্থায় লাল রঙ্গ দেখিতে বড় ভাল লাগিত। লাল রঙ্গ এখনও সেই লাল রঙ্গই

---

(১) Vide Hamilton's Lec. on Metapysics. vol 2. p 512,

Burke defines beauty as "qualities in bodies by which they cause love or some passion similar to it".

The Sublime and Beautiful Part III, Sec. 1.

(২) Brown's Lectures on the Mind p 350

আছে, কিন্তু আর দেখিতে তত ভাল লাগে না। কেন? মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া। পূর্ব্বে লাল রঙ্গ দেখিলে মনে আহ্লাদ হইত, তাই সুন্দর লাগিত। এক্ষণে আর আহ্লাদ হয় না, সুতরাং সুন্দর লাগে না। ইতি পূর্ব্বে স্ত্রীলোকে নাকে নথ পরিলে, ঠোঁটেমিশি দিলে, সুন্দর দেখাইত। এখন রাক্ষসীর মতন দেখায়। পূর্ব্বে কৃষ্ণদন্তী নথধারিণীদিগকে দেখিলে আহ্লাদ হইত, এক্ষণে ঘৃণা হয়, সুতরাং সুন্দর না লাগিয়া কুৎসিত লাগে।

সৌন্দর্য্য বস্তুর গুণ হইলে, ব্যক্তিভেদে সৌন্দর্য্যের তারতম্য হইত না। ইন্দ্রিয়ের সমধর্ম্মতা থাকিলে জ্ঞানেরও সমধর্ম্মতা থাকিবে। অপরের চক্ষুর সহিত আমার চক্ষুর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। চক্ষুর তেজ সকলের সমান না হইতে পারে, কিন্তু মোটামুটি সকলের চক্ষুই সমান। কৃষ্ণ বর্ণ, তোমার চক্ষে কৃষ্ণ বর্ণ, আমার চক্ষেও তাই। তবে কেন দুইজনে এক সময়ে এক বস্তু দেখিলে, একজন সেই বস্তুকে সুন্দর বলে, অন্য জন তাহাকে কুৎসিত বলে। বস্তুর আকারের কোন পরিবর্ত্তন হইল না, ইন্দ্রিয়ের উপর কার্য্যও একরূপ হইল, তবু সৌন্দর্য্যের তারতম্য কেন হয়? সৌন্দর্য্য বস্তুর গুণ নয়, সৌন্দর্য্য জ্ঞানে নাই—সৌন্দর্য্য মনের বিকার। মনের প্রকৃতি ভেদে সৌন্দর্য্যের তারতম্য। আমি কৃষ্ণকেশী স্ত্রীলোক দেখিলে আহ্লাদিত হই, আমার নিকট কৃষ্ণকেশীই সুন্দরী। ইংরাজেরা পটকেশ ভাল বাসেন, তাঁহাদিগের নিকট পটকেশীই সুন্দরী। ইংরেজেরা কৃষ্ণকেশীকে কুৎসিত বলেন, আমরা পটকেশীকে কুৎসিত বলি। চীনেরা ক্ষুদ্র চক্ষুকে সৌন্দর্য্যলক্ষণ বলে, আমাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র চক্ষু কদর্য্যতা। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই, আমরা যাহাকে কুৎসিত বলি, অপর একজন তাহাকে পরম সুন্দর দেখে। তাহাকে প্রাণতুল্য ভাল বাসে। তাহাতেই একজন

ইংরাজ কবি বলিয়াছেন, আকৃতিতে ভালবাসার কারণ নাই, ভাল-বাসার কারণ মনে। (৩)।

অনুষঙ্গে (Association) সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। অলঙ্কার অনেক দেখা যায়, কিন্তু স্বর্গীয়া স্ত্রীর সামান্য বালা গাছটী যেমন সুন্দর, হ্যামিল্টনের দোকান খুঁজিয়া তেমন সুন্দর অলঙ্কার পাইবে না। এই সৌন্দর্য্যের কারণ, মৃতাস্ত্রীর স্মৃতি ও তজ্জনিত আহ্লাদ। নির্ব্বাসিত ব্যক্তি দ্বীপের কদর্য্য ও ভয়ানক মরুভূমিকে সুন্দর দেখে, স্বীয় জন্ম ভূমির নিকট মরুভূমি আছে বলিয়া। ভাবুক ভুজঙ্গিনীকে সুন্দর দেখেন, রমণীর কেশের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া। তাই বলি সৌন্দর্য্য বস্তুতে নাই—সৌন্দর্য্য মনে। চিত্তই সৌন্দর্য্যের আকর।

সৌন্দর্য্য শব্দে কেবল রূপজনিত প্রীতি বুঝায় না। শব্দ, স্পর্শ, গতি, ভাবাদি জনিত প্রীতিকেও আমরা সৌন্দর্য্য বলিয়া থাকি (৪)। সুমধুর স্বর শুনিলে, আমরা স্বরটীকে সুন্দর বলি—মাধুর্য্যই শব্দের সৌন্দর্য্য। জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাটীকে আমরা সুন্দর বলি, বুদ্ধির নৈপুণ্য দেখিয়া আহ্লাদ হয়, কাজেই সুন্দর বলি। মিল্টনের কবিতা সুন্দর, ভাবে মনকে আর্দ্র করে বলিয়া। রূপজনিত প্রীতি, শব্দজনিত প্রীতি, বা ভাবাদি জনিত প্রীতি ঠিক এক নয়, কিন্তু এক জাতীয়। পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, সেই জন্য সকল প্রীতিকেই সৌন্দর্য্য বলা যায়।

আমরা সচরাচর সৌন্দর্য্যকে বস্তুর গুণ বলিয়া বিশ্বাস করি। সেটী বড় আশ্চর্য্য নয়। আভ্যন্তরিক ভাবকে বস্তুর সহিত সংলগ্ন করা,

(৩) The cause of love can never be assigned .
,Tis in no face but in the lover's mined .
Dryden .

(৪) Brown's Lec . p 378

মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (৫)। এবং কার্য্য ও কারণকে এক পদার্থ বা সদৃশ পদার্থ জ্ঞান করাই তদ্রূপ প্রবৃত্তির মূল কারণ। সুঘ্রাণ পাইলেই বোধ হয়, যেন সুঘ্রাণটী গোলাপ ফুলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। বস্তু দেখিলেই বোধ হয়, যেন তাহা চব্বিশ ঘণ্টা রঙ্গের দ্বারা আবৃত আছে। যখন না দেখি, তখনও যেন তাহাতে রঙ্গ থাকে। কিন্তু সৌরভ বা বর্ণ, বস্তুর ধর্ম্ম নহে, অনুভূতি মাত্র (৬) যতক্ষণ ভোগ করি বা যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণই ঘ্রাণের ও রঙ্গের অস্তিত্ব। নাশিকা হইতে অন্তরিত হইলে বস্তুর ঘ্রাণ থাকে না; চক্ষুর বাহির হইলে বস্তু লাল কি নীল থাকে না।

বস্তুর গুণ, কারণ; ঘ্রাণ ও রঙ্গ, কার্য্য। কার্য্য কারণের একতায় বা সাদৃশ্যে মনের বিশ্বাস আছে, সেই জন্যই মানসিক অনুভূতিকে বাহ্য বস্তুর গুণ বলিয়া আমাদের ভ্রম। এ রূপ ভ্রমে মনস্তত্ত্ববিৎদিগের মধ্যেও অনেকে পতিত হইয়াছেন (৭) সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও আমাদিগের ঐ রূপ ভ্রম—যাহা গৌণ কারণ, তাহাকে মুখ্য কারণ বলিয়া ভ্রম। সৌন্দর্য্য শব্দটি যে আমরা সর্ব্বত্রই দ্রব্যগুণ অর্থে ব্যবহার করি, এ রূপও নহে। যখন কালিদাসের কবিতাকে সুন্দর বলি, তখন সৌন্দর্য্যের অর্থ দ্রব্যগুণ নয়। কবিতা সুন্দর, ইহার অর্থ কবিতার ভাব সুন্দর। ভাব বস্তুর গুণ নহে। মনে আহ্লাদ উৎপাদন করে বলিয়া আমরা ভাবকে সুন্দর বলি। এস্থলেও আমাদের কার্য্য কারণে ভ্রম।

---

(৫) This fact was noted long ago by D'Alembert.

(৬) Brown's Lec, p 357.

(৭) "Color is a quality of bodies, not a sensation of the mind".

Reid's Enquiry, Ch. vi,

বস্তুতে সৌন্দর্য্য উৎপাদন করিবার গুণ বা ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু সে গুণ কি নিত্য সমসৌন্দর্য্যোৎপাদক? সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র সমফলোৎপাদন করে? এ সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিৎদিগের মধ্যে নানাবিধ মত আছে। কেহ কেহ বলেন, কতকগুলি দ্রব্য——যদিও সে রূপ দ্রব্যের সংখ্যা অতি কম;——স্বভাবতঃ সুন্দর, দেখিলে স্বতঃই মনে আনন্দোদয় হয় (৮) কেহ কেহ বলেন, দ্রব্যগুণে সৌন্দর্য্যের জন্ম নয়। দ্রব্যতে সৌন্দর্য্যের কারণ নাই, সৌন্দর্য্য অনুষঙ্গে হয়, দ্রব্যগুণ উপলক্ষ মাত্র (৯)। এ রূপ মতভেদ কেন হয়, ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। সৌন্দর্য্য মানসিক ভাব, বস্তুর গুণের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। বস্তুর ইন্দ্রিয়গত কার্য্য প্রীতিকর হইলেই সৌন্দর্য্যের সম্ভাবনা, কিন্তু ইন্দ্রিয়গত কার্য্যবিশেষ সকল সময়েই যে প্রীতিকর হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। ইন্দ্রিয় বিকার যদি সৌন্দর্য্য হইত, তাহা হইলে বস্তুতে নিত্য-সৌন্দর্য্য উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা থাকিত। মনের অবস্থাভেদে অনুভূতির প্রীতত্ব, মনের তৃষ্ণায় সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি, এমত অবস্থায় বস্তুতে নিত্য সমসৌন্দর্য্যোৎপাদিকা শক্তি কিরূপে, থাকিতে পারে? শীতার্ত্ত ব্যক্তিকে উত্তাপ ভাল লাগে, উত্তপ্ত ব্যক্তিকে শীতলতা ভাল লাগে। এক ব্যক্তি এক্ষণে প্রতপ্ত হইয়াছে, শীতল জলে তাহার তৃষ্ণা, শীতলানুভূতিই তাহার নিকট প্রীতিকর। সেই ব্যক্তিই দুই ঘণ্টা পর হিমাবৃত হইলে, শীতলানুভূতিকে বিষবৎ জ্ঞান করিবে। তখন উত্তাপ তাহাকে ভাল লাগিবে। সৌন্দর্য্য

(৮) Brown's Lec. p. 370. Mr Payne Knight uses the word beauty in a different sense. With him 'beauty' is a sensation—so he is probably right in his own sense of the word.

(৯) Alison and Jeffrey are of this class. Vide Brown's Lec. and supplement to Ency. Britanica (Beauty).

সম্বন্ধেও ঠিক সেই রূপ। আমি অদ্য অষ্ট প্রহর লাল রঙ্গ দেখিতেছি, লাল রঙ্গ আর দেখিতে ইচ্ছা নাই, আমার নিকট লাল রঙ্গের আর সৌন্দর্য্য নাই। এ সময়ে একটী সবুজ রঙ্গের পদার্থ দেখিলে চিত্ত পুলকিত হয়, এখন আমার কাছে সবুজই সুন্দর। দিবারাত্রি কোকিলের শব্দ শুনিলে, কোকিলের শব্দও কাকের শব্দের ন্যায় বিরক্তিকর হইয়া উঠে। কোন কোন দ্রব্যে মনের অধিক রুচি, সহজে মন পরিতৃপ্ত হয় না, সে সকল দ্রব্যও অপরিমিত ব্যবহারে ক্রমশ ঘৃণিত হইয়া উঠে (১০)। সুন্দরী স্ত্রীলোক, যাহা দেখিয়া পুরুষের তৃপ্তি হয় না, যদি অধিক সময় দেখা যায়, তাহা হইলে মনের তৃষ্ণা অনেক কমিয়া আসে। বস্তু না দেখিলে বস্তুর সৌন্দর্য্য জন্মে না। অরণ্যে সুন্দরী থাকিলে, তাহাকে সুন্দরী বলা অন্যায়। যত ক্ষণ পুরুষের দৃষ্টিতে না পড়িল, তত ক্ষণ সে সুন্দরী নয়—ততক্ষণ সে কেবল কতকগুলি পরমাণু সুশৃঙ্খলরূপে একত্রিত। (ক্রমশঃ)

উঃ!

১

উঃ!—একি হল হায়, প্রাণের ভিতরে,
কি দিয়া কে যেন কি যে ছিন্ন ভিন্ন করে!
মনে করি কিছু নয়,
তবে কেন হেন হয়,
মনে করি চিন্তা বিষে এ পরাণ জরে,
তবে কেন এত করি,

---

(১০) "The effect of long use is to make all things, of whatever kind, entirely unaffecting".

Burke on the Sublime and Beautiful.

এ জ্বালা ভুলিতে নারি ?
আকাশ পাতাল কেন ঘুরিছে অন্তরে ?
উঃ !—একি হল হায়, প্রাণের ভিতরে !

২

চিকিৎসক ! খুল ত্বরা পুঁথি চিকিৎসার,
দেখত কি লেখা আছে ভিতরে তাহার ;
কি রোগ ইহারে বলে
কি হেন ঔষধ দিলে
উপশম হবে মম প্রাণের বিকার ?
দেখ দেখ ;—যাই যাই,—
আর দেখে কাজ নাই ;
তব সাধ্যাতীত মম প্রাণ প্রতিকার।

৩

হায়রে, উঃ একি এ যে বিষম যন্ত্রণা !
কি পাপে এ ক্ষীণ বক্ষে অশনি ঝঞ্ঝনা ?
চির বুক,—দেখ চেয়ে,
কি তথা পশিল গিয়ে ;
কেন ভয় ?—ফেল চিরে— হবেনা বেদনা
তার চেয়ে, যে ব্যথায়
আজি প্রাণ যায় যায় ;—
থাক্ থাক্—কাজ নাই—চিরনা—চিরনা।

৪

যে বক্ষে—যে ক্ষীণ বক্ষে সোণার প্রতিমা
বিরাজ করিত ধরি স্বর্গীয় সুষমা,
সে বক্ষে কেমন করে

তীক্ষ্ণ ছুরি জোরে মেরে,
চিরিবে ?—চিরনা—ছুরি ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা।
যদিও প্রতিমা গেছে,
এ বক্ষ ত আজো আছে,
ইহাই লইয়া আমি জুড়াই যন্ত্রণা।
উঃ!—তা যে হয় না রে,—বিফল বাসনা!

৫

হায়, কি অভাগা আমি!—হায় রে কপাল!
উঃ, কি পলকে বাড়ে নিরাশা-জঞ্জাল!
বক্ষ মম খালি করে,
গেল সে রে কত দূরে ?
হেন বসুন্ধরা আজ অতল পাতাল!
কই সে আমার কই ?
অই বুঝি, অই অই,
সে নয়—ছায়ায় ও যে কল্পনা খেয়াল!
এই কি, কল্পনে! তোর চাতুরীর কাল ?

৬

অই যে বসিল শশী নিলীম গগনে,
অই যে জোছনা হাসি বসিল কুসুমে,
অই যে বিটপী পরি
বিহঙ্গী বসিল ফিরি,
এই যে বসিল সন্ধ্যা মেদিনী আসনে,
সে কেন আমার বুকে
বসিল না হাসিমুখে ?
এ বক্ষ যে তারি তরে ধরেছি যতনে,

কোথা সে বুকের ধন আজি এতক্ষণে ?

৭

'উঃ শব্দ যে রকম, কি যে মর্ম্ম তার,
কখন আসেনি মনে মুখে অভাগার,
আজ তাই হল, হায়,
কিছু নাহি দেখা যায়—
কিছু নাহি শুনা যায় উঃ ছাড়া আর।
আমার যা কিছু যত
'উঃ, শব্দে কি পরিণত
করিবার ইচ্ছা ছিল ক্রূর বিধাতার ?
এক জন দেখে আলো, অন্যে অন্ধকার !

৮

চিরিব না বক্ষ ;—না না চিরিব নিশ্চয়,
না চিরিলে সে রতন পাবার যে নয়।
দেখিব কি দোষ দেখে,
এ হৃদয় খালি রেখে,
করিল রতন চুরি বিধি নিরদয়।
দেখিব সেখানে আজি
বিধাতার কারসাজি,
দেখিব আমার ধন কেন মোর নয়
দেখিব সুখের বক্ষ কেন শোকে দয় ?

৯

বুঝেছি সে গূঢ় তত্ত্ব—বুঝেছি এক্ষণে—
কেন যে সে নাই মোর হৃদয়-আসনে,
কেন যে সে মোরে ভুলি,

চিরতরে গেল চলি,
কেন যে সে নাহি কাঁদে আমার রোদনে,
কেন যে আমার পাশে
আর না সে ফিরে আসে,
কেন যে না চায় আর সে চারু নয়নে,
বুঝেছি সে গূঢ় তত্ত্ব— বুঝেছি এক্ষণে।

১০

তবে কেন দেরি আর?—যাই তবে যাই;
দাঁড়াও, বুকের ধন! যেও না—দোহাই।
দৃষ্টিরোধ অভাগার,
দেখিতে না পায় আর;
দাঁড়াও—যে দিকে থাক;—এই আমি যাই।
তুমিইত কর্ণমূলে
পরতে পরতে খুলে,
শুনালে সে গূঢ়তত্ত্ব;—মনে জাগে তাই;
দাঁড়াও, প্রাণের প্রাণ! এই আমি যাই।

১১

নিশাকর করজাল করিয়া বিস্তার,
ধর, যদি দেখে থাক প্রতিমা আমার।
সমীরণ! ক্ষণতরে
গতি তার রোধ করে,
দাঁড়াও—দিও না যেতে—ধর একবার;
মসীমুখী সন্ধ্যা সতি!
আজি মম এ মিনতি;—
আরো দ্রুত এসে কর আঁধার বিস্তার,

ধর, যদি দেখে থাক প্রতিমা আমার।

১২

আমি যে আমার তারে না পাই দেখিতে,
তোমরা তাহারে ধর—দিও না যাইতে।
এই আমি যাই—যাই—
কোথা পথ ?—নাহি পাই—
বিশ্ব যে আঁধারময়!—না পারি ছুটিতে।
পেয়েছি পেয়েছি পথ,
পূরিয়াছে মনোরথ,
কে তবে আমারে আর পারে নিবারিতে ?
আর কি পারিবে বাধা বাধা মোরে দিতে ?

১৩

অই যে তমসস্তুপ করিয়া বিদার,
অপূর্ব্ব আলোক-রেখা হতেছে সঞ্চার,
অই আলোকের মাঝে
আমার প্রতিমা সাজে,
নূতন অথচ সেই পূর্ব্বের আকার।
আর কেন ?—যাই যাই—
যারে চাই—অই তাই,
ওরে ছেড়ে এ নরকে এখনো কি আর
থাকিব ? সে গূঢ় তত্ত্ব বুঝেছি এবার।

১৪

পার্থিব জীবন, আর চাই না তোমায়,
অলক্ষ্যে চলিয়া যাও, বাসনা যথায়।
ওরে ও পার্থিব কায়া,

ছাড় মায়া—ছাড়ি মায়া,
ত্বরায় মিশায়ে যাও পরমাণু গায়।
পার্থিব বাসনা—আশা!
রে পার্থিব ভালবাসা!
রে পার্থিব সুখ দুঃখ! যা রে অচিরায়,
আমারে বিদায় দিয়ে, লইয়ে বিদায়।

১৫

আমি যারে ভালবাসি, আমার সে অই;
আমারে যে ভালবাসে, আমি তার নই?
না না—তা না—আমি তারি,
তারে কি ভুলিতে পারি?
ভুলিবার নহে যেই, তারে ভুলে রই?
এও কি হইতে পারে?
কে বলে ভুলেছি তারে?
সকলি ভুলেছি আমি—সেই এক বই;
সে ছাড়া এ বিশ্বে আমি আর কারো নই।

১৬

এ কথা মুখের নয়, মনের মাঝারে
বলিছে মনের মন জাগায়ে আমারে।
কে যেন আমায় ডাকি,
বলিছে,—ধরায় থাকি,
মৃত তুমি,—জীবিত সে ছাড়িয়া ধরারে।,
গূঢ়তত্ত্ব হল ভেদ;
ধুইব পার্থিব ক্লেদ,
সে যেখানে—সে খানের অমৃত-আসারে;

আবার—আবার পাব প্রাণ প্রতিমারে।

১৭

দাঁড়াও প্রস্তুত আমি,—আর দেরি নাই,—

জ্বেলেছি আলোক,—থাম,—তমস তাড়াই।

এই যে ধরেছি ক্ষুর,

আঁধারো হতেছে দূর,

এখনো কতক আছে—বাধা লাগে তাই?—

এবার পেয়েছি পথ,

এই পূরে মনোরথ,

সরে এস, প্রিয়তমে! মুখপানে চাই,

ক্ষুরে বক্ষ চিরিবার যন্ত্রণা জুড়াই!——

এই ত চিরিনু বক্ষ!—উঃ—যাই—যাই!

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কুঞ্জলতার মনের কথা।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত মাসিক সমালোচক সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

সম্পাদক মহাশয়,

অনেক দিন হইতে মনে সাধ, মনের কথা খুলিয়া বলিব। বলি বলি করিয়া এত দিন বলা হয় নাই। কতকটা ভয়ে, কতকটা লজ্জায়, কতকটা বিদ্যা বুদ্ধির অভাবে মনের সাধ এত দিন পূর্ণ করিতে পারি নাই। এখনই যে বুদ্ধি বিদ্যায় কাটিয়া পড়িতেছে তাহা নহে; কিন্তু যাহাদের হইয়া দুটো কথা বলিতে কেহ নাই, তাহারা নিজের কথা নিজে না বলিলে আর কে বলিবে? তাই ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিয়াছি যে, চির দিন গর্ভাগ্নি ভূধর হইয়া না থাকিয়া মনের কথা মুখে ফুটিয়া বলিব। যাহা থাকে অদৃষ্টে হইবে।

আমার মনের কথা, সে কিসের কথা? পুরুষেরা কি রূপ আশা করিবেন, বলিতে পারি না; কিন্তু আমি যাহা বলিব মনে করিয়াছি, সে বড় দুঃখের কথা——অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতার কথা, পুরুষের অত্যাচারের কথা, সমাজের নির্যাতনের কথা, আমাদের দুরবস্থার কথা, বাঙ্গালির অন্তঃপুর রূপ নরকের কথা। এক কথায় বলিতে গেলে, আমার মনের কথা আমাদের মর্ম্মের ব্যথা মাত্র। ছোট মুখে বড় কথা শুনিয়া, প্রিয় সম্পাদক মহাশয় কিছু মনে করিবেন না ত?

একটা ছোট রকমের অনুরোধ আছে। লেখা পড়া তেমন জানিনা। তবে যে একটু আধটু লিখিতে পারি, সে অভ্যাস দোষে। আমার স্বামী——ঈশ্বর তাঁহাকে পরলোকে সুখী রাখুন——আমার স্বামী, প্রেমিক বলিয়াই হউক, নভেল পড়িতেন বলিয়াই হউক, বিদ্যাবতীর স্বামী বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছাতেই হউক, বড় সাধ করিতেন যে, তিনি যখন বিদেশে থাকিবেন, আমি তাঁহাকে কাঁদিয়া কাটিয়া, হপ্তায় হপ্তায়, এক একখানি মলিন-বদন, সজল-নয়ন পত্র লিখি। সেই জন্য তিনি বিনা প্রয়োজনেও বৎসরে তের মাস প্রবাস করিতেন। আমি মহা শঙ্কটে পড়িতাম। নিত্য নূতন প্রেমকান্না কাঁদিতে পারি, এত বিদ্যা কোথায় পাইব? তবু লিখিতাম। আজ-কার এই মনের কথা সেই অভ্যাসের ফল। অতএব সম্পাদক মহাশয়, যদি পারেন, যদি অবসর হয়, আমার এই ছাই ভস্ম, এই হিজি বিজি সিজি, একটু দেখিয়া শুনিয়া ছাপাইবার উপযুক্ত করিয়া লইবেন না কি?

আপনার পত্রের প্রতীক্ষায় থাকিলাম। আমি জানি, সম্পাদকেরা ঘরের টিকিট দিয়া ইষ্টদেবতাকেও পত্র লিখেন না। সেই জন্য একখানি টিকিট এই পত্র সহ পাঠাইলাম। আমার 'মনের কথা, আপনার পত্রে স্থান পাইতে পারে কি না, লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন। আপনার পত্র পাইলে আশ্বস্ত হইব। ইতি। সেবিকা

শ্রীকুঞ্জলতা দেবী

নারীজন্ম।

"কেন আসিলাম হায় এ পাপ সংসারে ?"

নারীজন্ম বড় পাপ—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, সর্ব্বাপেক্ষা বঙ্গদেশে। কেবল জন্মদোষেই আমরা ছোট, পুরুষ বড়। হাজার বুদ্ধিমতী হই, হাজার গুণবতী হই, তবু পুরুষদিগের বিচারে বার হাত কাপড়ে কাছা নাই। কাছা নাই, সত্য; কিন্তু কাছা থাকিয়াই যে আপনারা কি ইন্দ্রত্বলাভ করিতে পারিয়াছেন, তাওত দেখিনা। তবে আপনারা বাঙ্গালি পুরুষ, কাছা আঁটায় আপনাদের একটা সুবিধা আছে—পলায়নের বেলায় বেশ্ সহজে কার্য্য সিদ্ধ হয়। পথে কুকুর ডাকিলে, অথবা ছাদের উপর হনুমান আসিলে, যখন আপনারা সাহসে বুক বাঁধিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আমাদের আঁচল ধরিতে আসেন, তখন পায়ে কাপড় জড়াইয়া যায় না। এটা আপনাদের পক্ষে বড় বিশেষ সুবিধা, সন্দেহ নাই।

নারী জন্ম বড় পাপ! তা জন্মবৃত্তান্তের পরিচয় লইয়াই দেখ। পূর্ব্বজন্মাচরিত পাপের ফলে যদি একটী কন্যা সন্তান হইল, অমনি যেন বাড়ীশুদ্ধ লোকের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিতা বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া উঠিলেন, বাত্যাবিচ্ছিন্ন বল্লরীর ন্যায় হস্তমধ্যে মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়িলেন—হয় ত সেই সন্তাপে জ্বর হইল। মাতা কন্যা প্রসব করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে বড় হতভাগিনী মনে করিলেন—পতিপ্রেম হারাইবার আশঙ্কায় নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। শত্রু হাসিল বলিয়া আত্মীয়স্বজন বিষন্ন হইলেন—মুখময় কে যেন কালী ঢালিয়া দিল। যে না জানে, সে মনে করে, বাড়ীতে বুঝি ডাকাইতি হইয়াছে; বুঝি কে মরিয়াছে। যে জানে, সে মনে করে; ডাকাতি হইলে যে ছিল ভাল, কেহ মরিলেও যে ছিল ভাল।

তার পর স্বামীগৃহের সুখ—হায় রে কপাল! সে রসের কথা বলি কাকে? শুনে কে? স্বামী ভাবিয়া রাখেন, এ যেন ইন্দ্রিয়বিশিষ্টা, চেষ্টাযুক্তা পাষাণপ্রতিমা॥ মনে করেন, ইহার প্রাণ প্রাণ নহে, প্রেম বিশিষ্ট চৈতন্য মাত্র। তিনি রাত তিনটা পর্য্যন্ত লোকের দুয়ারে দুয়ারে মাথা কুটিয়া, শেষ নিশায় প্রভাত বায়ু সেবন করিতে, প্রভাত নিদ্রা উপভোগ করিতে, দাসীকে চরিতার্থ করিতে ঘরে আসিবেন, আর আমাদিগকে বাতাস করিতে হইবে, পদসেবা করিতে হইবে, হাসি মুখে কথা কহিতে হইবে, তাঁহার রসিকতায় হাসিতে হইবে, তাঁহার প্রেমালাপে গলিয়া জলের অধিক হইতে হইবে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া আহ্লাদে আঠারখানা হইতে হইবে। রাগ করা নিষেধ, অভিমান নিষেধ, মুখভারি করা নিষেধ—সেই সুখের প্রভাত মিলনে ন-ধর হইতে হইবে। মনে করিতে হইবে যে, "প্রভাতে হেরিনু এ চাঁদবদন দিন যাবে ভালে ভাল"। ইহাই যদি না পারিলাম—শরীরই ত, যদি না চলিল—নিত্য আশাপথ চাহিয়া, রাত জাগিয়া বসিয়া থাকিতে যদি না পারিলাম; মনই ত, যদি না বুঝিল—নিত্য হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিতে যদি না পারিলাম, তবেই আগুণ লাগিল। তখন কত কথাই উঠিবে,—কপট প্রেম, মুখের ভালবাসা আত্মপরায়না, তীর্থের পাপ—তার পর ফণিভায্য শেষ করিয়া প্রতিজ্ঞা হইল, আর কালোরূপ হেরিব না, কালো জলে গা ধুব না, কালো কেশ মুড়াব, কালো কাপড় ধোবাবাড়ী দেব, ইত্যাদি। হাসিও পায়, দুঃখও ধরে—অপরাধের মধ্যে, শেষ রাত্রে তিনি খোলশ-ছাড়া সাপের মতন ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গড়িতে গড়িতে ঘরে আসিয়াছিলেন, আমি হাসিয়া কথা কই নাই—অপরাধ ত এই, ইহারই জন্য এত। তা ইহাতেই কি নিস্তার আছে? পর দিন পাড়ার গেজেট সুভদ্রার পিসী পাড়ায় পাড়ায় খবর দিয়া আসিল—চাটুয্যেদের ছোট বৌ স্বামীকে নাথি

মারিয়া খাটে হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল, আমি গিয়া চোখে মুখে জল দিয়া দাঁতি ছাড়াই। শেষে কি করি, কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকিয়া, পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গাইতে হয়।

কি করি, সকলই সহ্য করিতে হয়। না করিলে উপায় নাই। কারণে হউক, অকারণে হউক, স্বামী যদি বিমুখ হইলেন, তবে এত বড় পৃথিবীটাতে আর আমাদের দাঁড়াইবার স্থান থাকিল না। গত্যন্তর নাই বলিয়া তোমরা অত্যাচার কর; গত্যন্তর নাই বলিয়া আমাদিগকে সবই সহ্য করিতে হয়। এত যে অত্যাচার কর——কত বার রাগ কর, কত বার মুখ বাঁকাও, কত বার অন্যায় তিরস্কার কর, কত বার বাক্যালাপ রহিত কর, কত বার পরিত্যাগ করিতে চাও—এত যে অত্যাচার, এত যে লাঞ্ছনা, তবু আশ্রিত, পদানত, শ্রীচরণোপান্তে একটু স্থান পাইবার জন্য লালায়িত। তোমরা পুরুষ, যা কর তাই শোভা পায়; আমরা স্ত্রীলোক হইয়াই চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছি। সম্পাদক মহাশয় বলিতে পারেন, কি জপ জপিলে, কি তপঃ তপিলে নারীজন্ম রূপ নরক হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়?

কৃতবিদ্য নব্যদিগের নিকট আমার একটা নিবেদন আছে। আপনারা পুরুষ, আমরা স্ত্রীলোক—আমরা আপনাদের আশ্রিত, প্রতিপালিত, পদানত—দাসীদিগের একটা নালিশ শুনিবেন না কি? আমরা আপনাদের ক্রীড়ার পুতুল, কথার ভিক্ষারী, দাসীর দাসী—আপনাদের চরণের ধূলো, খড়মের বলো, গায়ের মলা, শ্লিপারের সুখতলা—আপনাদের জুতার বকলশ, পিরানের বোতাম, ফতুয়ার আস্তিন, প্যাণ্টালুনের পকেট, নাকের চুল, দাড়ির উকুন—গরিব দাসীদিগের প্রতি একবার মুখ তুলিয়া চাহিবেন না কি? আপনারা এত মহৎ কার্য্য করিতেছেন; আমাদের জন্য কিছু করিতে পারেন না কি? আপনারা চসমা চোখে দিয়া স্বদেশের উদ্ধার করিতে পারেন,

মদ খাইয়া ভারতের লুপ্ত মনুষ্যত্বের উদ্ধার করিতে পারেন, বেশ্যার গালি খাইয়া পূর্ব্ব পুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন—গরিব দাসী দিগকে কোন প্রকারে এ নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারেন না কি? ভাবিয়া দেখুন, আপনারা বৈ আর আমাদের কে আছে? আপনারাই আমাদের সর্ব্বস্ব—আমাদের বিপদে ভরসা, শোকে সান্ত্বনা, ইহলোকের আশ্রয়, পরলোকের গতি—আপনারা আমাদের মাথার মানিক, নয়নের তারা, অঞ্চলের নিধি, বুকের রক্ত, দেহের নিশ্বাস—আমাদের সীঁতার সিন্দুর, চোখের কাজল; ঠোঁটের মিসি, পায়ের আলতা—আপনারা আমাদের খোঁপার ফুল, কাণের দুল, নথের ঝুম্‌কা, চন্দ্রহারের চাঁদ—আমাদের চুলবাঁধা দড়ি, লক্ষ্মীর কড়ি, নুতন কুমড়ার বড়ি, ছড়া ঝাঁটের হাঁড়ি, অন্ধের নড়ি, বারাণসী সাড়ী। আপনারাই এ ফুটো ডিঙ্গিতে বাঙ্গাল মাঝি, এ চাকাভাঙ্গা রথের নুলো সারথী, এ ভাঙ্গা ছ্যাকুড়ার কাণা কোচ্‌ম্যান। আপনারা আমাদের জ্বরে কুইনাইন্, কৃমীতে স্যাণ্টোনাইন্, ধাতুদৌর্ব্বল্যে ষ্ট্রিকনাইন, সংসার বন্ধনের ল্যাক্‌-লাইন্, জীবন-চিম্‌নির কেরোসাইন্—আমাদের ওলাউঠায় ক্যালোমেল, বাতে ফ্লানেল, বিপদে আক্কেল,—আমাদের দুর্দ্দিনের সম্বল, অরুচির অম্বল, শীতের কম্বল,—একবার দাসীদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবেন না কি? মনে করিলে আপনারা কি না করিতে পারেন? আপনারা শাম্‌লা মাথায় দিয়া সরকারি জুজু * হইয়া চিরপরিচিতকে ভুলিয়া যাইতে পারেন, তিন দিনের জন্য বিলাতে গিয়া মাতৃভাষা বিস্মৃত হইতে পারেন, ডাল ভাত খাওয়া রোগা পেটে টুইটুম্বুর করিয়া মদ ঢালিয়া দিয়া ছত্রিশ জাতির উচ্ছিষ্ট গোগ্রাসে গিলিতে পারেন, ভদ্রসন্তান হইয়া থিয়েটরে শং সাজিতে পারেন—আপনারা

---

* 'সরকারি জুজু'——হাকিম নাকি?

Printer's Devil.

না পারেন কি? আপনারা লেখাপড়া না শিখিয়া পণ্ডিত হইতে পারেন, ম্যাক্‌স্‌মূলরের তালিকা নকল করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ হইতে পারেন, পুরুষ হইয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন—আপনাদের অসাধ্য কি আছে? আপনারা অন্তঃপুরে বক্তৃতা করিতে পারেন, ভিখারীকে গলাধাক্কা দিতে পারেন, গৃহিণীকে পদাঘাত করিতে পারেন, আবার অপিসে গিয়া সোণা হেন মুখ করিয়া সাহেবের লাথি খাইতেও পারেন—আপনাদের অসাধ্য কি? আপনারা পার্টিতে বসিয়া রাতকে দিন করেন, খোঁয়ারি চাপিলে দিনকে রাত করেন, তিন পাতা ইংরেজি পড়িয়া বাঙ্গালিকে সাহেব করেন, সভ্য হইয়া পিতামাতাকে পর করেন—জগতে আপনাদের অসাধ্য কিছু আছে, এ কথা যে বলে, সে মিথ্যা-বাদী। গরিব দাসীদিগের উপর একটু নজর রাখিবেন—ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করিবেন।

শ্রীকুঞ্জলতা দেবী

ব্রাহ্মণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বুদ্ধিমূলক, অর্থমূলক, ও দৈহিক, এই তিন প্রকার ক্ষমতার মধ্যে প্রথমোক্ত ক্ষমতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অপর দুইটি প্রথমটির দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু সমাজ সৃষ্টির প্রারম্ভে ইহার বিপরীত দেখা যায়। তখন বুদ্ধি বৃত্তি অপরিস্ফুট থাকে এবং সমাজস্থ লোকগণের স্থৈর্য্য ও অবকাশ না থাকায় সমাজে অর্থ সঞ্চয় হয় না, সুতরাং তখন দৈহিক ক্ষমতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র আদরণীয় বলিয়া গণ্য হয়। মৃগয়া অথবা পশুপালন দ্বারা তখন লোকে জীবিকানির্ব্বাহ করে, সুতরাং যে ব্যক্তি অধিকতর বলবান্ এবং অন্যের অপেক্ষা অধিক মৃগয়াপটু, সে সমাজে অধিক আদর প্রাপ্ত হয়। তোমার যাহা আছে, আমার তাহা যদি না

থাকে, অথচ তাহা ভাল ও জীবিকা নির্ব্বাহ পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়, আমি তোমাকে ভক্তি করিব, বলিব "হে মহান্, এই রৌদ্র দগ্ধ সংসার মরু-ভূমে তুমি এক মাত্র ছত্রপতি, আমাকে ছায়া দান কর"। ভক্তি, ভয় ও বিস্ময়ের সমপারিমাণিক। এই ভয় ও বিস্ময়, ভীত ও বিস্মিত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে তাহাকে চালিত করিতে থাকে। মানব সমাজ যে কোন অবস্থাপন্ন হউক না কেন, এই মনোবৃত্তির প্রভাব হইতে কোন কালেই মুক্ত হইতে পারে না। আমেরিকার তাম্রবর্ণ, উলঙ্গ আদিম নিবাসী যে কারণে তাহার জাতীয় "বৃষ্টিকারক (Rain maker) ও "ঔষধ মানুষের" (Medicineman) ভক্তি করে ও তাহাদের আহারার্থ মৃগয়ালব্ধ সর্ব্বোত্তম মাংস আনিয়া দেয়, সেই কারণেই ডেভিড্ গারিক্ আভন্ নদীর তীরে কবিগুরু সেক্ষপীয়রের পূজা করিয়াছিলেন, ও পারিসের নাগরিক দল ভল্‌তেরকে স্কন্ধে করিয়া সমস্ত পারিস্ পরিভ্রমণ করিয়াছিল। আমাদের মহাদেবের সৃষ্টি এই মনোবৃত্তি-মূলক।

ভবং শর্ব্বং তথেশানং তথা পশুপতিং প্রভু।
ভীমমুগ্রং মহাদেবং উবাচ স পিতামহঃ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ। ৫২ ম।

পিতামহ ক্রোড়স্থ নীললোহিত কুমারের রোদন শান্তির জন্য তাহাকে রুদ্র প্রভৃতি যে নাম প্রদান করিলেন, তাহা ভয় ও বিস্ময়মূলক। এই রূপ ভয় ও বিস্ময়-প্রসূত শত শত দেবতা পৃথিবীর দেব মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। এই সূত্র, দেব মানব উভয়েই সমপ্রযোজ্য।

ধনসঞ্চয়জনিত অবকাশের সহিত বুদ্ধিবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও অননুভবনীয় রূপে সমাজের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। এই আধিপত্য স্বভাবজ, এবং প্রায় সকল স্থলেই অধিপতি ও অধিকৃত উভয়েরই অজ্ঞাত। যে খানে মার্জ্জিতবুদ্ধি ব্যক্তি

স্বসমাজস্থ অপর ব্যক্তিগণের হীণবুদ্ধি উপলব্ধি করিতে সক্ষম, সেই খানেই মহা অনর্থ উপস্থিত হয়। বুদ্ধি-সম্ভূত আধিপত্য যেমন স্বভাবজ, তেমনি বুদ্ধির বিকাশও স্বভাবজ। প্রাকৃতিক ঘটনা যেমন কোন উপায়েই রুদ্ধ করিতে পারা যায় না, তেমনি মানবমনোবৃত্তি নিচয়ের বিকাশও কিছুতেই রুদ্ধ হইবে না। সমাজে অলক্ষ্য ভাবে ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হইয়া এই বৃত্তিনিচয় যখন গিরিকন্দরনিসৃত প্রস্রবণ তুল্য বেগে ধাবিত হয়, তখন তাহাদের গতিরোধ চেষ্টা বিফল। ফ্রান্সের পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই উভয়েই ফ্রান্সের এই প্রধাবনোন্মুখ প্রস্রবণের গতিরোধ চেষ্টা করিয়াছিলেন ও সেই চেষ্টার ফল ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের ফরাসী বিপ্লব। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ইউরোপে লুথার কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্ম সংস্কার ও তন্মূলক ত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী যুদ্ধ, জিস্‌কার বিনিয়োগ পত্র * —এ সমস্তই এই গতিরোধ চেষ্টার অপরিহার্য্য ফল।

বুদ্ধিবৃত্তি অলক্ষ্যভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ও সঙ্গে সঙ্গে লোকে তৎপ্রতি ভক্তি করিতে আরম্ভ করে। মহাধনী ব্যক্তি বিশেষকে যেমন লোকে ভক্তি করে, তেমনি সমধিক বুদ্ধিসম্পন্ন সম্প্রদায় প্রতিও লোকের ভক্তি সঞ্চার হয়, এবং এই ভক্তি তাহাদের বংশীয়গণের উপরেও প্রসারিত হইয়া থাকে।

---

*বোহেমিয়ার জন্ জিস্‌কা, সম্রাট সিজিসমণ্ড কর্ত্তৃক জন হস্ ও জিরোমের প্রাণ সংহারের পরে, এই ধর্ম্মসংস্কারক দ্বয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধার্থে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। জিস্‌কা অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার তুল্য তৎকালে (১৪২০ খৃঃ অব্দ) ইউরোপে কেহ সেনানায়ক ছিল না। মৃত্যুকালে জিস্‌কা স্বীয় বিনিয়োগ পত্রে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুন্তে তাঁহার চর্ম্ম দ্বারা এক ঢক্কা প্রস্তুত করিয়া হসাইট্ দলের যুদ্ধ যাত্রা কালে সেনাগণের অগ্রে বাদিত হইবে, এবং তৎশব্দ শ্রবণে শত্রুসৈন্য ভয়ে পলায়ন করিবে।

আমি যদি তোমাকে ভক্তি করি, তোমার পুত্র পৌত্রের প্রতিও আমার ভক্তি জন্মিবে,—পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু ভক্তি জন্মিবে। যে যে দেশে জাতিভেদ প্রথা ছিল, সেই সেই দেশেই এই কৌতূহলজনক ঘটনা দেখিতে পাইবে। ভারতবর্ষ, পারশ্যদেশ, মিসরদেশ, আমেরিকার মেক্সিকো, পেরু—সকল দেশেই এই প্রকার ঘটিয়াছে। ইউরোপে রোমান কাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের ন্যায় কোন বিশেষ জাতি সৃষ্টি না হইবার একমাত্র কারণ এই যে, উক্ত ধর্ম্মযাজকগণের দারপরিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। নিষিদ্ধ না থাকিলে, ইউ-রোপেও যে ব্রাহ্মণের ন্যায় জাতি বিশেষের সৃষ্টি হইত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের জাতিবিভেদ যে এই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিমূলক, তাহা মহাভারত লেখক বোধ হয় অবগত ছিলেন,—তাঁহার সর্ব্বত্র প্রসারিণী বুদ্ধিশক্তি যে বর্ণবিভেদের গূঢ়তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক সকল তাহার প্রমাণ। মহর্ষি ভৃগু ভরদ্বাজকে বলিলেন যে,

ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকোবর্ণঃ শূদ্রানামসিতস্তথা॥

শান্তিপর্ব্ব। ৬৯৩৪ শ্লোক

"ব্রাহ্মণগণের শুভ্রবর্ণ, ক্ষত্রিয়গণের লোহিত বর্ণ, বৈশ্যগণের পীতবর্ণ এবং শূদ্রগণের কৃষ্ণবর্ণ"। ভৃগুবাক্যে ভরদ্বাজের সন্দেহ উপস্থিত হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য বর্ণেন যদি বর্ণোবিভিদ্যতে।
সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণশঙ্করঃ॥
কামঃ ক্রোধঃ ভয়ং লোভ শোকশ্চিন্তা ক্ষুধাশ্রমঃ।
সর্ব্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্বর্ণো বিভিদ্যতে॥
স্বেদমূত্র পুরীষাণি শ্লেষ্মাপিত্তং সশোনিতং।

তনু ক্ষরতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্ বর্ণো বিধিয়তে॥
জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরানাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধ বর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ॥

শান্তিপর্ব্ব। ৬৯৩৬—৩৯ শ্লোক

চাতুর্ব্বর্ণ্যগণের বর্ণানুসারে যদি জাতিবিধান হয়, তাহা হইলে সকল বর্ণগণের বর্ণশঙ্কর নিশ্চিত দৃষ্ট হইতেছে। কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা, শ্রম আমাদের সকলের উপরেই প্রভুত্ব করিয়া থাকে, তবে বর্ণবিভেদ কি প্রকারে হইল? স্বেদ, মূত্র, মল, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত সকলের পক্ষে সাধারণ, এবং সকলেরই দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; তবে বর্ণবিধান কি প্রকারে হইল? অসংখ্য স্থাবর জঙ্গম জাতি সকল দৃষ্ট হয়, সেই বিবিধ জাতিদিগের জাতিনির্ণয় কি রূপে সাধিত হইবে?

ভরদ্বাজের চিত্ত বাস্তবিকই সন্দেহাকুল হইয়াছিল। বর্ণ অনুসারে জাতিবিভেদ করিতে হইলে, তিনি দেখিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না, কারণ তাঁহার সময়েই অনেক ব্রাহ্মণ শ্বেতকায় ছিলেন না, হীনজাতিগণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ছিলেন। মহর্ষি ভৃগু উত্তর করিলেন

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বং সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণা ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্টন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিসিধ্যতে॥
ইত্যেতে চতুরোবর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥

শান্তিপর্ব্ব। ৬৯৪০-৪৫ শ্লো

"জাতি বিভেদ নাই। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণময় সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে কর্ম্ম দ্বারা বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ কামভোগপ্রিয়, উগ্র ও ক্রোধযুক্ত, সাহসী, স্বধর্ম্মত্যাগী এবং লোহিত দেহ, তাহারা ক্ষত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ গাভিজাত দ্রব্যে জীবন নির্ব্বাহ করে, পীত বর্ণ, কৃষি উপজীবী ও স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহারা বৈশ্যতা প্রাপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণগণ হিংসা এবং অসত্যপ্রিয়, লোভী, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, কৃষ্ণবর্ণ ও শুদ্ধাচার ভ্রষ্ট, তাহারা শূদ্রতা প্রাপ্ত হইল। এই রূপে কর্ম্ম দ্বারা বিভিন্ন হইয়া দ্বিজগণ বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের ধর্ম্মাচরণ ও যজ্ঞ ক্রিয়াদি চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ হয় নাই। আমি এই চতুর্বর্ণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, ব্রহ্মা পূর্ব্বে ইহাদের জন্য ব্রাহ্মী সরস্বতী বিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু লোভবশত ইহারা অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

মহর্ষি ভৃগু ব্রাহ্মণের যে লক্ষন নির্দ্দেশ করিলেন, তাহার সহিত উপরোক্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কোন সাদৃশ্য নাই।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃত শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ষঠ্ সুকর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারস্থিত সম্যগ্ বিঘ্নাশাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে।

শান্তিপর্ব্ব। ৬৯৫১-৫২ শ্লোক।

যিনি জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত এবং শুচি হইয়াছেন, যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও ষড়কর্ম্মস্থিত, শৌচাচারী, যজ্ঞান্নভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী এবং সত্যানন্দ, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।

আর্য্য-সমাজের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি উপরোক্ত গুণসম্পন্ন নহেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নামে অভিহিত হইলেন। ভৃগুর মতে ইহারা সকলেই "ত্যক্তস্বধর্ম্মা" কিন্তু "স্বধর্ম্ম নানুতিষ্ঠন্তি"। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণেরও কোন উল্লেখ নাই, এবং "কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণা" ও "হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধা" ইত্যাদি যে সকল গুণের নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির নিকৃষ্ঠতার পরিচায়ক। বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিবৃত্তি যে সমগতি বিশিষ্ট ও এই সমগতি যে প্রকৃত উন্নতির একমাত্র সংসাধক, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষের চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাতন ঋষিগণের কি প্রকার বিশ্বাস ছিল, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহাদের মতে প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতলেখক প্রভৃতির ন্যায় যাঁহারা বর্ণবিভেদের গূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের মত লোকসমাজে প্রচারিত নাই, সাধারণ হিন্দু ব্রহ্মার অঙ্গচতুষ্টয় চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি স্থান বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমরা বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ঋগ্বেদ সংহিতা পৃথিবী মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ। মোক্ষমূলর সাহেবের মতে খৃষ্ট শতাব্দির ১০০০—১২০০ বৎসর পূর্ব্বে এই সংহিতার শ্লোক সকল রচিত হয়। পণ্ডিতাগ্রগণ্য অধ্যাপক মোক্ষমূলর সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যে কথা বলিবেন, তাহা আমাদের শিরোধার্য্য, এবং আমরা সরল চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে তাহার প্রতিবাদ

করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে সংস্কৃতানুশীলনরত আর এক দল প্রাচ্য পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা ঋগ্বেদ রচনার কাল নির্ণয় সম্বন্ধে ভিন্ন মতানুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার হগ্ সাহেব ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে "খৃষ্ট শতাব্দির পূর্ব্ব ১৪০০—১২০০ বৎসর আমি ব্রাহ্মণ সমূহের অধিকাংশের রচনা কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কিছুমাত্র সন্দেহ করি না। ব্রাহ্মণ রচনার শেষ সময় হইতে দুই শত বৎসর বাদ দিয়া নিতান্ত পক্ষে তৎপূর্ব্ব পাঁচ ছয় শত বৎসর সংহিতার রচনার জন্য আবশ্যক। তদনুসারে সংহিতার অধিকাংশের রচনার নিমিত্তে আমরা খৃষ্ট শতাব্দির পূর্ব্ব ১৪০০—২০০০ বৎসর সময় পাইতেছি। প্রাচীনতম ঋক্ ও মন্ত্র সকল আরও কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমরা খৃষ্ট শতাব্দির পূর্ব্বে ২০০০—২৪০০ শত বৎসর বৈদিক সাহিত্য রচনার প্রারম্ভকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।"

এখন পাঠক দেখুন যে, খৃষ্ট শতাব্দির পূর্ব্ব ২০০০—২৪০০ বৎসর ঋগ্বেদের রচনাকাল বলিয়া অনেক ইউরোপের পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন। এই ঋগ্বেদে জাতি বিভাগের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা এক স্থলে মাত্র; অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ম সূক্তের ১ম ঋকের নাম পুরুষসূক্ত, এবং এই সূক্তে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে। আমরা সমুদায় ঋক্‌টি উদ্ধৃত করিলাম।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং ॥ ১
পুরুষঃ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভাব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩

ত্রিপাদূর্দ্ধোদৈত পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিশ্বং ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।। ৪
তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ।। ৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবাঃ যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্মঃ ইধ্মঃ শরদ্ হবিঃ ॥ ৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি পৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবাঃ যাজন্ত সাধ্যায়াঃ ঋষয়াশ্চ যে ॥ ৭
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূন্ তংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাংশ্চ যে ॥ ৮
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯
তস্মাদশ্বা জায়ন্ত যেকেচোভয়াদতঃ।
গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতাঃ অজাবয়ঃ ॥
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধাবি অকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কোরুপাদোচ্যতে ॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥
চন্দ্রমা মনসো জাত শ্চক্ষোঃ সূর্য্যোঃ অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত ॥ ১৩
নাভ্যাঃ আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যোঃ সমবর্ত্ততঃ।
পদ্‌ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোতাৎ তথা লোকানকল্পয়ন্ ॥১৪
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয় স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবাঃ যদ্ যজ্ঞং তন্বানাঃ অবধ্নন্ পুরুষং পশুং ॥ ১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞ মযাজন্ত দেবা।

স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত
যত্র পূর্ব্বে সাধ্যায়াঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬

পুরুষ সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু ও সহস্রপাদ। তিনি এই পৃথিবী সর্ব্বত্র আবরণ পূর্ব্বক দশাঙ্গুলব্যাপ্ত স্থান দ্বারা ব্যাপিয়া রাখিয়াছেন। পুরুষই এই সমস্ত বিশ্ব, ভূত ভাবী সমস্তই পুরুষ, এবং তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর, যে হেতু তিনি অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। তাঁহার মহিমা এই প্রকার, এবং পুরুষ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ভূতগণ তাঁহার চতুর্থাংশ মাত্র, অবশিষ্ট তিনভাগ স্বর্গে অমৃত রূপে বিরাজ করিতেছে। পুরুষ ত্রিপাদ সহ ঊর্দ্ধে গমন করিলেন, তাঁহার চতুর্থাংশ এই পৃথিবীতে পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর তিনি সমস্ত ভোজী ও অভোজী বস্তু অধিকার করিয়া এই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইলেন। তাঁহা হইতে বিরাটের উৎপত্তি হইল, এবং বিরাট হইতে পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলেন। জন্মিয়া, তিনি অগ্র পশ্চাৎ উভয়ত পৃথিবী অতিক্রম করিয়া দেহ প্রসারণ করিলেন। পুরুষ রূপ বলি দ্বারা দেবতারা যে যজ্ঞ করিলেন, বসন্ত তাহার আজ্য, গ্রীষ্ম ইন্ধন ও শরৎ হবিঃ হইয়াছিল। অগ্রজাত যজ্ঞরূপ সেই পুরুষকে কুশোপরি বলি প্রদান করিয়া দেবগণ ও সাধ্যায়সম্পন্ন ঋষিগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সর্ব্বলোকসম্পন্ন সেই যজ্ঞ হইতে ক্ষির এবং নবনী সঞ্চিত হইল, এবং উক্ত যজ্ঞ বায়ব্য, আরণ্য ও গ্রাম্য পশু সৃষ্টি করিল। সর্ব্বলোকসম্পন্ন সেই যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সাম সমুহ জন্মলাভ করিল। তাহা হইতে ছন্দঃ সকল ও যজুঃ উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে অশ্ব ও দ্বিশ্রেনী দন্তবিশিষ্ট পশু সকল জন্ম লাভ করিল এবং তাহা হইতে গো, মেষ ও অজা উৎপন্ন হইল। দেবতারা যৎকালে পুরুষকে বিভক্ত করিলেন, তখন তাঁহাকে কত খণ্ড করিয়াছিলেন? ইহার মুখ

কি, বাহুদ্বয়ই বা কি, ও উরু এবং পাদই বা কাহাকে বলে? ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ ছিলেন, বাহুদ্বয় দ্বারা রাজন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইঁহার উরুদ্বয় তাহাই যাহা বৈশ্য, এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইল। তাঁহার মনঃ হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং নিশ্বাস হইতে বায়ু সৃষ্টি হইল। নাভি হইতে অন্তরিক্ষ, মস্তক হইতে দ্যুলোক, পদদ্বয় হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ সমূহ সৃষ্ট হইল। এই রূপে সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন। যৎকালে যজ্ঞোদ্যত দেবতারা পুরুষকে পশু রূপে বন্ধন করিলেন, তৎকালে তাঁহারা সপ্তপরিধি ও একবিংশ সমিধ্ স্থাপন করিয়াছিলেন! দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। এই সকল প্রথম ধর্ম্মক্রিয়া রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই মহিমাময় ক্রিয়া সকল স্বর্গে সমুত্থিত হইয়াছে, যে খানে পূর্ব্বকালীন সাধ্যায় ও দেবগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

—০—

মাসিক সমালোক সম্বন্ধীয় রচনা প্রবন্ধাদি, সমালোচ্য গ্র
খাগড়া, বহরমপুরের ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে
কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্নস্বাক্ষরকারী নিকট পাঠা
হইবে।

ব্যারিং বা ইন্সফিসিয়েণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না। যাঁহ
পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উ
লেখা যাইবে না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে।
যাঁহারা ডাকের টিকিটে মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি টাক
৵০ আনা কমিসন দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টি
যেন কেহ না পাঠান। মনিঅর্ডারে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর জী
নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন তাঁহাদিগের নিকট পর
হিসাবে ৪৲ টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে,
বিনা মূল্যে দেওয়া এক কালে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্র ৵
হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে সতন্ত্র ব
করা যাইতে পারে।

ও দেব

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র
কার্য্যাধ্য
মাসিক সমালোচক
খাগড়া বহ

১ম খণ্ড।] [৪র্থ সংখ্যা।

মাসিক সমালোচক।

(সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।)

সম্পাদক

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

সন ১২৮৬ সাল শ্রাবণ।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

বহরমপুর অরুণোদয় যন্ত্রে

মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য।৵০ আনা।

মাসিকসমালোচক।

—*:※:*—

ভারতের এ দশা কেন?

ভারতের এ দশা কেন? যাহার গণিত শিখিয়া ইউরোপের শিরোমণি গ্রীক জাতি কৃতার্থ হইত, আজ তথায় হরণ পূরণ শিখিলে নির্ব্বংশ হয়। যাহার দর্শন ন্যায়ের কণামাত্র পাইয়া অধুনাতন সভ্য সমাজ আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিতেছে, আজ তথায় নিবীড়তম অন্ধকার। যেখানে কালীদাস, ভবভূতি, ব্যাস ও শঙ্কর জন্মিয়াছে, আজ তথায় বিজাতীয় কবির আদর ও পাদরী সাহেবের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা। যে মাটিতে গার্গি, লীলাবতী, মৈত্রেয়ী সীতা, দ্রৌপদী ও কর্ণাটমহিষী বিরাজ করিয়াছেন, আজ তথায় মিস্ কার্পেণ্টর স্ত্রীশিক্ষা বিধান করেন ও মিস্ কবের নাম ধ্বনিত হয়। দ্বিসহস্র বৎসরাধিক অতীত হইল যেখানে শাক্য সিংহ জন্মিয়াছিলেন, আজ সেখানে রুসো ও কোমতের নিকট সাম্য শিক্ষা হয়। যে সকলের বড় ছিল, সে সকলের ছোট হইয়াছে। যে মাথার মাণিক ছিল, সে পায়ের পাদুকা হইয়াছে। কেন এমন হইল? অদ্য এই প্রস্তাবে আমরা ভারতের এই দুর্দ্দশার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম

আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নহে। যে জন্মে সেই মরে; যে আসে সেই যায়; যে বড় হয়, আবার সেই ছোট হয়। দিন কাহারও সমান যায় না। জড় জগৎ বল, চেতন জগৎ বল, কোথাও দেখিতে পাইবে না, দিন এক ভাবে গেল। তবে, হে ক্ষুদ্র শক্তি মনুষ্য! তোমার চির দিন কেমনে সমান যাইবে? মনুষ্যের দিন সমান না গেলে, মনুষ্যসমষ্ঠি সমাজের চির দিন কেমনে সমান যাইবে?

এ হেন মিসর, যাহার শোভা দেখিয়া আজও দর্শকের নয়ন মন ভুলিয়া যায়, সে বিদেশীর পদতলে। এ হেন রোম, যাহার দিগন্তব্যাপী নামে পৃথিবী কাঁপিত, যাহার প্রতাপে ভুবনবিজয়ী কার্থেজ চিতানলে দগ্ধ হইল, সভ্যতার আকর গ্রীস্ নতশির হইল, তাহার কি দশা? তবে ভারতের চির দিন কেমনে এক ভাবে যাইবে? আজ যে ভারত ছোট, তাহা আশ্চর্য্য কি? আজ যে ভারত বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ধন মানে ছোট, তাহা আশ্চর্য্য কি? তবে এখন এই জিজ্ঞাস্য, যে এই রূপ বড় ছোট হওয়ার কারণ কি? প্রকৃতিতে কেন পরিবর্ত্ত হয়, তাহা বিজ্ঞানবিৎ বলিয়াছেন। মিসোর, গ্রীস্, রোম কেন ছোট হইল, তাহা ইউরোপীয় অনেক গ্রন্থকার বলিয়াছেন। ভারত কেন ছোট, তাহা ভারতের কীটানুকীট আমি অদ্য বলিব।

প্রথম কারণ, ভারতের জল বায়ু। জল বায়ুর গুণে মনুষ্য সবল হয়, জল বায়ুর দোষে দুর্ব্বল হয়। ভারত নানা প্রদেশে বিভক্ত। নানা প্রদেশের জল বায়ু নানা প্রকারের। এই জন্য কোথাও ভারতবাসী সবল কায়, কোথাও দুর্ব্বল ও চিররুগ্ন। জল বায়ুর প্রকৃতি অনুসারে ২।১ প্রদেশীয় ভারতবাসী সবল হইলেও সাধারণতঃ দুর্ব্বল। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশীয় লোকের বল ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। পুরাকালে যখন আর্য্য জাতি ভারতে আসিয়া বাস করে, তখন কি রূপ সবল ও তেজস্বী ছিল, ঋগ্বেদের প্রত্যেক শ্লোকে তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য দিতেছে, কিন্তু ভারতের প্রখর সূর্য্যরশ্মি আর্দ্র মৃত্তিকার উপর পতিত হইয়া ক্রমশঃ বলবীর্য্য হ্রাস করিয়াছে। জল বায়ুর দোষ ভারতের বলবীর্য্যের হ্রাস, ভারতের অবনতির অন্যতম কারণ হইলেও প্রধান কারণ নহে। কারণ গ্রীস, পারস্য প্রভৃতি যে যে জাতি কর্ত্তৃক ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিবাসী প্রথমতঃ জিত হয়, তাহারা পূর্ব্বপুরুষাপেক্ষা হতবল হইলেও জেতাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে

দুর্ব্বল ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া দূরে থাক, আজও দেখা যায়, পঞ্জাবীয়গণ পৃথিবীর অধিকাংশ লোকাপেক্ষা সবলকায় ও ক্লেশসহিষ্ণু।

দ্বিতীয় কারণ, মানসিক বলের হ্রাস। শারীরিক তেজ হ্রাস হইলে মানসিক তেজও হ্রাস হয়। মানসিক তেজের হ্রাস হইলে মনোবৃত্তিচালনাও হ্রাস হয়, এবং উৎসাহ ও যত্ন, একাগ্রতা ও দৃঢ়তা শিথিল হয়। শারীরিক তেজ বল, মানসিক তেজ বল, সকলই আপেক্ষিক। তুমি আজও আমা অপেক্ষা অনেক অধিক বলশালী হইতে পার; কিন্তু হয়ত তোমার বল ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। আমি তোমা অপেক্ষা দুর্ব্বল বটি, কিন্তু আমার বল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। এ অবস্থায় তোমা অপেক্ষা আমার মনের বল, চিন্তাশীলতা, একাগ্রতা ও দৃঢ়তা অবশ্য অধিক হইবে। তোমার আমার সম্বন্ধে যে নিয়ম, মানবসমাজ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। ডেরায়স অথবা সেকন্দর যখন পঞ্জাব আক্রমণ করেন, তদঞ্চলবাসীরা তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক বলশালী হইলেও পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ হতবীর্য্য, সুতরাং হতোৎসাহ ও হতবুদ্ধি হইয়া উন্নতিশীল আক্রমণকারীদিগের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

এই সাধারণ নিয়মের বশীভূত হইয়া ক্রমশঃ অবনতশীল ভারত সমাজ খলিফাদিগের সেনানিবর্গ ও তাহাদিগের সহচরগণ অপেক্ষা অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াও বলে সমকক্ষ হইতে পারিল না ও অধনীতা স্বীকার করিল। তৎকালে মনের তেজ যে কিছু ছিল, দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তাহাও ক্রমশঃ হারাইল। শারীরিক ও মানসিক বলের ক্রমশঃ হ্রস্বতা, ভারতের এদশার অন্যতর কারণ হইলেও প্রধান কারণ নহে। নেপাল, ভূটান, ব্রহ্ম অথবা চীন দেশের অধিবাসিগণ কদাপি মানসিক তেজ, বুদ্ধি ও উৎসাহের বিশেষ কোন পরিচয় দেয়

নাই, তথাপি এ কাল পর্য্যন্ত পরাধীন হয় নাই। তবে ভারতের মানসিক বলের হ্রাস কি রূপে প্রধান কারণ বলা যায়?

তৃতীয় কারণ, ভারতের সুখদায়িকাশক্তি। আদিম কালে যে কারণে ভারত উপরে উঠিল, আবার সেই কারণেই তলে পড়িল। অল্প শ্রমে খাদ্য সুলভ, এই জন্য অল্প শ্রম ও সময়ে উদরান্ন সংগ্রহ করিয়া যেমন লোকে একদিকে মনোবৃত্তি পরিচালনে অগ্রসর হইল, আবার সেই রূপ অপর দিকে নিশ্চিন্ত লোকসুলভ বিলাসপরায়ণ হইল। অতএব যে কারণে ভারতে দর্শন, স্মৃতি ও গণিতের উন্নতি হইল, সেই কারণেই আবার কাব্য, আদিরসঘটিত কাব্য, ভারতবাসীদিগের হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। এই সমুদায় কাব্য পাঠ করিয়া ও কাব্যের ভাব শ্রবণ করিয়া, লোকের মন আরও বিলাসী হইয়া উঠিল। মহাভারতের তেজস্বিনী বীরেন্দ্রাণী গর্ব্বিতা হইয়া আত্মাভিমানে দুষ্মন্তকে কাল সর্পিণীর ন্যায় বাক্যে দংশন করিলেন, ও পরিণীতা ভার্য্যার প্রতি স্বামির কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন, আবার সেই শকুন্তলা কালীদাসের কাব্যে কেবল বিনয় করিলেন। একই নায়িকা, একই নায়ক, কিন্তু সে তেজ কোথায়, সে অভিমান কোথায়? তেজের পরিবর্ত্তে প্রেম, অভিমানের পরিবর্ত্তে ব্যাজস্তুতি। ইহার কারণ কি? আমি বলি, প্রধানতঃ বিলাস-সহচর কোমলতা। যদি শীতপ্রধান দেশের ন্যায় ভারতে খাদ্য দুর্লভ হইত, তাহা হইলে সময়াভাবে লোকে এত বিলাসী বা রসপ্রিয় হইত না *।

চতুর্থ কারণ, ভারতের গ্রীষ্মাধিক্য। সত্য বটে, ভারতের গ্রীষ্মাধিক্য আদিম সভ্যতার প্রধান কারণ। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আদিম কালে মনুষ্য জাতির শীতনিবারক পরিচ্ছদাদি অতি সামান্যই ছিল, সুতরাং শীতপ্রধান দেশবাসী এক এই জন্য অনেক

* এই বিষয় লেখক প্রণীত সভ্যতার ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

সময়ে গৃহের বাহিরে আসিয়া কাজ করিত না। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান হওয়ায় লোকের এ রূপ অসুবিধা ছিল না। কিন্তু গ্রীষ্মাধিক্যে লোকে কঠোর শ্রম পরায়ণ হয় নাই এবং পুরুষানুক্রমে অলস ও নির্বীর্য্য হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ গ্রীষ্মাতিশয্যে শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি অল্প বয়সেই বিকসিত হইয়া বিলাসপরায়ণ ও ভোগসুখলিপ্সু, সুতরাং কঠোরশ্রমবিমুখ, অলস ও দুর্ব্বল হইয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়, অল্প বয়সে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকসিত হওয়ায় সন্তান উৎপাদন করিয়া ক্রমশঃ বল বীর্য্যের হ্রাস হইয়াছে *। এই জন্য আমাদিগের এত দুর্দ্দশা। এই জন্যই আমরা বিদ্যালয় হইতে বাহির না হইতে কঠিন পীড়াগ্রস্ত। এই জন্যই গ্রোট বা প্রেস্কট, বকল বা রবর্টসন্ এক একখানি ইতিহাস লিখিতে যে শ্রম করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের দশজনের পক্ষেও স্বপ্নের বিষয়। ভারত যদি আমাদিগের উপর এত সদয় না হইয়া, প্রখর দিবাকরকে মাথার উপর করিয়া না বহিতেন, তাহা হইলে আমরা ক্রমশঃ এমন অসাড় হইতাম না।

পঞ্চম কারণ, অভাবাভাব। ভারতে কিছুরই অভাব নাই, অল্প শ্রমে আহার ও অল্প শ্রমে সচ্ছন্দতা। অভাব না থাকিলে লোকে কেন শ্রম করিবে ? মৃত্তিকাতে এক মুষ্টি শস্য ছিটাইলেই যদি আহারের চিন্তা না থাকে, তবে কেননা মনুষ্য ক্রমশঃ বলবীর্য্যহীন হইবে ? তবে কেননা চিরদিনই বলরাম ঠাকুরের লাঙ্গল চলিবে ? বস্তুতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বা লৌহ অস্ত্র নির্ম্মাণ, বা শিল্প বিশেষে যে ভারতে কোন কালে বিশেষ উন্নতি হয় নাই, তাহার এক কারণ তত্তৎ বস্তুর প্রয়োজনাভাব। দ্বিতীয়

* ২৫ বৎসর ন্যূন বয়স্ক পুরুষ দ্বারায় যদি ১৯ বৎসর ন্যূন বয়স্কা স্ত্রীর গর্ভোৎপাদন হয়, তাহা হইলে ঐসন্তান গর্ভেই মরে বা ভূমিষ্ট হইলে চিররুগ্ন ওনির্বীর্য্য হয়।

চরক।

কারণ, ভারতের জল বায়ু কল প্রভৃতি সংস্থাপনের উপযোগী নহে। লৌহ কারখানা ভারতের উচ্চ পর্ব্বত ব্যতীত আর কোথাও সংস্থাপন হইতে পারে না, তথায় কয়লা একেবারে দুষ্প্রাপ্য। নীচে হইতে লইলে এত ব্যয়সাধ্য হয়, যে তদ্রূপ ব্যয়ে নির্ম্মিত লৌহ অস্ত্রাদি অধুনাতন ইঈরোপীয় অস্ত্রাদি অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্য ব্যতীত বিক্রীত হইতে পারে না। এই জন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে কোন অংশে প্রতিযোগ করিতে পারে না। ভারত যে ইউরোপের সমকক্ষ নহে, প্রয়োজন ও সুযোগাভাবই তাহার প্রধান কারণ। প্রয়োজন ও সুযোগ বশতঃ ইউরোপ উন্নত হইয়াছে, ভারত পূর্ব্ব অবস্থাতেই পড়িয়া রহিয়াছে। এই জন্যই ভারত আজ ইউরোপের নীচে ও অধীন।

ষষ্ঠ কারণ। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণ ও পার্শ্বে ভারত মহাসাগর ও উপসাগরবর্গ——ভারতের এক দিকে অত্যুচ্চ অভ্রভেদী হিমাচল গগনে মস্তকস্পর্শ করিয়া অনায়াসে অন্য দেশে গতি বিধির পথ রোধ করিয়াছে, অপর দিকে ভারত মহাসাগর উপসাগরবর্গের সাহায্যে, প্রবলতরঙ্গভীষণ হইয়া বহুকালার্জ্জিত উন্নত শিল্প বিনির্ম্মিত ও বহু ব্যয় ও শ্রমসাধ্য পোত ভিন্ন সাধারণ মানবের জীবন ভ্রমণের সীমা স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। এক দিকে গগনস্পর্শী হিমালয়ের তরঙ্গমালা সদৃশ শৃঙ্গাবলী, অপর দিকে গভীর সাগরের ভীষণ তরঙ্গশ্রেণী দেখিয়া কয়জন মনুষ্যের তাহা অতিক্রম করিয়া দূর দেশে যাইতে প্রবৃত্তি হয়? তাহাতে আবার ভারত এতই বিস্তৃত ও এত রত্নের আধার, যে একজন মানুষের জীবনে তাহার সমুদয় দেখা বা আহরণ করা সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্যই যেমন প্রাচীন কালে তাতার প্রভৃতি অসভ্য জাতিতে চীন প্রভৃতি দেশের অনিষ্ট করিয়াছে, সেরূপ ভারতের অনিষ্ট কবিতে পারে নাই। সেই রূপ আবার ভারতের জয়-

লিপ্সু ভূপালদিগের মধ্যে প্রায় কেহই স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য হিমাচল বা ভারত সাগর অতিক্রম করিয়া দূরে যান নাই। যিনি অশ্বমেধ উপলক্ষে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়াছেন, তিনি ভারতেরই ভিন্ন ভিন্ন ভূপালদিগকে জয় করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন। প্রায় কেহই দূরদেশে যান নাই। রাজসূয় কালে ভারতীয় প্রদেশ বিশেষের ভূপাল ভিন্ন প্রায় আর কাহারও নাম শুনা যায় না। এই রূপে গৃহবিরোধ এত প্রবল হইয়াছিল যে, পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ ভিন্ন প্রায় এক দিনও যাইত না। পরস্পর যুদ্ধের ফল, অনৈক্য, লোকহানি, অর্থহানি ও দেশের লাভ ব্যতীত বলক্ষয়। মনে কর, রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধের ঘোটক ছাড়িয়া দিলেন, বিজয়লিপ্সু রনোন্মত্ত সেনানী ভীমার্জ্জুন সসৈন্যে ঘোটকের পশ্চাত চলিলেন। ঘোটক কোথায় গেল? ১ম বেহার, ২য় বাঙ্গলা, ৩য় আসামের প্রদেশ বিশেষ ইত্যাদি। সমুদয়ই ভারতের প্রদেশ। অনেকে ঘোটক ধরিল। অনেকে যুদ্ধ করিল, ভীমার্জ্জুন অনেককে পরাভব করিলেন। ফল কি হইল? রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন, ভীমার্জ্জুন মহা যোদ্ধা বলিয়া গণ্য হইলেন। কিন্তু ভারতের বলক্ষয়, ধনক্ষয় ভিন্ন আর কি লাভ হইল? যদি উত্তরে হিমাচল বা দক্ষিণে মহাসাগর না থাকিত, তাহা হইলে তেজস্বী ভূপালগণের স্বাভাবিক জয় ইচ্ছা অন্য দেশে প্রধাবিত হইত, অশ্বমেধের ঘোটকও অন্য দেশে যাইত; এবং তাহাতে যদিও বলক্ষয় ও ধনক্ষয় হইত, কিন্তু বিদেশ জয় করায় বল ও ধন বর্দ্ধিত হইত। হয়ত স্বাভাবিক জয়লিপ্সা চরিতার্থ হইলে পরস্পর যুদ্ধ ও অনৈক্য এত বেশী হইত না। খৃষ্টীয় ১০ম, ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে যখন মুসলমান সেনানীগণ ভারত আক্রমণ করিল, তখন কেন ভারত নিস্তেজ? নবীন ধর্ম্ম গ্রন্থিতে অভিন্নহৃদয় মুসলমান সৈন্য সহজেই আত্মকলহপরায়ণ ভারতবাসীকে পরাভব করিতে পারিল। এই সময় হইতে উনবিংশ

শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত [অর্থাৎ লর্ড ডেলহাউসীর সময়] পরস্পর কলহ ও গৃহবিচ্ছেদে যে ভারতের এ দশা হইয়াছে, তাহা আমাদিগের পাঠকবর্গ প্রচলিত ইতিহাস পাঠ করিয়া অবগত আছেন, সুতরাং এ প্রস্তাবে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

সপ্তম কারণ, ভারতের বিস্তার—ভারত একটী দেশ হইলেও এতই বিস্তীর্ণ যে একটী মহাদেশ তুল্য। ভারত এত বিস্তীর্ণ না হইলে আচার ব্যবহার রীতিনীতি ভাষা সাহিত্য ও ধর্ম্মে অনৈক্য এত হইত না, প্রতি প্রদেশের লোকে আপনাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি মনে করিত না, সুতরাং এত বিভিন্ন ভূপালাধীন হইত না ও এত অনৈক হইত না। এখন যেমন পরস্পর ভিন্ন জাতির বাসস্থান হওয়ায় পরস্পর সহানুভূতি বিহীন হইয়াছে, তাহা হইত না; সুতরাং স্বার্থপর মনুষ্যস্বভাব ভারতবাসী পরস্পর এতাধিক কলহ প্রিয় হইয়া একত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিত না।

অষ্টম কারণ বর্ণভেদ——একে ভারত বিভিন্ন জাতি পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার প্রত্যেক জাতি বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত। প্রতি বর্ণে সৌহার্দ্দ ও ঐক্যের মূল আদান প্রদান ও পান ভোজন নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চ্চা শ্রেণীবিশেষ অর্থাৎ কেবল ব্রাহ্মণের হস্তগত হওয়ায় ব্রাহ্মণ মানবসুলভ স্বার্থ বশীভূত হইয়া এমনই কঠিন নিয়ম সংস্থাপন করিলেন, যে পৃথিবী তাঁহাদিগেরই উপভোগ্য এবং অন্য বর্ণের লোক সেবক হইল। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণের নিকট শূদ্রে ও পশুতে কোনই পৃথক রহিল না। বিদ্যা, বুদ্ধি, সমাজ, ধর্ম্ম; সংক্ষেপে ইহলোক ও পরলোক সকলই তাঁহার হইল, শূদ্র কেবল তাঁহার সেবাদাস মাত্র। জ্ঞান চর্চ্চা যেমন বর্ণবিশেষের এক চাটিয়া হওয়ায় বহুল পরিমাণে উন্নতি হইল, সেই রূপ সাধারণ্যে প্রচার না হওয়ায় অতি অল্প লোকেই উন্নত হইল। ইহার কি ফল ফলিল? আদৌ

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার * ও ধর্ম্মবিরোধ, ও তাহার ফল স্বরূপ, পরস্পর অনৈক্য। মহাত্মা শাক্য সিংহের জন্মের কিছু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ এতাধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন ও শূদ্রবর্গকে এতই হীনাবস্থায় ফেলিয়াছিলেন, যে তাৎকালিক শূদ্র ও পশুতে অল্পই পৃথক ছিল। ইহা দেখিয়া স্বভাবতঃ উদারহৃদয় মনুষ্য কখন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। দুই এক জন নিস্বার্থ অসাধারণ মনুষ্য ইহার বিরুদ্ধে বলিতে লাগিলেন ও এই অন্ধকার দূর করিতে অগ্নি জ্বালিলেন। পরিশেষে শাক্য সিংহ সেই সমুদয় অগ্নি একত্র করিয়া যে মহা বহ্নি জ্বালিলেন, তাহাতে ভারতের অধিকাংশ লোকের মধ্যে মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ ধ্বংশ হইল ও ব্রাহ্মণ এবং সাম্যবাদীদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উৎপন্ন হইল। কোথায় সকলে একত্র হইয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি ও ধন বৃদ্ধি করিবে, না দ্বিসহস্রাধিক বৎসর কেবল সাম্য ও বৈষম্য লইয়া কলহ করিয়া কাল কাটাইল। এ কাল মধ্যে যে অন্য বিষয়ে কোন উন্নতি হয় নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না। এক এই সাম্য ও বৈষম্যবাদের পরস্পর কলহেই অনেক উন্নতি হইয়াছে। বস্তুতঃ একথা আমাদিগের বিশ্বাস যে, এই বিরোধ উপস্থিত না হইলে দর্শন ও ন্যায়ের এত উন্নতি হইত না। কিন্তু সাম্য ও বৈষম্যবাদীদিগের কলহ আরম্ভ হওয়া অবধি ভারতবাসীগণ আধ্যাত্মিক চিন্তাতেই অধিক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, সুতরাং দেশের গৌরব বা ধন বৃদ্ধি সম্বন্ধে অতি অল্পই উন্নতি হইল। নিরবচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক চর্চ্চা করিয়া ক্রমশঃ হত-বীর্য্য হইতে লাগিল। যে দিন আর্য্যজাতি ঋগ্বেদ রচনা করেন, আর যে দিন আর্য্যজাতি কুসমাঞ্জলী

*বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে যে দেশের কোন উপকার হয় নাই, এ রূপ আমাদিগের বক্তব্য নহে। প্রত্যেক বিষয়ের ন্যায় ইহারও দুই দিক আছে।

রচনা করেন, উভয়মধ্যে প্রকৃতিগত কত পার্থক্য! ঋগেদ বীরত্ব, যুদ্ধ-লিপ্সা ও প্রতিহিংসায় পরিপূর্ণ; কুসুমাঞ্জলী কেবল আধ্যাত্মিক,—সাম্য ও বৈষম্যবাদীদিগের কলহময়। যাহার যে ভাবনা, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়। ঋগ্বেদের সাময়িক আর্য্যগণ বীর পুরুষ ছিলেন; ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক বিরোধে হতবীর্য্য হইয়া কেবল মার্জ্জিতবুদ্ধি হইলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্য্যসমাজে জ্ঞানচর্চ্চা বর্ণবিশেষ মাত্রের একচাটিয়া ছিল, সুতরাং সাম্য ও বৈষম্য বিরোধে হিন্দু সমাজের কেবল বর্ণ বিশেষ মাত্র উন্নত হইল, সাধারণ মানব এক রূপ অন্ধকারেই থাকিল, লাভের মধ্যে পূর্ব্বতেজ ও প্রতিহিংসার ইচ্ছা হারাইল। ইহাই ভারতের পরাধীনতার একটী প্রধান কারণ।

নবম কারণ, ভারতে তেজাধিক্য। আর্য্য জাতি এত তেজস্বী না হইলে এত হতবীর্য্য হইত না। ভারতে সাম্যবাদ প্রচারাবধি তেজের হ্রাস আরম্ভ হয়। ২। ৩০০ বৎসর ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া, অর্থাৎ ভারত সমরের সময়েও এত তেজ ছিল যে, অন্য জাতি তাহার সমকক্ষ হইতে পারিত না। এই তেজাধিক্যের প্রথম ফল, পরস্পর কলহাধিক্য; দ্বিতীয় ফল, দুই জনে কলহ হইলে অন্যের তাহাতে এক এক পক্ষ অবলম্বন। তেজস্বী, কলহপ্রিয় ক্ষত্রিয় রণে নিমন্ত্রিত হইলে ন্যায়ান্যায় বিবেচনা না করিয়া পক্ষ অবলম্বন করিতেন। পক্ষ প্রতিপক্ষের মধ্যে যে অগ্রে নিমন্ত্রণ করিবেন, তিনি তাহারই। প্রতি পক্ষ অত্যাচারিত হউক, আত্মীয় হউক, স্বসম্বন্ধীয় হউক, কিছুই ধর্ত্তব্য নহে। তিনি অগ্রে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাঁহার পক্ষ কি রূপে অবলম্বনীয় হইবে? ভীষ্ম দ্রোণ, পাণ্ডবের সত্ত্ব বুঝিয়াও, পাণ্ডবের পক্ষপাতী হইয়াও দুর্য্যোধনের জন্য পাণ্ডববিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। কারণ কি? দুর্যোধন অগ্রে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। দুর্য্যোধন ন্যায় যুদ্ধেই প্রবর্ত্ত হউন বা, অন্যায় যুদ্ধেই প্রবর্ত্ত হউন, তাঁহার পক্ষ সমর্থনই

ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম। মদ্রপতি শল্য ভাগিনেয়ের বিপক্ষে অস্ত্র ধরিলেন। ভুবন বিজয়ী কর্ণ সহোদরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিলেন। ভারত অনুসন্ধান কর, দেখিবে অগ্রে নিমন্ত্রণ ভিন্ন কারণান্তর নাই। অগ্রে নিমন্ত্রণ করিলেই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার কারণ কি? আমরা বলি, আর্য্যদিগের তেজাধিক্য ও তন্নিবন্ধন কলহপ্রিয়তা। পুরুষানুক্রমিক কলহপ্রিয়তা বশতঃ ন্যায়ান্যায় বিবেচনা না করিয়া পক্ষাবলম্বন করিতে করিতে ক্ষত্রিয়দিগের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, অগ্রে নিমন্ত্রণ করিলে নিমন্ত্রণ রক্ষাই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম। মানবশোণিত ক্ষয়কারক ও দেশের ধনহানির নিদান, এরূপ ভয়ানক বিশ্বাস কোন জাতি মধ্যে প্রচলিত নাই। তবে অন্যান্য আদিম জাতির ইতিহাস পাঠ করিয়াও আমরা এই মাত্র অবগত হই, যখন মনুষ্য জ্ঞানচর্চ্চায় উন্নত হয় নাই, যখন ন্যায়ান্যায় অথবা ধর্ম্মভাব মানব হৃদয় আলোকিত করে নাই, তখন কলহপ্রিয় আদিম মনুষ্য ন্যায়ান্যায় বিবেচনা না করিয়া রণে পক্ষাবলম্বন করিত। কিন্তু কথঞ্চিত উন্নত হইলে, স্বার্থ অথবা ক্রোধ দ্বারা উত্তেজিত না হইয়া এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় নাই। এ বিষয়ে কেবল ভারতেরই কপাল ভাঙ্গিয়াছিল। ভারতবাসীগণ জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিসহ আদিম অবস্থার কলহপ্রিয়তা পরিত্যাগ করা দূরে থাক, ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ জ্ঞান করিত। ইহার কারণ, আমাদিগের বিবেচনায়, ভারতের তেজাধিক্য।

এই রূপ কলহপ্রিয়তা নিবন্ধন, দুই জন মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইত, তাহাতে সমুদায় জাতি, পরিশেষে সমুদয় ভারত পরিব্যাপ্ত হইত। কৌরব ও পাণ্ডবে রাজ্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, ক্রমে ভারতের সমুদয় ভূপাল, সমুদয় অস্ত্রধারী পুরুষ এক এক পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ফল কি হইল? এক পক্ষ জয় লাভ করিল; কিন্তু এত বলক্ষয় ও ধনক্ষয় হইল, যে ভারত তাহা হইতে আর উঠিতে পারিল

না। কথিত আছে, অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী ভারত সেনা মধ্যে একাদশ জন মাত্র যুদ্ধ অন্তে জীবিত ছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী ঠিক হউক বা না হউক, ভারতের অধিকাংশ অস্ত্রধারণক্ষম পুরুষ যে ইহাতে যোগ দিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ যে কারণে ১৭৬১ সালে তৃতীয় পানিপটের যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্রীয়গণ মাথা তুলিতে বা তুলিলে, বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই, সেই কারণেই ভারত সমরের পর ভারতবাসীগণ বিশেষ তেজস্বীতা বা বল দেখাইতে পারেন নাই। অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীর শোণিতে কলুষিত ভারত ভূমি আর তেমন যোদ্ধা * প্রসব করে নাই।

ভারতের প্রায় এমন রাজ পরিবার বা ক্ষত্রিয় পরিবার ছিল না, যাহার দুই এক জন না লোক ক্ষতি হইয়াছিল। আমাদিগের বিশ্বাস, এই ভারতসমরান্তে ক্ষত্রিয় রমণীকুল ক্ষত্রিয় পুরুষাভাবে ব্রাহ্মণ সহবাসে বংশ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদিও শাস্ত্রে বলে, পরশুরাম ভারত নিঃক্ষত্রিয় করিলে ক্ষত্রিয় রমণী ব্রাহ্মণ সহবাসে বংশ রক্ষা করে ও ঐ বংশধরগণ আধুনিক ছত্রি জাতি, কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, ভারত সমরান্তেই এরূপ হইয়াছিল। ভারত বিদেশীর করতলস্থ হওয়ার প্রধান কারণ, ভারত সমরে ভারতের বল ও ধন ক্ষয়।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র।

ব্রাহ্মণ ভারতের শ্রেষ্ঠ জীব, অপর সকলেই তাঁহার অধীন,—পৌরাণিক কালে ভারতের এই অবস্থা। নহুষ ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্রের শচীলাভ কামনায় শচীবাক্যোত্তেজিত নহুষ মহর্ষি

*অশোক, বিজয় প্রভৃতি ২। ১ জন ভিন্ন যোদ্ধার ভারত সমরান্তে ভারতবর্ষে জন্ম হয় নাই। তাহারাও প্রকৃত যোদ্ধা নহে। নব ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহী।"

গণকে স্বীয় শকটে যোজিত করিয়া গগনমার্গে বিচরণ করিতেন। শচী বলিয়াছিলেন, নহুষের তুল্য বড় লোকের সামান্য উচ্চৈঃশ্রবা-যোজিত রথ শোভা পায় না, সুতরাং মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণ নহুষের রথ টানিতেন। এই স্বর্গাধিপ বজ্রধর নহুষ কাল-বশে স্বীয় রথবদ্ধ অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি ইন্দ্রত্ব হারাইলেন, মুনির শাপে শতসহস্র বৎসর সর্পদেহ প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে যুধিষ্ঠির কর্তৃক শাপমুক্ত হইলেন। মানুষ অথবা ইন্দ্রের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং নারায়ণ ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ-পদাহত হইয়া করযোড়ে বলিয়াছিলেন "ব্রহ্মণ, আপনার চরণে আঘাত লাগে নি ত"? সেই দিন হইতে বিষ্ণু ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করিলেন। যে জাতির অহঙ্কার এত অধিক, তাহার অধঃপতন অতি নিকটে,—অহঙ্কার পতনের অগ্রগামী মাত্র। ব্রাহ্মণ নিপাত গিয়া-ছেন, আরও যাইবেন,—ভারতের প্রতি গৃহে বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই শীঘ্র গাহিবে "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাম্"।

মনু বলিয়াছেন,

ব্রাহ্মণং দশবর্ষন্তু শতবর্ষন্তু ভূমিপং।
পিতাপুত্রৌ বিজানিয়াৎ ব্রাহ্মণস্তু তয়োঃ পিতা॥

পৌরাণিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের গৌরব এত অধিক ছিল, যে দশ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণশিশু পলিতশির্ষ শতবর্ষিয়ান্ ক্ষত্রিয়ের পিতা বলিয়া গণ্য হইত। এই পদ ক্ষত্রিয় সহজে ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দেয় নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া ভারতবর্ষে যে বিবাদ হইয়াছিল, তাহা বহুকালব্যাপী ও তাহাতে সমস্ত ভারত কম্পিত ও রক্তপঙ্কিল হইয়াছিল। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানে এই বিবা-দের কতক বিবরণ পাওয়া যায়।

যে সময়ে হিন্দুর "দেব,, ও "অসুর,, পারসীকের "দেও" ও "অহুর" হইয়াছিল, তাহা অতি প্রাচীন ও তমসাচ্ছন্ন। সে দৃশ্য দেখিতে কৌতূহল হইলেও সে কৌতূহল অতৃপ্ত থাকিবে,—কস্মিন্ কালেও যে তৃপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। হিন্দু বৌদ্ধের বিবাদ ইহার তুলনায় আধুনিক, কিন্তু এই আধুনিক ঘটনার ইতিহাসও ভারতবর্ষে লোপ পাইয়াছে। যে বিবাদে বারাণসি প্রভৃতি মহানগরী দুই তিন বার ভস্মীভূত হইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে, যে বিবাদ বদ্ধমূল বৌদ্ধধর্ম্মকে সমূলোৎপাটিত করিয়া দেশনিষ্কাসিত করিয়াছে, আমরা তাহার বিষয় কিছুই জানি না। বর্ত্তমান প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়ও প্রায় এই রূপ অবস্থাপন্ন, তবে এ বিষয়ে অনেক মহর্ষি পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা সেই মত গুলির আলোচনা করিব, আপনাদের যদি কিছু সঙ্গতি থাকে, তাহাও পাঠক সমীপে উপস্থিত করিব।

বেণ, নহুষ, নিমি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, সুদাস প্রভৃতি রাজাগণের উপাখ্যান কাশিদাস ও কৃত্তিবাসের প্রসাদে সকল বাঙ্গালিরই এক প্রকার জানা আছে। কৌশিকবংশসম্ভূত বিশ্বামিত্র স্বয়ং ব্রহ্মার সহিত বিবাদ করিয়া নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন, ঠাকুরদাদা এই কথা শিখাইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রসৃষ্ট মানবমুণ্ড নারিকেল বৃক্ষে লম্বিত রহিয়াছে; চক্ষু, নাসিকা, শিখা প্রভৃতি সকলই আছে, কিন্তু অসম্পূর্ণ, দেবতাদের অনুরোধে শান্তকোপ ঋষি স্বীয় সৃষ্টি সম্পূর্ণ করেন নাই। এই বিশ্বামিত্র কে, আর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বশিষ্ঠই বা কে? পুরাণ সকল এ বিষয়ে প্রায়ই এক মত,—পুরাণ প্রণেতাগণ বলেন, বিশ্বামিত্র কৌশিকবংশজ গাধিরাজার পুত্র। রামায়ণের বালকাণ্ডে বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে লইয়া মিথিলায় উপ-

নীত হইলে, রাজর্ষি জনকের পুরোহিত গৌতমপুত্র শতানন্দ রামের সমীপে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ কীর্ত্তন কালে বলিয়াছিলেন,

রাজাসীদেব ধর্ম্মাত্মা দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।
ধর্ম্মজ্ঞ কৃতবিদ্যশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ॥
প্রজাপতি সুতস্ত্বাসীৎ কুশোনাম মহীপতিঃ।
কুশস্য পুত্রো বলবান্ কুশনাভঃ সুধার্ম্মিকঃ॥
কুশনাভসুতস্ত্বাসীৎ গাধিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।
গাধেঃ পুত্রো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥

আমরা দেখিতেছি শতানন্দের বর্ণনানুসারে বিশ্বামিত্র স্বয়ং ব্রহ্মার বৃদ্ধ প্রপৌত্র। বিশ্বামিত্র স্ববংশ কীর্ত্তন কালে যাহা স্বয়ং বলিয়াছেন. তদ্দ্বারাও রামায়ণের মতে তিনি ব্রহ্মার বৃদ্ধ প্রপৌত্র।

ব্রহ্মযোনিমহানাসীৎ কুশোনাম মহাতপাঃ।
*　　*　　*　　*
বদর্ভ্যাং জনয়ামাস চতুরঃ সদৃশান্ সুতান্॥
কুশাম্বং কুশনাভঞ্চ অমূর্ত্তরজসং বসুম্।
*　　*　　*　　*
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কুশনাভস্য ধীমতঃ।
জজ্ঞে পরম ধর্ম্মিষ্ঠো গাধিরিত্যেব নামতঃ॥
স পিতা মম কাকুৎস্থ গাধি পরম ধার্ম্মিকঃ।
কুশবংশপ্রসূতোস্মি কৌশিকো রঘুনন্দন॥

মহাভারত লেখকের মতে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার বৃদ্ধপ্রপৌত্র নহেন। অনুশাসন পর্ব্বে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে বিশ্বামিত্র দেহান্তর প্রাপ্ত না হইয়া কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন।

দেহান্তরমনাসাদ্য কথং স ব্রাহ্মণোঽভবৎ।

উত্তরে ভীষ্ম, অজামীঢ় হইতে বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি বর্ণনা করিলেন। অজামীঢ় ভরতবংশজ। ভরতের পুত্র জহ্নু, এই জহ্নু কুশিকের পূর্ব্বপুরুষ। কুশিক (মহাভারতের মতে) বিশ্বামিত্রের পিতামহ ও গাধির পিতা। বিষ্ণু পুরাণের মতে বিশ্বামিত্র পুরূরবার বংশজাত। পুরূরবা বৈবস্বত মনুর পৌত্র ও ইলার পুত্র,

পুরূরবস্ততো বিদ্বান্ ইলায়াং সমপদ্যত।
সা বৈ তস্যাভবদ্ মাতা পিতা চৈবেতি নঃ শ্রুত॥

আদি পর্ব্ব। ৩১৪২ শ্লোঃ

ইলা কি প্রকারে পুরূরবার পিতা মাতা উভয়ই হইয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান পাঠক বিষ্ণু পুরাণের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সর্গে পাইবেন। এই পুরূরবা হইতে দ্বাদশ পুরুষ পরে বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। এই দ্বাদশ পুরুষের নাম (১) পুরূরবা, (২) অমাবসু, (৩) ভীম, (৪) কাঞ্চন, (৫) সুহোত্র, (৬) জহ্নু, [৭] সুমন্তু, (৮) অজক, [৯] বলাকাশ্ব, [১০] কুশ, (১১) কুশাম্ব, (১২) গাধি। সুতরাং এই বংশাবলী অনুসারে কুশের ব্রহ্মযোনিত্ব লোপ পাইল। বিষ্ণু পুরাণের মতে স্বয়ং ইন্দ্র কুশাম্বের পুত্র গাধিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। "তেবাং কুশাম্বঃ শক্রতুল্যো মে পুত্রো ভবেদিতি তপশ্চচার। তঞ্চ উগ্রতপসমবলোক্য মা ভবত্বন্যোঽস্মাত্তুল্যবীর্য্যঃ ইত্যাত্মমেবাস্য ইন্দ্রঃ পুত্রত্বমগচ্ছৎ। গাধির্নাম স কৌশিকোঽভবৎ"। (বিষ্ণু পুরাণ, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম সর্গ) "কুশের পুত্রগণের মধ্যে কুশাম্ব, আমার ইন্দ্রতুল্য পুত্র হউক, এই কামনা করিয়া তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র উগ্রতপা কুশাম্বকে অবলোকন করিয়া 'আমার সমবীর্য্য অপর কেহ জন্মিতে না পারে" এই মানসে স্বয়ং কুশাম্বের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কুশবংশপ্রসূত সেই পুত্র গাধি নামে খ্যাত হইল।"

হরিবংশে বিশ্বামিত্রের উৎপত্তির যে বর্ণনা আছে, তাহা বিষ্ণুপুরাণের সহিত প্রায়ই একরূপ, তবে হরিবংশমতে কুশাম্ব বিশ্বামিত্রের পিতামহ নহেন, তাঁহার পিতামহের নাম কুশিক। এই কুশিক কুশের পুত্র

> কুশপুত্রাঃ বভুবুর্হি চত্বারো দেববর্চসঃ।
> কুশিকঃ কুশনাভশ্চ কুশাম্বোমূর্ত্তিমাংস্তথা॥
> পহ্লবৈঃ সহ সংবৃদ্ধো রাজা বনচরৈস্তদা।
> কুশিকস্তু তপস্তেপে পুত্রমিন্দ্রসমং বিভুঃ॥
> লভেয়মিতি তং শক্রস্ত্রাসাদভ্যেত্য জজ্ঞিবান।
> স গাধিরভবদ্ রাজা মঘবান্ কৌশিকঃ স্বয়ং॥

হরিবংশ। ১৪২৫। ২৯ শ্লোক

কুশের দেবপ্রভাব কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব ও মুর্ত্তিমান্ নামে চারি পুত্র ছিল। রাজা কুশিক বনবাসী পহ্লবগণের সহিত সম্বর্দ্ধিত হইয়া ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম পুত্রলাভ করিব, এই কামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্র ভয়ে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ইন্দ্র কুশবংশজাত রাজা গাধি হইয়াছিলেন।

মহাভারত ও হরিবংশের মতে কুশিক বিশ্বামিত্রের পিতামহ, রামায়ণের মতে তাঁহার পিতামহের নাম কুশনাভ, ও বিষ্ণু পুরাণ মতে তাঁহার পিতামহ কুশাম্ব। চারি পুস্তকের মতেই এই কয়েক জন কুশের পুত্র। মহাভারতের মতে কুশ ভরতবংশজ, রামায়ণের মতে ব্রহ্মবংশজ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের মতে সূর্য্যবংশজ (বৈবস্বত মনু সূর্য্যের পুত্র)। গোলযোগের শেষ এই খানেই হয় নাই, আরও আছে। বিশ্বামিত্রের পিতার নাম গাধি, ইহা চারি পুস্তকেই স্বীকৃত আছে।

বিশ্বামিত্র ঋগ্বেদের সমস্ত তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি, অনুক্রমণিকার

এই উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ টীকাকার সায়নাচার্য্য তৃতীয় মণ্ডলের প্রারম্ভে বলিয়াছেন "অস্য মণ্ডলদ্রষ্টা বিশ্বামিত্রঃ ঋষিঃ"। এই বিশ্বামিত্র অর্থে একমাত্র গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র নহে, তদ্বংশজাত অন্যান্য ঋষিকেও বুঝায়।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দশম সূক্তের একাদশ ঋকের ঋষির নাম মধুচ্ছন্দঃ। উক্ত ঋকে ইন্দ্রের প্রতি কৌশিক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। রামায়ণের বালকাণ্ডের ৬২ ম সর্গে শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের শরণাগত হইলে, মুনি আপন পুত্রগণ মধ্যে অন্যতমকে শুনঃশেফের পরিবর্ত্তে প্রাণ দান করিতে আদেশ করেন,

মুনেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মধুচ্ছন্দাদয় সুতাঃ।
সাভিমানং নরশ্রেষ্ঠ সলীলমিদমব্রুবন্॥
কথমাত্মসুতান্ হিত্বা ত্রায়সেঽন্যসুতং বিভো।
অকার্য্যমিব পশ্যামঃ শ্বমাংসমিব ভোজনে॥

"মুনির বাক্য শুনিয়া মধুচ্ছন্দাদি পুত্র অভিমান সহকারে পরিহাস পূর্ব্বক বলিল, প্রভো, আপনি স্বপুত্র ত্যাগ করিয়া অন্যের পুত্র কি প্রকারে রক্ষা করিতেছেন? আমরা দেখিতেছি ইহা নিজ মাংস ভোজনের ন্যায় অকার্য্য"। এই মধুচ্ছন্দঃ বিশ্বামিত্রের পুত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত ঋকের ঋষি এই মধুচ্ছন্দঃ কি না, তাহার স্থিরতা নাই। ঋকটি এই

আ তু নঃ ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব।
নব্যমায়ুঃ প্রসুতিরকৃষি সহস্রসাং ঋষিং॥

"হে ইন্দ্র কৌশিক, তুমি আগমন কর, ও আমাদের প্রদত্ত পেয় আনন্দের সহিত পান কর। আমাকে নব ও দীর্ঘ আয়ু দান কর, এবং ঋষিকে সহস্র অনুগ্রহের অধিকারী কর"। সায়নাচার্য্য টীকায় লিখিলেন "কৌশিক কুশিকস্য পুত্র। যদ্যপি বিশ্বামিত্র কুশিকস্য

পুত্রে স্তথাপি তদ্রূপেন ইন্দ্রস্যৈব উৎপন্নত্বাৎ কুশিকপুত্রত্বমবিরুদ্ধং।
অয়ং বৃত্তান্তোঽনুক্রমণিকায়ামুক্তঃ। কুশিকস্ত্বৈষীরথিরিন্দ্রতুল্যং পুত্র
মিচ্ছন্ ব্রহ্মচর্য্যং চচার। তস্য ইন্দ্রঃ এব গাথী পুত্রো জজ্ঞে” ইতি।”

কুশিকের পুত্র কৌশিক।——যদিও বিশ্বামিত্র কুশিকের পুত্র, তথাপি ইন্দ্র সেই রূপ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করায় তাঁহার কুশিক পুত্র নাম বিরুদ্ধ নহে। এই বৃত্তান্ত অনুক্রমণিকায় কথিত আছে। ইষিরথপুত্র কুশিক ইন্দ্রতুল্য পুত্র ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহার গাথী নামে পুত্র হইয়াছিলেন। অনুক্রমণিকামতে আবার এই এক ইষীরথ উপস্থিত ও বিশ্বামিত্রের নূতন পিতামহ কুশিক বর্ণিত হইল।

(ক্রমশঃ)

কুঞ্জলতার মনের কথা।

মেয়ের আদর।

পুত্র কন্যার মধ্যে পিতা মাতায় যে তারতম্য করেন,——স্নেহের তারতম্য থাকে কি না, ঠিক বলিতে পারি না; ব্যবহারের তারতম্য যে থাকে, তাহা বলা বাহুল্য—কিন্তু তাহার জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দি না। পুত্র বড় হইয়া রোজকার করিয়া দিবে, কন্যা ত তাহা দিবে না! তবে পুত্র নির্ব্বিশেষ ব্যবহারই বা সে কেন পাইবে? যাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়া পরকে বিলাইয়া দিতে হইবে, তাহাকে খাওয়ান পরান ন ধর্ম্মায় ন দেবায়—ইহার অপেক্ষা জলে ফেলিয়া দেওয়া ভাল। এ রূপ ভাব পিতার মুখে প্রকাশ না হউক, ব্যবহারে প্রকাশ পায়। পুত্রের অন্নপ্রাশনে দেশদেশান্তরে খবর যাইবে—সাজাইবার জন্য গলকুন্দা হইতে হীরক আসিবে, ঢাকা হইতে অলঙ্কার আসিবে; বিলাইবার জন্য কাশ্মীর হইতে শাল আসিবে,

বারানসি হইতে সাড়ী আসিবে ; আথোদের জন্য কলিকাতা হইতে খেমটা আসিবে, লক্ষ্ণৌ হইতে বাই আসিবে ; আমোদ করিবার জন্য দেশদেশান্তর হইতে আত্মীয় কুটুম্ব আসিবে ; আহারের জন্য উইল্‌সনের বাড়ীর খানা আসিবে——আহার করিতে, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত ন্যায়লঙ্কার ফুলের মুখুটি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান আসিবেন। দক্ষিণার টাকায় পুরোহিতের ব্রাহ্মণীর সোণার কঙ্কন হইবে। নাপিত গরদের জোড় পাইবে , নাপিতানী বহু দিনের সাধ পূরাইয়া বালুচরের সাড়ীর উপর চন্দ্রহার দোলাইবে পিতার সময়ে স্নান হইবে না, সময়ে আহার হইবে না। মাতা কার্য্যের ব্যস্ততায় ন্যুনকল্পে দিনান্তে দশ বার সালগ্রাম শীলার মস্তকে পা দিবেন। আর বাড়ীর চাকর, নফর, রাঁধুনী, চাকরানী, বৌ, ঝি, মন্দিরস্থ বিগ্রহের পর্য্যন্ত গলা ভাঙ্গিয়া যাইবে। পাড়ার কত লোকের যে জ্বরাতিসার হইবে, তার আর সীমা থাকিবে না। আর মেয়ের বেলায় ?——সাজাইবার জন্য বড় পিসির হাতের ভাঙ্গা বালা, আর ছোট ঠাকরুণ দিদির পায়ের ফুটো মল ; পরাইবার জন্য বড় বৌয়ের নববধূ-অবস্থার পুতুলের কাপড়, অথবা অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ছেলে বেলাকার চেলী——বদল করিয়া বাটি কিনিবার জন্য ছিল, না হয় মেয়েটা পরিল। নাপিতানীর লাভ, বড় জোর এক থালা মাড়েভাতে। নাপিত বেচারার আসা যাওয়াই সার। পুরোহিতের দক্ষিণা—মধুপর্কের বাটিটি, আর নগদ পাঁচ পয়সা।

পুত্রের আদরই বা কত ? প্রায় কোলে কোলেই বেড়ায়. কোলে কোলেই থাকে, কেননা এ অমূল্য নিধি মাটিতে রাখিলে পীপিড়ায় খায়, মাথায় রাখিলে উকুনে খায়। আর মেয়েটা প্রায় পাড়ার গোয়ালা বাড়ী পড়িয়া থাকে—ধূলা মাখে, কাদা খায়, পেটে চুল-কানি, পায়ে ঘা, মাথায় উকুন, চুলে জটা, নাকে পোঁটা, মুখে অশ্রু-

রেখা, বুকে মুখনিঃসৃত লালার বন্নুধারা, গায়ে উদ্গীরিত দুগ্ধের দুর্গন্ধ —কেহ দেখে না, কেহ সুধায় না; মেয়ে আপনি কাঁদে, আপনি চুপ করে, আপন মনে খেলা করে, আপন মনে হাসে। দিনান্তে যদি একবার মায়ের কোলে উঠিতে পায়, তবে সে পরম ভাগ্যবতী। আর পিতার সঙ্গে—সেই অন্নপ্রাশনের দিনে দেখা হইয়াছিল, আর সেই বিবাহের রাত্রে দেখা হইবে। পুত্র রাত্রি দুই প্রহরের সময় উঠিয়া ধুম ধরিল "আমি রৌদ্রে পৃষ্ঠ দিয়া সন্দেস খাইব,,—অমনি সেই দুই প্রহর রাত্রে—মুষল ধারে বৃষ্টি হইতেছে, পলে পলে বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে, পলে পলে বজ্রনির্ঘোষ হইতেছে—সেই দুর্দিনের নিশীথ অন্ধকারে রৌদ্রের অন্বেষণে পাড়ায় পাড়ায় লোক ছুটিবে;—মেয়েটা সাত দিন সাত রাত মাথা কুটিয়াও এক পয়সার একটা খেলানা পায় না। পুত্র যদি একবার কাঁদিল, অমনি বাড়ী শুদ্ধ হুলস্থূল পড়িয়া গেল—কাঁদিয়া পাছে ছেলের মাথা ধরে, এই আশঙ্কায় প্রসূতির মাথা ধরিল, জনকের সন্নিপাৎ চাপিল, রাঁধুনী মাগী ত্রিপুষ্করাগ্রস্ত হইল, চাকরাণীরা মাথা ভাঙ্গিতে বসিল—আর মেয়েটার যদি কাঁদিয়া দম আট্‌কায়, তবু কেহ একবার সুধায় না, কেহ একবার আহা করে না।

পুত্র কন্যার মধ্যে এই রূপ তারতম্য করাটা যে নিতান্ত নিষ্কারণ নহে, তাহা বিবাহের সময় বেশ বুঝা যায়। পুত্রের পিতা আশা বাঁধিয়া রাখেন, যে ইহার বিবাহোপলক্ষে এক খানা জমীদারি করিয়া লইব। তার পর যদি একটু কুলের গন্ধ থাকিল, যদি ছেলেটা মুখস্থ করিয়া হউক, প্রশ্ন চুরি করিয়া হউক, উত্তর নকল করিয়া হউক, অদৃষ্টগুণে হউক, যদি কোন প্রকারে কায়ক্লেশে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তবে সেই ছেলের বাপই বা কে, আর দিল্লীর সম্রাটই বা কে? ছেলে যখন একটা পাশ করিয়াছে, তখন সে অবধারিত হাইকোর্টের জজ হইবে। তখন পাড়ার রসতরঙ্গিনীগণ অপরাহ্ণে পুষ্করণীর

বাঁধা ঘাটে দাঁড়াইয়া, জলে কলসি ভাসাইয়া দিয়া, তৎসম্বন্ধে কত রসের গল্প করিবে। কেহ বলিবে, ছেলের এই অল্প বয়সে এত বিদ্যা হইয়াছে, যে কলেজের সাহেবেরা আর পড়াইয়া উঠিতে পারে না—বড় সাহেব স্বয়ং হার মানিয়াছেন, অন্যে পরে কা কথা। কেহ বলিবে, কোম্পানি বাহাদুর নিজ হাতে লাল কালি দিয়া দাদাঠাকুরকে চিঠি লিখিয়াছেন যে, তোমার ছেলের যে বিদ্যা হইয়াছে, ইহার অধিক হইলে আর আমি উপযুক্ত চাকরি যোগাইতে পারিব না, অতএব এই বেলায় চাকরি করিতে দাও—দারগার মুহুরিগিরি খালি আছে। ক্রমে বাঁধা বকুলতলার তাসের আড্ডায় কত অশীতিপর বৃদ্ধ চকমকি ঠুকিতে ঠুকিতে এই কথার সমালোচন করিল। কত জন আশঙ্কা করিয়া বলিল—তাইতে হে! এই বয়সে এত! বাঁচে কি না, সন্দেহ। কত জন দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিল, "গুরু, তোমার ইচ্ছা! আমার চতুর্থ পক্ষের ছোট কন্যাটি থাকিলে এত দিন বিবাহযোগ্যা হইত। ক্রমে দেশময় রাষ্ট হইল, যে অমুকের পুত্রের চতুর্ভুজ হইত আর বড় বাকী নাই।

তখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। পাত্র কর্ত্তার মেজাজ বেজায় গরম—তিনি সময় বুঝিয়া স্বর্গে এক ঠোঁট মর্ত্ত্যে এক ঠোঁট দিয়া সর্ব্বগ্রাস করিতে প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছেন। যদি কোন কন্যাদায়ের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল, অমনি তাঁহাকে হাতে বহরে লম্বা দীর্ঘ এক তালিকা দেওয়া হইল, তাহাতে নাই হেন জিনিস নাই—ঘড়ি চাই, চেইন চাই, বিবিয়ানা পোষাক চাই, আকাশের চাঁদ চাই, আলাদিনের প্রদীপ চাই,—সংক্ষেপতঃ অর্দ্ধেক রাজত্ব এবং এক রাজকন্যা চাই। তা ইহাতেই কি নিস্তার আছে? এ শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়ায়। পাত্র কর্ত্তা যাইবেন আপন পুত্রের বিবাহ দিতে, সপ্তসিন্ধুর জল আনিয়া তাঁহার পদধৌত করিতে হইবে। গ্রামের

অসভ্যের দল—ভদ্রতার চিরশত্রু, সরস্বতীর ত্যজ্য পুত্র—বরযাত্র যাইবেন; তাঁহাদিগকে সোনার সিংহাসনে বসাইয়া মাণিকের ছাতা ধরিতে হইবে। তাঁহারা হুঁকা চুরি করিবেন, জুতা চুরি করিবেন, শুভ্রশীর বৃদ্ধকে ব্যঙ্গ করিবেন, গৃহস্থের বৌঝিকে রহস্য করিবেন,—সব নতশীরে সহ্য করিয়া কীর্ত্তিকুশলদিগকে গুরুপুত্রের অধিক সমাদর করিতে হইবে। সাত পুরুষে যার মর্য্যাদার সঙ্গে সম্পর্ক নাই, তাহাকেও দেবতার ন্যায় মর্য্যাদা করিতে হইবে। এত করিয়াও পার নাই। এততেও পাত্রকর্ত্তার দাবি মিটে না। অকস্মাৎ প্রকাশ হইল, মেয়ের উল্কি নাই—অতএব এক শ টাকা বাটা দাও। বুঝা গেল, মেয়ের ভগিনীর গোঁফ_নাই—অতএব দুশ টাকা সুখদণ্ড দাও। দেখা গেল, মেয়ের ভ্রাতার লেজ নাই, তজ্জন্য এক খানা নিষ্কর জমী আক্কেল-সেলামি দাও। সর্ব্বশেষে, কন্যা সন্তান জন্মাইয়াছ, এবং সেই কন্যার এমন শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছ, এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের জন্য জন্মাবচ্ছিন্নে দাসখৎ লিখিয়া দাও—যত দিন বাঁচিবে, যাহা বলিব কৃতার্থ হইয়া করিও; যাহা চাহিব, হাসি মুখে দিও। আমার বাড়ীর, অথবা পাড়ার, অথবা গ্রামের কেহ তোমার বাড়িতে পদার্পণ করিলে, ষোড়শোপচারে পূজা করিও। তোমার বাড়ীর কেহ আমার বাড়ী আসিলে—যদি নিতান্ত না ছাড়ে—বাজার হইতে জিনিষ কিনিয়া আনিয়া রাঁধিয়া খাইবে, আমি গোয়ালবাড়ীতে স্থান দেখাইয়া দিব। যে মেয়ের জন্য এত লাঞ্ছনা, তাহাকে লোকে বিষ দেখিবে না ত কি!

তা পিতৃগৃহে কন্যার অনাদরই ভাল। দুইটী পদার্থ একত্র সমর্দ্ধিত হইলে উভয়ের মধ্যে উপযোগিতা থাকে, উপযোগিতা জন্মে। পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতির পদার্থ একত্র বর্দ্ধিত হইতে পারে না,—যেটী অধিকতর বলবান, সেইটী থাকে, অন্যটী লুপ্ত হয়। উপযোগিতা না থাকিলে একত্রাবস্থান, একত্র বৃদ্ধি ঘটে না। অমিল হইলেই পার্থক্য

হয়। কন্যা সন্তানের অনাদর করিতে বাঙ্গালিরা অন্যের কাছে শিখে নাই। এ প্রবৃত্তি এই মাটীরই ফসল। সুতরাং ইহাই অনুমেয়, যে কন্যার অনাদরের সঙ্গে নারীজীবনের উপযোগিতা আছে। বাস্তবিকও আছে। যাহার যে সুখসাধন আপন আয়ত্ত নহে, সে সুখে তাহাকে অভ্যস্ত করা অন্যায়। করিলে, একরূপ অত্যাচার করা হয়, কেননা যে লোক যে সুখে অভ্যস্ত, তাহার পক্ষে তদভাব ক্লেশকর। যে সুখ জানি না, তাহার অভাবকেও অভাব বলিয়া জানি না, সুতরাং অভাবে ক্ষুন্ন হই না। সুতরাং যে সুখ যাহাকে চির কাল দিতে পারিব না, সে সুখে তাহাকে অভ্যস্ত করা অন্যায়। সেই জন্য পুত্রনির্ব্বিশেষে কন্যার আদর করা অন্যায়। পুত্র চির কাল ঘরে থাকিবে——তাহারই ঘর —ইচ্ছা থাকিলে, সামর্থ্য থাকিলে, চির কাল তাহাকে রাজভোগে রাখিতে পারা যায়; সেই জন্য তাহাকে রাজভোগে বর্দ্ধিত করা দোষের কথা নহে। কিন্তু কন্যাকে নিরুপিত বয়সে——প্রায়ই তৎপূর্ব্বে, তৎপশ্চাতে কখনই নহে——পরান্নভোগিনী, পরাবসথশায়িনী হইতে হইবে। সেই পর, যে বড় আপনার, তাহাকে কেমন ভোগে ভুগাইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি?—অথবা, নিশ্চয়তার বাকীই বা কি? তাই কন্যার পক্ষে রাজভোগ ব্যবস্থা নহে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও যে পর প্রত্যাশিনী, তার অভাব যতই অল্প হয় ততই ভাল। পিতৃগৃহে কন্যার অনাদরই ভাল। সে অনাদর যে মর্ম্মান্তিক হয় না, এ রূপ নহে; কিন্তু তবু কন্যার অনাদরই ভাল। যদি বিবাহ তাহার অদৃষ্টে সুখের হয়, তবে পূর্ব্ব অনাদর নিবন্ধন সুখ বৃদ্ধি হইবে——দুঃখের পর সুখ, যেন হিমান্তে বসন্ত, যেন বর্ষান্তে শরৎ, যেন মেঘান্তে জ্যোৎস্না, যেন বিচ্ছেদান্তে মিলন——বড় মধুর। যদি অদৃষ্ট তেমন না হয়, তাহাতেও বিশেষ দুঃখ হইবে না। অনাদরে সে অভ্যস্ত, অনাদর তাহার কাছে বিশেষ ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইবে না——বর্ষার জলে

ভিজিয়া ভেকের কফ লাগে না। আদরিণীর পক্ষে অন্য কথা। স্বামীগৃহের সুখকে বিশেষ সুখ বলিয়া বোধ হইবে না, কেননা সে সুখ তাহার প্রয়োজনীয়ের মধ্যে। কিন্তু যদি কপাল পোড়া হয়, যদি বিধাতা বিমুখ হয়, তবে মর্ম্মান্তিক হইবে—সুখের পর দুঃখ হইলে প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা করে না। বিবাহের রাত্রে বিদ্যুল্লতাকে দেখিয়াছিলাম, যেন গোলাব ফুল ফুটিয়া আছে—সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রফুল্ল, বায়ুর ন্যায় ক্রীড়াশীল, নিদ্রার ন্যায় মনোহর, স্বপ্নের ন্যায় সুন্দর। কেমন সুকুমার—যেন নিদাঘ সন্ধ্যার আকাশ, যেন দূরাগত সংগীতের শেষ ভাগ, যেন বিস্মৃত স্বপ্নের অস্পষ্ট স্মৃতি। সেই কুসুমকোমল, কুসুমসুকুমার বিদ্যুল্লতা সে দিন শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছে, যেন হাড়ের মালা—দেখিয়া চিনিতে পারি না, পরিচয় লইয়া চিনিলাম। বিদ্যুল্লতা তাহার পিতার এক মাত্র কন্যা—বড় সোহাগের পাত্র—মনের সাধ মুখে প্রকাশ না হইতে পূর্ণ হইয়াছে; শাসন কেমন কখন জানে নাই, কর্কশ কথা কেমন কখন শুনে নাই। গায়ে ছড় যাইবে বলিয়া বিদ্যুল্লতা কখনও নূতন কাপড় পরে নাই, গলায় বাধিবে বলিয়া দুগ্ধ সর না ছাঁকিয়া খায় নাই। সেই বিদ্যুল্লতা আজ এমন—মলিনা, কাতরা, দুঃখভারপীড়িতা—যেন সাক্ষাৎ বিষাদ। স্কন্ধের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরে বসিয়া গিয়াছে, শরীরের সকল অঙ্গই দীর্ঘাকৃত হইয়াছে, দৃষ্টি শূন্যন্যস্ত—সদাই অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবে—সদাই যেন পতনোন্মুখ নিশ্বাস চাপিয়া রাখিত ব্যস্ত। মুখে হাসি ধরিত না—আগে হাসিয়া তবে কথা কহিত—এখন সেই মুখ দেখিয়া বোধ হয় যেন ইহাতে ইহজন্মে কখনও হাসি খেলে নাই। তাহার পতনোন্মুখ নিশ্বাস, বর্ষণোন্মুখ চক্ষু, অশ্রুপূর্ণ স্বর, নৈরাশ্যমন্থর গতি—হায়! এই জীবন্ত কুসুমরূপিনী বালিকার কপালে এত ছিল? আমার কান্না পায় —কবে শুনিতে হইবে, বিদ্যুল্লতা নাই। পিতৃগৃহে এত সোহাগ না

হইলে বুঝি এ কোজাগরের চাঁদ মেঘে ডুবিত না, বুঝি এ বসন্তব্রততী অকালে শুকাইত না, বুঝি বিদ্যুল্লতাকে এমন করিয়া মরিতে হইত না। স্বামীগৃহে বিদ্যুৎ যে দুঃখ ভুগিয়াছে—কিন্তু সে অনেক কথা; এখন থাক, সে মর্ম্মপীড়ার কথা সময়ান্তরে বলিব।

সুরা।

কুক্ষণে ভারতে বোতল বাসিনী,
আসিয়াছে মরি! অব্যক্ত রূপিনী!
নাশিতে ভারত রতনের খনি,
সাহিত্য, দর্শন, সভ্যতার মণি;
কবিত্বের ভুমি, কিবা লাবন্যানী,
বশিষ্ঠ বাল্মীকি ব্যাসের জননী—
কালি দাস, মাঘ, ভারবী সুগুণী;
ভবভুতি আদি কবি চূড়ামণি
আত্রেয়ী, দ্রৌপদী— সুশীলা সুধনী
খণা, লীলাবতী, প্রাচীনা রমণী;
আর্য্যাবর্ত্ত হায়, জ্ঞানের অবনী;
সোণার ভারত, সভ্যতা জননী,
হেন আর্য্যভুমি, বোতলবাসিনী
করিবারে নাশ হয়েছে অগ্রণী

দেখ ভ্রাতৃগণ! নয়ন মেলি।

ভ্রাতৃগণ দেখ! মেলিয়া নয়ন,
যায় রসাতলে আর্য্য নিকেতন;
অজ্ঞান তিমির শয়নে শয়ান,
কত কাল আর থাকিবে এমন;

মদ-মত্ততায় থাকিলে এখন
বিলুপ্ত হইবে ভারত ভূষণ ;
উড়িবেনা আর, সুনীল গগন
উজ্জ্বলিয়া, ওই জাতীয় কেতন ;
বোতল বাসিনী হতে বিনাশন
হইতেছে হায় ! গৌরব রতন ,
লুপ্তপ্রায় আজি বেদ, দরশন,
সাহিত্য, বিজ্ঞান,— মানস রঞ্জন ;
জ্ঞান-ধর্ম্ম-ময় ভারত নন্দন
অজ্ঞান তিমিরে করিছে ভ্রমণ,
উল্লাস পরাণে করিছে কেলি।

২

মদ মত্ততায় হইয়া বিভোর,
করিতেছে কেলি প্রফুল্ল অন্তর ;
ক্ষণে নৃত্য গীত ক্ষণে ভূমি পর
যায় গড়া গড়ি, তনু মনোহর
হইয়াছে হায় ! রুধির আকার,
রুধির প্রবাহে সিক্ত বসুন্ধর ;
আকুল পরাণে করিছে ন্যক্কার
হায় কি বীভৎস দৃশ্যের সঞ্চার ,
ক্ষণে বা রোদন করুণ অন্তর—
ক্ষণে অট্টহাস— হৃদয় ভিতর,
ক্ষণে বা ছিঁড়িছে সে বীণার তার,
হৃদয়ের বীণা একি চমৎকার।
গভীর নিশীথে আর্য্য কুলাঙ্গার,

ধিক্! ধিক্! ধিক্! হেন মন তার,
আনন্দে বিহ্বল আপনা ভুলি।
বারাঙ্গনা প্রেম কপটতা ময়,
প্রবঞ্চনাধার— সংকীর্ণ হৃদয়,
বর্ষে বিষবাণ যেই চক্ষু দ্বয়,
সে বিষ কটাক্ষ শোভন আশায়,
আর্য্য কুলাঙ্গার কুতূহলে ধায়,
অবশে ভূমিতে গড়া গড়ি যায়,
বিক্ষত শরীর শোণিতাদ্র ময়,
ধীরি, ধীরি, ধীরি, প্রাণ বায়ু বয়,
ছট্‌ ফট্‌ করে বিষের জ্বালায়,
কি আশ্চর্য্য দেখ পুনর্ব্বার ধায়!
আবার পড়িতে আপনা ভুলি!

৩

আহা! এই বারে অমূল্য জীবন,
বুঝি বাহিরিল— জীবন—তপন,
তিষ্ঠিল ক্ষণেক— দুরন্ত শমন,
প্রাণ বায়ু তার করিল হরণ;
দুর্ল্ভ জীবন চির—আরাধন,
মুহূর্ত্তে তাহার হেন সংঘটন;
কে বলিতে পারে কাল—নিহনন,
অজ্ঞাতে কি রূপে হয় নিষ্পাদন,
সামান্য এ নর বুঝিতে নারে।
আর্য্য কুলাঙ্গার মত্ততা তাড়নে,
হারাইল প্রাণ অতুল রতনে,

তুষিল না আর মেদুর পবনে,
ধীরি ধীরি ধীরি স্নিগ্ধ প্রবাহনে;
পাপের প্রায়শ্চিত্ত—শমন ভবনে
চিরকাল হায়! অমূল্য জীবনে
সহিতে হইবে ভীম প্রহরণে,
আঘাতিবে যবে দুরন্ত শমনে;
আর কি যন্ত্রণা সহিবে হারে!

গেল কুলাঙ্গার যম নিকেতন,
তার তরে বৃথা করি আক্ষেপণ;
ভারত সন্তান নির্ব্বোধ এমন,
যাকৃ রসাতলে, যাক্‌রে এখন,
কলঙ্কের কালি হবে প্রক্ষালন,
হবে না কো আর সহিতে লাঞ্ছন
হবে নিরমল ভারত রতন,
হবে আলোচন ষড় দরশন,
সাহিত্য বিজ্ঞান ভারত—ভূষণ,
জ্ঞান ধর্ম্ম আদি, সৌভাগ্য তপন
উদিবে উজ্জ্বলি ভারতাকাশে।
গাইব তখন প্রফুল্ল অন্তরে
ভারতের গুণ বীণা লয়ে করে;
বিজন অরণ্য পর্ব্বত শিখরে
জলধীর তীরে মেদুর সমীরে,
ইউরোপ, আমেরিক দেশ মনোহরে
অবহেলি এই পাশ্চাত্য গৌরবে,

বীণার সংযোগে মধুর সুস্বরে,
ভারতের যশ প্রফুল্ল অন্তরে,
পঞ্চমে মাতিয়া গাব প্রাণ ভোরে,
সে সঙ্গীত স্বর চিরকাল তরে
ধ্বনিবেক যশঃ অতি উল্লাসে।

৫

কুক্ষণে ভারতে বোতল বাসিনী
আসিয়াছে মরি! অব্যক্ত রূপিনী
নাশিতে ভারত রতনের খনি,
সাহিত্য দর্শন সভ্যতার মণি
দেখ ভ্রাতৃগণ নয়ন মেলি।
আর্য্য কুলাঙ্গার সহ বারাঙ্গনা
উল্লাস পরাণে করিছে কেলি।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার।

জেম্‌স্‌ ব্র্যাম্‌টন।

আমাদের দেশীয় অধিকাংশ লোক গল্প শুনিতে বড় ব্যগ্র। মাসিক সমালোচকে কাহিনী থাকে না বলিয়া অনেকে আমাদিগকে সময়ে সময়ে পীড়াপীড়ি করেন। গল্প যদি শুনিতেই হয়, তাহা হইলে মিথ্যা গল্প অপেক্ষা সত্য কথা শুনা ভাল। সেই জন্য আমরা জেম্‌স্‌ ব্র্যাম্‌টন নামক প্রসিদ্ধ মারকীন দেশীয় পুলিস কর্ম্মচারীর অদ্ভুত কার্য্যকলাপ হইতে এই গল্প সংকলন করিয়া দিলাম। ব্র্যাম্‌টন্ স্বয়ং তাঁহার প্রধান প্রধান কার্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সেই বিবরণ অবলম্বনে এই গল্প সংকলিত। ব্র্যাম্‌টন স্বয়ং বক্তা।

সন ১২৪৮ সালে পশ্চিম প্রদেশ জাল মুদ্রায় ভাসিয়া গিয়াছিল। নকল এমন উত্তম হইয়াছিল যে, সে সকল মুদ্রা সহজেই চলিয়া গিয়াছিল। ক্রমে জাল মুদ্রার চলন এমন বিপুল হইয়া উঠিল, যে মিলিত রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ, জালিয়াৎদিগের গুপ্ত কার্য্যালয়ের অনুসন্ধানের জন্য, ধৃতি বিভাগের নিকট এক জন সুদক্ষ কর্ম্মচারীর প্রার্থনা করেন। কার্য্যসাধনের নিমিত্ত আমি মনোনীত হই।

অনুসন্ধানের সূত্র আদৌ ছিল না। তবে, চিকাগো নগরে এই জাল মুদ্রার বহুল প্রচার ছিল বলিয়া মনে করিলাম যে, এই নগরের নিকটেই জালিয়াৎদিগের কার্য্যালয় হইবার সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া প্রথমেই চিকাগো নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। তথায় পাঁচ সপ্তাহ অতিবাহিত করিলাম, কিন্তু জালিয়াৎদিগের সম্বন্ধে কোনই সূত্র পাইয়া উঠিলাম না।

ক্রমে নিরুৎসাহ এবং ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িতেছিলাম। শেষে মনে করিলাম, বুঝি বিফলমনোরথ হইয়াই ঘরে ফিরিয়া যাইতে হয়। এক দিন আমার স্ত্রীর এক খানি পত্র পাইলাম—টাকা ফুরাইয়া গিয়াছিল, তাই কিছু টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। একটি ব্যাঙ্কে গিয়া হুণ্ডি চাহিলাম এবং সেই সঙ্গে হুণ্ডির টাকা দিলাম, তাহার মধ্যে কতকগুলি অর্দ্ধডোলার ছিল। এক জন কেরানী তন্মধ্যে তিনটী ডোলার আমার দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। বলিল, "এ জাল।"

আমি বলিলাম, "কি! এই অর্দ্ধডোলার তিনটি জাল বলিতেছেন!"

"হাঁ, বলিতেছি।"

"আপনি নিশ্চয় জানেন!"

"নিশ্চয়ই জানি। নকল অতি উত্তম হইয়াছে বটে, কিন্তু ওজনে কম। আপনি নিজেই কেন পরীক্ষা করিয়া দেখুন না!"

এই বলিয়া কেরানী বাবু একটি নিক্তির এক দিকে একটি আসল মুদ্রা এবং অপর দিকে একটি নকল মুদ্রা চড়াইয়া দেখাইলেন—আসল মুদ্রার গুরুত্ব অধিক হইল।

উভয় মুদ্রা উত্তম করিয়া দেখিয়া আমি বলিলাম, "এ রূপ অবিকল জাল মুদ্রা আমি ইহ জন্মে আর কখন দেখি নাই। যত জাল মুদ্রা বাজারে ফিরিতেছে, সবই কি এই রূপ ?"

কেরাণী বাবু বলিলেন, "না, না, সবই এমন উৎকৃষ্ট নহে। এ গুলি নিউইয়র্ক নগরের বিখ্যাত জালিয়াৎ নেড উইলেটের হাতের। আমি এ সকল বিলক্ষণ চিনি; আমার হাতে এরূপ টাকা অনেক আসে।" তার পর একটি দেরাজের ভিতর হইতে আর কত গুলি অর্দ্ধডোলার বাহির করিয়া আমায় দেখাইয়া বলিলেন যে, "এই দেখুন, এ গুলিও জাল, কিন্তু নকল তেমন উত্তম হয় নাই। নিতান্ত মন্দ হয় নাই বটে, কিন্তু নেড উইলেটের হাতের মতন নহে।"

আমি মিলাইয়া দেখিলাম, কেরানী বাবুর কথা সত্য। জাল মুদ্রা তিনটি পকেটে রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে আসল টাকা দিলাম।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে একটি অপরাধের সংবাদ আসিল। তাহার তদারকের জন্য আমাকে চিকাগো হইতে পনর ক্রোশ দূরে এক খানি গ্রামে যাইতে হইল। আমি তথায় গিয়া রাত্রে পৌঁছিলাম। সে গ্রামে একটি মাত্র ট্যাভার্ণ ছিল, সেই খানে বাসা লইলাম। গৃহটি অতি জঘন্য, এবং তাহার কর্ত্তা কর্ত্রীর ন্যায় খিঁটখিঁটে লোক আমি ইহ জন্মে দেখি নাই। রাত্রে বাসা পাওয়া যাইতে পারে কি না, জিজ্ঞাসা করায় দুই জনে একটু চাওয়া চাউই করিল, ছোট ছোট করিয়া কি বলা কওয়া করিল, শেষে অতি রূঢ়ভাবে বলিল, একটা বিছানা পাইতে পার।

কষ্ট এবং অসুবিধা এ জীবনে অনেক সহ্য করিয়াছি। কদর্য্য আহার, কদর্য্য শয়ন পাইয়াই অনেক সময়ে সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে। সেই জন্য আজিকার জঘন্য আহার্য্য এবং জঘন্যতর শয়নেও বিরক্ত হইলাম না। চিত্ত প্রসন্ন এবং মতি স্থির রাখিলাম।

ঘর খানি ক্ষুদ্র। বাতাসের যাতায়াত বিলক্ষণ ছিল স্বীকার করিতে হইবে, কেননা ছাদের ভিতর দিয়া আকাশের অর্দ্ধেক নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল। বিছানাটী কেবল একটী খড়ের ছালা, গৃহের এক কোণে নিক্ষিপ্ত, তাহার না আছে আবরণ; না আছে কিছু। যাহা হউক, তৎক্ষণ আমার বিশেষ কষ্ট বোধ হয় নাই, কেননা তখন গ্রীষ্ম কাল, গ্রীষ্মও অতিশয়।

সেই ঘরে জানেলার স্থলাভিষিক্ত একটা বৃহৎ ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্র দিয়া এক ঘণ্টারও অধিক কাল বাহ্য দৃশ্য দেখিলাম। দেখিলাম, আমার সম্মুখে যত দূর দৃষ্টি চলে, একটী প্রকাণ্ড মাঠ বিস্তৃত—এমন প্রকাণ্ড যে তাহার সীমা দৃষ্টিগোচর হয় না। যে গৃহে আমি বাসা লইয়াছিলাম, সে গৃহটী দেখিলাম অন্যান্য গৃহ হইতে বিযুক্ত, স্বতন্ত্র, দূরস্থিত। কেবল বৃক্ষভেক এবং উচ্চিঙ্গার ধ্বনি ব্যতীত অন্য শব্দ আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছিল না। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—দিব্য জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল—এমন পরিষ্কার, এমন উজ্জ্বল, যে অতি ক্ষুদ্র লেখাও সে আলোকে পড়া যায়।

শেষ একটু শ্রান্তি বোধ হইল। তখন সেই বিছানার অনুকরণের উপর পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না; কিন্তু কেমন একটা প্রচ্ছন্ন, অর্দ্ধস্ফুট, অর্দ্ধশ্রুত শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল—বোধ হইল যেন দূরে কে মার্ত্তুল পিটিতেছে। শব্দ বড় একটা উচ্চ হইতেছে না; বোধ হইল যেন আবরিত মার্ত্তুলের দ্বারা লৌহ আঘাত করিতেছে; কিন্তু শব্দটা একটু নূতন রকম হইতেছিল, এবং সেই

জন্যই বোধ হয়, তাহাতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। আমি বিছানা হইতে উঠিয়া জানেলার গোড়ায় গিয়া দঁড়াইলাম; দেখিলাম চাঁদ পশ্চিম গগনের নিম্নভাগে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; বুঝিলাম রাত্রি আর নাই। ঘরের পশ্চাদ্ভাগে যেমন শুনা যাইতেছিল, তদপেক্ষা এক্ষণে পূর্ব্ব কথিত শব্দ অধিকতর স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। বোধ হইল যেন দুই শত হস্ত দূরবর্ত্তী কোন গৃহ হইতে আসিতেছিল।

আমার চিত্ত স্বভাবতঃই অনুসন্ধানপরায়ণ। বিশেষতঃ লোকালয়ের এত দূরে, গভীর রাত্রে, এরূপ শব্দ শুনিয়া কারণ জানিবার জন্য বিশেষ কৌতুহল জন্মিল। শেষ এই কৌতূহলবৃত্তি এমন প্রবল এবং দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল যে, স্বয়ং সেই রাত্রে বাহির হইয়া কারণ জানিয়া আসিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। শব্দ পূর্ব্ববৎ হইতে লাগিল, আমি আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না; মনে করিলাম. যাহা থাকে অদৃষ্টে হইবে, কিন্তু একবার দেখিয়া আসি।

শয়ন কালে, পোষাকের মধ্যে কেবল জুতা খুলিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। তাহা পায়ে দিলাম। তার পর অতি সাবধানে দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে ভগ্ন অধিরোহনী অবতরণ করিলাম। নিম্ন তালায় আসিয়া দেখিলাম, জন মানব নাই। আস্তে আস্তে দরজার কাছে গিয়া অতি সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া বাহির হইলাম।

জীব সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু সেই শব্দ শুনা যাইতেছিল; এবং যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, শব্দও তত স্পষ্টতর হইতে লাগিল। শেষে একটী বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উঠিলাম। বাড়ীটির দৈর্ঘ্য বিলক্ষণ, কিন্তু উচ্চতা অতি অল্প, এবং ভিত্তি গাত্রস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে এক প্রকার তীব্র আলোক বাহির হইতেছিল। আমি মাথা নামাইয়া চাবির ছিদ্র দিয়া দেখিলাম—যাহা দেখিলাম, তাহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইলাম। পাঁচ ছয় জন বিলক্ষণ বলিষ্ঠ লোক আস্তিন গুটাইয়া নানা

বিধ কার্য্য করিতেছে। কেহ হাতিন চালাইতেছিল, কেহ ছাঁচ ঢালা তদারক করিতেছিল, কেহ অক্ষর উঠাইতেছিল। সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিলাম, কাণ্ড খানা কি? জালিয়াৎদিগের এই একটা আড্ডা, এবং যে গৃহে বাসা লইয়াছিলাম, তাহার কর্ত্তাকর্ত্রী উভয়েই এই দলভুক্ত—তাহারা ঘরের এক কোণে কার্য্য করিতেছিল; কর্ত্তা কতকগুলি অর্দ্ধ ডোলার পালিশ করিতেছিল, তাঁহার স্ত্রী প্রস্তুত মুদ্রা সকল কাগজে জড়াইয়া রাখিতেছিল।

যাহা দেখিবার তাহা দেখিলাম। ঘরে ফিরিয়া আসিব, এমন সময় কে যেন পৃষ্ঠে হাত দিল; ফিরিয়া দেখিলাম, এক জন ভীষণমূর্ত্তি বদমাইশের হস্তে পড়িয়াছি।

আমাকে রূঢ়ভাবে ঠেলিয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ভাল মানুষ এখানে কি করিতেছ!"

ধৈর্য্য ঠিক রাখিবার চেষ্টা করিয়া আমি বলিলাম, জ্যোৎস্নালোকে বেড়াইতেছি।"

"এসো একবার এই দিক দিয়া বেড়াইয়া যাও দেখি।" এই বলিয়া সেই দুরাচার দরজা ঠেলিয়া আমাকে টানিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইল।

যত লোক কার্য্য করিতেছিল সকলেই কার্য্য বন্ধ করিয়া আমাদের দিকে ঝুকিল। সকলেই বলিয়া উঠিল, "এ কি এ!"

যে ব্যক্তি আমায় ধরিয়াছিল, সে বলিল, "এ এক জন উপরি লোক, বাহির হইতে উকি দিয়া সব দেখিতেছিল।"

যে গৃহে আমি বাসা লইয়াছিলাম, সেই গৃহস্বামী বলিল, এ ব্যক্তি পথিক, অদ্য রাত্রে সরাইয়ে আসিয়া বাসা লইয়াছিল। আমি ইহাকে বিছানায় নিদ্রিত দেখিয়া আসিয়াছিলাম।"

আমার নিকট এক জনকে প্রহরী রাখিয়া, আর সকলে গৃহের এক কোণে সরিয়া গেল। আমি দেখিলাম, তাহারা সকলে অতি গম্ভীর-

ভাবে কি পরামর্শ করিতেছে। মন্ত্রণার বিষয় যে গুরুতর, তাহাও বুঝা গেল। যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রহরায় ছিল, সে ব্যক্তি কথা কহিল না বটে, কিন্তু কটমট দৃষ্টিতে এবং অতি কর্কশ ভাবে আমার দিকে চাইতেছিল। আমি এই ঘরে প্রবেশ করিয়া পর্য্যন্ত একটী কথাও কহি নাই। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলাম, যে, আমি যাহাই কেন বলি না, তাহাতে আমার ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনাই অধিক ; এবং সন্দেহের স্থলে নীরব থাকাই আমার নিয়ম। শেষ বোধ হইল, ইহাদের পরামর্শ স্থির হইয়াছে, কেননা তাহাদের মধ্যে অতি অপরিষ্কার কৃষ্ণবর্ণ এক জন বদমাইশ আমার দিকে অগ্রসর হইয়া, কোনরূপ ভূমিকা বা ভদ্রতা না করিয়া বলিল ?

"দেখ, পথিক, তোমাকে মরিতে হইবে।"

আমি একটী কথাও কহিলাম না, একটী শিরাও নাড়িলাম না। "তুমি আমাদের গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিয়াছ। মরা মানুষের দ্বারা কথা প্রকাশ হয় না।"

আমি উত্তর করিলাম না।

ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিবার জন্য তোমাকে দশ মিনিট সময় দেওয়া যাইতেছে। ফাঁসি যাইবে কি গুলিতে মরিবে, ইহাও মনোনীত করিতে দেওয়া যাইতেছে।

অকস্মাৎ একটা ভাব মনে উদয় হইল। এমন একটা কথা মনে পড়িল যাহাতে আমার জীবন রক্ষা হইলেও হইতে পারে। সহসা আমি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলাম। হাসিটা অনেকটা অস্বাভাবিক এবং বিকৃত হইল বটে, কিন্তু তাহা তাহারা কেহ বুঝিতে পারিল না। অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া এ উহার মুখ পানে চাহিতে লাগিল। এক জন বলিল, "মরনেও হাসি,—লোকটি বেশ নির্ব্বিকার দেখছি।"

আর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "বোধ হয় মনে করিয়াছে আমরা তামাসা করিতেছি।"

যে ব্যক্তি প্রথম কথা কহিয়াছিল, সে আমাকে বলিল, "এসো, পথিক, ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া লও; সময় যায়।"

আমি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উচ্চ হাস্য করিলাম।

তাহারা বলিয়া উঠিল, "আরে! লোকটা পাগল!"

কেহ কেহ বলিল, "না হয় মাতাল।"

আমি মুখ খুলিলাম। বলিলাম, "যা হোক্, এমন তামাসা আর দেখি নাই। এক জন কর্ম্মের কর্ম্মীকে ফাঁসি দেবে না কি!"

"কর্ম্মের কর্ম্মী—তুমি কর্ম্মের কর্ম্মী!"

"তা বৈ আর কিছুই নই।"

"তোমার নাম কি!"

আমি বলিলাম, "নেড্ উইলেটের নাম শুনিয়াছ কি!"

"শুনিয়াছি বৈ কি। তিনি আমাদের এ ব্যবসায়ের চূড়া।"

"আমার নাম নেড্ উইলেট্।"

সকলেই বলিয়া উঠিল, "কি, তুমি নেড্ উইলেট্!"

"হাঁ আমিই বটে,—সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া আমি, যেখানে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি প্রস্তুত মুদ্রা সকল সাজাইয়া মুড়িয়া রাখিতেছিল, সেই দিকে অতি গর্ব্বিত ভাবে গেলাম।

অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল। ইহাদিগের মধ্যে কেহই নেড্উইলেট্‌কে দেখে নাই, কেবল নামমাত্র শুনিয়াছিল। আমার উদ্ধত, গর্ব্বিত ভাব দেখিয়াও তাহারা অনেকটা ভ্রান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু ইহাও বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, এখনও তাহাদের সন্দেহ একেবারে দূর হয় নাই।

কতকগুলা মুদ্রা হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া বলিলাম, "এ গুলি ভাল হইয়াছে মনে করিয়াছ বুঝি? এর চেয়ে ভাল যদি না করিতে পার, তবে দোকান বন্ধ করিয়া দাও।" একজন জিজ্ঞাসা করিল,

"তুমি ইহার অপেক্ষা ভাল দেখাইতে পার কি?"

"বোধ হয়, পারি; তা যদি না পারিতাম, তবে এত দিন গলায় দড়ি দিয়া মরা উচিত ছিল।"

সকলেই বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, কৈ দেখি।"

এই আমার শেষ উপায়, শেষ অবলম্বন। বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলাম যে, ইহারই উপর আমার জীবন নির্ভর করিতেছে।

ব্যাঙ্কে যে তিনটী অর্দ্ধ ডোলার ফেরৎ হইয়াছিল, তাহার একটী বাহির করিয়া বলিলাম, "দেখ দেখি এটি কেমন হইয়াছে? এই আমার শেষ বারের কাজ।"

মুদ্রাটি হাতে হাতে চালান হইয়া গেল। কেহ বলিল জাল বটে, কেহ বলিল নয়।

এক জন বলিল "ইহা যে জাল, তার কি প্রমাণ দিতে পার?" আমি বলিলাম, "আসল টাকার সঙ্গে ওজন করিয়া দেখ।" সেই রূপ করিয়া দেখিল। সাব্যস্ত হইল, জাল বটে। এক জন আর এক জনকে অস্ফুটস্বরে বলিল "বোধ হয় দৈবাৎ কোন রকমে এটা পাইয়াছে।" আমি তাহা শুনিতে পাইলাম। বাকী দুইটি পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, এ গুলিও পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

তখন সকল সন্দেহ দূর হইল। কেহ বলিল, "অতি সুন্দর!" কেহ বলিল, "অতি চমৎকার!"

পরীক্ষা করা শেষ হইলে, সকলেই অতি বন্ধুভাবে আমার কর মর্দ্দন করিল—তখন তাহাদের মনে আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ব্যবসায় সম্বন্ধে দুই একটা কথা কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমি কৌশলে সে সকল পরিহার করিলাম। বলিলাম, আমি আমোদ ভ্রমণে বাহির হইয়াছি, এখন কাজের কথা রাখিয়া একটু পানীয় পাইলে ভাল হয়। তাহারাও 'হুইস্কি, সুরা আনিয়া উপস্থিত করিল,

এবং তাহাতে রাত্রিটা বেশ আমোদে কাটিয়া গেল। যখন মজলিস ভাঙ্গা গেল তখন বেশ ফরসা হইয়াছে।

"ভুলহ আমায়।"

১

ভুলহ আমায় প্রিয়ে চির দিন তরে!
অনর্থক অশ্রুজলে, গণ্ডকম ভাসাইলে
কি ফল ফলিবে বল? হব না তোমার,
এ জীবনে সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গেছে আমার!

২

হব না তোমার!—হায় লোক লাজ ভয়ে
ফণী কিরে ত্যজে মণি? লোক লাজ তুচ্ছ গণি;—
নহে তাহা, আজি যার দংশন জ্বালায়
বাঞ্ছিতের চির আশা করিনু বিলয়!

৩

নাহি ভাবি নিজ তরে। তোমারি কারণ
করেছি বাসনা প্রিয়ে, হায় রে চিরিয়ে হিয়ে
চির তরে প্রেম মুর্ত্তি দিয়ে বিসর্জ্জন,
হৃদয় মন্দিরে মম যাহার আসন!

৪

বাসনাত অনু দিন অন্তরে অন্তরে
উভয়ে রাখিব উভে;— কিন্তু এই দগ্ধ ভবে
অয়েয়, অকূল নদী সমাজ করাল;
তুমি আমি দুই কূলে, হায় রে কপাল!

৫

হীন শক্তি, তুচ্ছ নর! কে দিবে বলিয়া

কোন্ বলে কোন্ তরী, সাহসে আশ্রয় করি
উত্তরিতে এই নদী করিব যতন?—
যার ফলে হাতে পাব ত্রিদিব ভুবন!

৬

অসম্ভব, সুসম্ভব বলি কি কারণ
ক্ষণিক লভিব শান্তি? কেন এ বিষম ভ্রান্তি?
দুঃখের পাথারে যার ডুবিবে জীবন,
সে কেন দেখিবে বল সুখের স্বপন?

৭

তাই বলি কেন প্রিয়ে হায় অনর্থক
ও সুবর্ণ সুব্রততী, জিনি, প্রীতিময়ী মূর্ত্তি
প্রফুল্ল কুসুম সম কোমল অন্তর,
নিরাশা অনলে দগ্ধ কর নিরন্তর?

৮

সুধাইছ, কি হইবে আমার দশায়?
কেন হেন প্রশ্ন প্রিয়ে, আমি কি তোমার চেয়ে!
তুমি সুখী হও যদি ভুলিয়া আমায়,
তার চেয়ে সুখ মম কি আছে ধরায়?

৯

সত্য বটে মানবের অশান্ত হৃদয়!
কোন্ প্রাণে ভুলে রব? তা হলে যে মরে যাব!
না, তোমারি সুখে মম সর্ব্ব সুখ জ্ঞান,
আত্ম বিসর্জ্জন হায়, প্রেম পরিণাম!

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় রচনা প্রবন্ধাদি, সমালোচ্য গ্রন্থাদি জিয়াগঞ্জ বালুচর ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

ব্যাং বা ইন্সাফিসিয়েণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না। যাঁহারা পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উত্তর লেখা যায় না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা [illegible] টিকিটে মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় /০ আনা [illegible] দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট যেন কেহ না পাঠান। মনিঅর্ডারে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর ট্রেজরীতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন তাঁহাদিগের নিকট পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪) টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে, সুতরাং বিনা মূল্যে দেওয়া একেবারে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্র ৶০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে সতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ
মাসিক সমালোচক কার্য্যালয়
[illegible], বহরমপুর

১ম খণ্ড। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মাসিক সমালোচক।

(সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।)

সম্পাদক

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

সন ১২৮৬ সাল আশ্বিন।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—০—

বহরমপুর অরুণোদয় প্রেসে

মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।। [প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

মাসিক সমালোচক।

-*:ஜ:*

স্ত্রী চরিত্র।

পুরুষের ভাগ্য এবং নারীর চরিত্র দেবতারাও বুঝিতে পারেন না—মনুষ্য কোন্ ছার? সংস্কৃত ভাষায় এই রূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় ছাই ভস্ম যাহা কেন পরিব্যক্ত হউক না, তাহাতেই আমাদের অচলা ভক্তি, অটলা আস্থা। যেমন সংস্কৃত অন্যান্য কথায়, তেমনি এ কথাটার উপরও আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। অনেক সময় এই কথাটা মনে করিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি। অনেক সময় এই কথাটা বলিয়া অপরকে বুঝাই। কোন অমিতব্যয়ী, অমিতাচারী যুবা আত্মদুষ্কৃতনিবন্ধন দুর্দশাগ্রস্ত হইলে এই বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করি। কোন তরলমতি নবীনা, পিতামহের যোগ্য বৃদ্ধ স্বামীর চরণারবিন্দে মতি স্থির না রাখিয়া, প্রতিবেশী যুবককে দেখিবার জন্য দিনে দশবার কলসীকক্ষে ঘাটের পথে যাতায়াত করে—আমরা পাড়ার পাঁচ জন এই প্রবাদ স্মরণ করিয়া তাহার কদাচারের ব্যাখ্যা করি। কিন্তু, পুরুষের ভাগ্য যেমন হউক, নারীচরিত্র কি সত্যই বুঝা যায় না? সম্যক্ না যাউক, বুঝিতে চেষ্টা করিলে কতকটা বোধ হয় বুঝা যায়। কি রূপ শিক্ষা তাহারা পাইয়া আসিয়াছে, কি রূপ অবস্থাপারম্পর্য্যে তাহারা বর্দ্ধিত হইয়াছে, কি রূপ লোকের সঙ্গে সাহচর্য্য করিতে হইয়াছে—সংক্ষেপতঃ কি রূপে কাল কাটাইয়া আসিয়াছে—এ সকল বিবেচনা করিলে কতকটা বুঝা যাইতেও পারে।

দুঃখের বিষয় এই যে, কেবল কতকটাই বুঝা যায়—সবটা বুঝিবার পথ আমরা আপনারাই অনেক দিন হইল বন্ধ করিয়াছি। এ সংসারে পুরুষ প্রতিপালক, স্ত্রীলোক প্রতিপালিত, এই সম্বন্ধ এত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, যে পুরুষের দ্বারা নারীচরিত্র সম্যক্ জ্ঞাত হওয়ার আর বোধ হয় উপায় নাই। এত কাল হইতে স্ত্রীজাতি পরমুখাপেক্ষিনী, পরপ্রত্যাশিনী, পরান্নভোগিনী, পরাবসথশায়িনী, যে তাহাদের সকল কথা সেই পরের কাছে প্রকাশ হওয়া এক রূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। প্রতিপালকের কাছে প্রতিপালিতকে অনেক কথা লুকাইতে হয়—চির প্রতিপালক পুরুষের কাছে চিরপ্রতি-প্রালিত স্ত্রীজাতির অনেক কথা গোপনে থাকিবেই থাকিবে। যে চরিত্রগত স্বাধীনতা চরিত্রবিকাশের এক মাত্র পথ, তাহা তাহাদের নাই। সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীচরিত্র বুঝিবার পথ অনেক দিন হইল বন্ধ হইয়াছে। তবু যে টুকু বুঝা যায়, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, প্রাচীন কালে যে সকল জাতি জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছে, জীবিতচেষ্টায় কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাদেরই বংশাবলী পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। এক্ষণে পৃথিবীতে যে সকল জাতি বিদ্যমান্, যে সকল জাতি সভ্যতাপ্রাপ্ত, তাহারা আদি যুগের সেই সকল বিজয়ী জাতি হইতে উৎপন্ন। আদিম কালে যাহারা পরাজিত হইয়াছিল, তাহারা ক্রমে পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে—সংসারচক্রের নিদারুণ আবর্ত্তনে নেমীর পেষণে দলিত হইয়া গিয়াছে। পরাজিতের বংশাবলী নাই; বিজয়ীদিগের বংশাবলীতেই সভ্যতার সৃষ্টি। কিন্তু প্রাচীন কালে যাহারা জয়লাভ করিয়াছিল, তাহারা কি রূপ প্রকৃতির লোক ছিল? মনে করিয়া রাখিতে হইবে যে, অসভ্যদিগের যুদ্ধই প্রকৃত অবস্থা—আক্রমণকারী জাতির সহিত যুদ্ধ, পশুর

সহিত যুদ্ধ—যুদ্ধই নিয়ম; শান্তি তাহার ব্যভিচার মাত্র; এবং কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা তাহাদের যুদ্ধপ্রণালীর জীবন। * আদিম অসভ্য, উচ্ছৃঙ্খল, বিজয়ী বীরগণ কেবলমাত্র সাহসী ও বলবান ছিল, এরূপ নহে—তাহারা কলহপরায়ণ, কোপনস্বভাব, ন্যায়জ্ঞানবিরহিত, প্রতিহিংসারত, আত্মসর্ব্বস্ব, শোণিতপিপাসু এবং শত্রুর প্রতি প্রস্তরবৎ কঠিনহৃদয়। তাহাদের শত্রুও অনেক—যে কেহ আত্মীয় নহে সেই শত্রু; যে কেহ অন্য ভাষা ব্যবহার করে সেই শত্রু; যে কেহ অন্য দেবতা অর্চ্চনা করে সেই শত্রু; যে কেহ দূরে বাস করে সেই শত্রু; যে নিকটে বাস করে সে আরও শত্রু। কলহ বিবাদ তাহাদের জীবনের দৈনিক কার্য্য, এবং কলহমাত্রই তাহাদের মধ্যে প্রাণপণ—তাহাদিগকেও কেহ রেয়াত করে না, তাহারাও কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কয় না। মারে অথবা মরে—মিটমাট করিয়া লইতে তাহারা বড় একটা জানে না। যাহার সহিত বিবাদ হইল, সাধ্য থাকিলে তাহার রক্ত দর্শন না করিয়া জল গ্রহণ করিবে না। প্রাতে যাহার সঙ্গে কলহ হইল, মধ্যাহ্নে ঝোঁপের পার্শ্বে লুকাইয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণ শর তাহার হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ করিয়া দিল। মধ্যাহ্নে যাহার উপর রাগ হইল, সায়াহ্নে তাহাকে নিকটবর্ত্তী নদীগর্ভে শুয়াইয়া রাখিয়া আসিল। সায়াহ্নে যদি কেহ বিরাগভাজন হইল, নিশীথে নিঃশব্দে তাহার পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া পর্ণশয্যাশায়ী নিদ্রিতকে চিরনিদ্রিত করিয়া রাখিয়া আসিল। এইরূপ তাহাদের জীবন। আবার সেই অশিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল চিত্তের, সেই আদিম অনিয়ত হৃদয়ের বেগ উন্মদ, দুর্দ্দম, তরঙ্গময় এবং কার্য্যপ্রবণ। যখন যে ভাব উদয় হয়, তখনই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদের মতন তাহারা মনের কথা, হৃদয়ের ভাব লুকাইতে জানে না। বালকের ন্যায় তাহাদের প্রকৃতি।

---

* Vide Lesley's Man's Origin and Destiny. p. 269.

বালকে যেমন, যাহাকে ভাল লাগিল, তাহার গলা ধরিয়া কত অর্থশূন্য পরামর্শ করিল; যাহাকে ভাল না লাগিল, তাহাকে স্পষ্ট বলিল, ভাই তোমার খেলা লইব না। এই পাঁচজনে ধূলাখেলা করিতেছে, এই আবার ঘুসাঘুসি, চুলাচুলি। অসভ্যদিগের মধ্যেও সেই রূপ। এই পাঁচ জনে বসিয়া পানভোজন, নৃত্যগীত করিতেছে; আবার পরক্ষণেই সেই পাঁচ জনে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে। একত্রে দুই বন্ধু এক উদ্যমে, এক পরামর্শে পশু শীকার করিতে বাহির হইয়াছে; একটা কথান্তর হইল, কি অমনি এক জনের তীক্ষ্ণশর অপরের হৃদয়শোণিত পান করিয়া বসিল। যে সভ্যতার দায়ে আমরা পরমা শত্রুর সঙ্গেও নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় হাসিয়া কথা কই; যে দুটি চক্ষের বিষ, তাহাকে দেখিয়াও 'পরমাহ্লাদিত' হই, সে সভ্যতা তাহারা জানে না —তেমন চিত্তসংযম তাহাদের নাই। তাহারা আহ্লাদ হইলে নাচে, দুঃখ হইলে কাঁদে, রাগ হইলে মারে, ভয় হইলে পলায়; এবং নাচিতে কাঁদিতে, মারিতে, পলাইতে, তাহারা সমান তৎপর।

মনুষ্যজন্মের প্রথমাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে এই সকল লোকের সাহচর্য্য করিতে হইয়াছে—এই সকল স্বার্থপর, কলহরত, আত্মসর্ব্বস্ব উচ্ছৃঙ্খল, নিষ্ঠুর, পশুবৎ লোকের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছে—— এই সকল লোকের মন রাখিয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে। মনুষ্যই কি, আর অন্য জীবই কি, যে অবস্থায় পতিত হয়, ক্রমে তদুপযোগিতা লাভ করে, সেই অবস্থানুসারে প্রকৃতি গঠিত হয়—না হইলে রক্ষা নাই।

এই সকল লোকের কাছে স্ত্রীলোকদিগকে অনেক সময়ে মনের ভাব গোপন করিয়া চলিতে হইয়াছে। যাহাকে পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, বিশেষতঃ যাহাকে নির্দ্দয় দুরন্ত লোকের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়; তাহাকে অনেক মনের কথা, হৃদয়ের অনেক ব্যথা, চিত্তের

অনেক বেগ, অন্তরের অনেক সাধ গোপন করিতে হয়।-যদি কখন কোন প্রতিযোগিনী প্রতিবেশিনীর কর্ণছিদ্রে বিচিত্র প্রস্তর, কবরীতে নূতন পালক, পরণে রঞ্জিত বল্কল দেখিয়া, আপনার জীর্ণ বল্কল, মলিন পালক, পুরাতন কর্ণভূষার সহিত তুলনা করিয়াছে, তাহা হইলে আপন মনেই মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছে—দুঃখ, ঈর্ষা, অভিমান, কখন সাহস করিয়া মুখে ফুটিয়া ব্যক্ত করিতে পারে নাই —কখন আপনার হীনাবস্থার জন্য জোর করিয়া দুটো কথা স্বামীর কাছে বলিতে পারে নাই। বালিকা বিদ্যালয়ের আউট্ বিধুমুখী ন্যায়লঙ্কার, রাইকিশোরী বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার পতাকাধারিণীগণের ন্যায় যদি তাহারা যার তার অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া স্বামীর কাছে হাতনাড়া দাঁতঝাড়া দিতে যাইত, তাহা হইলে হাত নাড়িয়া, দাঁত ঝাড়িয়া আর তাহাদিগকে জীবলোকে থাকিতে হইত না—মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে শূলবিদ্ধ হইতে হইত। এবং ইহা তাহারা বিলক্ষণ জানিত। জানিত বলিয়া চিত্তবৃত্তি নিচয়ের উপর চিরকাল শাসন রাখিয়া আসিয়াছে। সেই আদিম অসভ্যাবস্থায় যদি কখন কাহারও রূপ দেখিয়া, তাহার দাসী হইতে সাধ গিয়াছে—মনের সাধ মনেই থাকিয়া গিয়াছে—সে সাধ বাহিরে প্রকাশ পাইলে তন্মুহূর্ত্তেই তাহাকে ভবের হাট হইতে দোকান পাট উঠাইতে হইত। সে যে দৃষ্টিপথে চিত্তহারা হইয়াছে, এ কথা যদি কখন স্বামী ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, তবে স্বামীহৃদয় হইতে সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য শত যত্ন করিতে হইয়াছে। এবং সেই যত্নে কৃতকার্য্য হওয়ার উপর তাহার জীবন নির্ভর করিয়াছে। কাজেই ইহার যে সকল তন্ত্র মন্ত্র আছে, তাহাতে ক্রমে এক প্রকার সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মনের আগুন মনে ঢাকিয়া রাখিয়া বাহিরে এমন ভালবাসা জানাইবে যে, স্বয়ং মেকিয়াভেলিকেও,

সাক্ষাৎ রোমেকুকলকেও তাহাতে প্রতারিত হইতে হইবে। চক্ষের জল তাহারা ইচ্ছা করিলেই ফেলিতে পারে। হলাহল মিথ্যা কথা তাহারা এমন ভঙ্গী করিয়া, এমন করিয়া সাজাইয়া বলিতে পারে, যে মূর্ত্তিমান সত্যও তাহার কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। এই রূপে তাহারা মনের কথা লুকাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে অভ্যাসের ফল এ কাল পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতিতে বিদ্যমান—তাহার চিত্তের গতি তুমি কখন বুঝিতে পারিবে না—অবলীলাক্রমে তোমার চক্ষে ধূলা দিবে। তাহার কথা তুমি কখন বাহির করিয়া লইতে পারিবে না———বুক ফাটিয়া যাইবে, কিন্তু মুখ ফুটিবে না।

আবার সেই সকল উচ্ছৃঙ্খল, নিষ্ঠুর, দুর্বিনীত, স্বার্থপর অসভ্য হস্তে তাহাদিগকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। ক্ষুধার ক্লেশ, অপমানের যাতনা, নির্যাতনের মর্ম্মপীড়া, তাহাদিগকে অনেক সহিতে হইয়াছে। অনেক দিন আপনি অনাহারে বা অল্পাহারে থাকিয়া স্বামী পুত্রের সেবা করিতে হইয়াছে। অনেক সময়ে, যখন স্বামী যুদ্ধে বা বন্য জন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আহত হইয়াছে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বামীর রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ধাত্রী এবং চিকিৎসকের কার্য্য প্রাণপণে করিতে হইয়াছে। নিজের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য, সংসারিক সুবিধা অসুবিধা, সকল ভুলিয়া সেই রোগীর সঙ্গে রোগী হইতে হইয়াছে। আবার সেই সকল উদ্ধত, নির্দ্দয়, ক্রোধপরবস আদিম অসভ্যদিগের হস্তে অনেক সময়ে অপমানিত, তিরস্কৃত, প্রহারিত হইয়াছে, অথচ কোন কথা কহিতে সাহস হয় নাই, প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে পারে নাই—বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় নীরবে, নিভৃতে আপন মর্ম্মপীড়ায় আপনি পীড়িত হইয়াছে। রাগ, দ্বেষ, অভিমান, সকলে জলাঞ্জলি দিয়া সেই অত্যাচারী স্বামীর সঙ্গে আবার সাহচর্য্য করিতে হইয়াছে। গৃহপালিতা হরিণীর ন্যায়, যে হস্ত যথার্থে

শূল উত্তোলন করিয়াছে, সেই হস্তই আবার আদরে লেহন করিয়াছে। বর্ষাসম্ভূত কর্দ্দম রাশির ন্যায়, যে পদে মর্দ্দিত হইয়াছে, সেই পদই আবার জড়াইয়া ধরিয়াছে! যে মুখের বাক্যবিষে মর্ম্মে মর্ম্মে বৃশ্চিক দংশন হইয়াছে, সেই মুখে হাসি দেখিবার জন্যই আবার সহস্র উদ্যোগ করিতে হইয়াছে—হৃদয়ের গরল হৃদয়ে লুকাইয়া মুখে মধুবর্ষণ করিতে হইয়াছে। এ সকলই তাহাদিগকে নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে, কাহারও কাছে আপনার মনের কথা, মর্ম্মের ব্যথা প্রকাশ করিতে সাহস নাই, কেননা যদি তাহা কোন প্রকারে স্বামীর কর্ণে উঠে, তাহা হইলে বিভ্রাট পড়িয়া যাইবে—অধিকতর অপমানিত, তিরস্কৃত, প্রহারিত হইতে হইবে—হয় ত গৃহবহিস্কৃত, সুতরাং আশ্রয়শূন্য হইতে হইবে—হয়ত প্রস্তর-কুঠারাঘাতে মরিতে হইবে—হয় ত অনাহারে মরিতে হইবে। সেই জন্য তাহারা সবই মনে মনে সহ্য করিয়াছে। যদি চক্ষে জল আসিয়াছে, তাহা চক্ষেই শুকাইয়াছে। যদি অন্তর বিদীর্ণ করিয়া বিষাদ নিশ্বাস উঠিয়াছে, তাহা অন্তরের অন্তরেই বিলীন হইয়া গিয়াছে—স্ফীত হৃদয়ের ব্যথা, সেই স্ফীত হৃদয় ব্যতীত আর কেহ জানে নাই—কাতর প্রাণের কথা, সেই কাতর প্রাণ ব্যতীত আর কেহ শুনে নাই। যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন হয় ত নিকটবর্ত্তিনী পর্ব্বতবাহিনী তরঙ্গিনীর তরঙ্গে আপনার নয়নের তরঙ্গ মিশাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে—হয় ত কুটীর পার্শ্বস্থ বনভূমি সঞ্চারী আলস্য মন্থর বায়ুতে আপনার নৈরাশ্যকাতর অন্তরের শ্বাস লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে—জীবলোকের সহানুভূতি আহ্বান করিতে বড় সাহস হয় নাই। এই রূপ সহ্য করিয়া করিয়া স্ত্রী চরিত্রে সহিষ্ণুতা এবং চিত্ত সংযম গুণ বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। উত্তরাধিকার নিয়মে তাহা স্ত্রী চরিত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এখনও আমরা দেখিতে পাই, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সহিষ্ণুতা অধিক। প্রাচীন কালে যে

তাহারা রোগে, শোকে, অনাদরে, নির্য্যাতনে, মর্ম্ম পীড়ায়, ক্লিষ্ট, আর্ত্ত, ক্ষুণ্ণ, পীড়িত, ব্যথিত হইয়াও গৃহধর্ম্মে উদাসীন বা স্বামীসেবায় বিরত হইতে পায় নাই—গৃহধর্ম্মে উদাসীন হইলে বিলিব্যবস্থার অভাবে পরিবার উৎসন্ন গিয়াছে—স্বামীসেবায় বিরত হইলে জীবনোপায়ে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে—সে কঠোর শিক্ষার ফল এ পর্য্যন্ত স্ত্রীচরিত্রে জাজ্বল্যমান। যে পীড়া হইলে পুরুষ শয্যাত্যাগ করিতে পারে না, স্ত্রীলোকে তদপেক্ষা উগ্রতর পীড়া লইয়াও গৃহকার্য্যে সাধ্যানুসারে সাহায্য করে। যে ব্যাধিতে পুরুষ ইহলোক পরলোক ভুলিয়া যায়, তদপেক্ষা শতগুণ তীব্রতর ব্যাধির যাতনার মধ্যেও স্ত্রীলোকে সামান্য গৃহকার্য্যটিও ভুলে না—ছোট ছেলেটি দুধ পায় নাই, বড় মেয়েটির স্নান হয় নাই, স্বামীর তাম্বুল প্রস্তুত হয় নাই, চৌকাটে জল পড়ে নাই, ঠাকুর ঘরে ঝাঁইট দিলে কে, যাতনার মোহেও এই সকল তাহার জপমালা হইয়া থাকে। কুলীনকুমারী চিরকৌমার্য্যভার বহন করিতে অপারগ নহে। বালবিধবা চিরবৈধব্যযন্ত্রণারূপ নিয়তপ্রজ্জ্বলিত রাবণের চিতা বুকে করিয়া বহিতে অসমর্থা নহে। তুমি তাহার উপর সহস্র অত্যাচার কর, তবু সে তোমা বৈ জানে না। তুমি তাহাকে পদাঘাত কর, তবু সে তোমার পদারবিন্দ ব্যতীত আর কিছু ভাবে না। তুমি প্রমোদগৃহ হইতে নিশীথে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর, সে তোমার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকে—তোমার আহার্য্য কাছে করিয়া তোমার জন্য জাগিয়া বসিয়া থাকে। তুমি যদি না আস, তবু সে বসিয়া থাকে—পল যায়, দণ্ড যায়, প্রহর যায়, সমান বসিয়া আছে। চন্দ্র উদয় হইয়া তাহাকে যেখানে দেখে, অস্ত যাইবার সময়েও তাহাকে সেই খানেই দেখিয়া যায়। শেষে চন্দ্র অস্ত যায়, নক্ষত্র সকল একে একে নিবিয়া যায়, রাত পোহাইয়া যায়, দিগাঙ্গনারা উপরের নীলসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে সুবর্ণ বালুকা একবার স্তূপীকৃত করিয়া, আবার ছড়াইয়া ফেলিয়া দেবখেলা আরম্ভ

করে, তখন হয় ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, এক বার অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া আবার গৃহকার্য্যে লিপ্ত হইতে যায়। পুরুষকে এতটা সহ্য করিতে হইলে সে হয় ত আত্মঘাতী হয়—বিষ খায়, জলে ঝাঁপ দেয়, গলায় ফাঁস লাগাইয়া মরে। সহিয়া সহিয়া এতটা সহ্য হইয়া গিয়াছিল, যে অবশেষে হিন্দুর মেয়েতে জ্বলন্ত চিতায় জীবন্তে পুড়িয়া মরাও সহ্য হইত।

(ক্রমশঃ।)

রেবেকা ও আয়েষা।

দুই জনই রমণীরত্ন, দুই জনই সুকবির তুলিকায় চিত্রিত। রেবেকা স্কটের মানস কন্যা, আয়েষা বঙ্কিমচন্দ্রের। এই দুই ললনা বঙ্গদেশের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে তর্কের স্থল। তাঁহারা বলেন যে, আয়েষা রেবেকার অনুকৃতি মাত্র। এ কথা কতদূর ঠিক, দেখা যাইবে।

রেবেকার প্রথম আকর্ষণ শারীর সৌন্দর্য্য, এবং তাহাই প্রাকৃতিক। যখন পিতৃগৃহে, রজতদীপে গন্ধতৈলোজ্জ্বলালোকে, বিচিত্র কুট্টিমে তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন দেখিলাম কি? শুধু রূপ? তাহা নহে। দেখিলাম, তিনি যথার্থ পিতৃবৎসলার ন্যায় কৃপণ পিতার অনর্থক মানসিক ক্লেশ অনুভব করিয়া বিষাদিনী। সে বিষাদ সহানুভূতিতে মধুময় হইয়াছে। সম্ভ্রমে দেখিলাম, ব্যয়কুণ্ঠ পিতার মহিমাময়ী সেই কন্যা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় মুক্তহস্তে এক জন সামান্য অপরিচিত দাসকে অর্থরাশি অর্পণ করিলেন। তার পর সাক্ষাৎ টুর্ণামেণ্ট প্রান্তরে। প্রতিপদে পিতৃ-অবমাননায় ব্যথিতা, তবু গর্ব্বিতা! সে গর্ব্ব ধনের, সে গর্ব্ব নির্দ্দোষিতার, সে গর্ব্ব অভিমানের এই বিচিত্র চরিত্রা রমণীতে স্বদেশহিতৈষিতা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—স্বজাতির অবনতিতে, স্বদেশ হইতে তাহাদের নির্ব্বাসনে রেবেকার অন্তঃকরণ সদাই

দুঃখে কাটিত। টুর্ণামেণ্ট প্রান্তরের ঐশ্বর্য্য, রণসজ্জা, একত্র সমবেত বীরবৃন্দের উল্লাস প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার হৃদয় উৎসাহে স্ফীত হইতেছিল। রেবেকা তখন পালেষ্টাইনের লুপ্ত গৌরব স্মরণ করিতেছিল। এই মুর্ত্তি কি মনোহর! তখন আমরাও একবার অগ্নিশিখারূপিণী চিতোর রমণীগণকে মনে করি।

তার পর অসহায়, মৃতপ্রায় যুবক আইভান্‌হোর প্রতি রেবেকার দয়া দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। কেবল তাহাই নহে। বিস্মিত লোচনে দেখিতে পাই, মানবীরূপে এই দেবী সদ্যঃ-বলময়, অব্যর্থ কি ঔষধের গুণে অন্তিম শয্যাশায়ী আইভান্‌হোর প্রায়ারোগ্যবিধান করিয়া তুলিয়াছেন। পিতা প্রশংসাছলে বলিতেছেন, যে তাঁহার নয়ন কৌমুদী কন্যা বস্তুগুণে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন এবং শত শত রোগার্ত্ত তাঁহার চিকিৎসায়, তাঁহারই শুশ্রূষায় জীবন লাভ করিয়াছে। পিতার এই সরল আনন্দ কি স্বাভাবিক! এবং কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ না করিবেন?

তার পর বিজন অরণ্যে যখন দস্যুদল আসিয়া বেড়িল, তখন রেবেকার প্রাণ কাঁদিয়াছিল কাহার জন্য? পিতার জন্য কাঁদিয়াছিল সত্য; আপনার জন্য একবারও কাঁদে নাই—যত আশঙ্কা, যত উদ্বেগ, সেই অসহায়, এখনও রুগ্ন, যুবকের জন্য। ইহাই রমণী হৃদয়ের মহত্ত্ব এবং ইহাই রেবেকা চরিত্রের প্রধান বিশেষণ।

কারাগারে যখন রেবেকা লম্পট বয়-গিলবার্টের করায়ত্ত, তখনই তাঁহার চরিত্রের বীর্য্য সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। সে বীর্য্য, সে শৌর্য্য যাহার, সে বুঝি নেপোলিয়ন অপেক্ষাও প্রশংসনীয়! পাঠক, এক বার মনে মনে সেই চিত্র অঙ্কিত কর। স্থির নেত্রে, স্থির সংকল্পে বঙ্কিম গ্রীবা হেলাইয়া কুপিতা ভুজঙ্গনীর ন্যায় রেবেকা কেমন দাঁড়াইয়াছে, তাহা একবার মনশ্চক্ষে দেখ। সে ভীমা মুর্ত্তি দেখিয়া গিল-

বার্টও স্তম্ভিত হইয়াছে—তাহার নারকী দৃঢ় সংকল্প শ্লথ হইয়াছে। রেবেকা বলিতেছে —"দেখ দুর্ম্মতি, যদি আর এক পদ অগ্রসর হইবি, তবে এইখান হইতে পড়িয়া আত্মঘাতিনী হইব। ধর্ম্মের সহিত তুলনায় প্রাণ কি ছার!" গিলবার্ট ব্যথিত হইল। তাহার আভ্যন্তরীণ, অনভ্যাসে ক্ষীণ সৎ প্রবৃত্তি নিশ্চয় জাগিয়া উঠিল। হৃদয়ে তাহার ফলে বিপরীত তরঙ্গ উঠিল। গিলবার্ট বলিল "না রেবেকা, মরিতে হইবে না—আমি আর তোমার প্রতি অত্যাচারের চেষ্টা পাইব না। তুমি সংকল্প ত্যাগ কর।" গিলবার্ট রমণীরত্নের মহিমা বুঝিল।

টেম্পলষ্টোন দুর্গে অবরোধ সময়ে ছদ্মবেশী পুরোহিতের নিকট রেবেকাকে একবার দেখিলাম। সেই কারাগারের ক্লেশ, সেই পৈশাচিক যাতনা, তবু রমণী হৃদয় হেলে না। পরের জন্য আপনার প্রাণ রেবেকা সুন্দরী বিসর্জ্জন দিয়াছিল। তবে আর ভয় কিসের? ভয় কাহার জন্য? মন প্রফুল্ল, সকলই প্রফুল্ল। তার উপর বুঝি নবীন প্রেমের আস্বাদন পাইয়াছে। রেবেকা সেই পুরোহিতকে বলিতেছে "একবার পিতঃ, রুগ্ন শয্যাশায়ীর কাছে আসুন।" কঠোর সেড্রিক শুনিল, এ বালিকা অস্পৃশ্যা য়িহুদীকন্যা।—তবু সেই সরলা সৌন্দর্য্য মহিষীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারিল না। যে মোহ রূপ জনিত, তাহা কিছু বুড়া সেড্রিকের পক্ষে সম্ভব নহে। শুধু রমণীর প্রভাব অপ্রতিহত। বোধ হয় এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য জ্ঞানময় কবি এ দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন।

আর এক রমণীয় দৃশ্য! কারাগারে শায়িত যুবক আইভান্‌হো এখনও সম্পূর্ণ সবল হয়েন নাই। রেবেকা তাঁহার অনুরোধে গবাক্ষে বসিয়া যুদ্ধ দেখিতেছেন। বীরের উল্লাস ধ্বনি, সমরের আসুরিক দৃশ্য, এ সকল ভয়াবহ জিনিষ রমণীর দ্রষ্টব্য বা শ্রোতব্য নহে কে বলিল? রেবেকা সকলই দেখিতেছিল—সঙ্গে সঙ্গে তার বীরহৃদয় নাচিতেছিল। এক দিন মূর্ত্তিমান বিপদের কবলে পড়িয়া, দৃপ্ত বাক্যে স্পর্দ্ধা করিয়া

রেবেকা বলিয়াছিল, "বীর কি কেবল পুরুষজাতি! তোমরা যুদ্ধ কর, দেখিয়া দেখিয়া আমার বোধ হয় যে আমার হৃদয় তোমাদের চেয়ে শত গুণ উৎসাহে স্ফীত হয়।" এ কথা আইভান্‌হো জানিতেন না। তাই তিনি সমরবার্ত্তা সকল বিশদরূপে রেবেকার নিকট শুনিয়াও তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, যে এমন সুন্দররূপে সমরবার্ত্তা বলিতেছে, যে বুঝি বীরেরও বীর। আইভান্‌হো বলিতেছিলেন, "দেখিও সখি, গবাক্ষের অত কাছে থাকিও না। কে এখনই অলক্ষ্যে ঐ সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া তীরক্ষেপ করিবে; আর তোমায় দেখিতে পাইব না। রেবেকা আমায় অতল দুঃখে ভাসাইও না।" রেবেকা তখন নবীন প্রেমের প্রফুল্লতা অনুভব করিতেছে—ভাবিতেছে, আমরা উভয়ে উভয়ের জন্য। ভাল, মিলন কি অসম্ভব? আমি যাকে ভাবিতেছি, সে হয় ত আমায় ভাবে না। ঐ যে আমায় 'সখি' সম্বোধন করিল! তা হোক, তাতে কি আসে যায়? কুকুরটা বিড়ালটাও তাহার ঐ সম্বোধনের পাত্র।" তখন রেবেকা হতাশের বিষম ব্যথা অনুভব করিল। বুঝিল, মিলন অসম্ভব। বুঝিল, দুই জনে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন গোত্র—হৃদয়ের মিলন যতই কেন হউক না, বিবাহ অসম্ভব। তখন রেবেকা সেই অদম্য হৃদয় বিপরীত খাদে প্রবাহিত করিতে প্রয়াস পাইল। সুন্দর নিকটে—অবোধ রেবেকা সৌন্দর্য্য তৃষা উন্মূলন করিতে চাহিল। চক্ষের আগে বিকারের হেতু বিরাজমান, তবু অদূরদর্শিনী বালিকা অবিকৃতা থাকিবে সংকল্প করিল—ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া রহিল। বালিকা বালির বাঁধ বাঁধিল।

গিলবার্ট কর্ত্তৃক তাঁহার হরণের পরে মহনীয় চরিতা রেবেকা আত্মযোগ্য বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আমরা এতক্ষণ যাহা দেখাইয়াছি, তাহাতেই বোধ হয় রেবেকার চরিত্র পূর্ণতা লাভ করি-

য়াছিল। কিন্তু কবি রেবেকার চরিত্র প্রায় অমানুষী করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি যে উপাদানে রেবেকা মণির সংঘটন করিয়াছেন, তাহা ত সাধারণ অগ্নিতে পুড়িবেই না ; কবি দেখাইয়াছেন যে, বিদ্যুতালোকেও তাহা দাহ্য নহে। ফলতঃ রেবেকা চরিত্র কবির সৃষ্ট ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ রমনীচিত্র। মিরন্দা বা দেসিদিমোনা, শকুন্তলা বা দ্রৌপদী চিত্র কমনীয় অথচ তেজস্বী বটে, কিন্তু তাহাতে সময়ের ছায়া আছে। মানুষ কালের ছায়া মাত্র। সময়ের প্রভাব প্রতিভাকে কিয়ৎপরিমাণে স্পর্শ করিবেই করিবে। রেবেকা যখন বিচারকর্ত্তা টেম্পলারের সম্মুখে আনীত হইল, তখন তাঁহার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইবার আদেশ প্রদত্ত হইল। ক্রোধে, অভিমানে রেবেকা অন্তরে অন্তরে মরিয়া গেল , কিন্তু তথাপি সে আপন গৌরবে আপনি নম্র। বলিল, " একবার নিজ তনয়ার পবিত্রতা স্মরণ কর, একবার মানব জাতির জননী রূপিনী রমনীর মহত্ত্ব ভাবিয়া দেখ।" কিন্তু যখন দেখিল যে, এ স্তুতিবাদে কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন রেবেকা আপন অবগুণ্ঠন আপনি উন্মোচন করিল। কুসংস্কারাপন্ন দর্শকেরা তাহার অতুল রূপরাশি দেখিয়া স্থির করিল, এত রূপ দৈবানুগৃহীতেরই সম্ভব। বিপদ দৃঢ়তর হইল। বিচার হইয়া গেল। রেবেকার মধুর আত্মসমর্থন কোন কাজের হইল না। চিত্তময়ী, আশাময়ী রেবেকা কি তবে যথার্থই বন্ধুহীন হইয়া প্রবাসে ঘোর নারকীর মত দগ্ধ হইবে ! এমন সময় গিলবার্টের নিক্ষিপ্ত লিপিখণ্ড তাঁহার হস্তগত হইল। আবার রেবাকা আশ্বস্তা হইলেন। তখন বীরাঙ্গনার মত, সৌন্দর্য্যের রাজ্ঞীর মত, স্বীয় করস্থ লিপি দূরে নিক্ষেপ করিয়া রেবেকা বলিলেন— " এ মানুষের বিচার অবিচার , আমি ইহা মানি না। আমার জন্য যুদ্ধ করিয়া আমার বন্ধু কেহ আমার নির্দোষিতা সমর্থন করিবে।" তাই বলিতেছিলাম, এই তেজোময়ী মূর্ত্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর ফল। মানুষ কালের ছায়ামাত্র।

প্রাসাদে রেবেকা আরাধনা করিতেছিলেন। জীবনের আশা প্রায় গত হইয়াছিল, কেনন্না যে অবকাশ সময় ছিল, তাহার মধ্যে তাঁহার বন্ধু কেহ আসিয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে কি না, তাহা অনিশ্চিত। বন্ধু কে? সেই চিরহিতার্থী যুবক আইভান্‌হো। তিনি কি আরোগ্য হইয়াছেন? তিনি কি প্রীতির অনুরোধে অভাগিনীকে উদ্ধার করিবেন? দুঃখিনী রেবেকা মরিতে চলিল, তবু নিজকৃত উপকারের প্রতিদান চাহে না। আরাধনা শেষ হইলে রেবেকা দ্বারের শব্দে বুঝিল, কেহ প্রবেশ করিতে চাহে। দ্বার খুলিল। কিন্তু রেবেকা দেখিয়া বিস্মিত ভীত হইল——প্রবেশকারী স্বয়ং গিলবার্ট। যার কুবুদ্ধিতে এত ঘটিয়াছে তাহাকে দেখিয়া রেবেকা শিহরিয়া উঠিল। গিলবার্ট বলিল —"সত্য রেবেকা, আমি তোমার শত্রু; কিন্তু এখন আর শত্রু নই। আর আমি তোমার প্রতি কুভাব পোষণ করি না। তুমি ভয় পাইও না। আমার ইচ্ছা থাকিলেও তোমার প্রতি আজি অত্যাচার করা অসম্ভব—চতুর্দ্দিকে প্রহরী।" তার পর কথা প্রসঙ্গে গিলবার্ট প্রস্তাব করিল যে, রেবেকা যদি তাহার সহিত দূরান্তরে যায়, তবে তার প্রাণ বাঁচিবে, নহিলে বালিকার কপালে অকালে ভীষণ মৃত্যু আছে। তখন গিলবার্ট রেবেকার কল্পনা পথে অনলকুণ্ডের ভীম দৃশ্য অঙ্কিত করিল। যুক্তিবলে দেখাইল যে, যোদ্ধার সহায়তায় তাহার উদ্ধার অসম্ভব। দেখাইল, রেবেকা তাহার কথা শুনিয়া কার্য্য করিলে পরিণামে ভুবনেশ্বরী হইতে পারিবে। যে ডুবিয়া মরিতেছে, সে তৃণগুচ্ছ পাইলে তাহাই প্রাণের দায়ে অবলম্বন করিতে যায়। রেবেকার মত অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইতে যে যাইতেছে, তাহার নিকট এ আশা বড় সামান্য নয়। কিন্তু রেবেকার হৃদয় তাহাতেও গলিল না। বজ্রাগ্নিতেও সে মহা উপকরণ গলিবার নহে। আশার এত মোহময় আকর্ষণ অন্য কোন কাব্যে চিত্রিত হইয়াছে কি না, জানি না; এবং কোন

নায়ক বা নায়িকা সেই আকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া এমন জীবন্ত বীরত্ব দেখাইয়াছেন কি না, তাহাও জানি না।

আমরা রেবেকা চরিত্রের প্রধানাংশ সমালোচনা করিয়াছি। সামান্যাংশ বাকী আছে। উপন্যাসের উপসংহারে কবি একবার রেবেকাকে অভিনয় ক্ষেত্রে আনিয়াছেন। রেবেকা তখন আত্মবিস্মৃত হইয়া বিবাহিতা সপত্নীকে মহামূল্য অলঙ্কার পরাইতেছিল। সে অলঙ্কার, সে বেশভুষা, সব নিজের। আবার দীনভাবে রেবেকা সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য সাধন করিতেছে। এ দৃশ্য ভয়ানক অথচ মধুরিমাময়। রেবেকার এই মূর্ত্তি ইহ জন্মে আমরা ভুলিব না।

আয়েষাকে প্রথমতঃ জগৎসিংহের রুগ্নশয্যাপার্শ্বে মূর্ত্তিমতী আশারূপে দেখিয়াছিলাম। যখন আয়েষাকে অপরিচিত অথচ পিতৃশত্রু অন্তিমশয্যাশায়ী জগৎসিংহের পীড়ার জন্য, জীবনের জন্য, ব্যাকুল হইতে দেখিলাম, তখন বাস্তবিক তাঁহার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি হইল। ওস্মান বলিলেন, "আয়েষা, তুমি রমনীরত্ন।" আমরা বলিলাম—শত বার। আবার ওস্মান আয়েষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি আশা-লতা ধরিয়া আছি, আর কতকাল তাহার তলে জলসিঞ্চন করিব?" গম্ভীর ভাবে আয়েষা বলিলেন—"ওস্মান! ভাই বহিন বলিয়া তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করিলে, তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না।" এ বড় সুন্দর কথা। আয়েষার সুন্দর চরিত্র অতি অল্প কথায় বঙ্কিম বাবু চিত্রিত করিয়াছেন।

কারাগারগৃহে মূর্ত্তিমতী সহৃদয়তারূপে আয়েষা তিলোত্তমাকে কোলে করিয়াছেন। অন্যে হইলে সাত পাঁচ ভাবিত; আয়েষা একেবারে আদরে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন! কি মধুর; জগৎসিংহ দূরে দাঁড়াইয়া! আয়েষা বলিতেছেন, "চল ভগিনি আমার আলয়ে। আমি শত্রুকন্যা বলিয়া অবিশ্বাস করিও না। যথাসময়ে যথাস্থানে তোমায়

পাঠাইয়া দিব।” হৃদয়ের কি ঔদার্য্য! ফলতঃ আমাদের বঙ্কিম বাবুর বিশেষ ক্ষমতা এই যে, তিনি দুই কথায় হৃদয়ভেদী, গম্ভীর, অথচ মধুর চিত্র প্রণয়নকুশলী। স্কট্ অতি নিপুণ চিত্রকর, কিন্তু তিনি রেবেকা চরিত্র আঁকিতে গ্রন্থের দশ আনা পূরাইয়াছেন। আয়েষা চরিত্র পূর্ণ হইয়াছে এক “মুক্তকণ্ঠ” পরিচ্ছেদে। এই “মুক্তকণ্ঠ” অধ্যায়ন কালে আমরা আত্মবিস্মৃত হই। রঙ্গস্থলে ইহার অভিনয় দেখিয়া আমরা অনেক বার উত্তেজিত, বিমোহিত হইয়াছি। আয়েষা কি, তাহা এই পরিচ্ছেদ পড়িয়া বুঝিতে পারি। স্নেহ, দয়া, নিস্বার্থপরতা, গাম্ভীর্য্য, প্রকৃত বীরত্ব, পবিত্রতা, এবং তদানুসঙ্গিক অভিমান প্রভৃতি ধর্ম্মরাজির সমাবেশে এই পরিচ্ছেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল দেববাঞ্ছিত উপকরণে কবি আয়েষাকে গড়িয়াছেন।

আয়েষাকে এক মুহূর্ত্ত অন্য মুর্ত্তিতে দেখিয়াছিলাম—তাঁহার পিতার অন্তিম কালে পিতৃশিরোদেশে। সে মুর্ত্তি “নির্বাতনিষ্কম্পামিব প্রদীপম্”—সুন্দর বটে। সেই দুঃখের, সেই নৈরাশ্যের সময়ত আয়েষা পরোপকারিণী। পিতা মৃত্যুকবলে, ভ্রাতা ভগিনী সকলে কাঁদিতেছে, মাতা বিমাতা সকলে বিলাপ করিতেছে—তখনও আয়েষা জগৎসিংহের মানসিক অসুখের কথা ভুলে নাই—কেমন ধৈর্য্য? কেমন ভালবাসা? পিতার কর্ণে মৃদু মৃদু বলিয়াছিলেন যে, তিনি জগৎসিংহের মন হইতে তিলোত্তমার প্রতি বৃথা সন্দেহভাব দূর করিয়া দেন। এরূপ মোহময় চিত্র সাহিত্য সংসারে বড় সুলভ নহে। রেবেকার মত আয়েষাও গ্রন্থশেষে সপত্নীর বেশবিন্যাস করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা একটু উন্নততর। আয়েষার পত্র বড় মর্ম্মভেদী, বড় ঔদার্য্যব্যঞ্জক।

রেবেকাকে আদর্শ করিয়া আয়েষাচরিত্র চিত্রিত হইয়া থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই দুই রমণীর মধ্যে কার্য্যগত সাদৃশ্য অনেকটা আছে। উভয়েই আপন প্রণয় পাত্রের রোগে শুশ্রূষাকারিণী, কারা-

গারে সঙ্গিনী। উভয়েই গ্রন্থশেষে সপত্নীকে অলঙ্কার পরাইয়া আসিয়াছেন; উভয়েই শেষ বিদায়ের দিনে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঞ্ছিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। উভয়েরই প্রণয়সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্য রহিয়াছে—রেবেকা য়িহুদী কন্যা, আইভান্‌হো খ্রীষ্টিয়ান্‌, সুতরাং মিলন হইতে পারে না—আয়েষা মুসলমান কন্যা, জগৎসিংহ হিন্দু, সুতরাং মিলন হইতে পারে না। বিশেষতঃ রেবেকা আইভান্‌হোকে রাউয়েনাতে আসক্ত বলিয়া জানেন, আয়েষাও জগৎসিংহকে তিলোত্তমাতে আসক্ত বলিয়া জানেন—তুমি না 'তিলোত্তমা, তাহার প্রমাণ—সুতরাং উভয়েরই ভালবাসা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্যের সঞ্চার আছে। আবার অপর দিকে, রেবেকার পিতা আইভান্‌হোর নিকট উপকারপ্রাপ্ত; জগৎসিংহ আয়েষার পিতৃশত্রু। হইতে পারে বঙ্কিম বাবু রেবেকার অনুকরণে অয়েষা চরিত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃততঃ তাহা ভিন্ন পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই কবি দুই বিভিন্ন মুলসুত্রের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া দুই রমণীচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। অবস্থার পার্থক্যে চরিত্রগত ঘোর পার্থক্য ঘটিয়াছে। রেবেকার পিতা অসীম ধনশালী হইলেও সমাজে ঘৃনিত জীব। ধনের প্রভাবে সমাজে যে প্রভাব, তাহা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার ছিল না, এমন নয়; কিন্তু তবু তিনি সমাজে হেয়। রেবেকা সুতরাং গৃহে সর্ব্বত্র আদরের সামগ্রী। আবার রেবেকা পিতৃকুলের ক্ষুন্নগৌরবও সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিত। তাই রেবেকাচরিত্র ঔদার্য্যময় অথচ সহিষ্ণু। বিষম বিদ্যুতালোককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলেও কেবল সেই কারণে রেবেকা মহারত্ন দগ্ধ হয় নাই। আয়েষা অনন্তপ্রতাপ নবাবের কন্যা। ঘরে বাহিরে তাঁহার প্রভুত্ব। আশৈশব তিনি প্রভুতাময়ী। তাই তাঁহার চরিত্র সংসারতঃ মহনীয়, কমনীয়, কিন্তু কত সহিষ্ণু তাহা বলিতে পারি না। দেখিয়াছি সাধারণ অগ্নিতে তাঁহার চরিত্রের মহা উপকরণ দাহ্য নহে।

তবে বজ্রাগ্নিতে দহে কি না, তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। দুই চরিত্রের পার্থক্য এই। কার্য্যক্ষেত্র উভয়ের স্বতন্ত্র, সুতরাং সে বিষয়ের তুলনায় সমালোচনার বড় সুবিধা হয় না। তবে সংক্ষেপে, চরিত্রগত উৎকর্ষ রেবেকারই অধিক।

জেমস্ ব্রাম্টন্।

ধৃতি বিভাগের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিউইয়ার্কে অবস্থান করিতে লাগিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই আমার বিলক্ষণ পসার হইয়া উঠিল। অনেক কার্য্য আমার হাতে আসিতে লাগিল, এবং সৌভাগ্য বশতঃ অধিকাংশ স্থলেই আমি কৃতকার্য্য হইতে লাগিলাম। তন্নিবন্ধন বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তিও লাভ করিলাম। ক্রমে এমন হইল যে, একটু গুরুতর এবং জটিল রকমের ঘটনা ঘটিলেই আমার পরামর্শ ব্যতীত কার্য্য করা হইত না।

এক দিবস আমি দ্রুতপদে বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছি, অকস্মাৎ কে যেন আমার স্কন্ধে হস্তস্পর্শ করিল। আমি অমনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম—তাই হোক্! আমার ভূতপূর্ব্ব সহপাঠী, হেনরি, মার্কহাম।

"তবে, হেনরি, আছ কেমন ?"

হেনরি আমার করমর্দ্দন করিয়া বলিল, "ভাই জেমস্, নিউইয়র্কে যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি জানিতাম, তুমি ষ্টান্‌স্‌ফিল্‌ড নগরে তোমার চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে ডুবিয়া আছ।"

আমি বলিলাম, "চিকিৎসাশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ধৃতি বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি।" এই বলিয়া সংক্ষেপে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সব বিবৃত করিলাম। "কিন্তু হেন্‌রি, তুমি এক্ষণে কি করিতেছ ?"

হেনরি বলিল, "আমার অদৃষ্ট আজ কাল খুব প্রসন্ন। ওয়াসিংটনের নিকটে

এক জন ধনবান ব্যক্তি বাস করেন, নাম পারসিভাল। তাঁহার ওখানে নিযুক্ত হইয়াছি। আহার, বাসা, এবং বৎসর দুই হাজার টাকা করিয়া আমায় দিয়া থাকেন। তহবিলের ভার আমাকে লইতে হইবে। পরিশ্রম তেমন নাই—কাজটা মন্দ নহে।”

মার্কহাম এ রূপ উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিলাম। পর দিবসই ওয়াসিংটন যাত্রা করিবেন শুনিয়া উভয়ে স্থির করিলাম যে, পাঁচটার সময় আবার দেখা হইবে এবং একত্রে আহারাদি করা যাইবে।

নিরূপিত সময়ে আমরা ডেনমনিকো হোটেলে গিয়া জুটিলাম! আহারের বন্দোবস্ত খুব ভাল রকম ছিল। আমরা সে কালের কথা তুলিলাম এবং বিদ্যালয়ের কথা লইয়া অনেক গল্প করা গেল। বেশ আনন্দে সময় অতিবাহিত হইতেছিল। যখন আমরা উঠিলাম, তখন রাত্রি অধিক হইয়াছে। উভয়েই দুঃখিত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় লইলাম।

রাত্রে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া একবার মনে মনে দিবসের ঘটনা নিচয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। হেনরি মার্কহামকে আমি চিরকালই ভালবাসি এবং পাঠাবস্থার কলহ বিবাদে কত বার তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি। বাল্যকালে তাহার সম্বন্ধে যতটা ভরসা করা গিয়াছিল, বয়োবৃদ্ধি হইলে দেখা গেল হেনরি তেমন হইল না। হেনরি অস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে, জানি না কি বিরাগে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া দুই বৎসর কাল উদ্দেশ্য শূন্য, লক্ষ্য শূন্য ভাবে বেড়াইতে ছিল। সেই জন্য, হেনারি এত দিন পরে এমন সুন্দর কর্ম্ম পাইয়াছে বলিয়া আমার এত আহ্লাদ। ভরসা হইল, এখন হেনরি অর্থ সঞ্চয় করিয়া পৃথিবীতে গণ্যমান্য হইতে পারিবে।

ইহার কিছু দিন পরে হেনরির এক পত্র পাইলাম। তাহাতে লেখা ছিল যে, হেনরি তথায় নিরাপদে পৌঁছিয়াছে এবং কার্য্যও তাহার মনোমত হইয়াছে। তাহার মুনিবের একটি মাত্র কন্যা ছিল, নাম মিস্ আমী পার্সিভাল, তাহার কথাও পত্র মধ্যে একাধিক বার উল্লেখ করা হইয়াছিল। আমি তাহার পত্রের উত্তর দিয়াছিলাম, কিন্তু আর পত্রাদি পাই নাই।

বৎসরেক পরে, অগ্রহায়ণ মাসে এক দিবস বড় অপ্রফুল্ল চিত্তে শয্যা হইতে উঠিলাম। একটা অতি গুরুতর বিষয়ের অনুসন্ধান ভার আমার হস্তে ছিল, তাহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই, তজ্জন্য চিত্তটা বড় উদ্বিগ্ন ছিল। তাহার উপর আবার দিনটা বড় দুর্দ্দিন করিয়াছিল—একে শীত, তাহাতে বাদল। ঘরের জানেলায় কঠোর শব্দে বৃষ্টির আঘাত হইতেছিল; পথ ঘাট জলে ও কর্দ্দমে পরিপূর্ণ—বহির্দৃশ্য যার পর নাই অবসন্ন ও অপ্রফুল্ল। তবে ঘরের ভিতর অগ্নি-কুণ্ডে অতি প্রসন্নভাবে অগ্নি জ্বলিতেছিল, টেবিলের উপর তুষার-শ্বেত চাদর বিছান ছিল এবং প্রস্তুয়মান আহার্য্যের সুঘ্রাণ নাসিকার সঙ্গে রসকেলী করিতেছিল। অল্প ক্ষণের মধ্যেই মিসেস্ হবস্ প্রাতরাশ আনিয়া উপস্থিত করিল, কিন্তু আমার মুখ পানে চাহিয়া, মুখের ভ্রূকুটি কুটিল অপ্রসন্ন ভাব দেখিয়া একটি কথাও উচ্চারণ করিল না—সে আমার মেজাজ বুঝিত। আহার্য্য টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়া যাইবার সময় "প্রাতরাশ প্রস্তুত" এই মাত্র বলিয়া গেল।

উদাসীন ভাবে আহার করিতে বসিলাম। আহার্য্য দ্রব্যাদির দোষ ধরিব মনে করিয়াই বসিয়াছিলাম, কিন্তু সে পথ ছিল না। দ্রব্যাদি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। যে অনুসন্ধানের ভার আমার হস্তে ছিল, আহারকালে সেই বিষয়টা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলাম। অকস্মাৎ একটা সূত্র পাইলাম, জটিলতার অন্ধকার মধ্যে একটু ক্ষীণা-

লোক দেখা গেল, ক্রমে পথ দেখিতে পাইলাম। আমার মনের অপ্রসন্নতা অন্তর্হৃত হইল।

আমার আহার প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছিল; হেন কালে মিসেস্ হবস্ এক খানি সংবাদপত্র হস্তে করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। বলিল, "হেরাল্ড পত্রিকা, আসিয়াছে।

আমি প্রসন্নভাবে তাহার হস্ত হইতে পত্রিকা লইলাম। আমার ভাবান্তর দেখিয়া মিসেস্ হবস্ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। আমি বলিলাম, "আজ মাংস অতি উত্তম হইয়াছে।" "আপনাকে ভাল লাগিলেই ভাল," এই বলিয়া এবং মস্তক হেলাইয়া ভদ্রতা প্রকাশ করিয়া মিসেস্ হবস্ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। মিসেস্ হবসের সঙ্গে এইরূপ মিটমাট করিয়া এবং অগ্নিকুণ্ডের দিকে আসন টানিয়া লইয়া প্রসন্ন মনে পত্রিকা খানি পাঠ করিব বলিয়া খুলিলাম। খুলিয়া, প্রথমে যাহার উপর দৃষ্টি পড়িল, তাহাতেই যেন রুদ্ধশ্বাস হইলাম। তাহার মর্ম্ম এই—

"আশ্চর্য্য মৃত্যু।—বিগত কল্য প্রাতে দেখা গিয়াছিল, ওয়াসিংটন নিবাসী মেং পারসিভাল বিছানায় মরিয়া পড়িয়া আছেন। পূর্ব্ব দিবস রাত্রে যখন শয়ন করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শরীরে কোন অসুখ ছিল না। সকলেই সন্দেহ করিতেছে যে, তিনি কাহারও দ্বারা হত হইয়াছেন, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে, কি উপায়ে, কাহার দ্বারা এই অত্যাহিত অনুষ্ঠিত হইল. তাহার কিছুই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান হইবে, সন্দেহ নাই।"

তখনই আমার হেনরি মার্কহামকে মনে পড়িল। এত শীঘ্র তাহার চাকরি যাইবে বলিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু, কেমন মনুষ্যের স্বার্থপরতা, আপন কার্য্যে মগ্ন হইয়া, পার্সিভালের মৃত্যু, হেন্‌রি মার্কহাম, সব ভুলিয়া গেলাম।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে, দিবসের কাজকর্ম্ম সারিয়া, বাসায় অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া ধূমপান করিতেছি, এমন সময় বহির্দ্বারে আগমন-সূচক ঘণ্টা শব্দ হইল। পর ক্ষণেই মিসেস্ হবস্ সংবাদ দিল যে, দুই জন ভদ্র লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমার ঘরে লইয়া আসিতে বলিলাম। অনতিবিলম্বে মিসেস্ হবস্ দুই জন ভদ্র লোক সঙ্গে করিয়া আসিল—তন্মধ্যে এক জন পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবা পুরুষ, অপরের বয়স ইঁহার অপেক্ষা আন্দাজ দশ বৎসর অধিক। তাঁহাদের পরিচয় শুনিয়া অবগত হইলাম যে, কনিষ্ঠের নাম ষ্টেফেন মাসেট এবং জ্যেষ্ঠের নাম এডোয়ার্ড মর্টন।

মাসেট সাহেব বলিলেন, "মহাশয়ের নাম বোধ হয় জেমস্ ব্র্যামটন।" আমি বলিলাম, "হাঁ আমারই নাম বটে।"

প্রথম বক্তা বলিতে লাগিলেন, "আমি শুনিয়াছি, রহস্যোদ্ভেদে আপনার অসাধারণ ক্ষমতা, সেই জন্য একটি দুরূহ এবং ভয়ানক দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। ওয়াসিংটন নগরে একটি অদ্ভুত মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, তাহার—"

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই আমি বলিলাম, "আপনি কি পারসিভাল সাহেবের মৃত্যুর কথা বলিতেছেন?"

মেং মাসেট বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি! আপনি ইহার মধ্যে শুনিয়াছেন?"

"অদ্যই প্রাতে সংবাদপত্রে দেখিয়াছি।"

"ওয়াসিংটন হইতে আমি কল্য আসিয়াছি। মৃত ব্যক্তির আমি ভাগিনেয়। আমার বিবেচনায় এ বিষয়ের অনুসন্ধান হওয়া উচিত। আপনি কল্য প্রাতেই ওয়াসিংটনের অভিমুখে যাত্রা করেন, এই আমার অভিপ্রায়। যদি অনুসন্ধানের পর আপনার এ রূপ প্রতীতি হয়, যে মৃত্যু স্বাভাবিক, তাহা হইলে আমাদেরও আর কোন সংশয় থাকিবে না।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, ডাক্তারের দ্বারা মৃত দেহের পরীক্ষা করা না হয় কেন ?"

"তাহা করা হইয়াছে।"

"ডাক্তারেরা কি বলেন ?"

"ডাক্তারেরা এত অধিক বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করেন যে, তাঁহাদের সকল কথা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন, কিন্তু আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহার মর্ম্ম এই যে মৃত ব্যক্তির এওর্টা নামক ধমনীতে কোন পীড়া ছিল।"

"কিন্তু তাঁহারা কি এমন কথা বলেন, যে মৃত্যু অস্বাভাবিক ?" "না বরং তাঁহাদের মত এই যে, মৃত্যু স্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়াছে।" "তাহা হইলে আর এ বিষয়ের অনুসন্ধানের কি প্রয়োজন হইতেছে ?"

"কথা কি জানেন, ডাক্তারেরা যদিও বলিতেছেন যে, মৃত্যু স্বাভাবিকই বটে, তথাপি মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের সন্দেহ দূর হয় নাই। তাঁহাদের ইচ্ছা, এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হয়।"

"আপনাদের যখন সেই রূপই ইচ্ছা, আমি কল্য প্রাতেই যাত্রা করিব।"

তখন মাসেট বলিলেন, "আপনার পরিশ্রমের জন্য এই হাজার টাকার নোট খানি লউন।"

টাকাটা যদিও অল্প নহে, তথাচ আমি তাহা গ্রহণ করিতে কোন প্রকার ইতস্ততঃ করিলাম না। আরও কিয়ৎকাল কথাবার্ত্তার পর ভদ্র লোক দুই জন বিদায় হইলেন।

পর দিন প্রাতেই আমি ওয়াসিংটন অভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং সায়ংকালে সাতটার সময় তথায় গিয়া পৌঁছিলাম। সর্ব্ব প্রথমই হেন্‌রি মার্কহামের নিকটে গেলাম। মার্কহাম তখন কি লিখিতেছিল। আমাকে দেখিবামাত্র মার্কহাম, চেয়ার হইতে উঠিয়া কিছু ঔৎসুক্য সহ-

কারে বলিল, “তবে, ব্র্যামটন্, তুমি এখানে? এ অঞ্চলে তুমি আসিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। কোন প্রয়োজন আসিয়াছ না কি?”

আমি বলিলাম, “হাঁ, কার্য্য বশতঃই আসিয়াছি।” তার পর মাসেটের সঙ্গে আমার যে যে কথা হইয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলাম। আমার কথা শেষ হইলে মার্কহাম বলিয়া উঠিলেন, একি পাগলামি! ডাক্তারেরা স্পষ্ট বলিয়াছে যে, এওর্টা নামক ধমনীর এনিউরিসম্ রোগে পারসিভাল সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। অগ্রে যদি তাহাঁদের সঙ্গে একবার দেখা কর, তাহা হইলে অনেক পরিশ্রমের সাশ্রয় হইবে।”

আমরও সেই রূপ বিবেচনা। ডাক্তারেরা যদি মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে যে, রোগে মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে এ বিষয়ে তদারক করা কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। কিন্তু আমি আমার পরিশ্রমিক লইয়াছি, সুতরাং আপন কর্ত্তব্য করিয়াই যাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, “মৃত্যুটা অকস্মাৎ হইয়াছিল, না?”

মার্কহাম বলিলেন, “তা হবেই ত—এনিউরিসম রোগে অকস্মাৎ মৃত্যুই হইয়া থাকে। আবরণ ফাটিবামাত্র মৃত্যু সংঘটিত হয়।—কিন্তু এত দিন তুমি বোধ হয় চিকিৎসাশাস্ত্র যাহা শিখিয়াছিলে, সব ভুলিয়া গিয়াছ।”

আরও দুই চারিটা কথাবার্ত্তা কহিয়া আমি মৃতদেহ দেখিতে চাহিলাম। মার্কহাম একটি আলোক হস্তে করিয়া, যে ঘরে মৃতদেহ ছিল, সেই ঘরে আমাকে পথ দেখাইয়া গেল। সমাধিস্থানের ন্যায় কেমন একটা ঘ্রাণ সেই ঘর ভরিয়া ছিল। মৃতদেহ এ পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত করা হয় নাই, বিছানার উপরেই পড়িয়াছিল।

মৃত দেহ দেখিয়াই বোধ হইল, লোকটি জীবদ্দশায় বিলক্ষণ সবল ও সুস্থকায় ছিল। মুখের গোড়ায় আলোক ধরিয়া দেখিলাম, মরা

মানুষের মুখ যেমন হইয়া থাকে তাই—অন্য কোন লক্ষণ বা চিহ্ন দেখিলাম না। তার পর গাত্রবস্ত্র সরাইয়া বক্ষস্থল পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু শেষে বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখায়, হৃদয়ের ঠিক উপরে পিনের মস্তকের ন্যায় আয়তনের একটী নীল দাগ দৃষ্টিগোচর হইল। হেন্‌রিকে তাহা দেখাইয়া বলিলাম,

"কি আশ্চর্য্য দাগ!"

হেন্‌রি বলিলেন, "কৈ?"

প্রদীপ নিকটে আনিয়া বলিলাম, "এই দেখ।"

হেন্‌রি বলিল, "ওটা বিশ্লেষণের দাগ।"

আমি মনে করিলাম, হবে বুঝি সুতরাং আর কিছু বলিলাম না। ঘরটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, তাহাতেও কিছুই বুঝা গেল না। তার পর, যে ডাক্তার মৃতদেহের পরীক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে গেলাম। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতেই পারে না। তিনি আরও বলিলেন. "রোগটা একটু নূতন রকমের হইয়াছিল বটে, কিন্তু আসলটা এনিউরিজম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডাক্তার মহাশয়, যে সকল প্রকার মৃত্যুকে লোকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে, পারসিভাল সাহেবের মৃত্যু তন্মধ্যে কোন এক প্রকারের বটে ত?"

"তাহাতে আর সন্দেহই নাই। তবু রোগটা নূতন রকমের, খুব নূতন রকমের। কোন চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সাময়িকপত্রে আমি এ বিষয়ের একটা ইতিহাস লিখিব মনে করিয়াছি।"

তার পর চাকর বাকরদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম, কিন্তু সন্দেহের উদয় হইতে পারে, এরূপ কোন কথাই পাইলাম না। শুনিবার মধ্যে শুনিলাম যে, তাঁহার কন্যা এবং মার্কহামের পরস্পর আনুগত্য

দেখিয়া তিনি অনেক সময় বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তিনি স্বভা-বতঃই কিছু খিঁটখিঁটে এবং ছিদ্রানুসন্ধায়ী লোক ছিলেন বলিয়া তাহা বড় গুরুতর বলিয়া বোধ হইল না। দেখিলাম বিষয় আশয় সমস্ত কন্যার নামে উইল করা আছে, দশ হাজার টাকামাত্র মার্সেট পাই-বেন। কন্যার যদি সন্তানাদি হয়, তাহা হইলে তাহারাই বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে। যদি না হয়, কন্যা আপন ইচ্ছামত যাহাকে হয় বিষয় দিতে পারিবে।

তথায় আর অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন দেখিয়া পর দিবসই প্রাতে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলাম। মার্সেট সাহেব আমার সহিত দেখা করিলে তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইলেন।

ইহার চারি মাস পরে এক দিন এক খানি বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম। মিস্ অ্যাডা পারসিভাল্ এবং হেন্‌রি মার্কহামের বিবাহ। অ্যাডার সঙ্গে মার্কহামের যে রূপ আনুগত্য ও অনুরাগের কথা শুনি-য়াছিলাম, তাহাতে তাঁহাদের বিবাহ হইতেছে শুনিয়া কিছুই বিস্মিত হইলাম না। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর চারি মাস যাইতে না যাইতে কন্যার বিবাহ কেমন অসদৃশ বলিয়া বোধ হইল।

ক্রমে ছয় মাস উত্তীর্ণ হইল; মার্কহামের আর কোন সংবাদ নাই। তাঁহার বিবাহের সময় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই অবধিই আমাদের পত্র লেখালেখি বন্ধ হইয়া যায়। এক দিন প্রাতে বাটী হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময় দেখি হেন্‌রি মার্কহাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, মার্কহামের আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। অনবরত মদ্য-পান করিয়া তাঁহার সেই সুন্দর মুখমণ্ডল বিবর্ণ এবং বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, হস্ত কাঁপিতেছে—পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, তাহার ধ্বংসাবশেষ

মাত্র বলিয়া বোধ হইল। আমার সঙ্গে পূর্ব্বেকার সেই বন্ধুভাবে আলাপ করিলেন। আমি আদর করিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলাম। তাঁহার বিবাহ যে সুখের হয় নাই, তাহা বুঝিতে বড় অধিক সময় লাগিল না। নানা দুঃখে তিনি মদ্যপ হইয়া উঠিয়াছেন, এবং ইহা অপেক্ষাও যাহা ভয়ানক, জুয়া খেলিতে শিখিয়াছেন। তিন চারি দিবস আমার গৃহে থাকিলেন, কিন্তু এ অবস্থান বিশেষ সুখের হইল না। তার পর তিনি বিদায় লইলেন। আমিও থাকিবার জন্য অধিক পেড়াপীড়ি করিলাম না।

এই ঘটনার অনুমান দুই মাস পরে এক দিবস প্রাতে মার্সেট্ আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আসিয়াই বলিলেন, "মেং ব্র্যামটন, আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, প্রায় এক বৎসর অতীত হইল আমার মাতুল মেং পারসিভালের মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিতে আপনাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, সেই রূপ কার্য্যে আজি আবার আপনার নিকটে আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "বটে! কার মৃত্যু হইল।"

"আমার ভগিনীর।"

"আপনার ভগিনী কে?"

"মেং পারসিভালের এক কন্যা ছিল আপনার স্মরণ হয় কি?

"কি! হেন্‌রি মার্কহামের সহিত যাঁহার বিবাহ হইয়াছিল?"

"হাঁ, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। বলিলাম, "কি! মৃত্যু! অসম্ভব!"

"অসম্ভব নহে, সত্য। গত কল্য তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এবং আনুসঙ্গিক অবস্থা গুলি ঠিক তাহার পিতার মৃত্যুর ন্যায়। আমার দৃঢ় প্রতীতি, ইহার ভিতর কিছু লুকাচুরি আছে, অতএব আপনাকে এ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাহারও উপর সন্দেহ হয় কি ?"

"কাহারও উপরই না। যে ডাক্তার মৃতদেহের পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনি বলেন, এক প্রকার এনিউরিজম রোগে মৃত্যু হইয়াছে।"

"পিতার যে রোগে মৃত্যু হইয়াছিল ঠিক তাই ?"

"হাঁ, তাহাই বটে।"

"আমি অবিলম্বে বোষ্টন যাত্রা করিতেছি। আমারও বিশ্বাস এই যে, এ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।"

মাসেট বিদায় হইলেন। আমি অবিলম্বে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহাতে যে রূপ হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম তাহা বলিবার নহে। এক বার মনে হইল, হয় ত হেন্‌রি মার্কহাম— কিন্তু এ চিন্তা শেষ হইতে দিলাম না।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বোষ্টন নগরে মার্কহামের বাটীতে গিয়া উঠিলাম। যে কার্য্যে আসিয়াছি, তাহা স্পষ্ট করিয়া তাহাকে বলিলাম, কিছুই গোপন করিলাম না। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন গভীর শোকে মগ্ন। এ ব্যাপারের সবিশেষ তদন্ত যাহাতে হয়, তজ্জন্যও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এ কোন্ সময়ে, কি রূপ অবস্থায় মৃত্যু ঘটিয়াছিল, সর্ব্ব প্রথমে সেই বিষয়ের অনুসন্ধান করিলাম। অনুসন্ধানে যাহা অবগত হইলাম, তাহার সার মর্ম্ম এই ;—

যখন রাত্রে শয়ন করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শরীরে কোন রূপ অসুখ ছিল না। কয়েক মাস হইতে তিনি এবং তাঁহার স্বামী ভিন্ন ভিন্ন ঘরে শয়ন করিতেন। বিগত দুই সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদের কতকটা মিটমাট হইয়াছিল, কিন্তু উভয়ের পৃথক শয়ন ঘূচে নাই— সম্পূর্ণ মিটে নাই। পরিচারিকা তাঁহার শয়ন ঘরের দ্বারে গিয়া দেখে যে দ্বার বন্ধ—সে গিয়া বন্ধই দেখিত। দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়াও কোন সাড়া শব্দ না পাওয়াতে তাহার আশঙ্কা হয়। তখন সে

মার্কহামের নিকটে যায়। গিয়া দেখে, তিনি নিদ্রিত। তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ করাইয়া সকল কথা নিবেদন করে। মার্কহাম তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসেন এবং দ্বারে আঘাত করিয়া তাঁহার স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে না পারিয়া দুই এক জন পাড়া প্রতিবেশীকে ডাকেন। তাহারা আসিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে। দ্বারের চাবি তালাতে লাগানই ছিল। তাহারা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, মার্কহামের পত্নী মরিয়া কাষ্ঠবৎ বিছানায় পড়িয়া আছে। মৃত্যু আকস্মিক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, কেন না গাত্রবস্ত্রাদি কোন রূপ বিপর্য্যস্ত হয় নাই। বল প্রয়োগের কোন চিহ্নও শরীরে দেখা যায় নাই। মার্কহাম যখন তাঁহার পত্নীর মৃতদেহ দেখিলেন, তখন বোধ হইয়াছিল যেন তিনি দুর্ব্বিসহ যাতনায় দগ্ধ হইতেছেন—পত্নীর মৃতদেহের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া, শোকে অধীর হইয়া শিশুর ন্যায় বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে লোকে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া যায়। অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে যে রূপ হইয়া থাকে, মৃতদেহের পরীক্ষা করা হয়, করোনারেরা তদারক করেন, এবং শেষে সকলেই "দৈবাৎ মৃত্যু" বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

এই সকল কথা আমি অবগত হইলাম। এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য, কথা গুলি সত্য কি না, অনুসন্ধান করিয়া দেখা। প্রথমেই যে ঘরে মৃত্যু হইয়াছিল, সেই ঘর খানি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, সুতরাং এ পথে কেহ ঘরে প্রবেশ করে নাই, ইহা বিলক্ষণ বুঝা গেল। জানেলার মুখ দিয়া দেখিলাম, অন্য বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগের ছাদ ঠিক জানেলার নিম্নে কিছু দূরে অবস্থিত। সেই ছাদে একটি ভগ্ন তড়িৎশলাকা সংলগ্ন ছিল। সচরাচর যে রূপ দেখা যায়, তদপেক্ষা শলাকাটি কিছু মোটা বটে, কিন্তু তাহা জানেলা হইতে এতদূরে ছিল, যে সে পথেও কাহারও গৃহ প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না।

তার পর মৃতদেহের পরীক্ষা করিলাম। মুখ খানি দেখিলাম বেশ স্বাভাবিকই আছে। মৃত্যুর করাল মালিন্য তাহার উপর সংস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই যাহা হউক, নতুবা মৃতার মুখ দেখিয়া সুষুপ্তিশান্ত মুখ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারিত। জানি না, কোন্ প্রচ্ছন্ন প্রণোদনে, কিন্তু স্বতঃই যেন তাহার গাত্রবস্ত্র উন্মুক্ত করিলাম। করিয়াই চমকিয়া উঠিলাম——ঠিক হৃদয়ের উপরে, পিনের মস্তকের ন্যায়, একটি সপ্রকাশ নীল চিহ্ন বিদ্যমান।

এরূপ অবিকল সৌসাদৃশ্য কখনই দৈবগত্যা হইতে পারে না। যেমন পিতার মৃতদেহে, তেমনি কন্যার মৃতদেহে, একই স্থানে, একই বর্ণের, একই আয়তনের চিহ্ন—ইহার ভিতর অবশ্য কথা আছে। মৃতার শরীর পুনর্ব্বার ঢাকিয়া দিলাম। কি যে করিতে হইবে, কোন্ পথে যাইতে হইবে, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না—কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। যখনই কোন বিষয়ের সূত্র ধরিতে পারি না, আমার নিয়ম এই যে, তৎসম্বন্ধে আর কিছু করিবার পূর্ব্বে দুই এক ঘণ্টা কাল এক চিত্ত হইয়া মনে মনে সেই বিষয়ের আন্দোলন করি। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্য একটি ঘরে প্রবেশ করিলাম। এ পুস্তাকাগার। আমি টেবিলের নিকটে বসিয়া, হস্তোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইয়া উঠিল না, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না ; ভাবিয়া, ভাবিয়া, ভাবিয়া, পূর্ব্বে যাহা স্থির করিয়াছিলাম, শেষেও তাহাই স্থির করিলাম—এক মাত্র সন্দেহের বিষয় হৃদয়ের উপর ঐ নীল চিহ্ন। কিন্তু উহা স্বাভাবিক হইলেও হইতে পারে। যাহাই হউক, একবার ডাক্তারের সঙ্গে এ বিষয়ের কথা কহিতে হইবে। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলাম। ঘর হইতে বাহির হইব, এমন সময়ে একটি আলমায়রার উপর একখানি ফরাসী সাময়িক পত্র দেখিতে পাইলাম। পত্র-

খানি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। অন্য মনে সে খানি হাতে করিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। পুস্তক খানি আপনা হইতেই এক স্থানে উল্টাইয়া পড়িল। আমি ফরাসীভাষা উত্তম পড়িতে পারি। যখন নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তির উপর চক্ষু পড়িল, তখন যে আমি কি রূপ বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলাম, তাহা বর্ণনীয় নহে। লেখা ছিল ;——

যন্ত্রনাশূন্য মৃত্যু—বিগত বুধবারে মাসো ভেল্‌পো চিকিৎসা বিদ্যালয়ে যন্ত্রনাশূন্য মৃত্যু সম্বন্ধে একটি অতি মনোহর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, যে এওর্টার ঠিক উপরি ভাগে যদি একটি রৌপ্যনির্ম্মিত পিন ন্যস্ত করিয়া, সহসা তাহা ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তৎ সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু সংঘটিত হয়। শরীর কোন প্রকার বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না। মৃত্যুর পর কেবল মাত্র একটি পিন মস্তকের ন্যায় ক্ষুদ্র নীল চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। মাসো ভেলপো আরও বলেন যে, যে সকল অপরাধীর প্রান দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তাহাদিগকে এই রূপ হত্যা করিলে ভাল হয়।

এই কয় ছত্র পড়িয়া, তখন আদ্যন্ত সব বুঝিতে পারিলাম। দুই মিনিটের মধ্যে মার্কহামের ঘরে গিয়া দেখা দিলাম। তাহাকে যেমন দেখিয়াছিলাম তেমনি দেখিলাম—অপার দুঃখে ভাসমান। আমাকে দেখিয়া মার্কহাম বলিল,—"কেমন, তোমার তদারক শেষ হইয়াছে ত ?"

আমি বলিলম, "হইয়াছে।"

"শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। বোধ হয় মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে ডাক্তারের মতেই তোমার মত ?"

"না, তাহা নহে।"

মার্কহামের মুখ মৃত্যুমালিন্য প্রাপ্ত হইল। বলিল, "তুমি কি বলিতেছ ?"

আমি তাহার মুখ পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, "আমি এই বলিতেছি যে তোমার স্ত্রী খুন হইয়াছে।"

"খুন হইয়াছে! অসম্ভব!"

আমি পুনরায় বলিলাম, "অসম্ভব নহে, সত্য। দেখ মার্কহাম, আমার পক্ষে যত কেন ক্লেশকর হউক না, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্য আমাকে করিতে হইবে। যে রৌপ্য নির্ম্মিত পিনের দ্বারা তুমি স্বহস্তে এই কার্য্য করিয়াছ, সেইটি আমায় দাও।"

আমি এই কথা বলায় মার্কহামের মুখ যে রূপ বিবর্ণও বিভৎস হইল, সে দৃশ্য আমি ইহ জন্মে ভুলিব না। সে-রূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি কখন দেখি নাই। তাহার শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। যন্ত্রের ন্যায় তাহার হস্ত আপনা হইতেই কেমন তাহার পকেটের দিকে প্রসারিত হইল। আর সন্দেহ রহিল না—বুঝিলাম, মার্কহামই হত্যা-কারী,—বুঝিলাম, সেই পিন তাহার পকেটেই আছে। মুহূর্ত্তকাল মার্কহাম কি চিন্তা করিল, এবং তৎপরেই অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইল। বলিল, "ব্র্যামটন, আমি বুঝিতেছি, এক্ষণে অস্বীকার করা বৃথা; কোন অসা-মান্য উপায়ে তুমি জানিতে পারিয়াছ, কি রূপ দুইটি হত্যাকাণ্ড ঘটি-য়াছে। দুইটি বলিতেছি, কেননা পারসিভাল সাহেবকেও ঐ একই উপায়ে বধ করা হয়। দুই চারিটা কথাতেই তুমি সব বুঝিতে পারিবে। তুমি কখনও আমাকে চিনিতে পার নাই—উপরে, বেশ শান্ত আকৃতি, বিলক্ষণ ভদ্র ব্যবহার; ভিতরে, পিশাচের হৃদয়। যখন পার্সিভাল সাহেবের গৃহে প্রথম আসিলাম, তখনই তাঁহার কন্যা অ্যাড্যাকে দেখিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম। মেং পারসিভাল আমাদের এই গুপ্ত ভালবাসার কথা জানিতে পারিয়া, এক দিবস আমাকে তাঁহার পাঠ গৃহে ডাকিয়া বলিলেন যে, কল্যই প্রাতে তোমাকে আমার গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সেই রাত্রেই আমি তাঁহাকে একটি রৌপ্য পিনের দ্বারা বধ

করিলাম—”

আমি মধ্যে হইতে বলিয়া উঠিলাম, “ভেলপেয়ের উপদেশানুসারে।”

“ওঃ! এতক্ষণে বুঝিলাম, কেমন করিয়া তুমি সব জানিতে পারিয়াছ—কিন্তু যাক্ ও কথা। আমিই যে তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিলাম, তাহা আড্যা অবশ্য জানিত না। তাহার পিতার মৃত্যুর চারি মাস পরে আমি তাহাকে আমার সহিত বিবাহে সম্মত করি। কিন্তু, তুমি ত জানই, বিবাহ সুখের হইল না—উভয়েই বড় দুঃখে দিন কাটাইতে লাগিলাম। যে পাপ আমি করিয়াছিলাম, তাহার স্মৃতি নিয়ত কালের জন্য মনোমধ্যে জাগিয়া রহিল—নিয়ত কালের জন্য আমায় যন্ত্রনা দিতে লাগিল। তাহা ভুলিবার জন্য ক্রমে সুরার বিকৃত উল্লাসে এবং জুয়াখেলার বিকৃততর উৎসাহে মাতিলাম। শেষে আমার স্ত্রীর সঙ্গে এতটা আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়া গেল, যে আমরা পৃথক হইয়া বাস করিতে লাগিলাম। আমার শ্বশুরের উইল অনুসারে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আমার স্ত্রীর নামে ছিল। মিটমাট হইয়া যাহাতে আমাদের পুনর্মিলন হয়, তজ্জন্য যত্ন করিতে লাগিলাম এবং এই পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইলাম যে, আমার স্ত্রী এই মর্ম্মে এক উইল করিলেন যে, সন্তানাদি না রাখিয়া তাঁহার মৃত্যু হইলে বিষয় আমি পাইব। তখন আমি আবার তাঁহার মৃত্যুর উদ্যোগ করিতে বসিলাম। উইল দস্তখত হইবার দুই সপ্তাহ পরে আমি এক দিন তাঁহার শয়ন গৃহে লুকাইয়া থাকিলাম, এবং তিনি নিদ্রিত হইলে, সেই মারাত্মক পিন তাঁহার হৃদয়ের উপরিভাগে প্রবিষ্ট করিয়া দিলাম। তার পর জানেলা দিয়া বাহির হইয়া ভগ্ন তড়িৎশলাকা অবলম্বন করিয়া পলায়ন করিলাম। আমি নিশ্চিত জানিতাম যে, কেহই কিছু বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু কার্য্য করে মনুষ্য, ফল বিধান করেন ঈশ্বর। আর আমার কিছু বলি-

বার নাই। কিন্তু ইহা আমার দৃঢ় সংকল্প যে সামান্য অপরাধীর ন্যায় অপমানিত হইয়া মারিব না।—”

একটী কথা পর্য্যন্ত কহিবার অবসর পাইলাম না। তাহার পূর্ব্বেই মার্কহাম আপন পকেট হইতে একটি দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম পিন বাহির করিয়া বক্ষস্থলে, হৃদয়ের ঠিক উপরে লাগাইয়া চাপিল। পিন মাংসভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইল এবং তন্মুহূর্ত্তেই মার্কহাম একবারও চিৎকার না করিয়া, একটিও শব্দ না করিয়া, গতাসু হইয়া মেঝ্যার উপর পড়িয়া গেল।

আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া লোক জন ডাক্‌লাম, কিন্তু আর কি হইবে?—প্রাণবায়ু তখন সে দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সমালোচন।

ব্যবস্থা কৌমুদী।*

এই গ্রন্থ খানি দেখিয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। বঙ্গসাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থের বিশেষ অসদ্ভাব আছে। এ প্রণালীর কোন সংগ্রহ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হয় নাই, এমত আমাদের বক্তব্য নহে। ব্যবস্থার্ণব প্রভৃতি কয়েক খানি ব্যবস্থাসংগ্রহ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়, কিন্তু সে গুলি বড় অসম্পূর্ণ—অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য, অবশ্যপ্রকাশিতব্য কথা তাহাতে নাই। সে সকলে যাহা নাই, এরূপ অনেক ব্যবস্থা সমালোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এবং সেই জন্য পুস্তক খানি দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।

---

* ব্যবস্থাকৌমুদী। ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বহুবিধ ব্যবস্থা। শ্রীবরদাকণ্ঠ তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংগৃহীত। প্রথম খণ্ড। বহরমপুর অরুণোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ২ টাকা মাত্র।

সাধারণতঃ বঙ্গবাসী যে শ্রমবিমুখ এবং আলস্যপরতন্ত্র, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যবস্থাসংগ্রহেও ইহার পরিচয়ের অভাব নাই। পূর্ব্ব সংগ্রহ-কারেরা প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কেবলমাত্র রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিথি, অশৌচ, শ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তর্কা-লঙ্কার মহাশয় এরূপ শস্তা দরে ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতে উদ্যত নহেন। তিনি এই সংগ্রহকে যথাসাধ্য নির্দোষ করিবার জন্য রঘুনন্দনের গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য প্রাচীন স্মৃতিও অধ্যয়ন করিয়াছেন—প্রায়শ্চিত্তবিবেক, হরিভক্তি-বিলাস প্রভৃতি হইতেও অনেক ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাজেই উপস্থিত সংগ্রহে অনেক নূতন ব্যবস্থা আমরা দেখিতে পাই—নূতন এবং শাস্ত্র সম্মত—নূতন বলিয়া অশাস্ত্র নহে। চন্দনধেনুর ব্যবস্থা অন্য কোন বাঙ্গালা সংগ্রহে দেখিয়াছি বলিয়া আমাদের মনে হয় না। পঞ্চবর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালকের আদৌ পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত নাই; উপপাতকে শূদ্রের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত; যাহাকে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহার মুণ্ডন ও উপবাসাদি করি-বার আবশ্যকতা নাই; প্রায়শ্চিত্তের নিষিদ্ধ তিথিতে বা কালে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, যদি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দাহাদি করিবার আবশ্যকতা থাকে, তবে মৃত ব্যক্তির পুত্রাদি নিষিদ্ধ তিথি ও কাল অতীত হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দাহাদি করিবে—এতন্নিবন্ধন শব পর্য্যু-ষিত হইলে দোষ হয় না; এবং পুত্রাদি অশৌচগ্রস্ত থাকিলে দৌহিত্র কিম্বা কোন স্বজাতি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দাহাদি করিবে—এই সকল এবং আরও অনেক শাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থা, যাহা পূর্ব্বগামী বাঙ্গালা সংগ্রহকারেরা পরিত্যাগ করিয়াছেন বা অবগত ছিলেন না, এই সং-গ্রহে ধৃত হইয়াছে।

পূর্ব্ব সংগ্রহকারেরা কেবল যে অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য ব্যবস্থা পরিহার

করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে—দুই এক স্থলে সম্পূর্ণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, স্বকপোলকল্পিত ব্যবস্থাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উপস্থিত সংগ্রহে তাহা সংশোধিত হইয়াছে। অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার স্থান ক্ষুদ্রায়তন মাসিক সমালোচকে হইয়া উঠে না। আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন বাঙ্গালা সংগ্রহকার স্ত্রীলোকের মুণ্ডন একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বিধবাদিগের সর্ব্বত্র মুণ্ডনের বিধি আছে। সধবাদিগের মুণ্ডনের বিধি নাই, কেবল প্রায়শ্চিত্ত স্থলে দুই অঙ্গুলী পরিমিত কেশচ্ছেদনের বিধি আছে। প্রয়াগে সধবারও মুণ্ডন করা আবশ্যক, তবে আজকাল প্রয়াগেও সধবার মুণ্ডনের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু সে অন্য কথা। আজকালকার রঙ্গিনীদিগের মধ্যে এমন সুন্দরী কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা প্রয়াগে কেন, নির্ব্বাণ মুক্তির জন্যও মাথার চুল কাটিয়া দিতে সম্মত হয়েন কি না, সন্দেহ—এরূপ বিলাসিনীও কখন কখন দেখা যায়, যাঁহাদের মস্তকের এক গাছি চুল যদি খোঁপা বাঁধিবার সময় চিরুনীর টানে উঠিয়া আসে, তবে যেন তাঁহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে—সমস্ত দিন আর কোন কাজে মন লাগে না, সমস্ত রাত আর নিদ্রা হয় না—পুত্র বা পতিবিয়োগ হইলেও বুঝি এতটা মর্ম্মান্তিক হয় না। মস্তক মুণ্ডন যে স্ত্রীলোকের পক্ষে তুষানলেরও অধিক, ইহা আমরা স্বীকার করি এবং কতকটা বুঝিতেও পারি; কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীলোকের খাতিরে অন্যায় ব্যবস্থা কেন লিপিবদ্ধ হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সংগ্রহে এ ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে; কিন্তু এ সংশোধন বোধ হয় আমাদের নভেলপ্রিয় নব্যদিগের ভাল লাগিবে না।

গ্রন্থ খানির এক আধ স্থলে একটু আধটু অঙ্গহীনতাও দেখা যায়; কিন্তু তাহা এত সামান্য যে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলিত। রঘুনন্দন এক স্থলে গর্ব্ভিনী গোবধে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্তের প্রাচীন বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, মনুষ্যেতর জন্তুদিগের গর্ব্ভসঞ্চারের ঠিক সময় নিরূপণ করা অনেক সময়েই দুর্ঘট; এবং যে খানে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্তের বাস্তবিক আবশ্যক নাই, সে স্থলেও দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করায় কোন প্রত্যবায় নাই। কিন্তু যদি দ্বিগুণের আবশ্যক বাস্তবিক থাকে, এবং দিন গণনার ভ্রমবশতঃ অর্দ্ধেক করা হয়, তাহাতে ধর্ম্মহানি আছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় এ কথাটার উল্লেখ অনায়াসেই করিতে পারিতেন। তাহা না করায় যে একটু অঙ্গহীন হইয়াছে, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

সে যাহা হউক, উপস্থিত গ্রন্থ খানির দ্বারা অনেকের উপকার হইবে। প্রথমতঃ বিষয়ী লোকের উপকার। তাঁহাদিগকে কথায় কথায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারে যাইতে হইত, এরূপ এক খানি গ্রন্থ ঘরে থাকিলে সে দায় হইতে তাঁহারা অনেকটা নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ "যজমেনে" ব্রাহ্মণদিগের উপকার। ব্যবস্থা দিবার ক্ষমতা ইহাঁদের যে প্রকার, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং নুতন করিয়া পরিচয় দিবারও আবশ্যক নাই। কিন্তু যজমানে ত ছাড়ে না—তাঁহার ক্ষমতা থাকুক আর না থাকুক, তাহারা তাঁহাকে বৈ জানে না। পুরোহিত মহাশয়ও কিছু জানুন না জানুন, যজমানের কাছে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতে কাজেই নারাজ। সেই জন্য তিনিও দুই এক বার ইতস্ততঃ করিয়া, দুই এক বার হাই তুলিয়া, দুই এক বার মাথা চুলকাইয়া, শেষে মুখ রাখিবার জন্য সত্যনারায়ণের পুঁথি খুলিয়া মাথা মুণ্ডু যা হয় একটা কথা বলিয়া দেন। কার্য্য পণ্ড হয়, যজমানেরই হইবে;

নরকে যাইতে হয়, যজমানই যাইবে—তাঁহার চাল কলা ত বজায় থাকিল। এ প্রকার এক আধ খানি গ্রন্থ ঘরে থাকিলে তাঁহাদিগকেও আর সম্ভ্রম রক্ষার দায়ে এমন করিয়া ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে না।

তৃতীয়তঃ অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরও উপকার হইবার সম্ভাবনা। অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের যেমন হউক, আমাদের এই মুরশিদাবাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ত নিশ্চয় হইবে। এ কথা বলিবার একটা কারণ এই যে, এখানকার কোন কোন পণ্ডিতকে অন্যায় ব্যবস্থা দিতে আমরা দেখিয়াছি। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। এখানকার কোন কোন পণ্ডিত শনি মঙ্গলবারে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ করিয়া থাকেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বচন বলিবেন—

নাষ্টম্যাং ন চতুর্দ্দশ্যাং প্রায়শ্চিত্ত পরিক্ষণে।
ন পরীক্ষা বিবাহশ্চ শনিভৌম দিনে তথা॥

কিন্তু শনিভৌম দিনের যে প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে অন্বয় হইবে না, ইহা তাঁহারা মনে করেন না।

কিন্তু আসল কথা এই যে, এখানকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ নহেন—তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে যেমন হউক, পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাহ্য আড়ম্বর সাড়ে আঠার আনা আছে—টৈতন্য, চটি জুতা, অসভ্যতা, কুকথা, বাড়ীতে যেমন হউক, গঙ্গার ঘাটে আহ্নিকের ঘটা—এ সকলের ত্রুটী পাইবেন না; কিন্তু ভিতরে যোল কড়াই কানা। তাঁহাদের বিদ্যা শিক্ষার বড় একটা প্রয়োজনও নাই। টোলে পাঁচ জন ছাত্রের সঙ্গে গোলে হরিবোল দিয়া যেন তেন প্রকারেণ সহনৈষধঃ পর্য্যন্ত পড়িয়া উঠিতে পারিলেই মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাড়ীর পূরা বিদায় ধরাই আছে। কাহাকেও

পরীক্ষা দিয়া বিদায় লইতে হয় না—বিদ্যানুসারে মর্য্যাদার রীতি আর এ দেশে নাই—সুতরাং কেহ শিবের ধ্যান শিখিয়াই জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন, কেহ গঙ্গার স্তব কণ্ঠস্থ করিয়াই দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য হইয়া উঠেন। ইহা ছাড়া আর এক দল পৈতৃক পণ্ডিত আছেন। পিতা দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, সেই সূত্রে পুত্রও প্রধান বিদায়ের দাবি করেন—সরস্বতীর সঙ্গে কস্মিন কালে দেখা সাক্ষাৎ নাই, কিন্তু পুরা বিদায় লইবেন—না দিলে শাপান্ত করিবেন, বাপান্ত করিবেন, উপবীত ছিঁড়িবেন, বাড়ী গিয়া ব্রাহ্মণীর উপর তম্বি করিবেন। কাজেই দিতে হয়—না দিলে রক্ষা নাই। এখানকার সকল পণ্ডিতই এই প্রকারের, এ কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। দুই চারি জন অবশ্য এরূপ আছেন, যাঁহারা রীতিমত বিদ্যাধ্যায়ন করিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন; এবং তাঁহাদের যাহাতে প্রতিষ্ঠা ও সমাদর হয়, তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। কিন্তু আমাদের এখানকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাই যে সরস্বতীর ধার ধারেন না, তৎপক্ষে বিন্দুবিসর্গও সন্দেহ নাই। সেই জন্য আমরা বলিয়াছি যে, উপস্থিত গ্রন্থ খানিতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরও উপকার হইবে।

যে গ্রন্থে এত লোকের উপকার আছে, তাহা সকলেরই আদরণীয়। হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার হিন্দু মাত্রেরই জানা কর্ত্তব্য, এবং সেই জন্য আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য যে এই গ্রন্থ এক এক খানি ক্রয় করিয়া আপনার উপকার সাধন করি এবং সেই সঙ্গে তর্কলঙ্কার মহাশয়কে উৎসাহ দি। এখানি প্রথম খণ্ড। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড যাহাতে সত্বর প্রকাশ হয়, তাহা আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

বিজ্ঞাপন।

এ পর্য্যন্ত গ্রাহকগণ মধ্যে যাঁহারা মাসিক সমালোচকের মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহাদিগের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে তাঁহারা যেন আর স্ব স্ব দেয় পাঠাইতে বিলম্ব না করেন। সমালোচক ধারে দিবার রীতি নাই।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

—০—

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় রচনা প্রবন্ধাদি, সমালোচ্য গ্রন্থাদি জিয়াগঞ্জ, বালুচর ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

ব্যারিং বা ইন্সফিসিয়েণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না। যাঁহারা পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উত্তর লেখা যাইবে না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা ডাকের টিকিটে মূল্য পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় /০ আনা কমিসন দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট যেন কেহ না পাঠান। মনিঅর্ডারে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর ট্রেজরীতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন তাঁহাদিগের নিকট পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪৲ টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে সুতরাং বিনা মূল্যে দেওয়া এক কালে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্র ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ
মাসিক সমালোচক কার্য্যালয়
খাগড়া বহরমপুর।

(১ম খণ্ড।) (৭ম ও ৮ম সংখ্যা।)

মাসিক সমালোচক।

([illegible] মাসিকপত্র ও সমালোচন।)

সম্পাদক

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

সন ১২৮৬ সাল কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—o⬭o—

বহরমপুর,—অরুণোদয় যন্ত্রে

মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। প্রতি সং[খ্যার] মূল্য ।৶০ আনা।

মাসিক সমালোচক।

—*:❀:*—

দুই ভগ্নী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যুগল।

Sight hateful ! sight tormenting ! thus these two,
Imparadist in one another's arms,
The happier Eden, shall enjoy their fill
Of bliss on bliss ;——

Paradise Lost.

হাসিতে হাসিতে, দুলিতে দুলিতে, চন্দ্রমা আকাশ-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কে-জানে-কোথায় যাইতেছে ; অসংখ্য তারকারাজি প্রস্ফুটিত প্রসূন সমূহের ন্যায় সঙ্গে যাইতেছে। শরীর কণ্টকিত করিয়া দিয়া, হৃদয় পুলকিত করিয়া দিয়া, সরস বসন্ত বায়ু নাচিয়া বেড়াইতেছে। রজনী শুভ্রা। আর্য্য বিধবা পৌরকামিনীর ন্যায় পৃথিবী শুক্লাম্বর-বিশোভিতা।

এই রূপ সময়ে যুবক যুবতী এক পরম রমনীয় উদ্যান মধ্যস্থ সরোবরতীরে বসিয়া আছেন। সরোবরতীরে মর্ম্মর প্রস্তরের অতি মনোহর সোপানাবলী ; সেই সোপানে যুবক যুবতী উপবিষ্ট——তাঁহাদের পদ-নিম্নে সরসীর সুনির্ম্মল বারি রাশি। সরসী বক্ষে চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে ডুবিতেছে, ভাসিতেছে, দৌড়িতেছে, আবার স্থির হইতেছে। বালক খেলিতে খেলিতে ক্লান্ত হইয়া যেমন এক একবার স্থির হয়, স্থির হইয়া সঙ্গীদের প্রতি যেমন এক একবার চাহে, চন্দ্রমা যেন সেই রূপ

স্থির হইয়া সেই রূপ চাহিতেছে। উদ্যানস্থ প্রস্ফুটিত কুসুম সমূহ, দাতার সম্পত্তির ন্যায়, স্ব স্ব সুরভিরাশি অকাতরে বিলাইতেছে। বায়ু পুষ্পরাশি লইয়া বড় রঙ্গ করিতেছিল। একটি বিকসিত গোলাপকে শাখাসহ অবনত করিয়া পার্শ্বস্থ অপর গোলাপের গায়ে ফেলিয়া দিতেছে—গোলাপদ্বয় যেন "ছিঃ! কর কি?" বলিয়া সলাজ হাসির সহিত বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতেছে। বায়ু সকলেরই আত্মীয়; নীচ বা মহৎ, বায়ু কাহাকেও উপেক্ষা করে না—কখন দরিদ্রের কুটীরে গিয়া তাহার ঝাঁপ নাড়িতেছে, বা তাহার ছিন্ন কন্থা দুলাইতেছে; কখন বা ধনীর প্রাসাদে গিয়া তাঁহার ঝাড়ের কলম বাজাইতেছে, বা তাঁহার সাসীর কবাট ঠেলিয়া ভিতরে উঁকি মারিতেছে; কখন পুস্তক রাশি পরিবৃত লেখকের প্রকোষ্ঠে গিয়া তাঁহার লিখিত কাগজস্তূপ একটি একটি করিয়া চুরি করিতেছে, বা তাঁহার অধীতমান পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া দিতেছে; কখন বা ধীরে ধীরে পুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিন্তামগ্না নবীনার অলকদাম নাচাইতেছে, বা তাঁহার বস্ত্রাদি স্থানভ্রষ্ট করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। অদ্য সুরসিক বায়ু মনোহর চন্দ্ররশ্মিতে গা ঢালিয়া হাসিয়া হাসিয়া বেড়াইতেছে। যে স্থানে যুবক যুবতী বসিয়া আছেন, বায়ু তথায় গিয়া একের বস্ত্র অপরের সহিত মিশাইয়া দিতেছে, নবীনার আলুলায়িত কুন্তলরাশি যুবকের পৃষ্ঠে ফেলিতেছে এবং তাঁহাদের বস্ত্র সরসীজলে ফেলিয়া ভিজাইয়া দিতেছে। যুবক যুবতী কথোপকথনে বিনিবিষ্ট; কিন্তু কি জানি কেন, সহসা তাঁহাদের কথাবার্ত্তা ক্ষান্ত হইল। অনেক ক্ষণ পরে যুবতী জিজ্ঞাসিলেন—

"মানুষ মরিলে কি হয় যোগেন্দ্র?"

যোগেন্দ্র সবিস্ময়ে কহিলেন, "এ কথা কেন বিনোদিনী?"

বিনোদিনী ধীরে ধীরে নভোমণ্ডলের প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহি-

লেন, "আমি যদি মরি ?"

"কেন বিনোদ! তোমার মনে এ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল কেন ?"

"কি জানি, মানব নিয়তির কথা ত কিছু বলা যায় না। যদিই মরি, তাহা হইলে কি হইব তাহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "তুমি একা মরিতে পার না, তোমার মৃত্যুর সহিত আর এক জনের মৃত্যু দৃঢ় সম্বন্ধ। তুমি মরিলে সেও মরিবে, পরে উভয়ে অনন্ত জীবন লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে।"

বিনোদিনী ঈষদ্ধাসে কহিলেন, "কে সে জন ?"

"সে কে তুমি জান না ? সে ভাগ্যবান ব্যক্তি তোমার সম্মুখেই উপস্থিত।"

বিনোদিনী মুখে কাপড় দিয়া খল্ খল্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি !!!"

"কেন, আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না ?"

"না, তুমি বড় দুষ্ট। দেখ দেখি তোমার কি অন্যায় কথা! তুমি সে বার যখন কলিকাতায় যাও, আমায় সঙ্গে লও নাই। আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুন্। তুমি সপ্তাহ পরে স্বয়ং আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে। তাহার পর হইতে আমরা এক বারও কাছ ছাড়া হই নাই আজ আবার তুমি আমায় ফেলিয়া যাইবার কথা বলিতেছ। যাও, কিন্তু আমার শাপ লাগিবে; যেন তিন দিনের মধ্যে তোমাকে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিতে হয়।"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "বিনোদ, তুমি সঙ্গে থাকা কি আমার অসাধ ? কিন্তু তুমি জানত, এবার আমার শেষ পরীক্ষা——"

বিনোদ বাধা দিয়া কহিলেন, "এ পাপ পরীক্ষায় তোমার প্রয়োজন ? যাহারা চাকরির জন্য বিদ্যা শিক্ষা করে, পরীক্ষা বা উপাধি তাহাদের আবশ্যক। মনের আনন্দ ও সংসারের উপকারার্থে যাহারা

বিদ্যা শিখে পরীক্ষায় তাহাদের কোনই প্রয়োজন নাই।”

“তোমার কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি যে উদ্দেশে চিকিৎসা শাস্ত্র আলোচনা করিতেছি, তাহাতে উপাধির বিশেষ আবশ্যকতা আছে।”

“আমি কোনই দরকার দেখিতেছি না। টাকা বা চাকরি, ঈশ্বরেচ্ছায় তোমার অনুসন্ধান করিতে হইবে না। তুমিই বলিয়া থাক “লোকের উপকার করা অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ঔষধ ও চিকিৎসার দ্বারা আসন্ন মৃত্যু হইতে পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করা, উপকারের পরাকাষ্ঠা।” সেই উদ্দেশেই তুমি এ কঠোর পরিশ্রম, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র শিখিতেছ। কিন্তু আজ তোমার কথায় বোধ হইতেছে, তোমার আরও কি উদ্দেশ্য আছে।”

যোগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “তুমি যাহা বলিলে তদ্ব্যতীত আমার আর কোনই উদ্দেশ্য নাই। তবে পরীক্ষার প্রয়োজন কি, তাহা তোমায় বুঝাইয়া দিতেছি। চিকিৎসকের প্রতি ও তাঁহার ঔষধের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা, আরোগ্যের একটা প্রধান কারণ। চিকিৎসক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার প্রতি সাধারণের বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় হয়। পরীক্ষার এই এক প্রয়োজন। আর এক প্রয়োজন, যে কার্য্য করা গিয়াছে, অল্পের জন্য তাহার শেষ রাখা ভাল নয়।”

বিনোদিনী চুপ্ করিয়া রহিলেন; কথাটা বুঝি তাঁহার মনে লাগিল। যোগেন্দ্র আবার বলিলেন, “বিনোদ, তাহা না হইলে তোমায় ছাড়িয়া আমি কি যাইতে পারি? তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে আমার যে যাতনা, বোধ করি তাহার সিকিও তোমার হয় না।”

বিনোদিনী বলিলেন, “তুমি বড় মিথ্যাবাদী!”

“কেন বিনোদ?”

"কে কবে ইচ্ছা করিয়া যাতনা সহে? আমায় সঙ্গে লইয়া যাইতে দোষ কি?" যোগেন্দ্র কহিলেন, "এবার আমাকে পড়া শুনায় এত বিব্রত থাকিতে হইবে যে, হয় ত তোমাকে লইয়া আমায় বিপদাপন্ন হইতে হইবে।"

বিনোদিনী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "পড়া শুনার মুখে আগুণ!"

যোগেন্দ্র বিনোদিনীকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে কহিলেন, "বিনি, তুই পাগল!—"

এই সময়ে তাঁহাদের পশ্চাতে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী আসিয়া দাঁড়াইলেন। যুবক যুবতী কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। নবাগতা সুন্দরীর বয়স অনুমান অষ্টাদশ বৎসর। তাঁহার দেহ নিরাভরণ। বিধাতা তাঁহাকে যে রূপরাশি প্রদান করিয়াছেন, অলঙ্কারে তাহার কি বাড়াইবে? সুন্দরী বিধবা। তিনি অনেকক্ষণ সমভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার বদনে ঘৃণা ও বিরক্তির চিহ্ন ব্যক্ত হইতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে বোধ হয় তাঁহার যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, ভালা মেয়ে যা হোক!"

যুবক যুবতী চমকিয়া উঠিলেন। বিনোদিনী সলজ্জভাবে কহিলেন, "কেও—দিদি—তবু রক্ষা!"

দিদি কহিলেন, "বিনি, তোর কি একটুও লজ্জা নাই?"

বিনোদ মস্তকে কাপড় দিয়া যোগেন্দ্রের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া বসিলেন। যোগেন্দ্র বলিলেন, "ঠাকুরঝি, তোমার সাক্ষাতে আবার লজ্জা কি?"

ঠাকুরঝি কমলিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বিনোদিনীকে কহিলেন, "বিনি, মা তোকে সেই অবধি ডাকছেন! ঝিরা কোথাও তোর দেখা পেলে না। বাবা দুবার তোর খোঁজ করেছেন।"

বিনোদিনী বিনা বাক্যব্যয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুরাশা।

Which way I fly is hell ; myself am hell ;
And in the lowest deep a lower deep
Still threatening to devour me opens wide,
To which the Hell I suffer seems a Heaven.

Paradise Lost.

বিনোদিনী প্রস্থান করিলে কমলিনী সেই শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সরসীসোপানে রাজরাজমোহিনীরূপে উপবেশন করিলেন। শুভ্র চন্দ্র-রশ্মি, ক্রীড়াশীল বসন্তবায়ু, প্রস্ফুটিত কুসুমাবলী, প্রশান্ত সরসীবারি, শোভাময়ী প্রকৃতি, কমলিনীর আগমনে যেন সকলই সমধিক সমুজ্জ্বল হইল। সেই শোভাই শোভা, যাহা নিজগুণে পরের শোভা বর্দ্ধন করিতে সমর্থ ; সেই শ্রীই শ্রী, যাহা অচেষ্টিত ভাবে সন্নিহিত পদার্থের শ্রী সম্বিধান করে ; সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য, যাহা আপনি না মাতিয়া পরকে মাতাইতে সক্ষম। কমলিনী সেই স্থানে চিন্তিত, ব্যথিত ও কথঞ্চিৎ ক্রুদ্ধভাবে উপবেশন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ভাব যাহাই হউক, প্রকৃতি তাঁহার আগমনে প্রফুল্ল হইল।

যোগেন্দ্র যে খানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানেই রহিলেন , কমলিনী কয়েকস্তর ঊর্দ্ধ্ব সোপানে উপবেশন করিলেন। তিনি যেন যোগেন্দ্রকে কি বলিবেন মনে করিতে লাগিলেন, কিন্তু কি জানি কেন, পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়-আকাশে কি তাড়িত প্রবাহ ছুটিতে ছিল, কে বলিতে পারে ? কে জানে বিধবা কি ভাবিতেছিল ?

যোগেন্দ্র বহুক্ষণ অন্য দিকে মুখ করিয়া অন্য মনে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সুন্দরীর মুখের সে পরুষভাব তিরোহিত হইল। যোগেন্দ্র উঠিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “কমল, তুমি কি এখানে বসিবে ?”

কমল কোন উত্তর না দিয়া যোগেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন, কৈ যোগেন্দ্রের মুখে তাঁহার মত ভাবনার চিহ্ন নাই ত। অবনত মস্তকে কহিলেন, "না, বইস—এক সঙ্গে যাইব।"

যোগেন্দ্র বসিলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "কমল কি ভাবিতেছ?"

কমল যেন কি বলিতে গেলেন; আবার সাবধান হইয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন,—"না,"—

যোগেন্দ্র বলিলেন, "তুমি বল বা নাই বল, আমি বেশ্ বুঝিতে পারি, ইদানীং কিছু কাল হইতে তুমি কি ভাবিয়া থাক। তুমি বাল-বিধবা। আমাদের সমাজে বিধবার ন্যায় ক্লেশ আর কাহার? এই ভাবিয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে তোমার বিবাহের জন্য আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলাম। তুমি তখন সর্ব্বদা হাসিতে—আনন্দ তোমার সর্ব্বাঙ্গে মাখা থাকিত। তুমি কোন ক্রমেই বিবাহে সম্মত হইলে না। আমিও ভাবিলাম, বিধবার বিবাহের প্রধান প্রয়োজন, তাহার যাতনা নিবারণ; যাহার যাতনা নাই, তাহার বিবাহ না হইলেও চলে। কিন্তু এবার বাটী আসিয়া অবধি দেখিতেছি তোমার মনের শান্তি, তোমার আনন্দ আর তেমন নাই। কিন্তু কমলিনী! তোমার ক্লেশের কথা শুনিতে আমারও কি কোন অধিকার নাই?"

কমলিনী নীরব। এক বার যোগেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিলেন, আবার মস্তক বিনত করিলেন। যোগেন্দ্র দেখিতে পাইলেন না, যে কমলিনীর চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু সমাবিষ্ট হইল। যোগেন্দ্র আবার বলিলেন,—"কিন্তু আমার বোধ হয়, তোমার ক্লেশ সামান্য নহে। যাহাই হউক কমলিনী, আমার দ্বারা তোমার ক্লেশ কি কোন ক্রমে বিদূরিত হয় না?"

কমলিনী ধীরে ধীরে বলিলেন,—"হয়; তুমি—"

কথার শেষ ভাগ যোগেন্দ্র শুনিতে পাইলেন না। তিনি কহিলেন,

"তবে বল কমল আমাকে তোমার মনোবেদনা জানিতে দাও।„

কমলিনী বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া রোদন বিজড়িত স্বরে বলিলেন, "আমি কেন মরিলাম না ?„

যোগেন্দ্র বুঝিলেন, কমলিনী রোদন করিতেছেন। নিকটস্থ হইয়া কাতরভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "কমল, তুমি কাঁদিতেছ কেন ?"

কমল মুখ তুলিলেন। দেখিলেন, যোগেন্দ্রের বদনে যথার্থ সহানুভূতির চিহ্ন প্রকটিত। চক্ষের জল বন্ধ হইল। কি বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না ; আবার মস্তক বিনত করিলেন। যোগেন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "বল কমল, কি করিলে তোমার এ যাতনার অবসান হয় ?"

সহসা কমলিনী পাগলিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘোর মর্ম্মবিদারক স্বরে কহিলেন, "হায় ! এ পাপ দুরাশা কেন হইল ?„

যোগেন্দ্র সবিস্ময়ে সুন্দরীর বদনের প্রতি চাহিলেন, কিন্তু কথা শেষ হইবামাত্র কমলিনী বেগে ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যোগেন্দ্র বহুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে দীর্ঘ নিশ্বাস সহ বলিলেন, "কমল কি পাগল হইল ?„

তিনি ঘোর চিন্তিতের ন্যায় সেই সোপানে উপবেশন করিলেন।

উপস্থিত উপাখ্যান মধ্যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তৎসংক্রান্ত প্রধান ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা বিধেয়। আমরা এক্ষণে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি।

বীর নগরে রামনারায়ণ রায় নামক এক জন অতুল সম্পত্তিশালী লোক বাস করিতেন। তাঁহার দুই কন্যা ; কমলিনী ও বিনোদিনী। কমলিনী যখন অষ্টম বর্ষ বয়স্কা তখন কলিকাতার রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় নামক এক সমৃদ্ধিশালী সচ্চরিত্র যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের বৎসরদ্বয় পরে রাধাগোবিন্দ কালকবলিত হয়েন।

দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে শরদেন্দুনিভাননা কমলিনী দারুণ বৈধব্য চক্রে নিবদ্ধা হইলেন। রাধাগোবিন্দের যথেষ্ট স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ছিল। তাঁহার জীবনান্ত সহ কমলিনী তৎসমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। কিন্তু কমলিনী ধনবানতনয়া। সুতরাং তাঁহার স্বামীর অর্জ্জিত সম্পত্তির তিনি উত্তরাধিকারিণী হইলেও তাহা গ্রহণ ও অধিকার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। কমলিনীর পিতা রামনারায়ণ রায়ও সে সম্বন্ধে মনোযোগী ছিলেন না। রাধাগোবিন্দের জীবন বিগম কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ রাধাসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের একটি এক বৎসর বয়স্ক পুত্র ছিল। সেই পুত্র এবং তাহার সম্ভাবিত ভ্রাতৃগণ এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে, ইহাই সকলের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু কাহারও মুখ হইতে সে অভিপ্রায় স্ফূর্ত্তি পায় নাই। এই সকল কারণে বিধবা হইয়াও রাধাগোবিন্দের স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের সহিত কমলিনীর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। কমলিনীর মাতা, আপনার সন্তানেরা কমলিনীর সম্পত্তি পাইতে পারে, এমন আশা করিতেন। সেই কারণেই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, তিনি মাঝে মাঝে অত্যন্ত যত্ন করিয়া কমলিনীকে আনিয়া কলিকাতায় রাখিতেন এবং কখন কখন তাঁহার পুত্র নীলবস্কে কমলিনীর নিকট থাকিবার নিমিত্ত বীরনগরে পাঠাইয়া দিতেন।

কমলিনীর বিবাহের সমসময়েই রামনারায়ণ রায় বিনোদিনীর সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক পিতৃ মাতৃহীন নিরাশ্রয় কুলীন সন্তানকে নিজগৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। বিনোদিনী তখন পাঁচ বছরের এবং যোগেন্দ্র বারো বছরের। উভয়ে এক স্থানে অবস্থান করায় ও একত্রে প্রতিপালিত হওয়ায়, পরিণামে এই বিবাহ বড় সুখের হইয়া উঠিল। বিনোদিনীর বয়স যখন আট বৎসর তখন যোগেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল।

যোগেন্দ্র বৃদ্ধ রামনারায়ণ রায় ও তাঁহার গৃহিণীর পুত্রাধিক যত্নের সামগ্রী হইলেন, কমলিনীর পরম সুহৃৎ হইলেন এবং বিনোদিনীর হৃদয়ের সখা, মনের আনন্দ এবং হাসির ভাণ্ডার হইলেন। যোগেন্দ্র বিদ্যাও যথেষ্ট অর্জ্জন করিলেন, কিন্তু তাঁহার অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা কিছু-তেই নিবৃত্ত হইবার নহে। ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষালাভ করিয়া তিনি পরহিতসাধনোদ্দেশে ও চিকিৎসা-বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করিয়া অতুল আনন্দ সম্ভোগ বাসনায় কলিকাতার মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। যোগেন্দ্রনাথ মেডিকাল কলেজে প্রবিষ্ঠ হই-বার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রামনারায়ণ রায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। হর-গোবিন্দ বাবু নামক এক জন সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত ব্যক্তি রামনারায়ণের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি এই সংসারে চির প্রতিপালিত, যথেষ্ট বিশ্বাসভাজন ও পরিবারভুক্ত ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ, কম-লিনী ও বিনোদিনী হরগোবিন্দ বাবুর নিকট প্রথম শিক্ষালাভ করেন। অদ্যাপি কমলিনী ও বিনোদিনীর কোন নুতন পুস্তক পাঠকালে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে হরগোবিন্দ বাবুর নিকট হইতে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে হয়। জমিদারী নির্ব্বাহ করা যদিও হর-গোবিন্দের কার্য্য, তথাপি তাঁহার মাষ্টার মহাশয় এই উপাধিটা প্রচার ছিল। আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় এই কয় নর নারীই প্রধান পাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফাঁদ।

I under fair pretence of friendly ends,
With well placed words of glazing courtesy,
Baited with reasons not unplausible,
Wind me into the easy-hearted man
And hug him into Snares.

Comus.

যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি তাহার তলে কি রত্ন আছে অবশ্যই দেখিব; যে লোভ হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি তাহার সফলতা ফলিবই করিব; যে আশালতা প্রতি দিনের যত্নে লালিত হইয়াছে তাহার ফলভোগ করিবই করিব। এ দুর্দ্দমনীয় আশা ত্যাগ করা যায় না ত! এ লোভ ত্যাগ করিতে পারিব না; ইহা এ জীবনে ত্যাগ করিব না। লোকে নিন্দা করিবে—করুক্; সকলে ঘৃণা করিবে—করুক্; পরকালে অধর্ম্ম হইবে—হউক। বিনোদিনী—বিনোদিনীকে অসুখের সাগরে ভাসান হইবে—তা কি করিব? বিনোদ আমার সুখের পথে কণ্টক, বিনোদ আমার বাসনার প্রধান অন্তরায়—সে আমার পরম শত্রু। তাহার যাহা কেন হউক না, আমি মনের সাধ মিটাইব।

বেলা দ্বিপ্রহর কালে একান্তে একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া কমলিনী উক্ত রূপ আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে, মাধী নাম্নী ঝি সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। মাধীর বয়স যেন যৌবনের শেষ সীমা ছাড়াইয়াছে বোধ হয়, কিন্তু মনের উত্তাল বেগ কিছুই কমে নাই। মাধীর বয়স যতই হউক, তাহাকে দেখিলে সময়ে সময়ে যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার পরিষ্কার লাল পেড়ে সাটী, হাতের বালাও লাল বেলোয়ারি চুরি,

বাহুর স্বর্ণময় তাগা, কপালের ক্ষুদ্র টিপ্, অধরৌষ্ঠের সহাস্য ভাব ও পানের রং, মার্জ্জিত চুলের মোহিনী কবরী এবং সর্ব্বোপরি তাহার বিলাসময়ী গতি—কে বলিবে মাধীর যৌবন নাই? তুমি মাধীকে যুবতী নয় বলিয়া সন্দেহ করিলে, সে তোমার সহিত দারুণ বিবাদ করিবে এবং সম্ভবতঃ তোমাকে পরাজয় স্বীকার করাইয়া ছাড়িবে। হিংসা-পরবশ প্রতিবাসীগণ মাধীর চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা কহে, কিন্তু মাধী নানাবিধ কারণ দর্শাইয়া বলে "লোকেরা সব মিথ্যাবাদী।" ফলতঃ কলহ দ্বন্দ্বে মাধী যে রূপ নিপুণা, তাহাতে তাহার অপ্রীতিকর কোন কথা না বলাই ভাল।

মাধীর বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যেখানে ছুঁই না চলে, মাধবী সেখানে বেটে চালাইতে পারে বলিয়া খ্যাতি আছে। মাধী বীরনগরের রায়-দের বাড়ীর ঝি। সাধারণ ঝি সকলের শ্রেণীতে মাধীর স্থান নহে। তাহাকে অত্যন্ত কর্ম্মঠ, বিশ্বাসিনী ও চতুরা বলিয়া বাটীর সকলেই সমাদর করে। মাধীর সহিত বিনোদিনীর বিশেষ হৃদ্যতা, কারণ তাঁহার নিত্য এক খান দুই খান করিয়া কলিকাতায় যোগেন্দ্র বাবুর নিকট যে চিঠি লিখিতে হয়, মাধী তাহা চিরকাল সুনিয়মে ডাক ঘরে পৌঁছাইয়া দেয় এবং কলিকাতা হইতে তাঁহার যে সমস্ত চিঠি আইসে মাধী তাহা গ্রাম্য ডাক বাবুর নিকট হইতে যথাকালে আনিয়া হাজির করে। সাদামাটা ঝিরা এ কার্য্য এমন করিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না। কমলিনীর সহিত মাধীর আজি কালি বিশেষ হৃদ্যতা—কেন, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। মাধীকে আসিতে দেখিয়া কম-লিনী জিজ্ঞাসিলেন,—

"হাঁসি যে?"

"আবার চিঠি আসিয়াছে।"

"বিনীর হাতে?"

"মাধ্বী থাকিতে!"

"কই?"

মাধ্বী বস্ত্র মধ্য হইতে একখান পত্র বাহির করিয়া দিল। পত্র খানি বিনোদিনীর নামে লিখিত। কমলিনী ব্যস্ততা সহ পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

"প্রিয়তমে,

তোমার কি হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এখানে আসিয়া অবধি তোমাকে ছয় খানি পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু কোনই উত্তর পাই নাই। তোমার চিন্তায় আমার পড়া শুনা বন্ধ হইয়াছে। এই পত্রের উত্তরার্থে দুই দিন অপেক্ষা করিব, এই সময় মধ্যে সংবাদ না পাইলে সমস্ত কর্ম্ম ফেলিয়া তোমার নিকট যাইতে হইবে। চিন্তায় আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি; যদি আমাকে বাঁচাইতে বাসনা থাকে, ত্বরায় সংবাদ দিবে। ইতি তাং—সন১২—সাল।

কলিকাতা } তোমারই
২২নং শান্তসিংহের লেন } যোগেন্দ্র"

মাধী পত্র শুনিয়া বলিল, "ভালই হইয়াছে, আমিও ঐ রূপ চাই।"

কমলিনী বলিলেন, "আসিলে কি করবি?"

"আসিলে এমন কল পাতিব যে, ওদের মুখ দেখাদেখি থাকিবে না।"

কমলিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এ সকল যে করিতেছ তাহাতে আমার কি উপকার?"

"কলসীতে জল বোঝাই থাকিলে আর জল ধরিবে না। সে জল ফেলিয়া দিলে তবে তাহাতে অন্য জলের স্থান হইবে। বড় দিদি! যাহাতে ওদের এই ভালবাসা একেবারে ভাসিয়া যায়, সেই মতলবে এখন সব কাজ করিতে হইবে। এমন অগাধ ভালবাসা থাকিতে কিছুই হবে না। আগে এ গুড়ে বালি দিয়ে তার পর অন্য চেষ্টা।"

"আমার এ রাজকার্য্যে তুমিই মন্ত্রী। দেখিও ভাই যেন মন্ত্রণার দোষে সব না যায়।"

"সে ভাবনা আমার।"

"পত্র খানি কি করিব?"

"সে ছয় খানিরও যে দশা, এ খানিরও সেই দশা—আমাকে দাও।"

কমলিনী মাধীর হস্তে পত্র দিলেন। মাধী পত্র লইয়া বলিল, "একবার দেখে আসি ছোট দিদি কি কচ্চেন।"

"চুপ্ চুপ্! বিনী বুঝি ঐ আস্‌চে।"

অতি ধীরে ধীরে, নিতান্ত বিষণ্ণবদনে বিনোদিনী তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কমলিনী জিজ্ঞাসিলেন, "বিনোদ, তোকে এত ম্লান দেখাচ্চে কেন?"

বিনোদিনীর চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; তিনি এ প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না। কমলিনী পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "যোগীনের সংবাদ পেয়েছিস্ ত?"

বিনোদিনী 'না, বলিয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কমলিনী বলিলেন, "এর জন্য এত চিন্তা কেন? বোধ হয় কোন কার্য্যের গতিকে যোগেন্দ্র সংবাদ দিতে পারেন নাই। না হয়, দশ দিন পরেই সংবাদ পাওয়া যাবে।"

বিনোদিনী মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রতিদিন এক খানা, কখন বা দুই খানা পত্র পাই; এবারে তাঁহার কি হইল?"

কমলিনী বলিলেন, "বোধ হয় পরীক্ষার গোলে পত্র লেখা হয় না।"

বিনোদিনী নয়ন পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, "হাজার গোলেও এমন হইবার কথা নয়তো দিদি!"

মাধী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "ছোট দিদি, তুমি এখনও ছেলে-

মানুষ। আর একটু বয়স হইলে বুঝিতে পারিবে, পুরুষ মানুষকে অত বিশ্বাস করা ভাল নয়।”

বিনোদিনী সবিস্ময়ে কহিলেন, “সে কি কথা?”

মাধী সেই রূপ স্বরে বলিল, “সে কলিকাতা সহর; সেখানে তোমার মতন বিনোদিনীর ছড়াছড়ি আছে। জামাই বাবু নূতন বিনোদিনী পাইয়াছেন হয় ত।” বিনোদিনী ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, “দেখিলেও বিশ্বাস করি না। তাঁহার চরিত্রে এরূপ দোষ হওয়া অসম্ভব।”

মাধী হাসিতে হাসিতে বলিল, “সম্ভব কি অসম্ভব তা ও বয়সে বুঝা যায় না। তুমি যাহাই ভাব, আমি দেখ্‌ছি জামাই বাবু শিকলি কেটেছেন।”

কমলিনী কপট ক্রোধ সহ বলিলেন, “তোর এক কথা!”

“কেন, কি অন্যায়?”

“না; হলে ও দোষ পুরুষের সহজেই হতে পারে। তবে যোগেন্দ্রের যেমন স্বভাব তাহাতে ও সন্দেহ হয় না।”

“স্বভাব যেমনই হউক বড় দিদি, তিনি এবার ছোট দিদিকে সঙ্গে না লওয়াতে সব সন্দেহই হয়।”

কমলিনী যেন অত্যন্ত চিন্তার সহিত বলিলেন, “তাইতো মাধী, যোগীন বিনীকে ছেড়ে এক দিনও থাকিতে পারে না, তা এবার সঙ্গে লইয়া গেল না কেন?”

“তাতেই তো সন্দেহ হচ্চে দিদি ঠাকুরাণী—জামাই বাবুর স্বভাব মন্দ হয়েছে—ছোঠ দিদি সঙ্গে থাকিলে সুবিধা হয় না বলিয়া এবার রাখিয়া গিয়াছেন।”

“কে জানে ভাই কাহার মনে কি আছে?”

সত্য হউক মিথ্যা হউক, সম্ভব হউক অসম্ভব হউক, কথাটা শুনিয়া বিনোদিনীর হৃদয় ফাটিয়া গেল। তিনি একটা কার্য্যের ছলনা করিয়া

মন খুলিয়া ভাবিবার নিমিত্ত সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া গেলেন। বিনোদিনী চলিয়া গেলে কমলিনী ও মাধী খুব খানিকটা হাসিলেন। মাধী বলিল, "এই রূপেই ঔষধ ধরে।"

কমলিনী বলিলেন, "যাই বল, বিনির কষ্ট দেখিয়া আমার বড় যাতনা হয়।"

মাধী উদাস ভাবে বলিল, "তবে কাজ কি?"

কমলিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কাজ কি? আমি বিশেষ বুঝিতেছি, কাজ ভাল হইতেছে না; কে যেন বলিতেছে, ইহাতে সর্ব্বনাশ ঘটিবে—উঃ! তথাপি এ সংকল্প ত্যাগ করিতে পারিতেছি না তো! বিনোদিনীর যাহা হয় হউক, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, আমি এ সংকল্প কখন ত্যাগ করিব না। এ বাসনা আমাকে যে রূপে হউক মিটাইতেই হইবে।"

সহসা বাটীর মধ্যে একটা গোল উঠিল। ব্যস্ততা সহ এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "ছোট দিদি ঠাকুরানীর মূর্চ্ছা হইয়াছে।"

কমলিনী ও মাধী সেই দিকে দৌড়িলেন।

সৌর জগৎ।

পরিষ্কার রজনীতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখি, অগনন জ্যোতিঃ পদার্থ পরিশোভিত অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে। যত দুর দৃষ্টি চলিতে পারে, উজ্জ্বল গগন অপরিসীম দীপমালা বিলম্বিত নীল চন্দ্রাতপ তুল্য দেখা যায়। যত ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইতে পারে, নীল আকাশ আরও নীল দেখায়, আরও নুতন আকাশ দেখা যায়, পূর্ব্বের অদৃশ্য দৃশ্য হয়। দেখিয়া নয়নের তৃপ্তি হয় না—নয়ন দেখিয়া শেষ করিতে পারে না। আকাশ অনন্ত—মন অনন্ত চিন্তা করে। চিন্তা করে বটে, কিন্তু কোন খানে শান্ত হইতে পারে না।

অবশেষে নিরাশ্রয় হইয়া একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়ে—ভীষণ অনন্ত পর্য্যালোচনা করিতে অসমর্থ হইয়া ভয়ে জড়সড় হয়—মোহ আসিয়া অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করে। আমরা এক প্রকার সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ি। আবার জ্ঞান আসে, মন স্বসীমায় অবরোহণ করে—আবার আমরা তারাময় নীলাকাশ দেখি।

জগতে যে কত প্রকার পদার্থ আছে, কে বলিতে পারে? জগৎ দূরে থাক, ব্রহ্মাণ্ডের কনীনিকা সদৃশ সর্ব্বদা পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর বিষয়ই আমরা সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহি। কলরব শূন্য প্রশান্ত নিশীথে যখন নীল নভস্থল পর্য্যবেক্ষণ করি, কতই আশ্চর্য্য পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়—কত সূর্য্য, কত পৃথিবী, কত চন্দ্র দেখিতে পাই। দেখি, জগৎ একই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অনন্ত কাল একই কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। দেখি, এক একটি তারা একটি সূর্য্য, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি বৃত্তাকারে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। দেখি, রাশী রাশী নক্ষত্রনির্ম্মিত শ্বেত ধনুক সদৃশ ছায়াপথ শোভিত রহিয়াছে, যাহার নিম্নোন্নত স্বচ্ছ ছায়ায় পূর্ব্বপুরুষেরা তরঙ্গাকুলিত স্রোতস্বতী দেখিতে পাইয়া স্বর্গ গঙ্গার নাম মন্দাকিনী রাখিয়াছেন। দেখি, মণ্ডলাকার ধূমজ্যোতির সন্নিপাত সদৃশ পদার্থনিচয় (nebulae) স্বর্গরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সাজান রহিয়াছে; কিছু দিন পরে দেখি, ইহারা তারা সমূহ। তারা দেখি, আবার কিঞ্চিদূর্দ্ধে পূর্ব্ববৎ ধূমমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয়। কোথাও নূতন নক্ষত্র আবির্ভূত হইয়া আবার তথা হইতে অন্তর্হিত হয়, কোথাও দৃশ্যমান নক্ষত্র নীল হইয়া যায়, কোথাও বা জ্যোতিহীন তমোময় নক্ষত্র উদিত হয়। ইত্যাকার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী দেখিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি না। তত্ত্বান্বেষী—নিমিত্ত অনুসন্ধান করি; গঠন, অবস্থান ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করি। শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রভাবে আমরা তাহাদিগের পর-

স্পরের প্রতি পরস্পরের কার্য্য দেখিয়াই ক্ষান্ত হই না। মনুষ্য প্রকৃতির সহিত তাহাদিগের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানিতে চেষ্টা করি।

নাক্ষত্রিক জগতে মনুষ্য বুদ্ধি বহুদূর প্রবেশ করিতে পারে নাই। নিকটবর্ত্তী সৌর মণ্ডলের নিয়মাবলী যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাতে কেবল পদার্থ সমূহের আকৃতি, গতি ও গতির পথ মাত্র অনুভূত হইয়াছে; মনুষ্য স্বভাবের সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ, তাহা জানিবারও কোন উপায় নাই, সম্যক্ জানাও নাই। যাহা কিছু জানা আছে, তাহাও লোকে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করিবেই বা কেন? যাহার কোন প্রমাণ নাই, যাহার প্রত্যক্ষ ফল আমরা পদে পদে দেখিতে পাই না, তাহার উপর আস্থা আমাদের কি প্রকারে হইতে পারে? যাহা স্পর্শ করিতে পাই না, বুঝিতে পারি না, যাহা নিকটে নাই, লক্ষ যোজনান্তরে জ্যোতিরীঙ্গনবৎ দিপ্ দিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার সঙ্গে যে আমাদের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে, ইহা কি রূপে বিশ্বাস করিতে পারি? বিশ্বাস করিতে পারি না, সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া অবিশ্বাসও করিতে পারি না। যাহা বুঝিতে পারিলাম না, তাহা সত্য নয়, এ কথা কে বলিতে পারে? অরোরা আমরা দেখি নাই, হয় ত তাহার উদয়ের কারণও কিছু বুঝি নাই, কিন্তু তাই বলিয়া অরোরা নাই বলা কি যুক্তিসঙ্গত? যে বিষয়ের কিছুই আমরা শুনি নাই বা যাহার অস্তিত্বের বিষয়ে আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি, সে প্রকার কত শত বিষয় দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে। টেলিফোন্, মাইক্রোফোন্ ফোনোগ্রাফ্, ইয়ারোফোন্ জন্মাইবে কে জানিত? অগ্নিবিনা অন্ন পাক করা যাইতে পারে, এত কাল কাহার মনে উদয় হইয়াছিল? অথচ রৌদ্রপক্ক অন্নের কল বোম্বাইয়ে প্রস্তুত হইবার কথা হইতেছে। অগ্নি ব্যতীত ষ্টীম্‌বোট চলিতে পারে, কাহার বিশ্বাস ছিল? অথচ চীনেরা

সে দিন অগ্নির ব্যবহার নিরপেক্ষ ষ্টীমারের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং আমি বুঝি না বা ভাবি না বলিয়া থাকিতে পারে না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। সৌর জগতের পদার্থ সমূহের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধেও সেই রূপ। তাহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ নাই বলা যেমন সঙ্গত, সম্বন্ধ আছে বলাও তেমনি সঙ্গত। সম্বন্ধ আছে, এ কথার যেমন প্রমাণ চাই; সম্বন্ধ নাই, এ কথারও তেমনি প্রমাণ চাওয়া আবশ্যক। সৌর গ্রহাদির সহিত আমাদের প্রকৃতিগত সম্বন্ধ নাই, এ বিষয়ে যথাযথ প্রমাণ কিছুই নাই, সুতরাং জোর করিয়া সম্বন্ধ নাই বলা অন্যায়। সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। সম্বন্ধনাস্তিত্বের প্রমাণাভাব এ স্থলে সম্বন্ধাস্তিত্বের লঘুপ্রমাণ স্বরূপ হইতে পারে।

আমরা দেখিতেছি, ব্রহ্মাণ্ড শৃঙ্খলাবদ্ধ। পদার্থ সমূহ স্বস্থানে আবদ্ধ রহিয়া প্রকৃতির আজ্ঞা পালন করিতেছে। জড় পদার্থ নিচয়ের পারস্পরিক অবস্থান পদ্ধতি অপরিবর্ত্তনীয়—অদ্য যেমন, কল্য তেমন, চিরকাল সমান থাকিবে। আমরা এরূপ কথা বলি না যে, বিশ্ব অবিনশ্বর, চিরকাল এক রূপ থাকিবে। এরূপ ভাবনা এক দিনের জন্যও আমাদের মনে স্থান পায় না; তবে, যত দিন প্রাকৃতিক পদার্থ নিচয়ের সম্বন্ধ এক প্রকার, ততদিন তাহাদের অবস্থানও এক প্রকার। জ্যোতির্ব্বিৎদিগের মতে সূর্য্য আপনার গ্রহোপগ্রহাদির সহিত অতি দ্রুত বেগে প্রতিনিয়ত সিরিয়স্ নক্ষত্রাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। উপস্থিত সৌর জগতে যত দিন এই প্রকার গতি বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন আজিকার মত অবস্থা বিদ্যমান থাকিবে। যদি কখন সূর্য্য আপনার গতি দ্বারা চালিত হইয়া সিরিয়স্ নক্ষত্রে আসিয়া পতিত হয়, তখন সৌর জগৎ পরিবর্ত্তিত হইবে, মিলন বিচ্ছিন্ন হইবে, পৃথিবী ধ্বংস হইবে; গ্রহগণ চূর্ণীভূত হইয়া হয় ত সিরিয়সে মিশাইবে এবং সিরিয়-

সের আয়তন বৃদ্ধি হইয়া হয় ত উহা একটি প্রকাণ্ডাবয়ব জ্যোতিঃ ও তেজের আধার হইয়া দাঁড়াইবে। তখন আমরা ? আমরা আমাদের পৃথিবীর সহিত চূর্ণীভূত হইব, আমাদের শক্তি অন্য পদার্থে মিশাইবে।

পদার্থ সমুহের পারস্পরিক সম্বন্ধের কতকগুলি নিয়ম বিজ্ঞানবিদেরা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণই তাহার মধ্যে প্রধান। যে শক্তির প্রভাবে অণুসকল পরস্পর পরস্পরের দিকে প্রধাবিত হয়, যে শক্তির বলে পদার্থ সমুহ পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়, সেই শক্তির নাম মাধ্যাকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণ যে কেবল পৃথিবীতেই আবদ্ধ, এরূপ নহে; ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানেই এই আকর্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে—সকল প্রকার পদার্থের উপরেই এই শক্তির প্রভাব সমান রূপে রহিয়াছে। পার্থিব মাধ্যাকর্ষণের ফল আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করি বলিয়া তাহাতে বড় বিস্মিত হই না। পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় অপরাপর গ্রহের এবং গ্রহপরিচালক সূর্য্যেরও আকর্ষণ শক্তি আছে, তবে তাহার কার্য্য তত প্রত্যক্ষ নহে——আমরা কখন দেখি নাই, এ পৃথিবীর বা অন্তরীক্ষের দৃশ্যমান কোন পদার্থ অন্য গ্রহে কখন পতিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, অন্তরীক্ষ হইতে নানাবিধ পদার্থ পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হয়। কিন্তু আমাদের স্থূল দর্শনে যাহাই হউক, সূক্ষ্ম দর্শনে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে যে, যে কারণ বলে পদার্থনিচয় পৃথিবীতে আকৃষ্ট হয়, সে কারণ সর্ব্বত্র রহিয়াছে এবং তাহার কার্য্যও সর্ব্বত্র চলিতেছে। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে—সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণই ইহার কারণ; চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণই ইহার কারণ; বৃহস্পতির চারি চন্দ্র এবং শনির আট চন্দ্র প্রতিনিয়ত বৃহস্পতি ও শনিকে যথাক্রমে বেষ্টন করিতেছে——বৃহস্পতি ও শনির মাধ্যাকর্ষণই ইহার কারণ। আবার সূর্য্যের এই শক্তি প্রভাবে বুধাদি অষ্টগ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

দূরবর্ত্তী গ্রহগণেরও যে আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহারও সুন্দর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সৌর জগতের অপর প্রান্তসীমালগ্ন নেপ্‌চুন্ গ্রহের আবিষ্কারের বহু দিন পূর্ব্বে এক জন বিখ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ ইউ-রেনাস্ গ্রহের ভ্রমণমার্গ পরীক্ষা করিয়া গণনা করিয়াছিলেন যে, সূর্য্য হইতে পৃথিবী যত দূর, এই গ্রহ হইতে তাহার প্রায় ৭৩ গুণ অন্তরে একটি গ্রহ অবস্থান করিতেছে। তিনি দেখিয়াছিলেন, সূর্য্যও আভ্যন্তরিক অপরাপর গ্রহের আকর্ষণে, ইউরেনাসের ভ্রমণমার্গ যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ প্রভেদ। তিনি গণনা করিলেন; এবং কিছু কাল পরে য়্যাডাম্‌স্ ও লাভেরিয়র্ পণ্ডিতদ্বয় যথানির্দ্দিষ্ট নেপ্‌চুন্ গ্রহের আবিষ্কার করিলেন। যদি এই নূতন বাহ্য গ্রহের আকর্ষণী শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে ইউরেনাসের মার্গ কখনই বিকৃত হইত না।

আমরা দেখিলাম, জড় জগতে প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেকের উপর আপনার গুরুত্ব অনুসারে অধিকার বিস্তার করে——পৃথিবী যেমন পৃথিবীস্থ ফলকে আকর্ষণ করে, ফলও তেমনি পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। আমরা দেখিলাম নেপ্‌চুনের পথ সৌর জাগতিক যাবতীয় পদার্থের শক্তির সমষ্টির ফল। আমরা বুঝিলাম, এই প্রকারে প্রত্যেক সৌর পদার্থের আকর্ষণের সমষ্টির দ্বারা পৃথিবীর পথ রচিত। আমরা স্পষ্টই জানিতে পারিলাম, অন্তরীক্ষের পদার্থ সমূহ পৃথিবীর সহিত প্রাকৃতিক নিয়মে সংলগ্ন, পৃথিবীর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। পৃথিবীর বায়ু, পৃথিবীর জল, পৃথিবীর মাটি, পৃথিবীর সমস্তই সূর্য্য চন্দ্র গ্রহাদির সহিত অনন্ত নিয়মে আবদ্ধ। চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়া জোয়ার ভাটা হইয়া থাকে——চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের আধিক্য ও অপ্রাবল্য হেতু সমুদ্রের জল কখন স্ফীত, কখন বা নিম্ন হইয়া থাকে। সমুদ্র জলের ন্যায় ভূবায়ুরও উন্নয়ন অবনয়ন হইয়া থাকে; কিন্তু বায়ু জল অপেক্ষা অত্যন্ত

তরল ও অনেক ঊর্দ্ধে বিস্তৃত বলিয়া আমরা ইহার পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারি না।

পৃথিবীর উপরে চন্দ্র ও সুর্য্যের কার্য্য নিরন্তর সমান ভাবে চলিতেছে। অনেকেই জানেন, মেঘশূন্য পরিষ্কার শুক্লরজনীতে নীল আকাশে চন্দ্রকীরণ বড় স্নিগ্ধকর। অনেকেই বোধ হয় পূর্ণচন্দ্রশোভিত গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অনাবৃত প্রদেশে চন্দ্রের শীতল রশ্মি সেবন করিয়াছেন। সেই জন্য অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে, চন্দ্রের রশ্মি শীতল। কিন্তু বাস্তবিক চন্দ্রের কীরণ শীতল নহে—চন্দ্রকীরণের কার্য্য শীতল। ঊর্দ্ধ দেশে যে সমস্ত মেঘজাল পৃথিবীকে ঘেরিয়া অবিস্থিতি করে, তাহাতে চন্দ্রকীরণের তাপ প্রবিষ্ট হইয়া সে সমুদায়কে বিনষ্ট করিয়া ফেলে; আকাশ পরিচ্ছন্ন হয়, পৃথিবীর উত্তাপ নির্গমের পথ পরিষ্কৃত হয়, পৃথিবী শীতল হয়——আমরা মনে করি চন্দ্রকীরণ শীতল।

সূর্য্যের কার্য্য গণনাতীত। সূর্য্যকে সৃষ্টি, পরিবর্দ্ধন ও প্রলয়ের এক মাত্র নিয়ামক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সূর্য্য জীবনের এক মাত্র সহায়, কার্য্য সমূহের প্রবর্ত্তক, জীবনোপায়ের জনয়িতা। আমরা যাহা করি, আমরা যাহা দেখি, আমরা যাহা স্পর্শ করি, সে সকলের মূল সৌর তেজ। সেই তেজ বিনা জীবন থাকিত না, জীবনোপায় থাকিত না, কার্য্য করিবার শক্তি থাকিত না, চেতন অচেতন ভেদাভেদ থাকিত না——সমস্ত বিশ্ব জড়ময় নিরাকারে পরিণত হইয়া যাইত। তেজ প্রাণ স্বরূপ—সৃষ্টির প্রারম্ভেই তেজের উদ্গম। তেজোদ্গমের পূর্ব্বে বিশ্ব নিরবচ্ছিন্ন ভেদরহিত আকারশূন্য পরমাণুরাশীতে পরিপূর্ণ ছিল; তেজসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলার আবির্ভাব হইল। সকলেই জানেন, সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, জলবায়ু সকলকে আকর্ষণ করিতেছে, সূর্য্যের উত্তাপে সাগরজল আকৃষ্ট হইয়া মেঘে পরিণত হই-

তেছে, মেঘ হইতে আবার জল হইতেছে; সূর্য্যকীরণে বৃক্ষাদি পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, আমাদের চক্ষুর ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে——সূর্য্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ অপরিহার্য্য।

মনুষ্য দেহেও সূর্য্যের কার্য্য জাজ্জ্বল্যমান। সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবী ঘুরিতেছে; সেই সঙ্গে মনুষ্যও ঘুরিতেছে। আমাদের ঘুরিবার একটা কারণ সূর্য্যের আকর্ষণ। সূর্য্য যদি আমাদিগকে পৃথিবীর সঙ্গে সমান বলে আকর্ষণ না করিত, আমরা কখনই পৃথিবীর সহিত সমান ঘুরিতে পারিতাম না। পৃথিবী সরিয়া যাইত, আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিতাম; অথবা গতিশীল পৃথিবীর বিকীরণ শক্তির (Centrifugal force) দ্বারা আমরা পৃথিবী হইতে তাড়িত হইয়া অনন্ত শূন্যে বিচরণ করিতে থাকিতাম। শরীর বিশেষে সূর্য্যের উত্তাপের আধিক্য ও অনাধিক্যে রোগবিশেষের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আবার সৌর অঙ্কের (sun spots) আধিক্য ও অনাধিক্য প্রযুক্ত পৃথিবীর বৈদ্যুতিক সাম্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং নানা প্রকারে আমরা সৌর প্রভাবের অধীন। সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রও আমাদিগকে অধিকার করিয়া থাকে। চন্দ্রের সাময়িক অধিকার বশতঃ মানবদেহে রোগবিশেষ জন্মিয়া থাকে। বহু দিন হইল কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, কোন এক জন সুবিখ্যাত ইউরোপীয় ডাক্তার জনৈক ভদ্রলোকের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। পীড়া শঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। সৌভাগ্য বশতঃ রোগী আরোগ্য লাভ করিলে ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে কিছু দিনের নিমিত্ত চন্দ্র কীরণে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি সেই কথা ভুলিয়া গিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা জ্যোৎস্নায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ তাঁহার মাথা ঘুরিয়া তিনি মুর্চ্ছিত হইলেন। কথাটা কত দূর যথার্থ আমি বলিতে পারি না, কিন্তু ঘটনাটি অসত্য হইবারও কোন কারণ দেখা যায় না। (ক্রমশঃ)

নাতিনীর প্রতি ঠাকুরুণ দিদি।

১

ভুলে যা সে চারু চোরা আঁখির বাহার ;
ভুলে যা বিনোদ নাম, ভুলে যা বিনোদ ঠাম,
ভুলে যা সে চাঁদ মুখ নাতিনি আমা'র।
এ কাঁচা বয়সে তোর, কেন এ ঘুমের ঘোর,
কেন এ নেশায় ভোর রে দুধের মেয়ে ?
ভুজঙ্গ ভাবিয়ে তায়, নাতিনি লো ফিরে আয়,
কি হবে যাচিলে প্রেম তার মুখ চেয়ে ?
শোন্ বলি স্বর্ণলতা, এ নয় কথার কথা,
মন দিয়ে মন গাঁথা_তার কর্ম্ম নয়।
এত "আমি" মনে যার, ছি ছি ভাই সে আবার,
কি বুঝিবে প্রেমবেদ প্রাণ বিনিময় ?
বল_ধনি ভাগ্য বলে, কজন এ ভূমণ্ডলে,
মাটি খুঁড়ে মহামণি লভিবারে পায় ?
না বুঝে বেসাতি করে, কেবল আসিলে ঘরে,
নাহি বলে মনে মনে হায় হায় হায় !

২

কার পায়ে বিনা মুলে বিকাইতে চাও ?
আইর এ মাথা খেয়ে, হায় রে অবোধ মেয়ে,
বুঝি জীবনের সুখ জীবনে হারাও !
কারে বিলাইবে তুমি, পবিত্র স্মরণ ভুমি,
মুকুল যৌবনে তোর মধুর হৃদয় ;
কার পায়ে দিবি তুলে, দেবতা আরাধ্য ফুলে,
কিশোরীর এই রাই-কিশোরি প্রণয় ?

হায় লো কৌস্তুভ মণি, মাধবেরি বক্ষে ধনি,
ভুবনমোহন রূপ করে লো ধারণ,
শচী পারিজাত হার, পুরন্দর বিনা আর,
কার কণ্ঠে দিলে তোর জুড়াবে জীবন?
চিনে নিয়ে প্রাণধন, করো প্রাণ সমর্পণ,
এ নারী জনম তোর হবে লো সফল;
হেলায় খেলার ছলে, যেন কর্ম্মনাশা জলে,
দিস্‌না দিস্‌না ফেলে সোণার কমল।

৩

কি বলে বুঝাব তোরে?—অবোধ, অজ্ঞান;
রমনীর চির আশা, চির দিন ভালবাসা,
অপ্রেমিকে পূরাবে না, জুড়াবে না প্রাণ।
জ্বরের পিপাসা তার, মিটিলে সে ফিরে আর,
ফিরে নাহি চাবে সখি মুখ পানে তোর;
আজি তার হবি দাসী, কালি পারে হলে বাসি,
পলাবে ভ্রমর বঁধু ফুলমধু চোর।
প্রেম কি লো বালকের, দৃষ্টিক্ষুধা মিঠায়ের,
প্রেম কি লো নবীনের যৌবনের সখ?
বন্যার জলের প্রায়, আজি আছে কালি যায়,
প্রেম কি লো সচঞ্চল বিদ্যুৎ ঝলক?
প্রেম সে বৈকুণ্ঠ ধাম, প্রেমে সিদ্ধ মনস্কাম,
নিত্য ধন প্রেমধন—অনন্ত-পরাণ;
প্রেম অর্থ প্রেম কর্ম্ম, প্রেম মোক্ষ প্রেম ধর্ম্ম,
প্রেম ভক্তি, প্রেম মুক্তি, প্রেম সে নির্ব্বাণ।

মনে পড়ে তার সেই প্রণয় বচন ?
বিপিনে ব্যাধের গান, মধুর মধুর তান,
জান না কি হরিণীর বধের কারণ ?
অমৃত পিবার তরে, চলেছ পিয়াস ভরে,
নরকের অন্ধকূপে—এ কিলো প্রমাদ !
জ্বলন্ত অনলে কেন, কুসুমকোমল হেন,
এ দেহ রতন তোর ফেলে দিতে সাধ ?
হায় নব ঘন জ্ঞানে, ঘন ঘন যার পানে,
চাহিতেছ চাতকিনি—সে কি জলধর ?
হায় কুহেলিকা সে যে, বারিদ বরণে সেজে,
ধাঁধিতে নয়ন তোর ছেয়েছে অম্বর।
ভুলে যা ভুলে যা তারে, মন্দার কুসুম হারে,
অসুরে সাজায়ে ধনি হবে কি সুসার ?
সপ্ত নৃপতির ধন, কেন এত আকিঞ্চন,
জলে জলাঞ্জলি দিতে নাতিনি আমার।

৫

কেন কি বলেছি বল ? চারু আঁখি ছল ছল,
ঢল ঢল মুখপদ্মে পড়িল শিশির ;
হায় রে দুখের মেয়ে, মরি তোর মুখ চেয়ে,
মরিরে নেহারি খেলা নিঠুর বিধির।
নব অনুরাগ হায়, নবীনার এত দায়,
বিধির কি সাধ হয় হেরিতে নয়নে—
আকাশের মত আশা, সাত সিন্ধু ভালবাসা,
কেন ক্ষুদ্র হৃদি ঘটে—বালিকার মনে ?

মুছে ফেল আঁখি জল, নাতিনি লো বুঝে চল,
আমি আনি দিয়ে তোর শ্যাম নটবর,
সাজাব বরণডালা, মদনমোহিনী মালা,
গাঁথিব যতন করি—জুড়াবে অন্তর।

ভারতে বিদ্যালোচনা।

অতি প্রাচীন কালে এসিয়া ভূভাগের মধ্যবর্ত্তী ইরান্ নামক প্রদেশে এক জাতি বাস করিতেন। তাঁহারা আপানদিগকে আর্য্য বলিতেন ও কৃষিকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বলা বাহুল্য, ইহাই তাৎকালিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রকৃষ্ট উপায় ছিল। উক্ত জাতিই তৎকালে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতি মধ্যে সভ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন এবং এক্ষণেও হইয়া থাকেন।

কালক্রমে বংশবৃদ্ধি হওয়াতে উক্ত আর্য্যবংশীয়গণ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া দেশ দেশান্তরে গমন পূর্ব্বক অবস্থিতি আরম্ভ করিলেন। এক দল ভারতে আসিয়া বাস করিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষ অজ্ঞা-নান্ধকারনিমজ্জিত অসভ্যের আবাসভূমি। কোন্ সময়ে আর্য্যকুলধুর-ন্ধরেরা এতদ্দেশে পদার্পণ পূর্ব্বক পশুসদৃশ আদিম নিবাসীদিগকে পদ-দলিত করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করেন, তাহার প্রামা-ণিক বিবরণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সেই নিবিড় তমসা-চ্ছন্ন পুরাকালগর্ভে অধুনাতন অনেক সুসভ্য জাতির অস্তিত্বের চিহ্ন মাত্রও পাওয়া যায় না। আর্য্যেরা এ দেশে আসিয়া যে স্থলে প্রথম অবস্থিতি করেন, উহা তাঁহাদিগের নামানুসারে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণনীয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ এক কালে কি রূপ উন্নত হইয়াছিলেন—কিরূপ

বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইহাও বক্ষ্যমান প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়।

আর্য্যগণ শস্ত্র বিদ্যায় কিরূপ পারদর্শী ছিলেন, তাহার প্রমাণ কুরুক্ষেত্র প্রভৃতির যুদ্ধ বিবরণে আছে। সেই প্রচণ্ড, অসীম প্রতাপান্বিত বীরমণ্ডলীর রণকুশলতার বিবরণমাত্র শ্রবণ করিয়া এক্ষণে আমাদের মস্তক বিঘূর্ণিত হয়। সম্মুখ যুদ্ধে আর্য্যগণ কাহারও নিকট পরাস্ত হয়েন নাই। কি মহাবীর আলেক্‌জন্দর, কি ঘোরবংশীয় মহম্মদ, সকলেই সম্মুখ যুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাভব করা একান্ত অসম্ভব দেখিয়া রণজম্বুকতা অবলম্বন করিয়াছেন। অধিক কি, বিগত চিলেনওয়ালার যুদ্ধে অদম্য বৃটিশ জাতিও মৃতপ্রায় আর্য্যসন্তানগণের পরাক্রম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রণকুশলতার বিষয় ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেক যে, মহম্মদের বংশীয় বাগদাদের খলিফা উপাধিধারী রাজগণ অথবা তাঁহাদের সেনাপতিগণ—যাহারা ইউরোপে স্পেইন রাজ্য পর্য্যন্ত তাবৎ দেশে মুসলমান পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল—ভারতবর্ষে আসিয়া পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়া গমন করেন। যে সময়ে তাঁহারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন ভারতবর্ষীয় রাজগণ মধ্যে সর্ব্বদাই গৃহবিবাদ উপস্থিত হইত এবং কার্য্যেরও নিতান্ত বিশৃঙ্খলাবস্থা ছিল, তথাপি খৃষ্টীয় ৭১০ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা সিন্ধু নদের পারবর্ত্তী মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেও সক্ষম হয়েন নাই।

ভারতের পরাধীনতা প্রাপ্তির প্রধানতঃ দ্বিবিধ কারণ উপলব্ধি হয়। প্রথমতঃ আর্য্যগণের অসতর্কতা এবং গৃহবিবাদই তাঁহাদের পতনের প্রধান হেতু। তাঁহারা সম্মুখ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ যোদ্ধাকে কাপুরুষ মনে করিতেন, সুতরাং ছল করিতেনও না, জানিতেনও না। কিন্তু বিদেশীয়গণ ত আর তাঁহাদের ন্যায় যুদ্ধস্থলে ধর্ম্ম বিচার করিত না—তাহারা ছলে, বলে, কৌশলে, যে কোন প্রকারে হউক, বিপক্ষকে পরা-

জয় করিতে পারিলেই আপনাদিগকে মহাবীর বলিয়া বিবেচনা করিত। দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসিগণ শাস্ত্রের দাস। যে স্থলে আত্ম কলহ উপস্থিত না হইয়াছে, তত্তৎ স্থলেও এই রোগে তাঁহারা বিনাশ পাইয়াছেন। কাশিমের যুদ্ধে ডাহিরের পরাজয় এবং বক্তিয়ার খিলিজির বাঙ্গালা জয়, ইহার দুই প্রসিদ্ধ উদাহরণ। তার পর শাস্ত্র। সাহিত্য। এ বিষয়ে যে আর্য্যগণ একদা উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যে সংস্কৃত ভাষা অধুনা ভাষামণ্ডলী মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সার উইলিয়ম জোন্সের ন্যায় লোকে যে ভাষাকে গর্ব্ব সহকারে গ্রীক্ হইতে সুসম্পাদিত, লাটিন হইতে বিস্তৃত, এবং অন্যান্য সমস্ত ভাষা হইতে সুমিষ্ট বলিয়াছেন, যে ভাষার অনুশীলনে জর্ম্মনগণ প্রাণপাত করিতেছেন, তাহা বহু কাল হইল ভারতবর্ষে জন্মে। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ ইহার বহুল উন্নতি সংসাধন করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের নাটক, কাব্য, অলঙ্কার বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদসংহিতা পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ।

আর্য্যগণের শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জগদ্বিখ্যাত। অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে ব্যাকরণের চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে। অবিশুদ্ধ স্বরসংযোগ ও উচ্চারণ বৈষম্য ঘটিলে আর্য্যগণ আপনাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও প্রণষ্টশক্তি মনে করিতেন, এই হেতু ভারতীয় ঋষিগণ ব্যাকরণ সূত্র প্রণালীর সমুৎকর্ষ সাধনে বিশেষ যত্ন করিয়া গিয়াছেন। সেমিতিক জাতির মধ্যে আরব্য ও য়িহুদীগণ, গ্রীকদিগের মধ্যে আরিস্ততল এবং ভারতের প্রাচীন আর্য্যগণ পৃথিবীর অপরাপর জাতির ব্যাকরণোপদেষ্টা বলিয়া বিখ্যাত। ভাষাবিজ্ঞানের এই অংশ গ্রীসদেশ হইতেই অন্যান্য স্থানে নীত হইয়াছে। কিন্তু গ্রীকগণ এ বিষয়ে ভারতের নিকট ঋণী বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। অতএব হিন্দুদিগের শব্দ

শাস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিতে হইবে। আপিশলী, গার্গ্য, কাশ্যপ, পাণিনি, কাত্যায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। পাণিনি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যাকরণাচার্য্য বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

গণিত। ভারতবর্ষই গণিত বিদ্যার আকর স্থান। এক অবধি নয় পর্য্যন্ত অঙ্ক লিখন প্রণালীর এই স্থানেই সৃষ্টি হয় এবং এখান হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র নীত হয়। বীজ গণিতের সৃষ্টিও ভারতবর্ষে হয়; আরবীয়েরা ইহার অনুবাদ করে, এবং তথা হইতে উহা ইউরোপ খণ্ডে নীত হয়। কোন্ সময়ে এ দেশে গণিত বিদ্যার সৃষ্টি হয়, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে, পুরাকালে রাক্ষসগণ জ্যোতিষে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। কেহ কেহ বলেন আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির প্রভৃতির সময়েই ইহার বিশেষ চর্চ্চা ছিল; কিন্তু ভাস্করাচার্য্যের সময়েই যে, এতদ্দেশে গণিত শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তিনি ১০৩৬ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাস্করাচার্য্য প্রণীত কয়েক খানা গ্রন্থ এবং সূর্য্য-সিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে অস্মদ্দেশে গণিত ও জ্যোতিষের কতদূর আলোচনা ছিল, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক পণ্ডিত বলেন, যে ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে যখন যখনই পৃথিবীর সর্ব্বাংশে দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, বাণিজ্য ব্যাঘাত, মহামারী প্রভৃতি দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তখনই কোন না কোন গ্রহের দুষ্ট অবস্থান উহার কারণ স্বরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিল। শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি, এই তিন গ্রহের দুষ্টভাব বশতঃ ১৬৬৫ অব্দে যে রূপ দুর্বৎসর হইয়াছিল, এরূপ আর কখন হয় নাই। ঐ বৎসরে মহামারীতে বার কোটি লোক নষ্ট হয়। ১৭২০ অব্দে শনি ও মঙ্গল গ্রহের প্রাতিকূলভাব নিবন্ধন এক মার্শেল নগরে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে ৭৫০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৫২০০০ লোক মারা

পড়ে। তুর্ক দেশে পাঁচ কোটী, মিসরে পাঁচ কোটী লোক মারা পড়িয়াছিল। আমরা দেখিতেছি, সভ্যতার উন্নতি সহকারে আমাদের ভারতবর্ষের জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনা সকল পুনর্ব্বার পরিগৃহীত হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে গ্রহের দোষে পৃথিবীর কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইতে পারে, এরূপ কথা হইলে সমগ্র শিক্ষিত সমাজ উহা উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু এখন আর কেহ উন্মত্ত প্রলাপ বলিবে না, কেহ হাসিয়া উড়াইবে না। একণে ভারতবর্ষের কোন প্রাচীন বিষয় লইয়া উপহাস করিবার পূর্ব্বে বিশেষ রূপ বিবেচনা করা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের বিশেষ কর্ত্তব্য। জগদ্বিখ্যাত নিউটন মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া সভ্য জগতে যে অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যভট্ট মাধ্যাকর্ষণের বিষয় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

ন্যায়, দর্শন ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে আর্য্যগণের উন্নতির বিষয়ে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবেক যে, পতঞ্জলি, কপিল, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রের যে সকল নিগূঢ় তত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, ইদানীন্তন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যাভিমানী ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অদ্যাপি তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বৈশেষিক, বেদান্ত, বৌদ্ধ, এবং চার্ব্বাক দর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতিও ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সংসাধন করিয়া গিয়াছেন। একণে নবদ্বীপে যে ন্যায়, স্মৃতি এবং দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা হইয়া থাকে, উহা তাহারই ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

নীতি শাস্ত্র বিষয়ে আমাদের বিবেচনা হয় যে, এমন কোন নীতি-

তত্ত্বই নাই, যাহা আর্য্য মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত বা প্রচারিত হয় নাই। এ বিষয়ে যাঁহারা বিস্তারিত অবগত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা বাবু ঈশানচন্দ্র বসু সংকলিত "হিন্দুধর্ম্মনীতি" নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

রসায়ণ দ্বারাই বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু রসায়ণের মূলও ভারতবর্ষ। ইউরোপীয়েরা আরবদিগের নিকট হইতে প্রথমে রসায়ণের শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্দেশীয় রসায়ণ শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াই যে এই শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে এতৎসম্বন্ধে রামেশ্বর সিদ্ধান্ত, ব্রাহ্ম রসায়ণ, আমলকী রসায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল এবং এক্ষণেও তাহার অনেক বিদ্যমান আছে। চরক, আয়ুর্ব্বেদ, নিদান প্রভৃতিতে রসায়ণ গ্রন্থ ও অধ্যায়ের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের বিখ্যাত বাদসাহ হারন্ অলরসিদের সময়ে তথায় হিন্দু চিকিৎসক এবং রসায়ণ শিক্ষার কথা শুনা যায়। প্রাচীন ঋগ্বেদেও রসায়ণের উল্লেখ আছে। আর্য্যগণ রসায়ণ শাস্ত্রে যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, "সমুদ্র মন্থন" নামক সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক ইতিহাস উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমুদ্র মন্থনের কার্য্য পরম্পরার প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি করিলে অনুভূত হইবে যে, উহার মূলে রসায়ণ শাস্ত্রের অতি গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

রাজনীতি বিষয়েও আর্য্যগণ সুদূরদর্শিনী বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ রাজনীতি বিশরদ কণিক রাজনীতি-বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের উপদেশও রাজনীতিজ্ঞতার সামান্য পরিচায়ক নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজ——

——

কুন্দনন্দিনী।

নন্দন কানন বিষবৃক্ষে বিকসিত পারিজাত কুসুম, কুন্দনন্দিনী। বিষবৃক্ষ হইতে একবার কুন্দচরিত্রের অনস্তিত্ব কল্পনা কর, দেখিবে উহার মোহিনী শক্তি আর নাই। নবীনতার, পবিত্রতার, নিবৃত্তি শক্তির দীপ্ত প্রতিকৃতিরূপা কুন্দচরিত্র বঙ্গ সাহিত্য সংসারে অতি উপাদেয় সামগ্রী। বিষবৃক্ষের যে শাখায় যখন এই কুন্দ-কুসুম ফুটিয়াছে, তখনই লোক মনোমোহন করিয়াছে। আজি সেই কুন্দ-কুসুম একত্রিত করিয়া পাঠক সমাজে এক ছড়া মালা উপহার দিব।

পাঠক নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিশীথে মৃত পিতার শব পার্শ্বে যে বালিকা কুন্দকে দেখিলেন, তাহা আর তিনি ভুলিতে পারিলেন না। আপনা ভুলিয়া, কালি কোথা যাইবে তাহা ভুলিয়া, গভীর নিশীথে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা মৃতকল্প পিতার শিরোদেশে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিল। যে অতুলিত সৌন্দর্য্য গ্রন্থশেষে পাঠককে কাঁদাইয়া ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রথম কার্য্যক্ষেত্রের আরম্ভ এই নিশীথে এবং তাহা বাস্তবিক হৃদয়দ্রাবক। সুপ্তা, স্বপ্নাভিভূতা কুন্দনন্দিনীতে নিবৃত্তি শক্তির কি সুন্দর বিকাশ হইয়াছে! কুন্দ মাতার আগ্রহাতিশয্য অনুভব করিয়াও বহু দূরবর্ত্তী, বেলাবিহীন অনন্ত সাগর পারস্থবৎ অপরিজ্ঞাত নক্ষত্রলোক দেখিয়া কহিল—"আমি অত দূর যাইতে পারিব না, আমার বল নাই।" তখন মাতা অসন্তুষ্ট হইয়া কারুণ্য প্রফুল্ল অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ অনাহ্লাদজনিতবৎ ভ্রূকুটি বিকাশ করিয়া কুন্দকে যে ভয়ানক কথা শুনাইলেন এবং যে ভীষণ চিত্র তাহার দৃষ্টিপথে ধরিলেন, অন্য হইলে আজীবন তাহা মুহূর্ত্ত জন্য বিস্মৃত হইত না। কিন্তু কুন্দের সরলতা অলৌকিক। প্রতি পদে যাহা ঘটিতে লাগিল—স্বপ্নের পরক্ষণেই বলিলে হয়, কুন্দ যাহা দেখিল—তাহাতে ত কুন্দের সেই সহজভীষণ স্বপ্ন, সংস্কারবৎ

হৃদয়ে মুদ্রিত হইবার কথা। কিন্তু কুন্দ সকলই ভুলিল! তাই বলিতেছিলাম যে, কুন্দের সরলতা অলৌকিক। ফলতঃ সারল্যের এমন দৃপ্ত ছবি সাহিত্যসংসারে সুলভ নহে—সংসারেও সুলভ নহে। কাব্য মধ্যে এই নবীন সৃষ্টির অনুরোধে কবি ভীষণ স্বপ্নের কল্পনা করিয়াছেন।

অনন্ত সৌন্দর্য্যের ক্রোড়ে আজন্ম লালিত হইয়াও রাজা দুষ্মন্ত বনলতার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শকুন্তলাকে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ। নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সে কথা বলা যায়। নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া প্রথমাবধি তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। হরদেব ঘোষালের প্রতি তাঁহার প্রথম পত্রের প্রতি পংক্তিতে চিন্তাশীল পাঠক তাহা অনুভব করিবেন। সংসারের চক্ষু সূর্য্যদেব, বুঝি আর একটু শীতাংশু হইলে ভাল হইত। সূর্য্যানুরূপিনী সূর্য্যমুখীর জ্বলন্ত রূপশিখার সাহচর্য্যে আসিয়াও কুন্দ রূপ নগেন্দ্রের চক্ষে হীনপ্রভ হয় নাই। নগেন্দ্র সে রূপ মোহে প্রথমাবধি অভিভূত হইয়াছিলেন। তাই তিনি হরদেবকে কুন্দের সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই——হায়, নগেন্দ্র! কুন্দের আন্তরিক সৌন্দর্য্য আজিও দেখিতে পাও নাই! দেখিলে বুঝিতে, স্বচ্ছ সরোবরে শরচ্চন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে সুষমার ভাবব্যক্তি, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিলেও তাহার কণামাত্র বুঝা যায় না।

বিধবা কুন্দনন্দিনী, নগেন্দ্রের পুরাতন অন্দরে মিলিত পৌরস্ত্রীবর্গ মধ্যে বসিয়াছিল। সকলেই একটা না একটা কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের রমণীগণ যে কার্য্যে তৃপ্তিলাভ করিতেছিল, তাহার সহিত কুন্দের সহানুভূতি থাকিতে পারে না। তাহা হইলে কুন্দচরিত্রের উৎকর্ষ রহিল কোথায়? কবি সে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কুন্দকে

উন্নততর আসনে বসাইয়াছেন। কুন্দ একটি বালককে তাহার মাতার অনুরোধে ক, খ, শিখাইতেছিল। এমন সময়ে হরিদাসী বৈষ্ণবী গান করিতে আসিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কি গাইব ?" সবাই নিজ নিজ রুচি মত ফরমায়েশ করিল। কুন্দ কিছু বলিল না। হৃদয়ের ঔৎ-সুক্য দমন করিয়া ধীরা কুন্দ প্রস্তর রচিত মূর্ত্তিবৎ স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। বৈষ্ণবী আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ গা, তুমি কিছু ফর্-মাশ্ করিলে না ?" কুন্দ তখন লজ্জাবনত-মুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই এক জন বয়স্যার কাণে কাণে কহিল, "কীর্ত্তন গায়িতে বল না ?" তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবী কীর্ত্তন ধরিল। সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী তাহার কথা রাখিল দেখিয়া কুন্দ বড় লজ্জিতা হইল। এ দৃশ্য যেমন স্বাভাবিক তেমনি মধুময়। তার পর বৈষ্ণবী জল খাইতে চাহিলে কুন্দ তাহাকে দূরে জল দিতে গেল। বৈষ্ণবীর দার্ঢ্যে কুন্দ ভুলিল না। বৈষ্ণবী যখন বারংবার উত্তেজনা করিতে লাগিল, শাশুড়ীর সঙ্গে গোপনে গিয়া দেখা করিয়া আসিতে বলিল, কুন্দ কিছুতেই সম্মত হইল না। বলিল "আমি গিন্নীকে না বলিয়া যাইতে পারিব না।" এ সকল কুন্দচরিত্রের যোগ্য বিকাশ। অলৌকিক সারল্যে তেজস্বিনী প্রতিভা কুন্দচরিত্রের উপকরণ।

বিজন কাননে কুসুম পরিমলের মত কুন্দ হৃদয়ে প্রেমপ্রবাহ খেলিল—কেহ তাহা জানিল না, বুঝি কেহ কখন তাহা জানিতে পারিতও না। বুঝি কুন্দ আজীবন সে অনুরাগ হৃদয়ের অভ্যন্তরে পোষণ করিত, বুঝি নৈরাশ্যের জ্বালা অনুদিন কুন্দহৃদয়ের প্রতিস্তর দগ্ধ করিত। যখন প্রেমময়ী কমলমণি গোবিন্দপুরে আসিলেন তখন কুন্দ গোপনে "অন্তরান্তরে" নগেন্দ্রের প্রতি প্রেম পোষণ করিতেছিল —অনুরাগের যাতনা গোপনে অনুভব করিত, নৈরাশ্যের বাত্যা হৃদয়-সাগর অনুক্ষণ মথিত করিত। তাই যখন কমল বলিল "ওলো কুঁদী

—কুঁদী চুঁদী—ভাল আছিস্ ত কুঁদী ?” তখন কুঁদী অবাক হইয়া রহিল—কেননা তখন কুন্দ নগেন্দ্র চিন্তায় সদাই অন্যমনস্কা—প্রেমের নৈরাশ্যে সদাই উদাসিনী। তাই কুন্দ কিছু কাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, “ভাল আছি।”

চিরপ্রেমময়ী কমলের সঙ্গে কুন্দের গাঢ় প্রণয় জন্মিল। নৈরাশ্যের অপার আঁধার সাগরে কুন্দ, কমলের বিমল প্রীতির আশ্রয় পাইল। তাই কুন্দ কমলের যাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল। কমলমণি লুকাইয়া লুকাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। সেই গৃহে উভয়ে উভয় হৃদয়ের যে পরিচয় পাইলেন, নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দ যে প্রগাঢ় প্রেমভাব অন্তরান্তরে পোষণ করিতেছিল, তাহা যে উজ্জ্বল চিত্রে বিভাসিত হইল, ইচ্ছা করে তাহার আমূল উদ্ধৃত করি। সেই খানে নরদেবীরূপিণী রমণীচরিত্রের উৎকর্ষ, রমণীয়তা, মহনীয়তা, অপার স্নেহশালিতার যে পরিচয় পাই, তাহা কখন ভুলিবার নহে। ফলতঃ এই চিত্রে কুন্দচরিত্র আমাদের মনে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ভাব অঙ্কিত করে। আমরা বিস্মিত হইয়া দেখি যে, শান্তিরূপিণী, সাক্ষাৎ নিবৃত্তি শক্তির প্রতিকৃতি কুন্দনন্দিনী, সহসা বীর নারীর বেশে পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল! আমরা স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণন্তরে বীরত্বের প্রচলিত সংজ্ঞা ভুলিয়া যাই। ভাবি—অকপটে ভাবি——

জানে সে ক জন, ভাবে সে ক জন,
বীরপত্নী কিসে হয় ?

পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিয়া কুন্দকুসুম ম্রিয়মান হইয়াছিল—নৈরাশ্যের উপর নৈরাশ্য, যাতনার উপর যাতনা। চিত্তবৃত্তি সকল উদাসীন। সুতরাং হরিদাসী বৈষ্ণবীর অশ্লীল সংগীতে বিরক্ত হইয়া কমল ও সূর্য্যমুখী স্থানান্তরে গেলেন, তখন কুন্দ উঠিল না—চরণে তাহার গতিশক্তি ছিল কি না, সন্দেহ। কতক সারল্য

ধর্ম্মে, কতক বা ঘোর অন্য মনস্কতার অনুরোধে কুন্দনন্দিনী গানের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই—বড় শুনেও নাই। এই জন্য কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী যখন তাহাকে অনেক কথা বলিল, কুন্দ তাহার কতক বা শুনিল, কতক বা শুনিল না।

সেই দিন প্রদোষ কালে উদ্যান মধ্যস্থ বাপীতটে কুন্দনন্দিনী বসিয়া আছে। প্রকৃতিতে শান্তি বিরাজ করিতেছিল—শান্তির সৌন্দর্য্যে নীলপ্রভ দীর্ঘিকা ভাসিতেছিল। বাহ্য জগতের সেই শান্ত ভাবের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর অন্তর্জগৎ সমভাবাপন্ন। কুন্দ প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিল কি না, সন্দেহ। সরোবরের পরিষ্কার জলে নক্ষত্র ছায়া নাচিতেছিল, কুন্দ-হৃদয়ে সুখ দুঃখের প্রবাহ নাচিতেছিল। কেবলমাত্র নিঃশব্দে কুন্দকুসুমোপরি বকুল পুষ্প সকল ঝরিয়া পড়িতেছিল—মধুরে মধুর মিলিতেছিল! কুন্দনন্দিনী মনের দুঃখে ভাবিতেছিল—"ভালো, সবাই আগে মলো, আমি মলেম না কেন? ভাল, মানুষ মরিয়া কি নক্ষত্র হয়?" সহৃদয়া, প্রতিভাময়ী কুন্দ ভাবিল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র হয়? সেই ক্ষুদ্র হৃদয় মধ্যে সময়ে সময়ে গভীর চিন্তার তরঙ্গ উঠিত—যে ভাবের প্রবাহ কেবল কবির অন্তস্তলেই সম্ভব, তাহা কুন্দহৃদয়ে উথলিত—এই নক্ষত্রচিন্তা তাহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু এখন কুন্দ নগেন্দ্র প্রেমময়ী। কুন্দ সে প্রেমে বিবশা, উন্মাদিনী। নিরুদ্ধ প্রেমপ্রবাহ হৃদয়কে মথিত করিত। আজি সেই শান্তিময় বিজনে কুন্দ তাহা ভয়ে ভয়ে প্রকাশ করিতেছিল। কমলের কথায় একটু আশ্বাসিত হইয়াছিল——জানিয়াছিল নগেন্দ্র তাহাকে ভাল বাসেন। এ সম্বাদ কুন্দ ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, কেননা নগেন্দ্রের প্রেম কুন্দের কাছে আকাশকুসুম। তাহা তিনি ভাল বাসুন আর নাই বাসুন, কুন্দ তাঁহাকে একবার মন ভরিয়া ভাবিবে—কমল দিদির কথা সত্য হউক্ আর নাই হউক্, মিছা কথাকে

সত্য বলিয়া ভাবিবে! কুন্দ ভাবিতেছিল, কি গুণে সে নগেন্দ্রের হৃদয় অধিকার করিবে? কোন্ রূপ গুণে দুঃখিনী কুন্দকুসুম নগেন্দ্র দেবতার চরণে স্থান পাইবার যোগ্য? সৌন্দর্য্যসার কুন্দের মুখে আত্মগ্লানি শুনিতে বড় মধুর——বুঝি বারুণী, নীলিমারাশিতে ফুল্ল কোকনদে বসিয়া, স্বচ্ছজলে নিজ প্রতিবিম্ব পাত করিয়া স্বচক্ষে তাহা দেখিতেছেন, কিন্তু তৃপ্তিলাভ করিতেছেন না। আবার কুন্দ ভাবিল যে, সে অন্যের সুখের পথে কাঁটা হইতে বসিয়াছে—"যদি কমলের কথা সত্য হয়, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে তাদের ত অসুখী করিতেছি।" তা যে জীবন অন্যের অসুখকর, মহনীয়চরিতা কুন্দ তাহা রাখিতে চাহে না। সুধু মুখের কথা নয়, অকপটে কুন্দ মরিতে চাহিল—কুন্দ ডুবিয়া মরিতে চলিল। সেই সময়ে মাতার সেই ভীষণ স্বপ্ন তাহার মনে পড়িল। কুন্দের হৃদয় ক্ষমিত্ব প্রাপ্ত হইয়া অস্খলিত পদে মরিতে চলিল। কিন্তু কুন্দের মরা হইল না। নগেন্দ্র সেই বিজনে আঁধারে আসিয়া ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলিস্পর্শ করিলেন—কুন্দ আর মরিতে পারিল না। নগেন্দ্র যেন সহস্র মুখে অপরিমিত প্রেম পরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলেন। বলিলেন, শুন কুন্দ! এখন বিধবা বিবাহ চলিত হইতেছে, আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করিব। কুন্দ বলিল —'না।, কেন কুন্দ, বিধবা বিবাহ কি অশাস্ত্র? কুন্দ আবার বলিল—'না।, নগেন্দ্র বলিল, "তবে না কেন? বল, বল—বল—আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভাল বাসিবে কি না?" কুন্দ বলিল—'না।' বিধবা বিবাহ শাস্ত্রে আছে, তাহার জন্য নয়। তথাপি কুন্দ অন্তরীক্ষে বলিতে লাগিল 'না।' আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াও কুন্দ প্রকৃতি প্রলোভন হইতে দূরে রহিতে চায়, কেননা কুন্দ কমলের কথা মনে ভাবিতেছিল। সোণার সংসার ছারখার গেল! কি কাজ জীবনে? কেন অন্যের সুখের পথে কাঁটা হইব?

বাতদুলিত অরণ্যলতার মত মৃদুপ্রকৃতি কুন্দ কখনও উত্তর করিতে জানিত না। তাই নগেন্দ্র তাহাকে গৃহে রাখিয়া সূর্য্যমুখীর অন্বেষণে প্রবাসে বহির্গত হইলে শীতল প্রকৃতি কুন্দ প্রভুপত্নী হইয়াও হীরার কাছে দাসীর মত থাকিত। তাই যদি কেহ গৃহিণী কুন্দকে গৃহিণী ভাবিয়া কোন কথা কহিত, কুন্দ ভাবিত আমায় তামাসা করিতেছে। যেমন আর পাঁচ জনে খাইত, পরিত, কুন্দও তাই। প্রভুপত্নী কুন্দ বাস্তবিক দেওয়ানজিকে বড় ভয় করিত। দেওয়ানজি যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তবে কুন্দের বুক দুড় দুড় করিত। ইহার কারণ, নগেন্দ্র দেওয়ানকে যে পত্রগুলিন লিখিতেন, কুন্দ তাহাই চাহিয়া আনিয়া পড়িত। পড়িয়া, আর ফিরাইয়া দিত না। সেই গুলিন পাঠ তাহার সান্ধ্যা গায়ত্রী হইয়াছিল। সর্ব্বদা ভয়, পাছে দেওয়ান পত্রগুলি ফিরিয়া চায়। কুন্দের সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম! প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া তাহা কুন্দের হৃদয়ে নিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত আঘাত করিত। কুন্দ কথা জানিত না। তাই অদূরদর্শী নগেন্দ্র সে হৃদয়ের মহিমা প্রথমে অনুভব করিতে পারেন নাই। তাই বিবাহের পূর্ব্বে যখন কুন্দের সতীত্বে সন্দেহ করিয়া সূর্য্যমুখী বলিয়াছিল——"তুই বাড়ী হইতে এখনই দূর হ, নহিলে হীরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে"—তখন অপমানিতা অভাগিনীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই। কেবল তাহার গা কাঁপিয়াছিল। পাঠক দেখিবেন, সাধে কুন্দকে নিবৃত্তিশক্তির অবতার বলি নাই।

(ক্রমশঃ)

প্রলয়।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১

গম্ভিরে তখন করি সম্বোধন

মানবতনয় বলে,

হেরি সে করাল মূরতি ভয়াল
ছিয়া তিল নাহি টলে,—

২

"এ সুখের দিন হইল বিলীন,
ত্রিলোক সংহারী, আজ,
করিলে সংহার সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার,
ধাতার যত্নের কাজ।

৩

"এই শূন্য তলে, মিলি দলে দলে,
গ্রহ রবি শশী তারা,
ঘিরিয়া ঘিরিয়া ধাইত ছুটিয়া,
এবে সবে কক্ষ্য হারা।

৪

"দেখ প্রভাকর, ত্যজিয়া অম্বর,
প্রলয় আঁধারে পশে,
বুধ, শশধর, শুক্র, শনৈশ্চর
দেখ পড়িতেছে খসে।

৫

"দেখ, দেব, চেয়ে, শূন্য বিদারিয়ে,
ধাইছে নক্ষত্র রাশি,
গগনের তলে বেড়াইত জ্বলে,
কিম্বা ছায়াপথ বাসী।

৬

"পূরিয়া অম্বর শব্দ ভয়ঙ্কর
হইতেছে শুন ঘোর,

নক্ষত্র ফাটিছে, ভাঙ্গিয়া পড়িছে
ছিড়িয়া বন্ধন ডোর।

৭

"এ বিশ্ব ভবনে, বিধাতা যতনে
গড়িয়া রতন চয়,
চন্দ্রাতপ তলে ঝুলায়ে কৌশলে
করিল আলোকময়।

৮

"সে আলো নিবিল, আঁধারে ডুবিল
এ চারু বিশ্বের ঘর,—
আর না শোভিবে, আর না হেরিবে
সে শোভা নয়নে নর।

৯

"হের ধরাতল জলধির জল
কল্লোলে করিল গ্রাস,
নিরব অবনি নাহি প্রাণীধ্বনি
নিরব মানব বাস।

১০

"ছিল পৃথ্বিতল তরল অনল
তরঙ্গে আবৃত যবে,
বল কে জানিত বল কে ভাবিত
তখন মানব হবে?

১১

"না ছিল তপন শশীর কিরণ,
না ছিল নক্ষত্র চয়,

শূন্যের ক্রোড়েতে ধরিত্রি বেগেতে
ভ্রমিত অনলালয়।

১২

"ক্রমে দিল দেখা প্রভাকর রেখা
পূরব গগন ভালে,
উদিল চন্দ্রমা; বিকাশি সুষমা
তারা ফুটে নভোতলে।

১৩

"নিবিল অনল, দেখা দিল জল,
সলিলে অবনি ভাসে,
ধাতু শঙ্খালয় ক্রমে মীন চয়
জনমে সে নীর বাসে।

১৪

"বিদারিয়া নীর, ঊর্দ্ধে তুলি শির,
গিরিকুল দেখা দিল,
প্রকাণ্ড উরগ ভীষণ বিহগ
ক্রমে ক্রমে জনমিল।

১৫

"প্রক্ষালি তখন হিমাদ্রির চরণ
জলধি যাইত বহি,
প্রতীপ প্রস্তর তটের উপর
বসিত বিহঙ্গ অহি।

১৬

"সহস্র যোজন ব্যাপিয়া, কানন
উঠিল গগন ভেদি;

ভীম কলেবর প্রাণী ভয়ঙ্কর
গম্ভীর বিকট নাদী।

১৭

"সে বন মাঝারে কান্তারে কান্তারে
ফিরিত নির্ভয় চিতে ;
নাহি ছিল নর ; মানব সঞ্চার
নাহি ছিল অরণ্যেতে।

১৮

"ফুল না ফুটিত, ফল না ফলিত
সে কানন তরুশিরে,
বিজন কাঁপায়ে, সঙ্গিত ভাসায়ে,
পাখী না উড়িত ধীরে।

১৯

"সে সৃষ্টি ধাতার করিলে সংসার
যুগান্তে, প্রলয়ি, তুমি,
স্রষ্টা পুনর্ব্বার সৃজিলা সুন্দর
মৃণ্ময় মানব ভূমি।

২০

"জন্মিল মানব,— ধাতার গৌরব,—
প্রাণী আর নানা জাতি,
প্রকৃতি হাসিল বসুধা সাজিল
ছড়ায়ে রূপের ভাতি

২১

দেব তেজ সম নর পরাক্রম,
যুঝিয়া মোহের সনে,

বিজয় লভিল, এ মহী শাসিল
ভুজ বলে বীরগণে।

২২

"জান, হে সংহারী, যুগ অন্তকারী,
নরের অসীম বল,—
ধরা তুচ্ছ করে, গরবে নেহারে,
শাসিতে ত্রিদিব তল।

২৩

"যে শক্তি দুর্জ্জয়, দেখাইয়া ভয়,
মানবে, করিয়া দাস,
চাহিল রাখিতে বাঁধিয়া মহিতে,
নর বলে তার নাশ।

২৪

"অই গ্রহদল, ছাড়ি নভোস্থল,
খসিয়া পড়িছে যারা,
অই শশধর, অই প্রভাকর
অই ম্লান মুখী তারা,

২৫

"অই উর্ম্মিমালী ভয়াল কল্লোলী
জলধি ফুলিছে রোষে,
এই প্রভঞ্জন করি আস্ফালন
প্রলয় বারতা ঘোষে,

২৬

"অই ইরম্মদ, এ বিশ্ব বিপদ
হেরি যে বিকট হাসে,—

জড় সচেতন বিধির সৃজন
যা আছে ব্রহ্মাণ্ড বাসে,—

২৭

"সবে নরদাস, মানব বিলাস
সাধনে সকলে রত,
ভৃত্যভাব ধরি দিবস শর্ব্বরী
চরণ প্রান্তেতে নত।

২৮

"দম্ভে পদে দলি, পরায়ে শিকলি
রেখেছিল ধরি নর,
বাসনা পূরাল, প্রভুত্ব করিল
গরবে অবনি পর।

২৯

"ফুরাল সকলি, নর লীলাস্থলী
সংসার শ্মশান ময়,
প্রলয় করাল বদনে বিশাল
বসুধা পাইল লয়।"

৩০

বলিতে বলিতে লাগিল বহিতে
গণ্ড ভাসি অশ্রুধার,
ডাকিয়া আবার বলে—"হে শঙ্কর,
দেখ ধায় অন্ধকার।

৩১

"কিবা ক্ষতি তায়? এ ব্রহ্মাণ্ড লয়
হউক প্রলয়-জলে,

নিবুক ভাস্কর, গ্রহ নিশাকর
ডুবুক অতল তলে।

৩২

"এই সানুশিরে প্রলয় তিমিরে
যুগান্তের সাক্ষী আমি,
বলিব, শঙ্কর, রহস্য সুন্দর
শুনহে কৈলাস-স্বামী।

৩৩

"সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ত্রিগুণ বিষম
যে সৃজিল গুণাতীত,
যাহার পলকে আকাশ ফলকে
কোটি ভানু বিলম্বিত;

৩৪

তুমি, হে সংহারী, যার আজ্ঞাকারী,
করিছ ব্রহ্মাণ্ড লয়,
যার কৃপাবলে ত্রিদিব মণ্ডলে
নির্জ্জর অমর চয়;

৩৫

পুরুষ প্রধান সে দেব মহান
অমৃতে গড়িল নরে;
ভেবনা, প্রলয়ী, তুমি কালজয়ী
একা আজি এ সংসারে।

৩৬

অমর মানব, জান নাকি, ভব,
প্রলয়ে তার কি ভয়?

নিবুক ব্রহ্মাণ্ড, হয়ে শত খণ্ড
এ বিশ্ব পাউক লয়।

৩৭

"অনাদি অনন্ত, গভীর প্রশান্ত,
কারণ জলধি জলে
বুদ্বুদ এ নর, রঞ্জিত সুন্দর
কালের পবনে চলে।

৩৮

যার বলে ফুটে, নীর বক্ষে উঠে,
সে বিম্ব ভাসিয়া যায়,
তাহারই ইচ্ছায়, আপনি মিশায়
যবে কাল পূর্ণ হয়।"

৩৯

বলিতে বলিতে গভীর রবেতে
জলধি গরজে ঘোর,
উন্মত্তের প্রায় প্রভঞ্জন ধায়
দাপটে প্রকাশি জোর।

৪০

নিবিল ভাস্কর, লুপ্ত শশধর,
লুপ্ত তারাগ্রহ চয়,
প্রলয় তমসে বিশ্বসৃষ্টি পশে
ব্রহ্মাণ্ড পাইল লয়।

৪১

ভাঙ্গিল স্বপন, মেলিনু নয়ন,
দেখিনু রজনী শেষ,

উসার উরষে কিরণ বরষে,
অরুণ রঞ্জিয়া দেশ।

আফ্রিকা-পরিব্রাজক। *

মঙ্গোপার্ক।

প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক মঙ্গোপার্ক ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর, স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী ফাউলশিল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সেই গ্রামে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

* আফরিকার বিবরণ আমাদের দেশে অনেকে জানেন না। বিশেষতঃ বঙ্গভাষার তৎসম্বন্ধে কোনও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ না থাকাতে বঙ্গবাসীগণ, সেই মহাদেশের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত নহেন। আমাদের অভিলাষ, ক্রমে ক্রমে তাহা আমাদিগের পাঠক ও পাঠিকাবর্গের গোচর করি। সত্য বটে, যাঁহারা ইংরেজী অধ্যয়ন করিয়া তদ্দেশীয় ইতিহাসাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধে বিশেষ কিছুই জ্ঞাতব্য দেখিবেন না। কিন্তু বঙ্গ ভাষায় এতদ্বিষয়ের জ্ঞান, অকিঞ্চিৎকর মনে করিলেও অনিষ্টকর বোধ করা কর্ত্তব্য নহে। কি উপায়ে আফরিকার বিবরণ পাঠকবর্গের সমীপে উপহার প্রদান করিলে উহা তাঁহাদের গ্রাহ্য ও উপাদেয় হইতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া বোধ হইল, তদ্দেশগত পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও জীবনচরিত সংক্ষেপে বিবৃত করিলে তাঁহাদিগের নিতান্ত অরুচিকর হইবে না। আমাদের আফরিকা সম্বন্ধে জ্ঞান অতি অল্প। সুতরাং বাধ্য হইয়া অনুবাদ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইতেছে। উপস্থিত প্রবন্ধ Kington প্রণীত African Tra veller গ্রন্থের অনুবাদ। পাঠকবর্গ এতৎপাঠে কিঞ্চিন্মাত্র উপকার লাভ করিলেও অনুবাদক তদ্দেশের অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়া উপহারার্থ সমুপস্থিত করিতে যত্ন করিবে।

মঙ্গোপার্কের পিতা অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া পরম যত্নে নিজ গৃহে সন্তানগণের শিক্ষা প্রদান করিতেন। বাল্যকালে পার্ক এইরূপে পিতৃভবনে কিয়ৎকাল শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রাম সন্নিকটস্থ শেলকার্ক নগরের গ্রামার স্কুলে প্রেরণ করেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি কোনও এক সার্জ্জনের নিকট নিযুক্ত থাকেন। তথা হইতে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যথারীতি বিদ্যাভ্যাসে নিরত হয়েন।

শীতাদি অবকাশক্রমে তিনি যে দীর্ঘকাল অবসর পাইতেন, তত্তৎ সময় বৃথা ব্যয়, কিম্বা অন্য কোনও বিষয়ে প্রয়োগ না করিয়া প্রিয়বন্ধু উদ্ভিজ্‌বিদ্‌ ডিক্‌সন্‌ সাহেবের সহিত দেশ ভ্রমণে নিয়োজিত করিতেন। ফলতঃ তিনি সময় পাইলেই দেশ ভ্রমণ উপলক্ষে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন এবং এই হইতেই তাঁহার পর্য্যটনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

একদা লণ্ডন যাত্রাকালে, তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় এক সার্জ্জনের সহকারী নিযুক্ত করিয়া দেন; তদুপলক্ষে তিনি একবার এদেশে আইসেন। অল্প কাল মধ্যেই তিনি এ দেশ ত্যাগ করেন এবং একান্ত ভ্রমণলালসা প্রযুক্ত, ইংলণ্ডে "আফ্রিকার সভা" নামে যে এক মহাসভা আছে, তথায় আফ্রিকা পর্য্যটন মানসে আবেদন করেন। প্রথমবারে সেই সভার উদ্যোগে যে সকল লোক প্রেরিত হয়, তাহাদিগের যত্ন একেবারেই বিফল হয়। কিন্তু একবার বিফল মনোরথ হইয়া সমাজ ভগ্নোৎসাহ হয়েন নাই। উত্তর কালেরই সমাজের যত্নে ও উদ্যোগে আফ্রিকার অনেক বিষয় পরিজ্ঞাত ও সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। সদস্যগণ, পার্কের অপরিসীম সাহস, অবিচলিত উৎসাহ ও একান্ত পর্য্যটনানুরক্তি সন্দর্শনে হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকেই পর্য্যটক মনোনীত করেন। তিনি তাঁহাদিগের নিকট প্রচুর উপদেশ লইয়া আফ্রিকা যাত্রার উপক্রম করিলেন।

পার্ক ২২শে মে (১৭৯৫ খৃঃ অব্দ) পোর্টসমাউথ হইতে এক বাণিজ্য জাহাজে আরোহণ করিয়া পরবর্ত্তী মাসের ২১শে তারিখে গাম্বিয়া উপকূলে উত্তীর্ণ হইলেন।

কোন্ পথে ভ্রমণ আরম্ভ ও কোন্ পথে ভ্রমণ করিবেন, সভার সভ্যগণ-সহ পূর্ব্বেই তাহা সুস্থির করিয়াছিলেন। 'বাম্বুক, পথে যাইয়া 'নীজর, বা 'কোয়ারা, নদীর গতি নিরূপণ করাই যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য; আর 'তিম্বক্তু, ও 'হোসা, এই দুই সমৃদ্ধিশালী নগর, তথা পথিপ্রাপ্ত পার্শ্ববর্ত্তী ও সন্নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর এবং গ্রামাদি পরিদর্শন করিয়া, গাম্বিয়া বা অন্য কোন ঋজুপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, ইহাই তাঁহাদিগের সংকল্প ছিল।

তৎকাল মধ্য আফ্রিকার সমস্ত বিবরণ ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। সভা মনে করিয়াছিলেন, 'হোসা, এক নগর; বস্তুতঃ 'হোসা,নগর নহে। পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা তন্নামধারী নগর বিশিষ্ট এক বিস্তীর্ণ রাজ্য।

২১শে জুন 'জালিফ্রিতে, জাহাজ নোঙর করিলে, পার্ক তথা হইতে 'পাইসানিয়া, যাত্রা করিলেন। এই হইতেই তাঁহার আফ্রিকা পর্য্যটন আরম্ভ হইল। ডাক্তর লেভলী এবং আন্‌শ্লী নামক অন্য দুই জন মাত্র ইউরোপীয় বণিক এই 'ঈযালী,রাজ্যে তত্রত্য রাজার আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। তাহাদিগের সহিত অনেক কৃষ্ণনিগ্রো বণিক ছিল।

পার্ক, ডাঃ লেভলীর সাহায্যে 'মাণ্ডিঙ্গো, ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এবং যত পারিলেন, 'সৌদি, অর্থাৎ তত্রত্য কৃষ্ণব্যবসায়ী-গণের নিকট হইতে, মধ্য আফ্রিকার বিবরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি 'পাইসিনিয়াতেই জ্বর রোগে আক্রান্ত ও উত্থান শক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এইরূপ দুই মাস কাল অতীত

হইলে পর, সহযাত্রীগণের যত্ন ও সুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করিয়া গন্তব্য স্থানে প্রস্থানার্থ সচেষ্ট হইলেন।

তিনি দেখিলেন, সদ্যই এক দল বণিক, মধ্য আফ্রিকায় যাত্রা করিতেছে। কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে তিনি তাহাদিগের সহিত যাত্রা করিতে উদ্যোগ করিলেন। জন্সন্ নামা একজন নিগ্রো তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিল। জন্সন্, দেশীয় ও 'মাণ্ডিঙ্গো, উভয় ভাষাই জানিত। ডাঃ লেভলী, তাঁহাকে 'ডম্বা, নামক এক তরুণ ভৃত্য প্রদান করেন। এই তেজস্বী যুবা ভৃত্য কেবল মাণ্ডিঙ্গো নহে, মধ্য-আফ্রিকার বহুভাষায় কথা কহিতে পারিত। পার্ক যে বণিক দলে যাত্রা করিতে মানস করিলেন, তাহাদের নিকট হইতেই একটী তেজীয়ান ঘোটক ক্রয় করিয়া লইলেন। ঐ ঘোটকে আরোহণ করিয়া তিনি পর্য্যটন আরম্ভ করিলেন।

পার্কের চর্ম্ম-ভাণ্ডারে আহার সামগ্রী অতি অল্পই ছিল। তামাকু, বস্ত্র, ও আলঙ্কারিক প্রস্তরাদি তিনি আহার্য্য বস্তু ক্রয়ের জন্য রাখিলেন। এতদ্ভিন্ন ছাতি, দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র, দুই জোড় পিস্তল ও অন্যান্য লঘু সামগ্রী তাঁহার সঙ্গে ছিল। চারি জন অশ্ব ব্যবসায়ী—নিগ্রো মুসলমান তাঁহার ভৃত্যের ন্যায় আসিয়া জুটিল। উহাদের মধ্যে একজন কর্ম্মকার ছিল। এই ছয় জনেই তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি ও সম্মান করিত এবং তাঁহার অভিপ্রেত সম্পাদনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইত না। তাহাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার আশ্রয়েই তাহাদিগের যাত্রা শুভ ও নিরাপদ হইবে।

ডাঃ লেভলী ও আন্‌স্লী নামা বণিকদ্বয় গোপনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে পার্কের আর প্রত্যাগমন সন্দর্শন করিবেন না। তাঁহারা বেশ জানিতেন, আফ্রিকা, সিংহ ব্যাঘ্রাদি নানা হিংস্র শ্বাপদ-সমাকুলা এবং তাহার অধিবাসীগণও সেই শ্বাপদকুল হইতে বড়

অধিক ভদ্র কিম্বা সভ্য নহে। এরূপ দেশে পর্য্যটন, ও জানিয়া শুনিয়া মৃত্যুমুখে প্রবেশ, কার্য্যতঃ একই কথা। ফলতঃ আফ্রিকা যেমন ভীষণ জন্তু পরিপূর্ণ, এবং তথাকার লোক যেরূপ ক্রুর, বিশ্বাসহন্তা ও অনাতিথেয়, তাহাতে আফ্রিকা পর্য্যটন যে নিতান্ত দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিকতার কার্য্য তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সংশয় নাই।

তাঁহারা তাঁহাকে দুই দিবসের পথ অগ্রসর করিয়া দিয়া 'পাইসিনিয়ায়, প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পার্ক, জন্সনাদি ভৃত্য এবং দেশীয় বণিক দল সমভিব্যাহারে মহদুদ্যমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

প্রত্যেক নগরে এক এক জন সরদার বা তত্তুল্য কোনও ব্যক্তি থাকে উহারা যাত্রীদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করে। অতঃপর যে নগর পাওয়া গেল তাহার নাম 'মদিনা,। মদিনার রাজা বৃদ্ধ 'যাটা, ; ইনি পরম সাধু ও আতিথেয়। রাজা, সাদরে পার্ককে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি মেজর হটন নামা ভ্রমণকারীকে যথেষ্ট আদর ও সদয় ব্যবহার দ্বারা পরিতুষ্ট ও পরম উপকৃত করেন। পার্ক উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ রাজা মাদুর সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট ; তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন পার্শ্বে স্ত্রী ও পুরুষগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গান করিতেছে। পার্ক নত হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন। রাজা প্রতিসম্ভাষণ করিলে পর, তিনি স্বীয় পরিভ্রমণের তাবত উদ্দেশ্য ও বিবরণ বিবৃত করিলেন। রাজা শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সচ্ছন্দে নিরুদ্বেগে যাত্রার উপায় বিধান করিয়া দিলেন। তিনি তাঁহাকে একজন পথ প্রদর্শক প্রদান করিলেন এবং পথে যে সকল বিপদ সংঘটনের সম্ভাবনা, তত্তাবৎ অবগত করাইয়া দিলেন। পরিশেষে স্বয়ং তাহাদের নিরাপদ যাত্রা ও মঙ্গল জন্য ঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

পার্ক রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মদিনা হইতে প্রস্থান

করিলেন। রাত্রিতে তিনি 'কাঞ্জোয়ারে, পঁহুছিলেন, এবং আহারার্থ একটী মেষ ক্রয় করিলে, জন্‌সন ও অন্য এক নিগ্রো ভৃত্য তাহার শৃঙ্গ লইবার জন্য দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিল। পরে মূল কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, যে মেষের শৃঙ্গে 'সাফি, অর্থাৎ কবচ প্রস্তুত হয়। মোল্লারা কোরাণ হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া মেষশৃঙ্গ-নির্ম্মিত কোষে রাখিয়া এইরূপ 'সাফি, প্রস্তুত করে। ইহাকেই নিগ্রোগণ মহামূল্যে গ্রহণ করে; তাহাদিগের বিশ্বাস এরূপ 'সাফি, অদ্ভুত গুণ বিশিষ্ট।

৮ই তাঁহারা 'কোলোয়া, নামক বৃহৎ নগরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। তথায় দেখিলেন, কোন বৃক্ষোপরি বৃক্ষ-ত্বক নির্ম্মিত এক ঢকাকৃতি গাত্রসজ্জা রহিয়াছে। উহাকে 'মাম্বো জাম্বো, নামক মুখসধারী ভূতেরবেশ কহে। 'মাম্বো জাম্বোর, আবির্ভাব আর কিছুই নহে তত্রত্য স্ত্রীলোক ও ক্বচিৎ অন্যান্যের শাসন জন্য ভূত বিশেষের প্রহসনাভিনয় মাত্র। তাহার বিবরণ এই—

আফ্রিকার লোকেরা আমাদের দেশের কুলীনদিগের মত দুই চারি গণ্ডা বা যত অধিক প্রতিপালন-সক্ষম, তত রমণীরত্নের দ্বারা কুটীর উজ্জ্বল করে। তাহার ফলও তদনুরূপ; রমণীগণ বিসংবাদিনী হইয়া গৃহে তুমুল কোন্দল উপস্থিত করে। পরিশেষে উহাদিগের বিবাদ বিসংবাদ এতদুর বিভীষণ হইয়া উঠে, যে স্বামীর প্রেম, প্রিয়বাক্য, ভয়, শাসন, প্রহার সকলই বিবাদের ঐক্য বন্ধনের নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়। স্বামী নিরুপায় হইয়া তখন গৃহে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপন-জন্য 'মাম্বো জাম্বোর, উপাসনা করেন। স্বামী স্বয়ং বা তাহার কোনও উপদিষ্ট লোক এই 'মাম্বো জাম্বোর, বেশ ধারণ করিয়া, মুখে মুখস দিয়া, হস্তে স্থূল যষ্টি ধারণ করিয়া সায়ংকালে অরণ্য হইতে ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে গ্রামবাসী সকলকে স্বীয় আগমন

বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করে। তৎক্ষণাৎ সকলে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহার সম্মানার্থ 'বেণ্টাং, অর্থাৎ সাধারণ বৈঠকখানা গৃহে সমবেত হইয়া সভা করিয়া বসে। প্রথমে কেহই নিশ্চয় করিতে পারে না, কাহার জন্য এ "মাম্বোজাম্বোর" আবির্ভাব; সুতরাং বিবাহিতা বিবদমানা নারী-মাত্রেই বিষণ্ণ এবং সকলেই আমার জন্য আসিয়াছে, ভাবিয়া ভয়ে বিহ্বল হয়। এ দিকে অপরেরা তাহার সম্মানার্থ নৃত্য গীত আরম্ভ করিয়া দেয়, আর অন্য দিকে "মাম্বো" হস্তস্থিত বিপুল যষ্টি, গদার ন্যায় আস্ফালন পূর্ব্বক ভল্লূকের মত এক একবার চীৎকার করিয়া প্রাণী মাত্রকেই চমকিত ও কম্পান্বিত করে। "জাম্বোর" প্রকৃতি এরূপ কর্কশ, রূঢ় ও ভীতিব্যঞ্জক, যে আগমন বার্ত্তা পাইয়া কেহ লুক্কায়িত থাকিতেও সাহস করে না।

এই প্রকারে দ্বিপ্রহর রাত্রি অবসান হইলে পর, "মাম্বো" দোষিণীকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সকলে অমনি তাহাকে বলপূর্ব্বক উলঙ্গ করে, এবং একটী খুঁটিতে বাঁধিরা রাখে। "মাম্বো" স্বীয় যষ্টি দ্বারা তৎ-ক্ষণাৎ তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। পুরুষেরা হস্তে তালি দিয়া নৃত্য, ও স্ত্রীগণ ঘৃণাব্যঞ্জক নিন্দা-স্বরে কোলাহল করিতে থাকে। সপত্নীঘাতিনী মানিনীর জন্য 'মাম্বো জাম্বোর' যষ্টি অব্যর্থ মহৌষধ। প্রহারান্তে "মাম্বো" নিরুদ্দেশ হন। রাত্রি প্রভাতে এই ভয়াবহ অভিনয় সাঙ্গ হয়; নিদারুণ প্রহারে রোগ অপনীত হইলে দোষিণী প্রভাতে মুক্তিলাভ করে।

এক্ষণে "কোলোয়া" দর্শন সমাপ্ত করিয়া জলশূন্য মরুভূমি পার হইতে হইবে, এজন্য যাত্রীদল দ্রুত পদে চলিল। কোলোয়াতে তাহারা সমস্ত জলের ব্যাগ পূর্ণ করিয়া লইল। "বন্দোয়ে" যাইবার পথে উলির প্রান্তস্থ যে, কুজায় নামক নগর আছে, তাহারা তাহা সন্দর্শন করিল। 'কুজায় হইতে ' বন্দো, দুই দিবসের পথ ব্যবধান। তাহা নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ ও ভীষণ শ্বাপদে সমাকীর্ণ।

মরুভূমি অতিক্রম কালে তাহারা একটী বৃক্ষ প্রাপ্ত হইল। উহা খণ্ড খণ্ড বস্ত্রে পরিবৃত হইয়া অপরূপ দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছিল। পার্ক ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, উহারা ইহার এই রূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিল, নিকটে জল পাওয়া যাইবে, পরগামী পথিকদিগকে অবগত করাইবার জন্য পান্থ মাত্রেই ঐরূপ সমীপবর্ত্তী বৃক্ষে বস্ত্র খণ্ড দ্বারা নিদর্শন রক্ষা করে। এই রীতি অনুসারে সকলেই এক এক খণ্ড বস্ত্র বৃক্ষে বাঁধিয়া দিল। পার্ক ও দৃষ্টান্তের অনুকরণে এক খণ্ড সুন্দর বিচিত্র বসন এক শাখায় লম্বমান করিয়া দিলেন। বস্ত্র বন্ধন সমাপ্ত হইলে, তাহারা দূরে অগ্নিশিখা ও ধূমপুঞ্জ দেখিতে পাইল; এই ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া নিগ্রোগণ অনুমান করিল, নিশ্চয়ই দস্যু-গণ গ্রামবাসী নিরাশ্রয় লোকদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনাদের নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছে, তাহারা আর অগ্রসর হইল না। অদূরবর্ত্তী কূপ সমীপে উপনীত হইয়া পশুপাল ছাড়িয়া দিল এবং বিশ্রামার্থ তথায় উপবেশন করিল। ইহাতেও তাহারা সুস্থির হইতে পারিল না। বন্দুকের শব্দে তাঁহাদিগের বড়ই আশঙ্কা হইতে লাগিল। তখন সকলেই সভয় ও সচকিত হইয়া রহিল, না অতর্কীত ভাবে বিপদে পতিত হইতে হয়। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা বিপদের সীমায় পদার্পণ করে নাই।

অনতিবিলম্বে তাহারা "কুরকারাণ" নামক মুসলমানদিগের নগরে উপস্থিত হইল। উক্ত নগর উচ্চ মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত, উহার মধ্যভাগে এক মস্‌জিদ্ আছে। তাহার 'মরাবু' অর্থাৎ মোল্লা, পার্ককে বহুতর আরবী গ্রন্থ দেখাইল, এবং কাহারও দুই এক চরণ পাঠ করিয়া "মণ্ডিঙ্গো" ভাষায় তাহার ব্যাখা করিয়া বুঝাইয়া দিল।

২১শে ডিসেম্বর তাহারা "কুরকারণ" ত্যাগ করিয়া তত্রত্য রাজ-ধানী 'ফতেকুন্দে' প্রবেশ করিল। 'ফতেকুন্দ' 'বন্দো' রাজ্যের

রাজধানী, রাজার নাম আলমানি। তিনি তথায় এক সম্ভ্রান্ত 'শ্লাণ্টে, অর্থাৎ পারিষদ ভবনে নিমন্ত্রিত হইলেন। ফতেকুন্দ রাজ, নামে মাত-মুর, কার্য্যে তিনি সম্পূর্ণ পৌত্তলিক বা জড়োপাসক। তিনি বিলক্ষণ ভদ্র, কিন্তু পার্ক তাহার ভদ্রতার উপর নির্ভর করিতে পারিলেন না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তিনি মেজর হটন নামা ভ্রমণকারীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেন ;. পার্কের মনে চিন্তার উদয় হইল, পরিশেষে ইনিই না আবার সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। পার্ক, সসম্মানে পলায়নের পন্থান্বেষণ করিতে লাগিলেন।

কেন যে লোকে বিষম কষ্টকর, নানা বিপদ্ভয়জড়িত, এতাদৃশ দুরূহ পর্য্যটন করে, রাজা তাহা আপন সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরিশেষে ইহাই তাঁহার নিকট চরম সিদ্ধান্তরূপে প্রতীত হইল, যে ইহারা গুপ্ত বণিক না হইয়া যায় না। নতুবা এ ভ্রমণের দ্বিতীয় অর্থ কি? রাজা, পার্কের নীলবর্ণের কোট এবং তদু-পরি ন্যস্ত পীতবর্ণের পিত্তল বন্ধন গ্রন্থি চমৎকৃতের ন্যায় সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিলাষ হইল, উহা যেন তাঁহাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদত্ত হয়। পার্ক, অনুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া অঙ্গাবরণ হইতে উহা উন্মোচন পূর্ব্বক রাজপদে প্রদান করিলেন। রাজা পরম তুষ্ট হইয়া পার্ককে প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রত্যুপহার প্রদান করিলেন।

রাজা আলমানি দেখিলেন, পরিবারস্থ রমনীগণ শ্বেতমনুষ্য দর্শনের নিমিত্ত নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। পার্ক তখন রাজাজ্ঞা ক্রমে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, অমনি অন্তঃপুরিকাগণ, বিশাল নয়নে, গ্রীবা উন্নত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, এবং ইহা দাও, উহা দাও বলিয়া বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। পার্কের তুষার-ধবল অঙ্গ-কান্তি এবং সুচারু উন্নত নাসিকা তাহাদের মনঃপূত হইল না। তাহারা

সে সমস্তের নিন্দা করিতে লাগিল। এবং কি কারণে তাহার চর্ম্ম নৈসর্গিক মসীত্ব পরিত্যাগ করিয়া বর্ণান্তর আশ্রয় করিয়াছে, তদ্বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হইল। বিচারের সিদ্ধান্ত এই হইল যে, শৈশবে দুগ্ধে মগ্ন করিয়া রাখাতে ত্বকের অসীতভাব দূরীভূত হইয়াছে, আর নাসার অনুচিত দৈর্ঘ্য, অবশ্যই শৈশব কালীন পুনঃ পুনঃ আকর্ষণের ফল। এই সিদ্ধান্ত, সেই নারী সভায় সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়া গৃহীত হইল। গৌরাঙ্গ পার্কও রসিকতার ভঙ্গীতে তাহাদিগের ভ্রমর-কৃষ্ণ-কান্তি ও শায়িত নাসিকার প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা তোষামোদ বুঝিতে পারিয়া বলিল, এ ‘মধুমুখ’ অর্থাৎ তোষামোদ প্রয়োগ করিতেছে। তাহারা আরও বলিল, ‘মধুমুখ’ কোন নিগ্রোই ভাল বাসে না। পার্ক অপ্রতিভ হইলেন।

বিদায় গ্রহণ কালে, পার্ক, রমণীগণের নিকট এক ভাণ্ড মধু ও কএকটী মৎস্য প্রাপ্ত হইলেন। রাজা তাঁহাকে পাঁচটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। এবং তাঁহার থলিয়ায় কি আছে, তাহার পরীক্ষা না করিয়াই বিদায় প্রদান করিলেন।

যত দিন না অধিকতর ভদ্র ও আতিথেয় লোকের রাজ্য পাওয়া যায়, তত দিন রাত্রিযোগে গমন করিব, সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ স্থির করিল। দস্যুবৃত্ত লোকের হস্ত হইতে আত্মরক্ষাই ঐরূপ অনুষ্ঠানের হেতু। তদনুসারে নিশীথকালে জনগণ নীরব ও নিদ্রাভিভূত হইয়া নিস্তব্ধ হইলে তাঁহারা নগর ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। নগর ত্যাগ করিয়া পার্ক দেখিলেন, যেন কোন অপরিচিত লোকান্তরে উপনীত হইয়াছেন। দৃশ্য সমস্তই নূতন, প্রান্তর নিস্তব্ধ, নৈশবায়ু প্রবল বেগে বহমান, অরণ্যের অভাবনীয় গভীর নিভৃতি, দূরস্থিত আরণ্য জীবের বিকট চীৎকার ধ্বনি, গুল্মগৃহানুসঞ্চারী শ্বাপদ কুলের ছায়াকৃতি অস্পষ্টাকার অহিকুলের হৃৎকম্পকর ফস্ ফস্ শব্দ। এই সমুদয় একত্রে

মিলিয়া তাহাদিগের মনে নানা বৃত্তির উদ্রেক করিয়া নানারঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

'বন্দোর' অধিবাসীগণকে 'কোলা, কহে। কোলারা স্বভাবতঃ নম্র প্রকৃতি। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মই তাহাদের চিত্তবিকৃতির কারণ। এক্ষণে তাহারা বিধর্ম্মী ও বিদেশীয়ের প্রতি কোনরূপ সদ্‌গুণ প্রদর্শনে তাদৃশ তৎপর নহে। 'মাণ্ডিঙ্গো, লোকদিগের সহিত তুলনা করিলে ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বৃত্ত, অশিষ্ট ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যাত্রীদল 'বন্দো, পরিত্যাগ করিয়া 'কাজো-আগা, রাজ্যে প্রবেশ করিল। ইহার অধিবাসীগণকে 'শেরাচুলী, কহে। 'কাজানা, রাজ্যের অন্তর্গত 'যোয়াগ, নগরে প্রবেশ করিলে, কি কারণে বলা যায় না, তত্রত্য গোরা মুসলমান ভূটি, পার্ক প্রতি সমাদর ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না। তথায় অবস্থান কালে, এক দল অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহাকে রাজসমীপে উপনীত করিবার জন্য রাজভবন 'মা-আনায়, লইয়া চলিল। পার্ক উপস্থিত হইলে, রাজা পথকরের জন্য বিষম পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; তিনি অগত্যা বন্দো রাজ প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রা পঞ্চ প্রদান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও রাজার মন উঠিল না; তিনি তাঁহার পুটুলী খুলিয়া যাবতীয় মুল্যবান বস্তু আত্মসাৎ করিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার সহযাত্রীগণ তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদান করিল। জন্‌সন্ কহিল, পাথেয় সম্বল বিনা পদমাত্র অগ্রসর হওয়া অনুচিত ও অসম্ভব। এই সুচতুর ভৃত্য কিঞ্চিৎ অর্থ গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, অধুনা তাহা তাহাদিগের জীবনোপায় হইয়াও জীবনোপায় হইতে পারিল না। ভূটি অর্থ গোপন ব্যাপারের ছন্দাংশ জানিতে পারিলে হয়ত তাহাদের রক্ষা

পাওয়া কঠিন হইবে। এই রূপে তাহারা নানাভয়ে ভীত হইয়া যৎ-
পরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে লাগিল।

নিরাহারে পার্ক একান্ত পীড়িত হইলেন, তিনি কাতর হইয়া মৃৎ-
শয্যায় উপবেশন করিলেন। ডেম্বা আসিয়া শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল;
এমন সময়ে এক বর্ষীয়সী তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,
তোমাদের কি আহার হয় নাই? বালক উত্তর করিল, 'না মা রাজা
আমাদের সকল অর্থ হরণ করিয়াছেন।' বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া মস্তক-
স্থিত বাজরা নামাইয়া পার্ককে প্রচুর বাদাম প্রদান করিল। পার্ক
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য উত্থান করিতেছেন, এমন সময়ে সেই নিঃস্বার্থ
পরোপকারিণী প্রাচীনা, প্রশংসার অপেক্ষা না করিয়াই সত্বরা হইয়া
প্রস্থান করিল।

পর দিন প্রাতঃকালে পার্ক 'কাসন, রাজ্যের অধিপতি ডেম্বোসে-
গোর ভ্রাতষ্পুত্র সহ নগর পরিত্যাগ করিয়া ছয়টী ভারবাহী গর্দ্দভ এবং
ত্রিশ জন লোকসহ নিঃশঙ্ক চিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভৃত্য
জন্‌সন্‌, অনিমেষ নয়নে পথি পার্শ্বস্থিত যাবতীয় বৃক্ষাবলী সন্দর্শন
করিতেকরিতে চলিল; যেন কোন বৃক্ষ বিশেষে তাহার বিশেষ প্রয়োজন
আছে। অনন্তর সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আহ্লাদ সহকারে 'যোয়াগ'
নগরে ক্রীত এক ধবল কুক্কুট-শাবক বাহির করিয়া পথিপ্রাপ্ত কোন
বৃক্ষের শাখায় বন্ধন করিয়া দিল। এই রূপ অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য
এই, তাহারা নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে; পথে
দস্যু তস্করাদির আশঙ্কা থাকিবে না। স্বভাবের ন্যায় জাতীয় সংস্কা-
রও দূর করা নিতান্ত কঠিন। জন্‌সন্‌, ইংলণ্ডে সাত বৎসর কাল অব-
স্থিতি করেন, তথাপি লৌকিকতা ও দেশাচার সিদ্ধ ক্রিয়াকলাপের
দাস ছিল।

যে সকল লোক পার্কের পরিচর্য্যা স্বীকার করিয়া অনুগমন করিয়া-

ছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন দেশীয় কর্ম্মকার ছিল। ‘কুমাবারি, নামক গ্রামে তাহার বাস। তথায় পঁহুছিলে উঁহার বৃদ্ধা জননী ও অন্যান্য পুরবাসী আত্মীয়গণ উঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া বহু দিনান্তর সাক্ষাতুল্লাসে, বন্দুকাদির শব্দে উৎসব ধ্বনি করিয়া সাক্ষাৎকার মানসে অগ্রসর হইল। মাতা, অন্ধ ছিলেন, কিছুই দেখিতে পাইতেন না। প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি হস্ত প্রসারণ করিলেন। বহুদিন পরে পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাহার বিচ্ছেদ-তপ্ত-হৃদয়, সুশীতল হইল। পুত্র-মুখ নিঃসৃত অনুপম বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। পার্ক এ স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, আফরিক ও ইউরোপীয় লোকে শত পার্থক্য থাকিলেও ঈশ্বর-দত্ত হৃদয়ের ভাব কখন দ্বিধা হইবার নহে।

অধিপতি ‘ডেম্বোসেগো, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং সদয় হইয়া সন্নিকটস্থ ‘কা-আর্টা, রাজ্যের প্রান্তদেশে উপস্থাপিত করিবার জন্য এক দল রক্ষী সেনা প্রদান করিলেন। নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহে আফ্রিকার এই অন্তর্দ্দেশ একান্ত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সরল বর্ত্ম সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, দেখিয়া তাঁহাকে দূরতর বক্র পথেরই অনুসরণ করিতে হইল। ১লা ফিব্রুয়ারি তিনি কা-আর্টা রাজ্যের রাজধানী ‘কেমা, নগরে পদার্পণ করিলেন। অনতিবিলম্বে তিনি সংবাদ পাইলেন, রাজা স্বাগত সম্ভাষণ করিয়াছেন; এবং সংবর্দ্ধনা পুরঃসর, দূরবর্ত্তী বৃহৎ কুটীরে তাঁহার আবাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

তিনি দেখিলেন, দর্শকের আর বিরতি নাই। শ্বেত খ্রীষ্টান মনুষ্য দর্শন জন্য, দলে দলে অবিশ্রান্ত লোক আসিয়া কুটীরের জনতা বৃদ্ধি করিতেছে। এক দল যাইতেছে, অন্য দল আসিয়া তাহাদিগের স্থান অধিকার করিতেছে। সেই দল নিষ্ক্রান্ত না হইতে হইতে, অপর দল

গৃহ প্রাঙ্গনে সমুপস্থিত। তিনি যাবৎ সেই স্থানে অবস্থিতি করেন, তাবৎ দর্শক সমাগম নিবৃত্ত হয় নাই।

পার্ক রাজ দর্শনে যাইয়া দেখিলেন, স্তূপাকার মৃৎখণ্ডোপরি ব্যাঘ্র-চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া রাজা সমাসীন রহিয়াছেন। উহাই তাঁহার সিংহা-সমাধিবেশন। দক্ষিণ পার্শ্বে যোদ্ধৃবর্গ এবং বামভাগে স্ত্রীলোক ও সন্তানেরা শ্রেণীবদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া সভায় বার দিতেছে। পার্ক রাজ সন্নিকর্ষে উপস্থিত হইয়া সমুচিত সম্মান সহকারে অভিবাদন করিলেন। রাজা, তৎপ্রমুখাৎ তাঁহার অদ্ভুত পর্য্যটন বৃত্তান্ত আক-র্ণন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর তিনি এই বলিয়া পার্ককে পরামর্শ দিলেন, যে অচিরেই যুদ্ধ বিগ্রহ হইবে, অত-এব যাবৎ না সংগ্রাম নিবৃত্ত পায়, তাবৎ 'কাসন, নগরে অবস্থানই পরামর্শাসিদ্ধ। রাজার পরামর্শ অতি সৎ পরামর্শ, কিন্তু পার্ক তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, গ্রীষ্মকাল উপস্থিত, এই বেলা সমীপবর্ত্তী রাজ্যগুলি অতিক্রম না করিলে বর্ষা ব্য-তীত তাদৃশ পূর্ব্ববর্ত্তী শুষ্ক-মরু ভূমি অতিক্রমণ করিতে পারিবেন না। অন্য ঋতুতে জলাভাবে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইবে।

অনন্তর নগর ত্যাগ অবধারিত হইলে, 'কা-আর্টা, রাজ পার্ককে বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলেন এবং রক্ষা স্বরূপ 'যারা, নগরে পঁহু-ছিয়া দিবার জন্য এক দল অশ্বারোহী সেনা প্রদান করিলেন। সেই সঙ্গে তিন জন রাজপুত্র, দুইশত অশ্ব লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হওনানন্তর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সংগ্রাম ঘটিত উপদ্রব তিনি শীঘ্রই সন্দর্শন ও হৃদয়ঙ্গম করি-লেন। পরবর্ত্তী নগরে অবস্থান কালে এক দল সশস্ত্র মুর, নগর দ্বারে প্রবেশ পূর্ব্বক গবাদি পশু হরণ করিয়া প্রস্থান করিল। উহাদের বন্দুক ত্যক্ত গুলি এক জন নিগ্রো অশ্বারোহীর এক পদ ভেদ করিয়া

অপর পদে প্রবেশ করে। সমভিব্যাহারী লোকগণ তাহাকে নগরাভ্যন্তরে লইয়া চলিল। উহার মাতা শোকে অধৈর্য্য হইয়া আর্ত্তস্বরে পুত্রের গুণ গান করিতে করিতে চলিল। আহত নিগ্রো ও আত্মীয় বন্ধুগণ, অঙ্গচ্ছেদ পূর্ব্বক গুলি উদ্ধার করিতে স্বীকৃত হইল না; অতএব জীবনের আশা সত্ত্বেও ঐ নিগ্রো সেই রজনীতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

১৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি “লুদামর” রাজ্যের অন্তর্গত “সীমবাগ” নগর অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পার্কের পূর্ব্বগামী পরিব্রাট্ মেজর হটন, এই “সীমবাগ” পর্য্যন্ত প্রবেশ করেন। এই নগর হইতে তিনি ডাক্তার লেভলীর নিকট পেন্‌সিল্ দিয়া এক পত্র লিখেন, উহাই তাঁহার শেষ পত্র। অতঃপর ঐ পরিব্রাজকের অন্য কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। নগর পুরোবর্ত্তী বিশাল মরু অতিক্রম কালে তিনি দস্যুবৃত্ত নিষ্ঠুর মুরদিগের হস্তে পতিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হয়েন। এবং তাহাদিগেরই হস্তে স্বীয় বহু মূল্য জীবন বিসর্জ্জন করেন।

অতঃপর পার্ক, যে প্রদেশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, তত্রত্য অধিবাসিগণ কুমুদ জাতীয় জলজ পুষ্পের বীজ অথবা শস্য হইতে এক প্রকার সুখাদ্য রুটি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করে। ঐ শস্যকে প্রথমে সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিয়া উদূখলে চূর্ণ করে; পরে তৎচূর্ণ জলে গুলিয়া পিষ্টক অথবা রুটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রৌদ্রোত্তাপে শুখাইতে দেয়। সুগন্ধে ও স্বাদুতায় এবংবিধ পিষ্টক অতীব উপাদেয়।

পার্কের ভেইসি রাজার রাজ্যে বাসকালে যে যুদ্ধ প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে দৃষ্ট হইল। প্রতিপক্ষ বামবারা রাজ মানসঙ্গ সেনা লইয়া তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন, গ্রাম দাহ ও হতভাগ্য অধিবাসীদিগকে বন্দীদশায় নিক্ষেপ করিয়া রাজ্যে অভাবনীয় উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতোপরি যে সকল দুরাক্রম্য স্থান ছিল,

রাজা ভেইসী তাহার সংস্কার ও সংরক্ষণ কার্য্যে সযত্ন রহিলেন, এ দিকে তাঁহার রাজ্য উচ্ছন্ন প্রায় হইল।

৫ই মার্চ্চ সায়ংকালে "দল্লী" নগর দৃষ্ট হইল। আফরিকার অভ্যন্তরে কোনও শ্বেত পুরুষ এপর্য্যন্ত এতদূর আগমন করেন নাই। সুতরাং গল্পপ্রায় শ্রুত সেই শ্বেত মনুষ্য দর্শন জন্য তত্রত্য লোকগণ এত অধিক সংখ্যায় তথায় উপস্থিত হইল যে, পার্ক অগত্যা বিশ্রাম ব্যপদেশে লোকারণ্য ত্যাগ করিয়া অনতিদূরবর্ত্তী 'সামী' নামক গ্রামে যাইয়া লোক-পিঞ্জর হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন।

এই স্থান হইতে 'গম্বো' রাজ্য পঁহুছিতে দুই দিন লাগে। ঐ রাজ্যের রাজা পৌত্তলিক ছিলেন। রাজা পৌত্তলিক এবং রাজধানী সন্নিহিত; এই বলিয়া পার্ক, প্রবল মুরদিগ হইতে তত আশঙ্কা করিলেন না। রাজ্ঞাদেশ ক্রমে তিনি তৎসমীপে উপনীত হইলেন। শ্বেত মনুষ্যের সৎকার করিলেন বলিয়া রাজার মনে গৌরব-সঞ্চার হইল। যদিও এই নিগ্রোগণ অঙ্গ সৌষ্ঠব বর্জ্জিত, কদাকার এবং যদিও ইহারা বিদ্যালোকে নিতান্ত বঞ্চিত, তথাপি ইহাদের সুশীল ব্যবহারে পরম প্রীত হইতে হয়; এবং ইহাদের সাধু জনোচিত সৌজনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। নৃশংস স্বভাব বর্ব্বর মুরদিগের সহিত ইহাদের তুলনা করিয়া পার্ক মুক্তকণ্ঠে ইহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

পার্ক তথায় আমোদে কাল হরণ করিতেছেন, নিগ্রোগণের সহবাসে বিদেশে সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া কিছুকালের নিমিত্ত বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছেন; এমন সময়ে একদল সশস্ত্র মুরসেনা দেখিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহারা পার্ক সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মুরপতি আলির সন্দেশ বিজ্ঞাপন করিল। আলির সহধর্ম্মিণী ফতিমা, খৃষ্টান ইতিহাস শ্রবণ করিয়া সেই বর্ণের এক ব্যক্তিকে দর্শন করিবার জন্য

কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছেন, অতএব আলির আজ্ঞা, তাঁহাকে 'বেনৌমে, যাইতে হইবে। তাহারা আরও কহিল, পার্ককে স্থির নিশ্চয় তাহাদিগের প্রভুর শিবিরে উপস্থিত হইতে হইবে; তাঁহার আজ্ঞা কখনই ব্যর্থ হইবে না। অসম্মতি প্রকাশিলে তাঁহারা আদেশক্রমে বল পূর্ব্বক তাঁহাকে 'বেনৌমে, লইয়া যাইবে।

'বেনৌম, তথা হইতে বহু দিনের পথ। উহার পথ, বালুকাময় মরুভূমির উপর দিয়া বিস্তারিত। এই হেতু পথে জলকষ্ট উপস্থিত হইলে পার্ক স্বয়ংও বন্দীকর্ত্তা নেতৃগণ শুষ্ক কণ্ঠে পিপাসা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

১২ই তারিখে 'বেনৌম, নগর তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। দৃষ্ট হইল, অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগে বহুসংখ্য তাঁবু বিশৃঙ্খলভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁবু গুলি অপারিষ্কৃত ও কদর্য্য। উহার ভিতরে অশ্ব, গো, উষ্ট্র, মেষাদি গ্রাম্য পশুপাল আবদ্ধ রহিয়াছে। কএক জন লোক দূরে কূপশ্রেণী হইতে জলোত্তলন করিতেছিল. পার্ককে দেখিতে পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল, এবং বৈধর্ম্মিক প্রতি সামান্য ইতরের ন্যায় অভদ্র ব্যবহারে বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ তাঁহার পরিধেয় আকর্ষণ পূর্ব্বক, কেহ শিরস্ত্রান হরণ পূর্ব্বক অসভ্যোচিত রসিকতা আরম্ভ করিল। অন্য এক তত্ত্বানুসন্ধায়ী মুর, তাঁহাকে দণ্ডায়মান করিয়া অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার বোতাম পরীক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর পার্ক, রাজ পটমণ্ডপে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, আলির সম্মুখে বহুতর লোক উপস্থিত। মন্ত্রদাতা সচীব, শমনপ্রাণ পারিষদ, চিত্ততোষক বিদূষক (মোসাহেব) ও অন্যান্য পার্শ্বচর, সকলেই সভাভূমে বিদ্যমান। সভার দ্বার, নরনারী উভয় জাতির নিকটই অবারিত, সুতরাং রমণী মুখমণ্ডলীতে সভা দ্বিগুণ উজ্জ্বলিত। আলি, কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্ম গদিতে সমাসীন রহিয়াছেন। পরিচারিকা সম্মুখে দর্পণ

হস্তে দণ্ডায়মানা; আলি, দর্পণস্থ প্রতিবিম্বোপরি নয়ন স্থির রাখিয়া কাঁচি হস্তে গোপ কাটিতেছেন;—দৃশ্য মন্দ নয়! মুরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বৈদেশিক আরবী ভাষায় বাক্যলাপ করিতে পারে কি না? প্রত্যুত্তরে জানিলেন, আরবী ভাষা তাঁহার পরিজ্ঞাত নহে। ঘৃণাবশতঃ আর কোনও বাক্যোত্থাপন করিলেন না। রমণীগণ শ্বেত মনুষ্য সন্দর্শনে অভূতপূর্ব্ব মন্যমানা হইয়া তৎপ্রমুখাৎ সবিশেষ পরিচয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে উৎসুক হইল এবং একে বারে সহস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। তিনি যত পারিলেন, উত্তর করিলেন; অনন্তর রমণীগণ সোৎসুক নয়নে তাঁহার পরিচ্ছদাদি পরীক্ষা করিতে লাগিল; তাঁহার পকেটে কি আছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পার্কের দেহকান্তি অমানুষী; এইরূপ বিশ্বাসাপন্না রমণীগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পার্ক, কোট খুলিয়া স্বীয় দেহকান্তি প্রদর্শন করিলেন।

সন্ধ্যা হইলে মোল্লা প্রার্থনা-শ্রাবণ-উচ্চারণ করিল; আলি এক্ষণে গাত্রোত্থান করিবেন। তাঁহার গাত্রোত্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক জন মুর, পার্ককে কহিল; আলি তোমাকে কিঞ্চিৎ আহার করাইতে চাহেন। পার্ক এই বাক্যে সম্মুখে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, কয়েক জন লোক এক বন্য বরাহ রজ্জুবদ্ধ করিয়া লইয়া আসিতেছে। শূকর উপস্থিত করিয়া তাঁবুর রজ্জুতে বন্ধন করিয়া দিল। আলি ইঙ্গিতে আদেশ করিলেন, পার্ক এই শূকর হত্যা করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করুক। ব্যাপার মন্দ নয়! কিন্তু পার্ক মনে মনে বিবেচনা করিলেন, মুসলমানেরা এই প্রাণীকে অতি জঘন্য বলিয়া ঘৃণা করে। যদিও আহার ভঙ্গ হেতু নিদারুণ কষ্ট হইতেছে এবং ইহা অতি উপাদেয় সামগ্রী, তথাপি ইহা আহার করা যুক্তি সঙ্গত নহে। প্রকাশ্যে কহিলেন, তিনি তদ্বিধ খাদ্য কখন স্পর্শও করেন নাই।

অনন্তর মুরেরা সম্ভাবিত আমোদ লাভে হতাশ হইয়া বিবেচনা

করিল; খ্রীষ্টানদিগের সহিত শূকর কুলের চির বিরোধ ও চির শক্রতা থাকিবে, নতুবা তাহারা ঈদৃশ অখাদ্য ভক্ষণ করিবে কেন? এইরূপ বিবেচনা করিয়া উহারা ঐ বন্য জীবকে মুক্তবন্ধন করিয়া দিল; সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল, চিরশক্র খ্রীষ্টানকে অবশ্যই আক্রমণ করিবে। কিন্তু আরণ্যশূকর, খ্রীষ্টান চিনিল না, যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই ক্ষত বিক্ষত করিয়া রাজগদির অধোভাগে লুক্কায়িত হইল। শূকর বড় নির্ব্বোধ, নতুবা আলিকে বরাহ বাহন করিবে কেন?

এক দল মুর, পার্ককে এক কুটীরে লইয়া চলিল। তথায় কুটীরাভ্যন্তরে অন্য এক আরণ্য শূকর বদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টানের উত্যক্তি জন্মাইবার জন্যই মুরেরা তাহার কুটীরে উহাকে বাঁধিয়া দেয়। পার্ক দেখিলেন, ঐ পশু লইয়া এক দল বালক ক্রীড়া করিতেছে। কেহ হাসিতেছে, কেহ বেত্ত মারিতেছে, কেহ বা উহার স্থূল কণ্ঠ বিনিসৃত সুমিষ্ট রবের অনুকরণ করিতেছে। ক্রীড়াতৎপর বালকগণের উত্তেজনায় শূকর এমনি উত্যক্ত হইয়াছিল যে, কোনও বালক নিকটে আসিলেই অবনত কন্ধরে বিষম বেগে তৎপ্রতি ধাবিত হইতে লাগিল।

শ্বেত মনুষ্য সন্দর্শন জন্য তাঁহার কুটীরে এক দল লোক উপস্থিত হইল এবং সুতীক্ষ্ণ নয়নে তাঁহার অবয়ব সমবলোকন করিতে লাগিল। তাহারা সন্দেহপ্লুত মনে তাদৃশ অমানুষিক জীবের হস্তাঙ্গুলি এবং গূঢ়াচ্ছন্ন চরণাঙ্গুলি গনণা করিয়া দেখিল অতিরিক্ত কিছু আছে কি না? কি প্রকারে পিরাণ ধারণ করেন, তিনি তৎসমুদায় প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের কৌতুহল নিবৃত্ত করিলেন।

কিন্তু প্রতি দিন তাহারা পার্কের প্রতি নিতান্ত অন্যায় অভদ্র ব্যবহার আরম্ভ করিল। উত্তরোত্তর তাহাদের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আলি তাঁহাকে নিত্য নুতন পদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এক দিন তাঁহাকে ক্ষৌরকার কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া শিশুরাজ পুত্রের

শিরোমুণ্ডন করিতে আদেশ করিলেন। পার্ক ক্ষৌরকার হইয়া ক্ষুর চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু অনভ্যস্ততা প্রযুক্ত বালকের শিরস্ত্বক কাটিয়া গেল; তাহা দেখিয়া আলির আজ্ঞায় আরব্ধ কার্য্য অর্দ্ধসমাপিতাবস্থায়ই স্থগিত রহিল।

১৮ই মুরেরা ভৃত্য জন্‌সন্‌কে বন্দী করিয়া আলি সন্নিধানে উপস্থিত করিল। বিশেষতঃ, পার্ক যারা, নগরে যে সমস্ত বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া আইসেন, উহারা সে সমস্তও অধিকার করিয়া লইল। আলি, পার্কের সমুদায় বস্ত্র গ্রহণ করিলেন; তিনি বহু প্রার্থনায় এক খণ্ডও ফিরিয়া পাইলেন না। আলি কেবল গাত্র বস্ত্র লইয়া ক্ষান্ত থাকিলেও পার্ক আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতেন; কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ সকল বস্তুতেই বঞ্চিত হইলেন। আলি বস্ত্র লইলেন, দিঙ্‌নিরূপক যন্ত্র লইলেন, আলঙ্কারিক প্রস্তর লইলেন এবং পথ সম্বল স্বরূপ যে কিছু স্বর্ণ মুদ্রা ছিল, তাহাও লইলেন। পরিধের মাত্র যে অবশিষ্ট ছিল, তাহা বোধ হয় তাঁহার দয়ার কার্য্য। পার্ক, অপর একটী দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র স্বীয় কুটীর দ্বারে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পথ ভ্রমণের অত্যাগসহ আনুষঙ্গিক দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র তথা গাত্রস্থ বসন ভিন্ন অন্য তাবতই আলির করকবলিত হইল।

আলি, পার্কের সকল বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র হস্তগত করিয়া দেখিলেন, উহার একাগ্র নিরন্তর উত্তর দিক্ লক্ষ্য করিতেছে। কেন ঐ লৌহ শলাকা অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলেও অনন্যাভিমুখী হইয়া শাহারার বিশাল ক্ষেত্রকেই নির্দ্দেশ করিতেছে; আলি এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, পার্ক যথার্থ উত্তর দানে অনিচ্ছু হইয়া কপট বাক্যে কহিলেন, আমার জননী শাহারার বহু উত্তরে আছেন। তাঁহার জীবিত কালে এই শলাকা দিগ্‌নিরূপক ও নেতা হইয়া তাঁহার অবস্থান নিরূপণ করিয়া দিবে; আর তাঁহার

প্রাণ বিয়োগ হইলে তাহার সমাধিস্থান অভিলক্ষ্য করিবে। এ মায়া দ্বারা নির্ম্মিত; এই সংশয়ে আলি তেমন ঐন্দ্রজালিক বিপন্ময় সামগ্রী গৃহে রাখিতে সাহস করিলেন না। ভয় পাইয়া ত্বরায় পরিত্যাগ করিলেন।

অতঃপর সকলে মিলিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল, এ বৈদেশিককে লইয়া কি করিতে হইবেক? একেত তাহারা অসভ্য বর্ব্বর, তাহাতে আবার বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী;—বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর দারুণ দ্বেষ্টা; পার্ক তাহাদিগের নিকট হইতে কিছুই মঙ্গল প্রত্যাশা করিতে পারেন না। কেহ কেহ কহিল, ইহার জীবনান্ত করাই বিধি। অন্যে কহিল ইহার দক্ষিণ বাহু গ্রহণ করা যাউক। অপরাপর লোক স্ব স্ব অভীষ্ট ব্যক্ত করিতেছে, এমন সময় আলির এক পুত্র আসিয়া কহিল যে, তাঁহার মাতুল তাহার পিতাকে কহিয়া পার্কের চক্ষুরুৎপাটনে সম্মতি লইয়াছেন। তাহার পিতা কহিয়াছেন, কার্য্য আপাততঃ স্থগিত থাকিবে, তাহার মাতা আলির সহধর্ম্মিণী উত্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার খ্রীষ্টান-দর্শন সমাপ্ত হইলেই কার্য্য সমাধা হইতে পারিবে। পার্ক চারি দিকে বিপদ সমুদ্র দেখিতে লাগিলেন।

পার্ক ‘যারায়, প্রত্যাবর্ত্তন জন্য বৃথা আবেদন করিলেন। আলির আদেশ আসিল, ফতিমার খ্রীষ্টান দর্শন সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহাকে অবশ্য থাকিতে হইবে। তৎপর তিনি যথেচ্ছা যাইতে পারিবেন। এবং তাঁহার ঘোটক পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন।

অসূয়া পরবশ, বিদ্বেষ বুদ্ধি, দাম্ভিক মুরেরা তাঁহার বৈরক্তি উৎপাদনে ক্ষণমাত্রও অনবসর ছিল না। নিত্য নিত্য সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার উপর পদাঘাত করিয়া লাঞ্ছনাও অবমাননার একশেষ করিতেছে; পরিশেষে এক দিন নিশ্চয়ই জীবনে চরমাঘাত করিবে এবম্প্রকার চিন্তায় পার্ক নিতান্ত ব্যাকুল হৃদয় হইলেন এবং দুঃসাহসিক কার্য্য দ্বারাও আত্মরক্ষণ সাধনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন।

একদা মুরপতি সংবাদ পাইলেন, তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণ শ্বেত মনুষ্য দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে তাহাদের সন্নিধানে যাইতে হইবে। তদনুসারে পার্ক, আলি সমভিব্যাহারে ঘোটকারোহণ পূর্ব্বক এক পট্টাবাস হইতে পটমণ্ডপান্তরে রমণীদিগকে সাক্ষাৎ দান করিতে লাগিলেন। তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মুরপতির অন্তঃপুরিকা মহিলাগণ অতীব স্থূল কলেবরা। সুবিপুল মাংস পিণ্ডের সাক্ষাৎ প্রতিমা স্বরূপ পীন কলেবর ও অসিত চর্ম্ম এস্থলে সৌন্দর্য্যের গরীষ্ঠ লক্ষণ, পার্ক চর্ম্মের ধবলত্ব তাহাদিগের চিত্তবিকার উপস্থিত করিল (১) কিন্তু সৌন্দর্য্যে প্রীত না হইলেও কামিনীগণ সৌজন্যপূর্ণ সদয়ভাব প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তিনি তত্রত্য রীতি অনুসারে সৎকার মূলক এক পাত্রে দুগ্ধ ও অন্য পাত্রে পানীয় প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগের মমতাপূর্ণ ব্যবহারে পার্ক মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণ হইতে যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ অবসান হইবে। কিন্তু মুরদিগ হইতে ভদ্র ব্যবহার প্রত্যাশা তাঁহার সুখসপ্ন মাত্র। এক দিকে আফ্রিকার অশ্রুত পূর্ব্ব প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, অন্য দিকে মুরদিগের বিদ্বেষদুষ্ট দুর্ম্মতি প্রযুক্ত নিরম্বু উপবাস, পার্ক উভয় ক্লেশের মধ্য স্থলে পতিত হইয়া পর্য্যটন সুখের গাম্ভীর্য্য পরিমাণ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য,)

শ্রীভ, ব, শীল।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ ও চারি জন সংস্কারক।

জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দিন দিন দেখিতে পাইতেছি যে,

---

(১) জাতীয় নেত্র সৌন্দর্য্য পরীক্ষা করে, নতুবা মার্জ্জার নেত্র, খর্ব্বীকৃত বরণ নমিত নাসিকা কি প্রকার সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বলিয়া ব্যাখাত হইতে পারে?

যে সকল নিয়মে জড়জগৎ শাসিত হইতেছে, অন্তর্জগৎ অবিকল তাহাদেরই অনুবর্ত্তন করে। একটী ভৌতিক নিয়মের অতিরেকে, জড় জগতের ভীষণ দশা উপস্থিত হইতে পারে, একটী সমাজিক নিয়মের ব্যভিচারে সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। অনন্ত সাগরের তুমুল জলোচ্ছ্বাসের মত মনুষ্য সমাজের বিপ্লব;—জলোচ্ছ্বাসের পর শান্তি, সামাজিক সুশান্তির প্রকার ভেদ মাত্র। আজি যে প্রবল বাত্যায় দেশ উৎসন্ন দিল, তাহার কারণ পরম্পরা অনেক দিন হইতে সঞ্চার হইতেছিল। আর্য্য সমাজে বৌদ্ধের প্রাদুর্ভাবে যে ঘোর বিপ্লববহ্নি জ্বলিয়া ছিল, তাহা শত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভূমিত হইতেছিল—আগুণ এক বারেই জ্বলে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফ্রান্সের যে বিপ্লবে সমগ্র য়ুরোপ আমূল আলোড়িত হইয়াছে, তাহা অসংখ্যবৎসর সমষ্টির ফল। আজি বঙ্গসমাজ অলক্ষ্যভাবে যে বিপ্লব-বাত্যায় মথিত হইতেছে, তাহার কারণানুসন্ধান আমাদের প্রবন্ধের গৌণ উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝাইবার পূর্ব্বে গৌণ উদ্দেশ্য বুঝাইবার চেষ্টা পাইব।

সামাজিক নীতি, সামাজিক অভাবের ফল। মিথ্যা কথা কহিলে সমাজতঃ পাপ হয়, কেননা উহার প্রাদুর্ভাবে সমাজে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়। এই জন্য বিভিন্ন সামাজিক নীতির মূর্ত্তিও বিভিন্ন। আমাদের দেশে গোবধ মহাপাতক—কেন? গোধন আমাদের সর্ব্বস্ব। আমরা গোদুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করি, গোরুর দ্বারা চাষ করিয়া খাই ইত্যাদি ইত্যাদি। গো হত্যায় গো কুলের ধ্বংস হইলে সমাজের গতি কি হইবে বল দেখি? তাই সমাজবেত্তা বিধিবদ্ধ করিলেন গো হত্যা আর্য্য সন্তানের পক্ষে মহাপাতক। বম্বের পারসীক কুলের কথা সকলেই জানেন। তাঁহাদের আদিম নিবাস পারস্য। তাঁহারা অগ্নির উপাসক। যখন পারস্য হইতে বিদূরিত হইয়া তাঁহারা প্রথমতঃ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন হিন্দু রাজা। পারসীকদের

ধর্ম্মানুশাসনে গো মাংস বা শূকর মাংস ভক্ষণে পাপ নাই। কিন্তু হিন্দু রাজা তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন, তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে হইলে গো বধ করিতে পাইবে না। সুতরাং সেই দিন হইতে পারসীকগণ গো মাংস ত্যাগ করিলেন,—গো বধ তাঁহাদের পক্ষে পাপ হইয়া দাঁড়াইল। তার পর মুসলমানাধিকারে পারসীকগণকে আদেশ করা হইল, শূকর মাংস ত্যাগ না করিলে তাঁহারা ভারতবর্ষে বাস করিতে পাইবেন না। সুতরাং সেই দিন হইতে পারসীকগণের পক্ষে শূকর মাংস ভক্ষণও পাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে দেখান যায় যে, সামাজিক নীতি, সামাজিক অভাবের ফল মাত্র। সকল সমাজবেত্তাই এ তত্ত্ব আদর্শ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। ফলবাদ নুতন কথা নহে,—মানুষ চির কালই ফলবাদী। তবে যে সকল সমাজে সমাজ বেত্তাগণ প্রমাদ বা অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কখন কখন অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—সমাজের গতি না বুঝিয়া কুচিকিৎসকের মত সামান্য রোগে উৎকট বিষপ্রয়োগ করিয়াছেন—নূতন খাতে মনুষ্যপ্রবৃত্তি স্রোত প্রবাহিত করিতে চাহিয়াছেন—কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, সেইখানেই গোল বাঁধিয়াছে। সামাজিক নীতি, সামাজিক অভাবের ফল ইহা তাঁহারা অনেক স্থলে সুন্দর বুঝিয়াছেন, অথচ সামাজিক অভাব সমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। প্রকৃতির বিকৃতি সুতরাং জন্মিয়াছে। কালের ফলে অভাব জন্মিল, অভাব পূর্ণ হইতে পাইল না। যে সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিল এ অন্যায়, অমনি তাহার পক্ষে সমাজ তুষানল ব্যবস্থা করিলেন, অর্থযাজকগণ তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। কেহ সুতরাং কিছু বলিল না। সমাজ একভাবে, আত্ম প্রবলতার বিপরীত দিকে চলিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস যিনি মন দিয়া পাঠ করিয়াছেন, তিনি ইহা স্বীকার করিবেন। তিনি দেখিবেন যে ভারতেতিহাসের সমগ্র ভাগ এই রূপ

জটিল কৌশলে অথচ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পূর্ণ। এ অবস্থায় কালের স্রোতে চিন্তাশীলতার তরীতে আরোহণ করিয়া বুদ্ধ যখন জন্মিলেন, তখন তিনি কাঁদিয়া রামমোহনের মত বলিলেন—

"চারি দিক্ অন্ধকার, তরী নাহি দেখি আর,
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিত জলে !„

বাস্তবিক দিক্ অন্ধকারই বটে। তবে তিনি শক্ত মাঝি বলিয়া পার হইয়াছিলেন। যাহা হউক, আবার ব্রাহ্মণ বিজয়ে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হইল। কালধর্ম্মে অভাব জন্মিল, কিন্তু তাহাত পূর্ণ হইল না। সমাজ দুঃখময়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনেক দিন লোপ পাইয়াছিল, বৈচিত্র্যের আদরও সুতরাং লোপ পাইয়াছিল। চিন্তা-শীলতা, মৌলিকতা হাসির কথা হইয়া উঠিল। পুরুষগণ শৌর্য্য বীর্য্যের মহিমা ভুলিলেন, মনের সংকীর্ণতা জন্মিল। তাহার ফলে, আবাল বৃদ্ধ, রমণীকুলভূষণ ভারত নারীর চরণে কঠিন নিগড় পড়িল। এইরূপে মুসলমান বিজয়ের পথ পরিষ্কৃত হইয়া রহিল।

সমগ্র ভারতবর্ষের যে অবস্থা ঘটিল, বঙ্গভূমির অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। বাঙ্গালার সর্ব্বেসর্ব্বা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ কুলের ব্রহ্মতেজ লোপ পাইয়াছিল। এখন আর তাঁহারা যাগ যজ্ঞে, অধ্যাপনা, অধ্যয়নে জীবন কর্ত্তন করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণ ঘোর সংসারী হইয়া উঠিলেন। ধর্ম্মে শাস্ত্রে থাকুক আর নাই থাকুক, ব্যবস্থা সম্বন্ধে কল্প-তরু হইয়া উঠিলেন। সমাজ বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিয়াছিল, আরো হইল। শেষ রাজা লাক্ষ্মণ্য সেন অশীতি পর বৃদ্ধ, মন্ত্রীকুল প্রকৃত রাজা। তাঁহারা বক্তিয়ারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া, ব্রাহ্মণ সহায়ে সপ্তদশ অশ্বা-রোহীর নামে, বঙ্গ ভূমিকে যবন করে অর্পণ করিলেন।

কিন্তু বঙ্গভূমি কঠোর বিধি জালে অষ্টে পৃষ্ঠে ললাটে বদ্ধ হইয়া-ছিলেন। শীঘ্র যে বন্ধন শ্লথ হইবার নহে। শ্লথ হইয়াও হয় না।

ব্রাহ্মণের অধঃপতন হইয়াছিল—পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি তাঁহারা অদ্যাপি সমাজের শীর্ষ স্থানীয়। হিন্দু সমাজ পূর্ব্ব বন্ধনের মহিমা ভুলিতে পারিলেন না। যবন বিজয়ে সমাজের অনেক অভাব জন্মিল, স্থিতিশীল ব্রাহ্মণ তনয় পিতৃকুলের বিধি স্মরণ করিয়া সে অভাব পূর্ণ হইতে দিলেন না। নূতন নীতি কিছুই গঠিত হইল না। কিন্তু সমাজ সে অভাব বুঝিলেন। দুঃখের ফলে, সুতরাং সময়ের ফলে গৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি সমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। বৈষম্যপূর্ণ, অধঃপতিত বঙ্গসমাজে, বৌদ্ধকে স্মরণ করিয়া তিনি সাম্যের দুন্দুভিনাদে সংস্কার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি সময়ের প্রভাব ঠিক্ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে সুধু সাম্যগীতে বাঙ্গালার জীবনী সঞ্চার অসাধ্য। কণ্ঠে সাম্যগীতি, করে তরবারীর প্রয়োজন ছিল। পরশুরামের মত ব্রাহ্মণ কুলের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে তিনি আপন সংস্কার চিরস্থায়ী করিতে পারিতেন। তাহা হয় নাই। অতএব শীঘ্রই সমাজে পুরাতন কঠোর বিধির প্রচলন হইল, বিশেষ গৌরাঙ্গের সংস্কার সর্ব্বব্যাপী হয় নাই, তবে তাহার ফলে সমাজিক বন্ধন যে বিশেষ শ্লথ হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। চিন্তাশীল স্বীকার করিবেন, যদি কখন বঙ্গ সমাজের প্রকৃত উন্নতি হয়, তাহার নিদান গৌরাঙ্গের সংস্কার।

বঙ্গভূমি যখন ইংরেজের করায়ত্ত হইল, তখন ইহা অন্তরে বাহিরে দুর্দ্দশাপন্ন। অভাবে অভাবে বঙ্গসমাজ অন্তরে অন্তরে জ্বলিতেছিল, দাহ্য পদার্থে পূর্ণ হইয়াছিল। এ অবস্থায় অগ্নি কণিকা মাত্রে দাবানল সঞ্চারের কথা। বঙ্গসমাজে এই সময়ে এমন লোক অনেকে ছিলেন যাঁহারা ইহার অভাব মোচনে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তবে সমাজের ভয়ে সিদ্ধকাম হন নাই। ইংরেজি শিক্ষার ফলে, সমাজে নূতন চিন্তা স্রোত বহিল, দাহ্য পদার্থে অগ্নি সংযোগ হইল। সামাজিক

বিপ্লবের এই সময়। সমাজ সংস্কারকও জন্মিবার এই সময়। ফলতঃ এমন সময় সকল সমাজে সচরাচর আইসে না। রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সংস্কারের ফলে, অভাবের প্রতিবিধানার্থ নূতন নীতি সমাজ মধ্যে আদৃত হইল। যে সতীদাহ পুণ্যের কথা ছিল, তাহা পাপ হইয়া দাঁড়াইল। যে উৎকোচ গ্রহণ দোষের কথা ছিল না, তাহা দোষের বলিয়া লোকের ধারণা হইল; তবে তাহা তখন নিবৃত্ত কেন হয় নাই, সে ভিন্ন কথা। রামমোহন হিন্দুশাস্ত্রের দোষোদ্‌ঘাটন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অন্তরে অন্তরে অনেকেই রামমোহন ছিলেন—কেননা রামমোহন সময়ের ফল মাত্র।

হিন্দু কলেজের যুবকগণ শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মতি গতি কিরূপ সময়োপযোগী, সংস্কারপ্রবণ হইয়াছিল, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহার চিন্তার বিবরণ রাজনারায়ণ বাবুর "সেকাল ও একাল" নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে দেখিবেন, ফলতঃ সংস্কার এই সময়ে সংক্রামক হইয়া উঠে। বাগ্মী রামগোপাল বাবুর আবির্ভাব ইহার প্রধান উদাহরণ। সেই সংস্কারের স্রোত, সংস্কারের প্রবল ইচ্ছা, আজি কালি বঙ্গসমাজের অস্থি মজ্জাগত।

বর্ত্তমান সমাজে আমাদের মতে সমাজ সংস্কারক চারি জন।—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কারকের তালিকা সর্ব্বসাধারণের মতে ঠিক হইল কি না, বলিতে পারি না এবং তাহার প্রত্যাশাও করি না।—আমাদের যাহা বক্তব্য অকপটে বলিয়া যাইব।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসমাজের সংস্কারক বটেন, কিন্তু তাঁহার সংস্কার প্রধানতঃ স্থিতিও উন্নতিশীলতার মধ্যবর্ত্তী। তিনি মনে করেন যে বঙ্গসমাজকে এখনও সংস্কার করিবার সময় আছে, সুতরাং তিনি

বিপ্লবের দিক্ দিয়াও যান না। এই জন্য যখন চিরদুঃখিনী বঙ্গবিধবার দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহাদের বিবাহ দিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল, তখনও বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের দোহাই দিতে বাধ্য। এই জন্যই বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত বাঙ্গলা ভাষাও সংস্কৃতানুকারিণী। কিন্তু তিনি সমাজের বর্ত্তমান প্রবণতা অনুধাবন না করিয়া সংস্কার আরম্ভ করেন। বঙ্গসমাজ এত পুরাতন এবং এত অধঃপতিত হইয়াছে, যে সংস্কারে আর ইহার কিছু হয় না। যাহার সর্ব্বাঙ্গেই ক্ষত, তাহার প্রলেপ দিব কোথা? যদি বঙ্গসমাজ কখন উন্নত হয়, তবে বিপ্লব চাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ রহস্য উদ্ভেদ করিতে প্রয়াস পান নাই। এই জন্যই তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কার বঙ্গসমাজের আমূল আলোড়িত করিল বটে, কিন্তু কাজ বড় হইল না। বরং প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতেছে। বিধবা বিবাহের প্রস্তাব যখন হয়, তখনও বরং একটু আধটু সংস্কারের সময় ছিল, কিন্তু সে দিন যখন কৌলীন্য প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার সময়ও তিনি শাস্ত্রের দোহাই দিতে সঙ্কোচ করেন নাই, তখন বাস্তবিক লোক হাসিয়া ছিল। বঙ্গদর্শন এ ভ্রম দেখাইতে গিয়া লোকের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন, কিন্তু তিনি সত্য কথা বলিয়াছিলেন। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদনুষ্ঠানপ্রিয়তা এবং অধ্যবসায় অলোকসামান্য। তাঁহার সংস্কাকারে বাঙ্গলার তাদৃশ উন্নতি না হউক, কিন্তু তাঁহার উদাহরণ বাঙ্গালীকে চিরকাল শিক্ষা দিবে। বঙ্গসমাজের স্বার্থ যিনি নিজ স্বার্থ হইতে অভিন্ন ভাবেন, বাঙ্গালী মাত্রেরই তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন।

কেশব বাবু সংস্কার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে বঙ্গসমাজের যে পক্ষাঘাত রোগ জন্মিয়াছে, তাহার প্রতিবিধান বড় সহজ নহে। এজন্য তিনি বিপ্লবের আশ্রয় লইয়াছিলেন। স্বাধীন ভাবে আত্ম মত প্রকাশ করিতে ইদানীন্তন বাঙ্গালীকে প্রধা-

নতঃ তিনিই শিক্ষাদেন। কিন্তু তিনি বুঝি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহায়তা গ্রহণ না করিলে বাঙ্গালার উন্নতি হইত। পাশ্চাত্য সভ্যতা স্রোতের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ এই বিজ্ঞান প্রধান ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমে, ধর্ম্মান্ধতা বিড়ম্বনা মাত্র। যাহার ভিত্তি চিন্তাশীলের নিকট অস্থির, তাহাকে স্থির স্বীকার করিয়া কোন কাজ করিলে তাহা টিকিবে কেন? কেশব বাবু মতের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু ধর্ম্মের অনুরোধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অস্বীকার করিলেন। তিনি সমাজ ও ধর্ম্ম অনন্য ভাবিলেন।—যে শৃঙ্খল কাটিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাহাই তাঁহার চরণে নিগড় স্বরূপ হইল। এই জন্য কেশব বাবুর ধর্ম্মানুশাসন, উচ্চনীত, বাঙ্গালীর নিকট অনাদৃত হইল। কিন্তু ইহা বঙ্গভূমির দুর্ভাগ্যের কথা। যখন দেখিতে পাই, উচ্চ শিক্ষা বাঙ্গালী বাবুর মনে স্ত্রীজাতির প্রতি পবিত্র ভাব পোষণ করিতে পারিল না—রেলওয়ে ষ্টেসনে ভদ্র কুলকামিনী দেখিলে হাঁ করিয়া তিনি চাহিয়া থাকেন, সুবিধা পাইলে সেই কথা লইয়া রহস্য করেন, তখন ভাবি কেশব বাবুর মত বঙ্গসমাজে আদৃত হইলে ছিল ভাল। যখন কৃতবিদ্য বাঙ্গালীকে স্বার্থ পরতা বশে মতামত বিসর্জ্জন করিতে দেখি, মুখে নৈতিক উন্নতির ভাণ করিয়া অন্তরে অন্তরে নীতির নামে হাস্য করিতে দেখি, দেখি যে তিনি বিদ্যা লাভ করিয়া নরাকারে অজেয় পশু হইয়া দাড়াইয়াছেন, তখন বাস্তবিক মনে হয়, কেশব বাবুর মত বঙ্গসমাজে আদৃত হইলে ছিল ভাল। ছিল ভাল, কিন্তু হয় নাই। আবার বলি, ইহা বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যের কথা। বঙ্গসমাজে অসময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা স্রোত আসিয়াছে। আগে নৈতিক উন্নতি হইয়া পরে আসিলে বুঝি বাঙ্গালীর ভরসা থাকিত।

কেশব বাবু বোধ হয় এতদিনে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ভ্রম বুঝিয়া উপকার কিছু হয় নাই। তিনি এক্ষণে যে নীতি-

মার্গ ধরিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা বিদ্যাসাগরের সংস্কারানুরূপ। তিনি হিন্দুর দেব দেবী লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। হিন্দুর ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে ব্রাহ্মের ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ায় উৎসব করিতেছেন ;—বিজয়ার জোৎস্নাময়ী নিশীথে, গঙ্গাবক্ষে দাঁড়াইয়া "মা গঙ্গে" বলিয়া হিন্দুর পতিত পাবনীকে উদ্বোধন করিতেছেন। তবে তাঁহার উদ্বোধন ভিন্ন প্রকারের বটে। কিন্তু যাঁহাদিগকে সংস্কৃত করিতে হইবে, তাহারা এ কথা বুঝে না। তাই বলিতেছিলাম, ধীরে ধীরে কেশব বাবু ঘোর প্রমাদে আচ্ছন্ন হইতে চলিলেন।

বঙ্কিম বাবু সাধারণতঃ সংস্কারক বলিয়া পরিচিত নহেন এবং আমরা যে তাঁহাকে সে ভাবে পরিচিত করিতে চলিলাম, ইহাতে আমরা বাঙ্গলার শ্রেণী বিশেষের উপহাসাস্পদ হইব। তবে সাহস এই যে, যে শ্রেণীর নিকট ব্রাহ্মণ মাত্রেই পণ্ডিত, তাঁহারাই এ কথায় উপহাস করিবেন। বঙ্কিম বাবুর সংস্কার ভিন্ন দরের এবং তাহাই বুঝি স্থায়ী। তিনি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন না, দেশের অমঙ্গল দূর করিবার জন্য বাগ্মিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন না, কিন্তু অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আদর্শ সমাজের চক্ষে ধারণ করিয়া ইহার প্রভূত মঙ্গল সাধণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের জন্য কি না করিয়াছেন? কিন্তু বঙ্কিম বাবু এক কুন্দনন্দিনীর মোহময় চরিত্র সৃজন করিয়া অলক্ষ্যভাবে আবাল বৃদ্ধ বনিতার হৃদয়ে বিধবার প্রতি সহানুভূতির ভাব অঙ্কিত করিয়াছেন।—কুন্দের বিধবা বিবাহ হইল—কোন্ পাঠক তাহাতে আপত্তি করেন? কেশব বাবু বীরের মত বাগ্মিতা অস্ত্রে দেশের দুর্নীতি দূর করিতে প্রয়াস পান, উদ্দীপনার মোহজাল বিস্তার করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে নৈতিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা অঙ্কিত করেন, কিন্তু বঙ্কিম বাবু এক প্রতাপ বা হেমচন্দ্রের, রমানন্দ স্বামী বা চন্দ্রশেখরের দেবদুর্ল্লভ চরিত্র প্রণয়ন করিয়া অলক্ষ্যভাবে দেশের নৈতিক

উন্নতি বিধান করিয়াছেন। তাঁহার আয়েষা বা বিমলা, মনোরমা বা গিরিজায়া, কপালকুণ্ডলা বা সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী বা কমলমণি, দলনী বা ভ্রমর, লবঙ্গ বা রজনী কোন্ পাঠকের হৃদয়ে স্ত্রীজাতির প্রতি পবিত্রতা পোষণ করিতে না শিক্ষা দেয়? তিনি শিখাইয়াছেন যে, প্রেম ও ইন্দ্রিয়-পরতা এক নহে। ভালবাসাই মহত্ত্ব, নিস্বার্থপরতাই উন্নতি, এ শিক্ষা বাঙ্গালী তাঁহারই কাছে শিখিয়াছেন। কিন্তু আরো কথা আছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী মাতৃ ভাষাকে পূর্ব্বে ঘৃণা করিতেন। বঙ্কিম বাবু এ কলঙ্কের অপনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার বঙ্গদর্শন প্রচার অবধি কৃতবিদ্য বাঙ্গালী মাতৃভাষাকে প্রীতি করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। বাঙ্গলাভাষার বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বঙ্কিম বাবু হইতে। তাঁহার ভাষা সরল অথচ মধুর, তেজস্বী অথচ পূর্ণ। ভাষাতত্ত্ব-বিদ্ জানেন, এই রূপ ভাষায় সমাজের কত উন্নতি আশা করা যায়। বঙ্গদেশে কখন সমালোচনা ছিল না; বঙ্কিম বাবুই তাহার প্রবর্ত্তয়িতা এবং সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্যবিধাতা।

বাঙ্গালীর রসিকতা বঙ্গদর্শন প্রচারের পূর্ব্বে যে সুরুচি বিগর্হিত ছিল, তাহা কেহ অস্বীকার করেন না। কবির লড়াই যে এক দিন আমাদের সমাজে আমোদের বিষয় ছিল, ইহা ভাবিতে আমরা লজ্জিত হই। কিন্তু ধন্য বঙ্কিম বাবু! তাঁহার কমলীয় লিপিপ্রণালী গুণে আমরা এখন সুরুচিসঙ্গত রসিকতার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গালী যে এখন মন খুলিয়া বিমল হাসি হাসিতে শিখিয়াছেন, ইহা বড় আহ্লা-দের কথা।

সুরেন্দ্র বাবু বঙ্গদেশে রীতিমত রাজনৈতিক শিক্ষা প্রচার করিতে-ছেন। তাঁহার বাগ্মিতার কুহকে ভুলিয়া আবাল বৃদ্ধ সেই চেষ্টার পৃষ্ঠ পোষণ করিতেছেন। ছাত্রগণ তাঁহাকেই আপনাদের নেতা ভাবে এবং কার্য্যে তাঁহাকে আদর্শ করে। এ সৌভাগ্য সকলের ঘটে না

এবং ইহা সুচিহ্ন বলিতে হইবে। যে সমাজ যখন উন্নত হইয়াছে, তাহার মূল সমাজের যুবকবৃন্দ। গত বৎসর যখন আমরা শুনিলাম, কালকাতার ছাত্রবৃন্দ সমাজ সংস্কার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তখন বাস্তবিক আমাদের ভরসা হইয়াছিল। তবে অন্ধভাবে কাহাকেও অনুবর্ত্তন করা বড় দোষ। বাল্যবিবাহ দোষের বটে, কিন্তু সে দোষ আপেক্ষিক। অন্য কোন সমাজে বাল্যবিবাহ যেরূপ দোষের, একণে ইহা বঙ্গসমাজে সেরূপ নহে। একথা অনুবর্ত্তনের দুর্বোধ্য। আর এক কথা। সুরেন্দ্র বাবু যে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা সুধু বাঙ্গালী কেন, সমগ্র ভারতবর্ষবাসীর পক্ষে নূতন। রাজনীতির ফল ভারতবর্ষের মাটীতে কেমন জন্মিবে, বিধাতা জানেন। যাহা নূতন তাহার ফল ভবিষ্যতে দ্রষ্টব্য। তবে একণে রাজনীতি শিক্ষার সময় হইয়াছে কি না, এতত্ত্ব আজিও আমরা বিশদরূপে বুঝিতে পারি নাই।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সমসাময়িক সাহিত্য।

ভারত গান। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। আল্‌বার্ট প্রেস্। মূল্য ৵০ আনা। ভারতের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রাজকৃষ্ণ বাবু স্বদেশানুরাগোদ্দীপক এই এক শত গীত রচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকের তাল ও রাগ নির্দ্দেশ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বাবু সাহিত্য সমাজে অপরিচিত নহেন। তিনি আপন গুণে সর্ব্বত্র সমাদৃত। বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, এবং এই ভারত গানও প্রায় এক বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং এমত আমাদের বোধ হয় না যে, এই গ্রন্থের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক আছে। তবু আমরা যখন ইহার

এক খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি; তখন মতামত প্রকাশ করিতেও বাধ্য আছি।

এই এক শত গীতের অধিকাংশই বিলক্ষণ সুরুচিসম্পন্ন এবং ভাবাত্মক। রচনা, যেমন সংগীতের রচনা হওয়া উচিত, প্রাঞ্জল এবং সরস। ইহার অনেকগুলি গান এরূপ আছে, যে তাহা পাঠকালে কেমন এক প্রকার প্রচ্ছন্ন, অস্পষ্ট বিষাদ অন্তরাত্মাকে অবসন্ন করে—ভারতের লুপ্ত গৌরবের কথা অর্দ্ধবিস্মৃত সুখস্বপ্নের ন্যায় ক্ষণেকের জন্য হৃদয়ে আসিয়া হৃদয় কম্পিত করিয়া যায়। দুই একটা গান পড়িতে পড়িতে আমাদের এরূপ মনে হইয়াছে যে, কোন সুগায়ককে দিয়া গাওয়াইয়া এই গুলি এক দিন শুনিব। উদাহরণ স্বরূপ একটী গান উদ্ধৃত করা গেল।

মালকোশ—চৌতাল।

(আস্থায়ী)

ভীষণ রাবে গর্জ্জ, হে সিন্ধু!
ঘোর তেজে তিবাম্পতি! গগনে ধাও।

(অন্তরা)

ভীম অশনি তুমি বিদর বিদর ভূমি,
হিমাদ্রি শতধা ভেঙ্গে যাও।

(সঞ্চারী)

অসংখ্য উলকাপিণ্ড দগধি চৌধার আজি,
ভুবন ভসম করি দাও ;—

(আভোগ)

মেঘ কঙ্কর রাশি অবিরাম ঢাল ঢাল,
পবন নিপাত-গীত গাও।

আরও দুই একটি গীত উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাব। রাজকৃষ্ণ বাবু সত্য সত্যই ভারতের দুঃখে দুঃখী, নহিলে এমন সুন্দর, সুভাবসম্পন্ন গীত তাঁহার লেখনী হইতে নির্গত হইত না। তবু সত্যের অনুরোধে ইহা বলা আবশ্যক, যে ভারতের দুঃখের গান যেমন হওয়া উচিত, ভারত গান তেমন হয় নাই। ভারত সংগীত শুনিয়া বনের পশু, বৃক্ষের পাখী রোদন করিবে, প্রস্তর গলিবে, জড়পিণ্ডে জীবনীসঞ্চার হইবে, তবে তাহা ভারত গান হইবে। সকলেই কিছু ভারত সংগীত রচনা করিবার অধিকারী নহে। যদি কাহারও হৃদয়ে এমন উদ্দীপনা থাকে, যে তাঁহার রচিত সংগীতশ্রবণে প্রতি শিরায়, প্রতি ধমনীতে তড়িৎপ্রবাহ ছুটে, মৃতদেহ পুনর্জ্জীবিত হয়, প্রফুল্ল চিত্তে লোক, দেবকার্য্যে দধীচির ন্যায়, আপন অস্থি সমর্পণ করে, তিনিই ভারত গান রচনার অধিকারী। যদি কাহারও বাক্যবিন্যাসে এমন মোহিনী থাকে, যে তাহাতে শ্মশানকাষ্ঠ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, কেরানীর লেখনী বাসবের বজ্রে পরিণত হয়, পলায়নতৎপর শৃগাল শোণিতামোদী সিংহত্ব প্রাপ্ত হয়, তবে তিনিই কেবল ভারতগান রচনা করিবার অধিকারী। তেমন অধিকার রাজকৃষ্ণ বাবুর আছে, এ কথা বলিলে আমরা ধর্ম্মে পতিত হইব। রাজকৃষ্ণ বাবুর ভারত গানে কবিত্বের অভাব নাই, কিন্তু উদ্দীপনার নিরতিশয় অভাব।

মাসিক সমালোচক রাজকৃষ্ণ বাবুকে বন্ধু বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। সেই বন্ধুত্বের জন্য আমরা এই সকল গানের তাল ও রাগ সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে চাই। ভারত গানের শেষ ভাগে কতকগুলি গান জংলা খাম্বাজ, পিলু, বারঞা-পিলু প্রভৃতি রাগিনীতে, এবং ঠুংরি, কাশ্মীরী খেমটা প্রভৃতি তালে রচিত হইয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে সুরে ও তালে "কদর পিয়া হো লাগি তোঁসে নয়না" গীত হইয়া থাকে, সেই সুরে, সেই তালে কি ভারত সংগীত গীত হইবে? যে সুরে, যে তালে তরলমতি বিলাসিনী "বিসরইও না রে ও রাজা মোরি সুরতিঁয়া" বলিয়া তেমনি তরলপ্রাণ বিলাসীর কাছে প্রেম ভিক্ষা করে, সেই সুরে, সেই তালে কি ভারতের অধঃপতনের গীত গাইতে হইবে?—

ভারতের লুপ্ত মনুষ্যত্বের উদ্ধার করিতে হইবে? ভারতের দুঃখ সমুদ্রের ন্যায় গভীর—যদি সে সাগরের তরঙ্গ দেখাইতে চাও, তবে প্রলয় ঝটিকার তালে গান গাইতে হইবে। মহা শ্মশানে প্রজ্জ্বলিত চিতা গর্জ্জনের যে সুর, সেই সুরে ভারতগান রচিত হওয়া চাই। জলমগ্নের অন্তিম ব্যাকুলতা যে সুরে ঘর্ঘরিত হয়, ভারত সংগীত সেই সুরে প্রকটিত হওয়া চাই। স্নেহময়ী জননী মৃত পুত্র কোলে করিয়া যে সুরে আর্ত্তনাদ করেন, ভারত বিলাপ সেই সুরে পরিব্যক্ত হইবে—তবে তাহাকে ভারতসংগীত বলিব। মন্দিরা বাজাইয়া খেমটাওয়ালী নাচান যাইতে পারে, কিন্তু মহাকালের নৃত্যের সঙ্গে শিঙ্গা রব আবশ্যক। ভারতসংগীত রচনায় আমরা লক্ষ্ণৌয়ের ওয়াজিদ আলি শাহের অনুকরণ দেখিতে চাহি না। তাঁহার রাজ্য গেল, মান গেল, স্বাধীনতা গেল, নির্ব্বাসিত হইলেন—সেই দুঃখের, সেই মর্ম্মপীড়ার গান তিনি আদ্ধায় গাইলেন—যে সুরে বিলাস ভবনে ইন্দ্রসভা করিয়া পরী নাচাইয়াছিলেন; রাজ্য নাশ, মনস্তাপ, বনবাসের গান সেই সুরে গাইলেন,—তাঁহার যত বিদ্যাবুদ্ধি, তাঁহার যেমন মানাপমান বোধ, তা এক আঁচড়েই বুঝা গেল। বুঝা গেল, যে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব অতি ক্ষুদ্র জীব—ঝান্সির রাণীর নফর হইবারও তিনি উপযুক্ত নহেন। আবার আজ ভারতের মর্ম্মদাহের গান দাদ্‌রায় গীত হইল—বড় লজ্জার কথা! যে গান দীপক রাগে গীত হইবে—গায়ক আপনি পুড়িয়া ছাই হইবে, শ্রোতৃবর্গ অগ্নিময় হইবে—সেই গান কাশ্মীরী খেমটায়, সেই নৈরাশ্যোচ্ছ্বাস পিলু রাগিনীতে—ছি! ছি!

কবিতাকৌমুদী। প্রথম ভাগ। বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত। রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় সুলেখক বালকশিক্ষার পুস্তক লিখিলে, তাহা ভাল হইবারই কথা। সমালোচ্য পুস্তকখানি যে বালকশিক্ষার উপযোগী হইয়াছে, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। ইহার বিষয়গুলি অতি সহজ এবং সুনীতি পরিপূর্ণ, ভাষা প্রাঞ্জল এবং অনায়াসবোধ্য; ভাব সকলও বালকদিগের ধারণার অতীত নহে। পুস্তকখানি পাঠশালায় ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ রূপে সমাদৃত হইবার উপযুক্ত। সে সমাদর ইহা

পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কেমনা পুস্তকের উপরে দ্বিতীয় সংস্করণ লেখা রহিয়াছে। পুস্তকখানি ভাল হইয়াছে বলিয়াই ইহার দুই এক স্থল কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত দেখিতে আমরা ইচ্ছা করি। "অপূর্ব্ব কৌশল" শীর্ষক তুরস্ক দেশীয় গল্পটির স্থানে একটি দেশীয় গল্প সন্নিবেশিত করিলে ভাল হয়—বৈদেশিক শব্দ ও নাম বালকদিগের ভাল লাগে না ; বৈদেশিক রীতি পদ্ধতি বালকদিগের সম্যক্ বোধগম্য হয় না। চতুর বালকের গল্পটি একেবারে উঠাইয়া দিলে ভাল হয়—চোরের উপর বাটপাড়ী সময়ে সময়ে মন্দ নহে, কিন্তু বালকদিগকে এ শিক্ষা না দিলেই ভাল হয়।

আক্ষেপ। ভবানীপুর ওরিএণ্টাল প্রেশে শ্রীবরদাকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য এক আনা মাত্র। উৎসর্গ পত্র পাঠে বুঝিলাম, গ্রন্থখানি কোন স্ত্রীলোকের লেখা। লেখিকার নাম কমলকামিনী—দেবী কি দাসী, তাহা প্রকাশ নাই। গ্রন্থখানি কাব্য—"প্রণয় বিচ্ছেদে" লিখিত—বিরহ বিলাপ। সচরাচর বিরহ বিলাপে যাহা থাকে, তাহা ইহাতে প্রচুর পরিমাণে আছে। গোধূলি, প্রদোষ, কাদম্বিনী, কমলিনী, চক্রবাক চক্রবাকী, দক্ষিণ বাহুস্পন্দন, ভুজঙ্গ জম্বুকের পাশ কাটিয়া গমন, আবশ্যক অনাবশ্যক, সঙ্গত অসঙ্গত, কিছুরই অভাব নাই—এমন কি, নয়ন-কটাক্ষ বাণ, শূন্য কোষ, প্রেমসাড়ী, মনিহারা ফনি পর্য্যন্ত আছে। গ্রন্থকর্ত্রীর নিজের কবিত্ব যত থাক না থাক, দুই এক খানা ভাল কাব্য বোধ হয় পড়া আছে। এই গ্রন্থের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থলটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

জানিতাম তুমি মোরে বড় ভাল বাসিতে ;
যে যাহায় ভালবাসে, সে যায় তাহার পাশে,
সাগর উদ্দেশে নদী ধেয়ে চলে বেগেতে ;
তুমি কেন শঙ্কা কর মম পাশে আসিতে ?

আমরা বুঝিলাম, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা ইঁহার পড়া আছে। শুদ্ধ তাহাই নহে ; দুই চারিটা পীরিতের টপ্পাও জানা আছে—অন্ততঃ ভালবাসি বলে কি রে আসিতে ভালবাস না "এ গানটা জানা আছে—প্রমাণ,

নাথ হে !
ভালবাসি বলে বুঝি বাসনা রে আসিতে ?

আমাদের দুঃখ এই যে, এই বিরহিণীর দুঃখে আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তবে লৌকিকতার দায়ে একটু প্রবোধ দেওয়া উচিত বটে। কিন্তু তাঁহার সখী এ বিষয়ের চরম করিয়া রাখিয়াছেন——

হাসি পায়, কান্না আসে, তোমার কথায় লো ;
এত যার বাড়াবাড়ী, এত যার তাড়াতাড়ী,
ছাড়াছাড়ী হলে যার এতেক প্রমাদ লো,
উচিত তাহারে সখি চখে করে রাখ লো।

আমাদেরও ঐ পরামর্শ। নাটক নভেলের মুখে ছাই! দেশের মেয়ে গুলা বড় নিলর্জ্জ হইয়া উঠিতেছে।

বিষাদপ্রতিমা। উপন্যাস। শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা। উপন্যাস লিখিলেই যে চতুর্ব্বর্গলাভ হইবে, এরূপ সংবাদ আমরা রাখি না। উপন্যাস না লিখিতে পারিলেই যে নরকে যাইতে হইবে, এ প্রকার কোন বিধানের কথাও অবগত নহি। জগতে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবার, আপন কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিবার সহস্র পথ আছে। যাহার প্রকৃতি যে পথের উপযোগী, তাহার সেই পথ অবলম্বন করিলেই ভাল হয়। রামচন্দ্র বাবুকে আমরা বন্ধুভাবে অনুরোধ করিতেছি, তিনি উপন্যাস প্রণয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন সাধু উদ্দেশ্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করুন——অন্য কোন পথ অবলম্বন করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হউন। তাঁহার বিষাদ প্রতিমা পাঠ করিয়া আমরা যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমাদের প্রতীতি হইয়াছে যে, ঈশ্বর তাঁহাকে উপন্যাস লিখিবার জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন নাই। আসল কথা, বিষাদপ্রতিমা কিছু হয় নাই। আমরা ইহা দায়ে পড়িয়া পাঠ করিয়াছি—কর্ত্তব্যানুরোধে অনেক সময় অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। ইচ্ছাধীন হইলে, বড় জোর দুই তিন পাতা পড়িতাম।

বিজ্ঞাপন।

কতকগুলি অনিবার্য্য কারণ বশতঃ মাসিক সমালোচক প্রকাশে অযথা বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, যে তজ্জন্য আমরা গ্রাহকগণের নিকট যার পর নাই লজ্জিত আছি। যাহা হউক, বর্ত্তমান বৎসরের শেষে আমরা প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া দিব।

এ পর্য্যন্ত গ্রাহকগণ মধ্যে যাঁহারা মাসিক সমালোচকের মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহাদিগের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা যেন আর স্ব স্ব দেয় পাঠাইতে বিলম্ব না করেন। সমালোচক ধারে দিবার রীতি নাই।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় রচনা প্রবন্ধাদি সমালোচ্য গ্রন্থাদি জিয়াগঞ্জ, বালুচর ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

ব্যারিং বা ইন্‌সফিসিয়েণ্ট পত্র আমারা গ্রহণ করিব না। যাঁহারা পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উত্তর লেখা যাইবে না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা ডাকের টিকিটে মূল্য পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় ৵০ আনা কমিসন দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট যেন কেহ না পাঠান। মনিঅর্ডারে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর ট্রেজরীতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন তাঁহাদিগের নিকট পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪৲ টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে সুত বিনা মূল্যে দেওয়া এক কালে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্র ৵০ আ. হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ

মাসিক সমালোচক কার্য্যালয়
খাগড়া বহরমপুর।

(১ম খণ্ড।) (৯ম সংখ্যা।)

মাসিক সমালোচক।

(সর্ব্ব-শাস্ত্র বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।)

সম্পাদক

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

সন ১২৮৬ সাল পৌষ।

—:*:—

বিষয়। পৃষ্ঠা।

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—০০০—

বহরমপুর,—অরুণোদয় যন্ত্রে

মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

মাসিক সমালোচক।

—*:✿:*—

সৌর জগৎ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চন্দ্র ও সূর্য্যের আবির্ভাব ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। জীব শরীরে অপরাপর গ্রহাদির কার্য্য আমরা সহজে দেখিতে পাই না, সুতরাং মনের বা শরীরের উপরে তাহাদের কোন্ কার্য্য আছে কি না, আমরা জানি না। যখন আমাদের বিশ্বাস আছে, পদার্থ সকল পরস্পর সম্বন্ধ, যখন আমরা জানি কোন বস্তু অনর্থক সৃষ্ট হয় নাই এবং প্রত্যেক বস্তুরই অবস্থোচিত কার্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন যে তাহারা মানব দেহে প্রকাশ পাইবে না বুঝিতে পারি না। এ বিষয়ে বিশ্বাস করিবার কারণও রহিয়াছে। চন্দ্র উপগ্রহ, এবং সূর্য্য গ্রহদেবতা; আমাদিগের উপর ইহাদিগের কার্য্য চলিতেছে। একটী উপগ্রহ এবং গ্রহদেবতা সূর্য্যই কি কেবল আমাদিগের উপর কার্য্য করিবে? অন্যান্য গ্রহাদির কি সে ক্ষমতা নাই? তাহারা কি পদার্থান্তর সংঘটিত? যদি তাহারা নিশ্চেষ্ট, অক্ষম এবং সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী হইতে ভিন্ন পদার্থে নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে যে তাহারা আমাদের সম্বন্ধে উদাসীন একথা একদিন সত্য হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু উত্তম রূপ পরীক্ষার দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, যে যে পদার্থের সংযোগে পৃথিবীর উৎপত্তি, সেই সেই পদার্থের সংযোগে গ্রহ ও উপগ্রহাদির উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য্যে পার্থিব পরমাণু অনেক প্রকারই বিদ্যমান রহিয়াছে।

এক পদার্থের একই কার্য্য। এক পদার্থ মানব দেহে এক সময়ে যেরূপ কার্য্য করিবে, সেই পদার্থই সময়ান্তরে প্রযুক্ত হইলে অবিকল সেই প্রকার কার্য্যই হইবে। সূর্য্য আমাতে কার্য্য করিতেছে, চন্দ্র আ-মাতে কার্য্য করিতেছে, সুতরাং অপরাপর গ্রহ ও উপগ্রহও আমাতে কার্য্য করিবে। সকলে আমাতে কার্য্য করিবে, কিন্তু সকলের কার্য্য কি আমাতে একরূপ হইবে ? বিভিন্ন প্রকার পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগের ভেদানুসারে কার্য্যের ভেদাভেদ ঘটিয়া থাকে। অম্লজাত (Oxygen) ও জলজান (Hydrogen) বাস্পদ্বয়ের রাসায়নিক সংযোগে জল উৎপন্ন হয় ; আবার অম্লজান (Oxygen) অধিক পরিমাণে মিলিত হইলে এই দুই পদার্থে অন্য দ্রব্যের (Hydrogen dioxide) সৃষ্টি হইয়া থাকে। গ্রহদিগেরও পরমাণুর সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ প্রযুক্ত তাহাদিগের কার্য্যের ফল ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কোন গ্রহের প্রাধান্য হেতু হয় ত রোগের সৃষ্টি হয় এবং অপর কোন গ্রহের আবির্ভাব প্রযুক্ত শান্তির উদয় হয়। সেইরূপ অনিষ্টকর ও শান্তিজনক গ্রহদ্বয়ের সম-সাময়িক আবির্ভাবে তাহাদিগের স্ব স্ব ক্ষমতার বিয়োগ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। উল্লেখ নাই বলিয়া যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবিষয়ে একেবারে বিশ্বাস করেন না, তাহা বলা যায় না। এ বিষয় লইয়া তাঁহারা সময়ে সময়ে আন্দোলন করিয়া থাকেন। কিছু দিন হইল অধ্যাপক গ্রিমার্ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে "১৮৮০ অব্দে বৃহস্পতি, ইউরেনাস্, নেপ্চুন ও শনিগ্রহ সূর্য্য সন্নিহিত হইয়া অমঙ্গল উৎপাদন করিবে। এই গ্রহগণের মধ্যে ৩টী কুগ্রহ, সুতরাং পৃথিবীর অবস্থা ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইবে। অত্যন্ত মারীভয় উপস্থিত হইয়া ৮ বৎসর পৃথিবীকে জলশূন্য করিবে, আমেরি-কায় প্রায় দেড় কোটী লোক মরিবে, ঝড় ও জলপ্লাবনে দেশ উচ্ছন্ন

যাইবে। দিগদর্শন যন্ত্র ঠিক থাকিবে না। পীড়ায় অনেক লোক মরিবে, কিন্তু যাহারা পীড়া হইতে রক্ষা পাইবে, দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লবে তাহারা ধ্বংস হইবে। অগ্নি ভয় উপস্থিত হইবে। এই কয় বৎসর ঘন ঘন উল্কাপাত হইবে।" ভবিষ্যৎবাণী সত্যই হউক মিথ্যাই হউক, ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মানব দেহে গ্রহাদির কার্য্যের পর্য্যালোচনা সময়ে সময়ে করিয়া থাকেন। পর্য্যালোচনার কারণ সন্দেহ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। যখন এ বিষয়ে সংশয় রহিয়াছে, তখন ইহা যে একেবারে নাই, একথা বলা কোন ক্রমেই উচিত হয় না। সংশয় জ্ঞানের পূর্ব্ব লক্ষণ। সংশয় জন্মিয়াছে, জ্ঞানেরও উদয় হইবে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলে আমরা উত্তমরূপে দেখিতে পাইব, গ্রহগণ আমাদিগের উপরে কার্য্য করিতেছে, আমরা সম্পূর্ণ রূপে তাহাদিগের দাস হইয়াছি।

১৮৮০ অব্দে গণনা সফল হউক বা না হউক, এবৎসর গণনার ফল ফলিতেছে আমরা হাতে হাতে দেখিতে পাইয়াছি। দেখিয়াছি যে, জলপ্লাবনে দেশ ডুবিয়া গিয়াছে, মনুষ্যের কষ্টের অবধি থাকিতেছে না, স্থানাভাবে কত শত জীবজন্তু ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে। শুদ্ধ আমাদের দেশে নয়, ইউরোপেও এই প্রকার অবস্থা হইয়াছে। মধ্য ও পাশ্চাত্য ইউরোপ এবং ইংলণ্ড এবৎসর জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। শস্যাদির আশা একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আগামী বর্ষে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বসূত্র হইয়া রহিতেছে।

পাশ্চত্য বিজ্ঞানে গণনা নাই, সুতরাং গণনা বিষয়ে আমাদের আস্থাও নাই। আজি কালি আমরা সভ্যতা শিখিয়াছি এবং জ্ঞান লাভ করিয়াছি, যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহা উল্লেখ করেন নাই, তাহা কদাপি থাকিতে পারে না।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকেই আমারা প্রমাণ স্বরূপ মানি, পাশ্চাত্য

বিজ্ঞানে থাকিলে তাহা বিশ্বাস করি, সম্ভব হউক অসম্ভব হউক, আমরা বিশ্বাস করি। নিউটন্ জ্যোতিস্তত্ত্ব (Newton's theory of light) উদ্ভাবন করিলেন, অমনি আমরা বিশ্বাস করিলাম। আবার যখন সে তত্ত্ব ভ্রান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, আমরা উহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া নূতন তত্ত্বে (Undulatory Theory of light) বিশ্বাস করিলাম। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অযৌক্তিক কথাও গ্রাহ্য, আমাদের যৌক্তিক কথাও অগ্রাহ্য।

আমাদের শাস্ত্রে আমাদের বিশ্বাস না থাকারও কারণ আছে। যে প্রণালীতে আমাদের শাস্ত্র লেখা হইয়াছে, তাহা সহজে বোধ গম্য নয়। যেরূপ যুক্তি আমরা অনুসন্ধান করি, সেরূপ যুক্তি আমরা সর্ব্বদা পাই না, অনেক স্থলে যুক্তিরও অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। চিন্তার সাহচর্য্যে সেই সমস্ত অভাব পূরণ করিয়া না লইলে আমারা সেই প্রকার বাক্যের সারতত্ত্ব অনুভব করিতে পারি না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ফলদর্শী, যে সমস্ত যুক্তির সাহচর্য্যে তাঁহারা ফল প্রাপ্ত হন, সে যুক্তিতে তাঁহারা নিজেই সন্তুষ্ট, সে যুক্তি দ্বারা অপরকে সন্তুষ্ট করিতে তাঁহারা সযত্ন নহেন। যে প্রকার কার্য্য করিলে বা যে প্রকার অবস্থা ঘটিলে যে ফল ফলিবে, তাহা তাঁহারা বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কেন ফলিবে, আমাদিগকে বলেন নাই। শনি কুগ্রহ। কেন যে শনি কুগ্রহ, তাহার কোন প্রমাণ নাই। "শুক্লাষ্টমী অবধি কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত পূর্ণচন্দ্র, আর কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত পাপশশী" ইহা আমরা জানি; কিন্তু কেন আমরা বলিতে পারিনা।

"শুক্রেন্দু বুধজীবানাং বারাঃ সর্ব্বত্রশোভানাঃ।
রবিভুস্সুত মন্দানাং শুভকর্ম্মসু কেধ্বপি ॥"

ইহাও আমরা জানি, কিন্তু কেন, তাহা জানি না। হিন্দু শাস্ত্র অত্যন্ত নিগূঢ়, গুরূপদেশ বিনা বোধাতীত, সহজে এ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন

হওয়া যায় না। পূর্ব্বতন আর্য্যদিগের কার্য্যগৌরব সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে। সকল বিষয়েই তাঁহারা আপনাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি এ প্রাকার শৃঙ্খলা কোন খানে দেখা যায় না। যুদ্ধ বিষয়ে আর্য্যেরা পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠার প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। দর্শনে তাঁহারা অদ্বিতীয়, রসায়ন ও বিজ্ঞানে তাঁহাদের জ্ঞানের অভাব ছিল না, অঙ্ক শাস্ত্রে ও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় তাঁহাদের বিলক্ষণ দর্শন ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহারা অতুলনীয়, তাঁহাদের পরিশ্রম কোথাও বৃথা ব্যয়িত হয় নাই। যাহা তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য মহান্—যদিও লোকে সে মহদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না।

যদিও আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া অনেক স্থলে কারণ অবগত হইতে পারি না, তথপি আমাদিগের বলা উচিত নয় শাস্ত্রি ভুল। জ্যোতিষ গণনা আমাদের দেশে দেশীয় মতে প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। যে প্রকার গণনা হইতেছে, ফলে সে সমস্তই মিলিতেছে। অন্যান্য বিষয় দূরে থাক্, সাধারণতঃ সকলে দেখিতে পাইতেছেন, দেশীয় মতে গ্রহণ গণনা ঠিক হইয়া থাকে। পঞ্জিকাতে যে দিবসে গ্রহণ হইবার কথা লেখা থাকে, সেই দিনেই গ্রহণ হইতেছে। গণনার ফল ফলিতেছে, কিন্তু যে সমস্ত অঙ্কপাত দ্বারা গণনা হইয়া থাকে সে সমস্ত অঙ্ক কেন ব্যবহার করা যায়, তাহা কোন স্থলেই পাওয়া যায় না। সচরাচর আমাদের দেশে তিন প্রকার মত দ্বারা গ্রহণ গণনা হইয়া থাকে—ভাস্বতী, মঞ্জরী ও রাঘব। প্রত্যেক মতানুসারে গণনায় ও ফলে ঐক্য হইয়া থাকে। গণনায় যে সমস্ত অংকপাত করা যায়; তাহা প্রয়োগ করিবার কারণ আমরা কোন খানে দেখিতে পাই না।

"মানং হিমাং শোর্গাতি রগ্নিহীনা
দিগ্‌ঘ্নাচ্চতুর্ভি শ্চতমঃ প্রমাণং।
তদেবাগতো হৰ্দ্ধখর বর্জিতঞ্চ
গ্রাসঃ সুধাংশোঃ স্ফুট পর্ব্বসন্ধৌ।"

হিমাংশুর গতি হইতে ৩ বাদ দিলে চন্দ্রমান এবং হিমাংশুর গতিকে ১০ দ্বারা গুণ করিয়া ৪ দিয়া ভাগ দিলে রাহুমান হয়। চন্দ্র-মান ও রাহুমান যোগ করিয়া তাহার অর্দ্ধেক হইতে স্পষ্ট সৌম্য শর বিয়োগ করিলে চন্দ্রগ্রাস পাওয়া যাইবে। চন্দ্রমান ও রাহুমানের যোগ ফল অপেক্ষা স্পষ্ট সৌম্য শর অধিক হইলে বিয়োগ করা যাইবে, সুতরাং সে দিবস গ্রহণ হইবে না। এই শ্লোকানুসারে গণনা করিলে গ্রহণ হইবে কিনা, আমরা নিশ্চয়ই জানিতে পারিব; কিন্তু এই শ্লোকে যাহা যাহা করিতে বলিতেছে তাহা করিব কেন, তাহা আমরা বলিতে পারিব না। চন্দ্র গতি হইতে ৩ বাদ দিব কেন এবং তাহাকে ১০ দ্বারা গুণ করিয়া ৪ দিয়া ভাগ করিব কেন, জানি না।

"অহোরাত্রং ন ভোক্তব্যং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহো যদা।
মুক্তিং দৃষ্টা তু ভোক্তব্যং স্নানং কৃত্বাততঃ পরং॥"

চন্দ্র গ্রহণে রাত্রিতে ও সূর্য্য গ্রহণে দিবা ভাগে আহার করা নিষিদ্ধ। মুক্তির পর স্নান করিয়া ভোজন করা বিধেয়। গ্রহণের সময় আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য আমরা জানিতে পারিলাম, কিন্তু কেন গ্রহণ সময়ে অহোরাত্র আহার করিব না, কেন মুক্তির পর স্নান করিয়া আহার করিব, শাস্ত্রকারেরা আমাদিগকে কিছুই বলিয়া যান নাই।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে গণনার কারণের উল্লেখ না থাকিলেও গণনা মিলিতেছে। সেই প্রকার অন্যান্য ভবিষ্যৎ ঘটনার উল্লেখ সম্বন্ধে কোন কারণ না পাওয়া গেলেও তাহা মিলিতে পারে। গ্রহগণের অবস্থান ভেদে মানব শরীরের অবস্থান্তর হইয়া থাকে, কেন বিশ্বাস

করিব না? বিশ্বাস না করিবার কারণ, প্রমাণাভাব। কিন্তু যখন দেখিলাম প্রমাণাভাব হইলেও গ্রহণ গণনা ঠিক বলিয়া বিশ্বাস করি, তখন আর আর বিষয়ের গণনা ঠিক নয় কেন বলিব? হিন্দু শাস্ত্র মতে মনুষ্যের শুভাশুভ গণনা করিতে পারা যায়। গণনা করা যায় মাত্র, কিন্তু গণনার কোন কারণ বলা যায় না। কারণ অব্যক্ত রাখা আমাদের শাস্ত্রকারদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের যুক্তি অবশ্যই ছিল, নহিলে ফলে মিলিবে কেন? সে সমস্ত যুক্তি লোপ পাইয়াছে, এবং আমরাও তাহার কিছুই উদ্ধার করিতে পারি না। আমাদিগের মতে ভাগ্য গণনাও অনেক স্থলে ঠিক মিলিতে দেখা গিয়াছে। জন্মলগ্ন নক্ষত্ররাশীর প্রভাবে আমাদের শুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট হইয়া থাকে। লগ্ন, নক্ষত্র প্রভৃতি স্থির করিয়া আমাদের জন্মকোষ্ঠি প্রস্তুত হইয়া থাকে। লগ্ন ও নক্ষত্র ঠিক হইলে কোষ্ঠীও ঠিক হয়। জন্মকোষ্ঠী বোধ হয় অনেকে অনেক স্থলে ঠিক মিলিতে দেখিয়াছেন। যে খানে মিলে না, সে খানে জন্মকালীন নক্ষত্র বা রাশী যথার্থ রূপে অবগত হওয়া যায় নাই বা সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞের দ্বারা গণিত হয় নাই। গ্রহদিগের কার্য্য দেখিয়া তাহাদিগের কার্য্যের ফল বলা সহজ ব্যাপার নয়। যদি কেবল একটী গ্রহ হইত, তাহা হইলে গণনা তত দুরূহ হইত না, বোধ হয় তাহা হইলে সকলেই স্ব স্ব ভাগ্য গণিয়া বলিতে পারিতেন। গ্রহ অনেক এবং প্রত্যেকের কার্য্যও ভিন্ন প্রকার, সুতরাং গণনাও সুকঠিন। কতকগুলি শুভ গ্রহ এবং কতক গুলি কুগ্রহ এক দেহে এক সময়ে কার্য্য করিলে তাহাদিগের ফল কিরূপ দাঁড়াইবে, বলা অত্যন্ত সুকঠিন। যথার্থ পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির হাতে না পড়িলে কখনই এরূপ স্থলে স্থির বিচার হইতে পারে না। আজি কালি সে রূপ পণ্ডিত আমাদের দেশে অত্যন্ত বিরল, সুতরাং গণনারও অত্যন্ত লাঘব হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে

জ্যোতিষানুসারে রাজা, জলাধিপ, শস্যাধিপ, মেঘ, মাহুত, দ্বীপ সমস্তই মঙ্গল দায়ক—সকলেই পৃথিবীকে শস্যপূর্ণ করিতে সমর্থ; নাগ, গজ অশুভদায়ক, ইহাদিগের ফল মন্দ,—পৃথিবীর শস্য হানি। এরূপ অবস্থায় ফল কিরূপ দাঁড়াইবে বলা সকলের কার্য্য নহে, অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্যতিত এরূপ দুরুহ বিষয়ের মীমাংসা কখনই হইতে পারে না। যদি যথার্থরূপে গণনা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে গণনার ফল ঠিক হইতে পারে, নইলে কতক মিলিবে, কতক মিলিবে না। এখন আমাদের দেশে উপযুক্ত লোক না থাকায় গণনা ঠিক হইতেছে না, সুতরাং লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিতেছে না। বিশ্বাস না জন্মিলেও ইহা ঠিক নয়, আমাদের বলিবার কোন অধিকার নাই।

আমরা দেখিলাম, প্রাকৃতিক নিয়ম সকলে বদ্ধ, এবং প্রত্যেক প্রত্যেকের উপর কার্য্য করিতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহাদি, পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে মনুষ্য শরীরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে, এবং মনুষ্যও স্বীয় ক্ষমতানুসারে ইহাদিগকে স্বকীয় তেজ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে। সৌর জগতের এই নিয়ম। নাক্ষত্রিক জগৎ আমরা চিনি না, নাক্ষত্রিক জগতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আছে কি না, আমরা জানি না। কোন নক্ষত্র আমাদের কখন কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল উৎপাদন করিয়াছে কি না, বলিতে পারি না। মনুষ্য কখন নক্ষত্র লোকে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিয়াছে কি না, বিবেচনাও করিতে পারি না।

আমরা এ পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য, ও গ্রহের কথা বলিলাম। চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ ব্যতীত সৌর জগতে আরও বহুবিধ পদার্থ আছে। গমনশীল নক্ষত্র এবং ধূমকেতুই তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। প্রায় প্রতি রজনীতেই আমরা দেখিতে পাই, আকাশ হইতে উজ্জ্বল পদার্থ পৃথিবীর অভিমুখে তীরের ন্যায় প্রবল বেগে দৌড়িতেছে। কখন কখন ইহা-

দিগের জ্যোতি এত প্রবল হয় যে, শূন্য দেশ ভয়ানক আলোকাকীর্ণ হইয়া যায়। সচরাচর আমরা ইহাদিগকে উল্কা কহিয়া থাকি। সময়ে সময়ে ইহারা পৃথিবীর এত নিকটবর্ত্তী হয় যে, পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ইহারা পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। ইহাদিগের আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সুতরাং ইহারা আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। কথিত আছে, যে বৎসর অধিক পরিমাণে উল্কাপাত হয় সেবার অত্যন্ত দুর্ব্বৎসর হয়।

ধূমকেতু আমরা সদাসর্ব্বদা দেখিতে পাই না। ইহাদিগের আকৃতি সম্মার্জ্জনীর ন্যায়। অতি দ্রুতবেগে ইহারা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, ইহাদিগের ভ্রমণমার্গ অত্যন্ত বৃহৎ। কোন ধূমকেতু ৭ বৎসর, কোনটী ১৪ বৎসর, কোনটী বা ৮০ বৎসরে, একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ধূমকেতু অমঙ্গলদায়ক, ইহাদিগের উদয়ে প্রকৃতিগত সাম্যের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে।

মঙ্গল (Mars) এবং বৃহস্পতি (Jupiter) গ্রহদ্বয়ের মধ্যদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ স্ব স্ব কক্ষে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন যে, অতি প্রাচীন কালে এই স্থলে বৃহদাকার একটী গ্রহ ছিল। স্থির। প্রকৃতির অপরিহার্য্য নিয়মবলে সেই গ্রহ চূর্ণীভূত হইয়া অগণন ক্ষুদ্র গ্রহে পরিণত হইয়াছে। ইহাদিগের কার্য্যের ফল কতদূর, আমরা অবগত নহি।

শ্রীশঃ

দুই ভগ্নী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীদেবতা।

Peace brother, be not over exquisite
To cast the fashion of uncertain evils?
For grant they be so, while they rest unknown,
What need a man forestall his date of grief,
And run to meet what he would most avoid;

Milton. Comus.

সন্ধ্যা সময়ে কলিকাতা রাজধানী চমৎকার শোভা ধারণ করিল। প্রশস্ত রাজপথ সমুহে প্রদীপ্ত গ্যাসালোক প্রজ্জ্বলিত হইল। মুল্যবান রমণীয় অশ্বযান সমুহ সজোরে বিলাসী আরোহী লইয়া ছুটিতে লাগিল। দলে দলে মুটিয়ারা ইলিষ মাছ লইয়া বাটী ফিরিতে লাগিল। হোস-ওয়ালা সাহেবগণ বাঙ্গালী কেরাণীর পক্ষে বড় সদয় নহেন, নচেৎ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে এখন চাপকান্ ঢাকা কোঁচাওয়ালা অদ্ভুত বেশ-ধারী ক্যারাণী বাবুরা কেহ বা একটা ওল, কেহ বা মাছ, কেহ রুমালে করিয়া আলু পটল লইয়া অবনত বদনে বাটী ফিরিতেছেন কেন? চীনাবাজারের দোকানদার চাবির গোছা হাতে লইয়া লাভালাভ চিন্তা করিতে করিতে বাটী ফিরিতেছেন। চাই বরফ, চাই সরিফের নকলদানা, চ্যানেচুর-র গরমাগরম প্রভৃতি নৈশ ফিরিওয়ালাগণ সহরের রাস্তায় মধুবর্ষণ করিতেছে। লোক ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। কেহ ব্যস্ত ক্ষুধার জ্বলায়, কেহ ব্যস্ত কাজের খাতিরে, কেহ ব্যস্ত ফাকি দিবার জন্য, কেহ ব্যস্ত সভ্যতার দায়ে, আর ঐ যে চস্মা চোখে বাবু ধীরে ধীরে গজেন্দ্রগমনে চলিতেছেন, উনি ব্যস্ত ভণ্ডামির অনুরোধে। এই রূপ ভাল মন্দ ব্যস্ততায় লোকগুলা ব্যতিব্যস্ত;——ফলতঃ নির্লিপ্ত ভাবে

সন্ধ্যা সময়ে কলিকাতার জনপ্রবাহ দেখিতে পারিলে সংসারিক অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়।

এই রূপ সময়ে গোলদীঘির পার্শ্বস্থ পথে দুই ব্যক্তি পরিভ্রমণ করিতেছেন। দারুণ গ্রীষ্ম হেতু তাঁহাদের ললাট হইতে ঘর্ম্মবারি বিগলিত হইতেছে। যুবকদ্বয়ের এক জন আমাদের পরিচিত—যোগেন্দ্র; অপর যোগেন্দ্রের সহাধ্যায়ী সুরেশ। অন্যান্য কথার পর যোগেন্দ্র বলিলেন—

"কি আশ্চর্য্য সুরেশ! আমি এখানে আসিয়া অবধি একে একে বিনোদিনীকে ছয় খানি পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু তাহার এক খানিও উত্তর পাইলাম না।" সুরেশ নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "এর আর আশ্চর্য্য কি?"

যোগেন্দ্র চমকিয়া বলিলেন—"বল কি? যে আমাকে প্রতি দিন পত্র লিখিয়া থাকে, আমার পত্র না পাইলে যে অধীরা হইয়া উঠে, দুই সপ্তাহ মধ্যে তাহার কোনই সংবাদ নাই—ইহা অপেক্ষা ভয়ানক কাণ্ড আর কি হইতে পারে?"

সুরেশ হাসিয়া বলিলেন, "তিনি হয় ত তোমার পত্র পান নাই।"

"কোন পত্রই পান নাই, ইহা অসম্ভব।"

"পাইয়াও হয় ত উত্তর দেন নাই।"

যোগেন্দ্র ঘৃণাসূচক হাসির সহিত বলিলেন—"তুমি পাগলের মত কথা বলিতেছ। বিনোদিনী আমার পত্র পাইয়াও উত্তর দেন নাই, ইহার মত অসম্ভব আর কিছুই নাই।"

সুরেশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি অতিশয় স্ত্রৈণ।"

যোগেন্দ্র গর্ব্বিত ভাবে বলিলেন, "তোমার অদৃষ্ট মন্দ; বিনোদিনীর ন্যায় স্ত্রীর স্বামী হইয়া স্ত্রৈণ অপবাদ কত সুখের, তাহা তুমি কি বুঝিবে?"

"ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, যেন আমার তাহা বুঝিতেও না হয়। তোমরা স্ত্রীদেবতার উপাসক—তোমরা ও কথা বলিতে পার। কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, সংসারে জঘন্যতার যদি কিছু আকর থাকে, তাহা স্ত্রীলোক।"

যোগেন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সুরেশ! তোমার অধিকাংশ মতামত আমি অতি সারবান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু স্ত্রী চরিত্রে তোমার যে অযথা বিদ্বেষ ইহাতে আমার একটুও সহানুভূতি নাই। তুমি যাই বল, বিনোদিনীর চিন্তায় আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। সম্মুখে পরীক্ষা উপস্থিত, কিন্তু আমার পরীক্ষা দেওয়া হইতেছে না। আমি কল্যই বাটী যাইব।"

"যাও, গিয়া দেখিবে বিনোদিনী সুস্থশরীরে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছেন।"

"ভাল—তাহাই হউক।"

সুরেশ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন——"এই দুষ্ট স্ত্রীলোক গুলা—ইহারাই সকল অনর্থের মূল। আর ইহাদের এমনি আশ্চর্য্য মোহমন্ত্র যে লোকে ইহাদের দোষ দেখিয়াও দেখিতে পায় না।"

যোগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—"সুরেশ! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তোমার মতিভ্রম হইয়াছে।"

"তা হউক; কিন্তু তুমি ও ভয়ানক জাতিকে চেন না। বিনোদিনীকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, বিনোদ পত্র লেখ নাই কেন, বিনোদ উত্তর করিবেন—'অমুকের ছেলের জন্য এক জোড়া মোজা তৈয়ার করিয়া দিতে বড় ব্যস্ত ছিলাম,' অথবা বলিবেন, 'সূর্পনখা নাটক পড়িতে বড় ব্যস্ত ছিলাম, কিম্বা হয় ত বলিলেন—'শামার মার সঙ্গে নুটোর পিসি কদিন ধরে যে ঝগড়া কল্লে তাতে পাড়ায় কাণ পাতবার গো ছিল না, পত্র লিখি কি করে?' ভাই! ওঁরা না পারেন এমন কর্ম্ম নাই।

ওঁদের উপর অত বিশ্বাস করো না।”

যোগেন্দ্র কিছু বিরক্তির সহিত বলিলেন—‘ছিঃ সুরেশ!—,

সু। ‘আচ্ছা; এখন আমার ডিউটি পড়িবে, আমি চলিলাম। তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে সময়ান্তরে আবার তর্ক করিব। তুমি কালি বাটী যাইবে, সত্য না কি?”

যোগেন্দ্র বলিলেন, “বোধ হয়—বোধ হয় কেন—নিশ্চয়ই যাইব।”

“তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর। তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, কেন অকারণ অধীর হইয়া একটা বৎসর বৃথা নষ্ট করিবে?”

এই বলিয়া সুরেশ প্রস্থান করিলেন। যোগেন্দ্র একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দারুণ চিন্তা হেতু সুশীতল সমীর সেবন করিয়াও চিত্তের শান্তি হইল না। তিনি মনে মনে বলিলেন—“সুরেশ যেরূপ বলিলেন, বিনোদ কি সেই রূপ? ছিঃ! আচ্ছা, বিনোদ তবে চিঠি লেখেন না কেন?—বিনোদের অসুখ হইয়াছে—তাহাই ঠিক।” এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে যোগেন্দ্র বাসায় ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন কালে দেখিলেন, একটা বৃদ্ধা অতিশয় কাতর ভাবে রোদন করিতে করিতে পথ দিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধার অবস্থা ও তাহার কাতরতা দেখিয়া সদয়-স্বভাব যোগেন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন—“ বাছা, কাঁদিতেছ কেন?”

বৃদ্ধা এই প্রশ্নে আরও কাঁদিয়া উঠিল।

বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে বিকৃত স্বরে বলিল—“আমার পোড়া কপাল পুড়েছে গো বাবু!” আবার উচ্চ ক্রন্দন। ক্রমে চারি দিকে লোক জমিয়া গেল। বৃদ্ধা আবার বলিল—“একে একে যম আমার সব খেয়েছে। আমার এক ঘর ছেলে মেয়ে ছিল, আমি অভাগী তাদের সব যমের মুখে দিয়ে অমর হয়ে বসে আছি।”

বৃদ্ধার কাতরতা ও তাহার মলিন বেশ দেখিয়া যোগেন্দ্রর চক্ষু

জনতারাক্রান্ত হইল।" বৃদ্ধা আবার বলিল—"একটি নাতি নিয়ে ছিলাম, তাও পোড়া যমের সহে না গো বাবা।"

এই বলিয়া বৃদ্ধা তথায় আছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে জনতার বৃদ্ধি হইল। সে জনতা—তামাসা দেখিতে। কলিকাতা অর্থের জন্য, অর্জ্জনের জন্য, প্রতারণার জন্য, ইন্দ্রিয়সুখের জন্য—ইহা স্বার্থপরতার শিক্ষাস্থান, কুনীতির আকর এবং স্বর্গীয় মনোবৃত্তি সকলের বধ্যভূমি। সুতরাং বৃদ্ধার পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া যে নিষ্কর্ম্মা মানব সমূহ দণ্ডায়মান হইল, তাহারা এই ব্যাপারকে স্বতন্ত্র নয়নে দেখিতে লাগিল। এক জন দর্শক বলিল, "চঃ ভাই কাজে যাই, কার দুঃখ কে দেখে?" অপর এক জন বলিল—"হয় ত জুয়াচুরি।" তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিল—"ভীকার এই এক উপায়।" এক জন নবাগত দর্শক কৌতুহল সহ নিকটস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিল, "ব্যাপারটা কি ভাই?" সে ব্যক্তি সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিল; শুনিয়া জিজ্ঞাসাকারী বলিল—"ওঃ এই কথা; তবু রক্ষা!" যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার নাতির কি হইয়াছে মা?"

"ব্যারাম—এত—ক্ষণ ওরে আমার কি হবে রে বাবা!"

"তুমি কোথায় থাক?"

"বাগবাজারে।"

"এখানে কেন আসিয়াছিলে?"

বৃদ্ধা বলিল, "শুনেছি এই ডাক্তারখানায় অমনি ঔষধ দেয়, তাই মরে মরে এত দুর এসেছি। তা বাবা কেহ এ দুঃখিনীর কথা শুনিল না। আহা! এক ফোটা ওষুদও বাছার পেটে পড়িল না।"

বৃদ্ধা উচ্চ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র বুঝিলেন, রোগী সঙ্গে নাই—ঔষধ দিবে কেন? পথ দিয়া এক খানি খালি গাড়ি যাইতেছিল, যোগেন্দ্র তাহার চালককে গাড়ি থামাইতে বলিলেন।

বৃদ্ধাকে বলিলেন, "এই গাড়িতে উঠ, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। আমি ডাক্তারি জানি—তোমার কোন ভাবনা নাই।"

বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবা তুমি রাজ্যেশ্বর হও, কিন্তু বাবা গাড়ি ভাড়ার পয়সা ত আমার নাই।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে জন্য কোন চিন্তা নাই। ঔষধ বা গাড়িভাড়া কিছুরই জন্য তোমায় ভাবিতে হইবে না।"

• বৃদ্ধা হাতে স্বর্গ পাইল। অনবরত আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গাড়িতে উঠিল। যোগেন্দ্রও সেই গাড়িতে উঠিয়া বাগবাজার চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শরীর ও মন।

"But O as to embrace me she inclin'd,
I wak'd, she fled, and day brought back my night."
Milton. On his deceased wife.

পর দিন বেলা দ্বিপ্রহর কালে যোগেন্দ্র বাসায় ফিরিলেন। বিনোদিনীর জন্য উৎকণ্ঠায় তিনি যৎপরোনাস্তি কাতর ছিলেন, আবার এই বৃদ্ধার বাটীতে সমস্ত রাত্রি অনাহার ও জাগরণ এবং অদ্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত স্নান আহার বন্ধ করিয়া রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করায় যোগেন্দ্রের শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া আসিল। রোগী তাঁহার অপরিমেয় যত্নে নির্ব্বিঘ্ন হইল। তাহার পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া ও তন্নির্ব্বাহার্থ বৃদ্ধার নিকট কিছু অর্থ দিয়া যোগেন্দ্র নাথ গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি বাসার দ্বারে লাগিলে, গাড়ি হইতে নামিয়া বাসায় যাওয়া যোগেন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন যে, অদ্যই তাঁহার

কোন কঠিন পীড়া জন্মিবে। অতি কষ্টে তিনি উপরে উঠিয়া যেমন ছিলেন সেই রূপ অবস্থায় শয্যায় পড়িলেন। কতক্ষণ তিনি এরূপে থাকিলেন তাহা তিনি জানিলেন না। বাসায় এক জন ভৃত্য ও এক জন পাচক ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তাহারা আসিয়া সময়ে সময়ে যোগেন্দ্র বাবুর সংবাদ লইতে লাগিল। বুঝিল বাবু বড় ঘুমাইতেছেন এখন ডাকিলে হয় ত রাগ করিবেন। অতএব আর অপেক্ষা করা অনাবশ্যক ভাবিয়া তাহারা আহারাদি সমাপন করিল।

বেলা ৪টার সময় যোগেন্দ্রের চেতনা হইল। তিনি বুঝিলেন, জ্বর হইয়াছে। মনে করিলেন মানসিক উদ্বেগ ও শারীরিক শ্রমই এই জ্বরের কারণ। আবার যোগেন্দ্র নাথ নি[illegible]ভূত হইলেন। তাঁহার ভৃত্য আসিয়া বুঝিল বাবুর জ্বর হইয়াছে। সে গিয়া ঠাকুর মহাশয়কে এই সংবাদ জানাইল। ঠাকুর মহাশয়ের মনে বিশ্বাস ছিল যে, নাড়ী পরীক্ষা করিতে তিনি অদ্বিতীয়। সে সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যেমনই হউক, ইহা আমরা ঠিক জানি যে, তিনি তরকারিতে কখনই ঠিক লবণ দিতে পারিতেন না। ঠাকুর মহাশয় যোগেন্দ্রের হাত দেখিয়া ভৃত্য সাধুচতরণকে আসিয়া বলিলেন,—

"বাবুর নাড়ী কুপিত বটে। বায়ুর কোপই অধিক। অদ্য লংঘন ব্যবস্থা। কল্য অন্য ব্যবস্থা করা যাইবে।"

ভৃত্য বলিলেন,—

"আমি বাবুকে ব্যারামের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোন কথা বলিলেন না—বোধ হয় কিছুই নয়।"

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—

"তা বই কি? তুমি রাত্রের আহারের জোগাড় কর।"

যোগেন্দ্র বাবুর নিয়োজিত ব্যক্তিদ্বয় তাঁহার ব্যাধি সম্বন্ধে এই রূপ মীমাংসা করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। যোগেন্দ্রনাথ সেই গৃহে এককী রহি-

লেন। নিদ্রিতাবস্থায় বহুবিধ স্বপ্ন ও বিভীষিকা তাঁহাকে নিরন্তর অবসন্ন করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে যোগেন্দ্রনাথের নিদ্রা ভঙ্গ হইল ও তিনি বিভীষিকা পূর্ণ স্বপ্ন সকলের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। জ্বর কমে নাই। জ্বর বড় তেজের নয় বটে, কিন্তু যোগেন্দ্র বুঝিলেন এই কয় ঘণ্টার জ্বরে তাঁহাকে মুমূর্ষু রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল ও ক্ষীণ করিয়াছে। মাথা ঘুরিতেছে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, চতুর্দ্দিক অন্ধকারময়, চিন্তার শ্রেণী নাই, সম্মুখে যেন কি ভয়ানক বিপদ। তিনি বুঝিলেন জ্বরটা সহজ নয়।

ডাকিলেন,—

"সাধুচরণ।"

তাঁহার ক্ষীণ স্বর নিম্নতলস্থ সাধুচরণের কর্ণে প্রবেশ করিল না। ক্ষণেক পরে আবার ডাকিলেন—কোনই উত্তর নাই। তৃতীয় বারে সাধুচরণ চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে আসিয়া বলিল,—

"আমাকে ডাকিতেছেন?"

কি জন্য যোগেন্দ্র সাধুচরণকে ডাকিতেছিলেন তাহা আর মনে হইল না। তিনি নীরবে রহিলেন। সাধুচরণ আবার জিজ্ঞাসিল,—

"আমাকে কি বলিতেছিলেন?"

যোগেন্দ্র চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন; বলিলেন,—

"ও—তুমি একবার বিনোদিনীকে ডাক। তিনি কোথায়?" বিনোদিনী কে তাহা সাধুচরণ জানে না। ভাবিল—'একি বাবুর উপর কি উপরকার দৃষ্টি পড়িয়াছে নাকি?' সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—

"আমাকে কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না।"

যোগেন্দ্র আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন।

বলিলেন,—

"আঃ—সুরেশ বাবু"

সাধু এবারেও বিশেষ কিছু বুঝিল না। কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না।

সে মন্ত্রীবর ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে গেল। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় তখন যে রূপ নিবিষ্টমনে নাক ডাকাইতেছেন তাহাতে তাঁহার সহিত কোনই পরামর্শ হওয়া সম্ভাবিত নহে। তাহা হইলও না। প্রাতে ঠাকুর মহাশয় নাসিকা ধ্বনির ডিউটী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে সাধুচরণ তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ জানাইল। তিনি সমস্ত শুনিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

"হয়েছে—বাবুর রীত বিগ্‌ড়েছে।"

"কিসে বুঝ্‌লে ঠাকুর মহাশয়? বাবু তো সে রকম মানুষ নয়।"

ঠাকুর মহাশয় হাসিয়া বলিলেল,—

"দুর পাগল—মানুষ কে কি রকম তা কি কেউ বল্‌তে পারে? দেখ্‌ছিস না ইদানীং বাবুর আর কিছুতেই মন নাই। কোন খানে কিছু নাই পরশু বিকালে থেকে দিন রাত কাটাইয়া কালি দুপুর বেলা বাসায় ফিরে এলেন। এ সকল কুরীত। জ্বরে আবাল ভাবাল বকিতে বকিতেও মেয়ে মানুষের নাম করছেন। নিশ্চয় বাবুর রীত বিগ্‌ড়েছে। আমি এমন ঢের দেখিছি।"

সাধুচরণ চক্ষু বিস্তৃত করিয়া কহিল,—

"উপায়?"

"তোমার মাথা আর আমার মুণ্ড।"

এই দুই জন মনীষী বসিয়া যখন এবম্বিধ পরামর্শ করিতেছেন সেই সময় সুরেশ বাবু তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"বাবু বাড়ী গিয়াছেন?"

সাধুচরণ উত্তর দিল,—

"না তাঁহার জ্বর হইয়াছে।"

"জ্বর হইয়াছে ?"

"আজ্ঞে।"

আর কিছু না বলিয়া সুরেশ রোগীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া সুরেশ মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। যোগেন্দ্রের জ্বর সহজ নয়। যোগেন্দ্র ধীরে ধীরে ক্লিষ্ট স্বরে বলিলেন,—

"সুরেশ! দেখিলে কি ভাই ? জ্বর তো সহজ নয়। বোধ হয় আর এ জীবনে বিনোদিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। আমি কালি সমস্ত রাত্রি স্বপ্ন দেখিয়াছি, দেখিয়াছি বিনোদিনী আকাশের মধ্যে নক্ষত্র সম্বেষ্টিত হইয়া বসিয়াছেন। আমি নীচে বসিয়া তাঁহাকে চীৎকার শব্দে ডাকিতেছি। বলিতেছি 'বিনোদ, আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেলে। বহুক্ষণ পরে আমার প্রতি বিনোদিনীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি পড়িল। তিনি বলিলেন,—আগে কেন বল নাই। আগে কেন বুঝ নাই। এখান হইতে তোমাকে দেখাইবার জন্যই তো আমি এতদূর আসিয়াছি। আর তো এখান হইতে ফিরিবার উপায় নাই। যোগেন্দ্র তোমার সহিত আর ইহজন্মে সাক্ষাতের আশা নাই। আমি পাগলের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম। বিনোদ আবার বলিলেন,—'কাঁদিলে কি হইবে ? পার যদি এখানে আইস। 'আমি পারিলাম না। বিনোদ আবার বলিলেন 'ছিঃ যোগীন্ তোমার এই ভাল বাসা ? দাঁড়াও যদি পারি তোমার কাছে একবার দুটা কথা বলিয়া আসি। 'বিনোদ আসিলেন। আমি বাহু প্রসারণ করিয়া ধরিতে গেলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—'যোগীন্ আমাকে ধরা তোমার এক্ষণে অসাধ্য।' আমি তাঁহাকে ধরিতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম তিনিও ততই পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দুস্তর সমুদ্র বিনোদের পশ্চাতে

পড়িল। আমি ভাবিলাম বিনোদ আর কোথায় পলাইবেন। কিন্তু বিনোদ হাসিতে হাসিতে সেই জল রাশির উপর দিয়া চলিয়া গেলেন, আমি অভগা পারিলাম না। পারে বসিয়া মিনতি করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বিনোদ মধ্য সমুদ্রে হইতে হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, ফিরিয়া যাও আর চেষ্টা করিও না। 'অবশেষে বিনোদ সমুদ্রের অপর পারে পৌঁছিলেন। তখনও তাঁহার মূর্ত্তি অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতে লাগিল। তিনি সেখানেও স্থির হইলেন না। অনবরত চলিতে লাগিলেন এবং হস্তান্দোলনে আমাকে ফিরিতে বলিতে লাগিলেন। তার পর ক্রমে তিনি এত দূরে গিয়া পড়িলেন যে, আর তাঁহাকে দেখা গেল না। ঘোর যন্ত্রণায় আমি মৃতপ্রায় হইয়া উঠিলাম। এমন সময় তোমার আগমনে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল ও এই যাতনার অবসান হইল। সুরেশ! একি দুঃস্বপ্ন ভাই? আমার কি হইবে?"

সুরেশ দেখিলেন বিনোদিনীর চিন্তাতেই যোগেন্দ্রের এই কঠিন পীড়া জন্মিয়াছে, এখনও সে চিন্তা হইতে অবসর না পাইলে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। বলিলেন,

"চিন্তা কি? আমি বিনোদিনীকে আসিতে লিখি।"

"আসিতে লিখিবে? সে আমার পত্রের উত্তর দিতে পারে—না সে ভাল নাই—সে আসিতে পারিবে না। কি হইবে ভাই?"

সুরেশ বুঝিলেল এই চিন্তা স্রোত যত দূর সম্ভব বর্দ্ধিত হইয়াছে। বলিলেন,—

"আমি রেজেষ্টরী করিয়া পত্র লিখিতেছি। যদি বিনোদ সুস্থ থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই পত্র পাঠ মাত্র এখানে আসিবেন।

"যদি তিনি ভাল না থাকেন?"

"তাহা হইলেও তোমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া কেহ না কেহ আসিবে!"

"যদি বিনোদ ভাল থাকিয়াও না আইসেন ?"

"তাহা হইলে—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বিনোদ পাপীয়সী। চিন্তা দূরে থাকুক তুমি তাহার নামও করিও না।"

যোগেন্দ্র মুদিত নয়নে ধীরে ধীরে বলিলেন,

"আচ্ছা। পরশ্ব বুঝিব বিনোদ মানুষ কি পাষাণ।"

সুরেশ ব্যস্ততা সহ পত্র লিখিলেন। যাহা লিখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রত্যয় হইল যে বিনোদ যদি সুস্থা থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি পত্র পাঠ এখানে চলিয়া আসিবেন।

সাধুচরণ আদেশ ক্রমে পত্র ডাকে দিয়া রেজেষ্টরী রসিদ সুরেশের হস্তে দিল। তিনি যোগেন্দ্রকে রসিদ দেখাইয়া বলিলেন,—

"এই দেখ রসিদ। তুমি চিন্তা ত্যাগ কর। পরশ্ব লোক জনের সহিত বিনোদিনী পাল্কী তোমার বাসার দ্বারে লাগিবে. এক্ষণে তুমি স্থির হও, আমি চিকিৎসার উপায় করি।"

সুরেশ ব্যস্ততা সহ কালেজে গিয়া অধ্যক্ষ সাহেবকে গলদশ্রু লোচনে সমস্ত বলিলেন। ডাক্তার সাহেব অবিলম্বে সুরেশকে সঙ্গে লইয়া যোগেন্দ্রের বাসায় আসিলেন এবং যথারীতি চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সুরেশ অনন্য কর্ম্ম হইয়া সুহৃদের ব্যাধি ক্লিষ্ট শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া নিয়ত সুশ্রুসা করিতে লাগিলেন।

কুন্দনন্দিনী।

অভিমানিনী সাধ্বী কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখীর তিরস্কারের উত্তর দিল না বটে, কিন্তু সে অপমান তাহার অসহ্য। পবিত্রতা কুন্দের প্রাণ—সেই কুন্দ অপবিত্রতা রূপে পরিচিতা রহিবে! গভীর রাত্রে সকলে সুষুপ্ত হইলে, কুন্দনন্দিনী এক বসন মাত্র সহায় করিয়া সূর্য্যমুখীর গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিল। কিন্তু কুন্দ এখন আর স্বাধীন নহে। মানু-

যের মতন পরাধীন জীব বুঝি আর নাই। কুন্দ নগেন্দ্রের প্রেমে অভিভূত হইয়াছিল। সে প্রেম শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার সাধ্য কুন্দের নাই। তাই কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহত্যাগ করিয়াও একবার নগেন্দ্রের শয্যা গৃহের আলোক না দেখিয়া যাইতে পারিল না। প্রেমময়ী কুন্দ সেই আশায় গবাক্ষসমীপে বসিয়া রহিল। সেই বাতায়ন শ্রেণীর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে—কুন্দ সেই দিকেই চাহিয়া রহিল। নগেন্দ্রের দেবমূর্ত্তি একবার দেখিল। কিন্তু রোমিও জুলিয়েটের মত এই প্রেমিক-যুগল ভাগ্যবান নহে!—আমরা অদৃশ্যে দুই জনকে দেখিলাম; দুই জনের প্রেমের গাম্ভীর্য্য হৃদয়ে অনুভব করিলাম। কিন্তু নূতন প্রেমের যে অদমনীয় চাঞ্চল্য, তাহা তাহাদের পরস্পরের দর্শন সাপেক্ষ! এ প্রেমে শান্ত গাম্ভীর্য্য দেদীপ্যমান। শান্তিময়ী কুন্দ দেখিতেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ শ্রেণী নগেন্দ্রের মুক্ত বাতায়ন পথে প্রবেশ করিতেছে! —প্রেমতৃষ্ণার্ত্তা কুন্দ মনে করিতেছে, কি পুণ্য করিলে পতঙ্গ জন্ম হয়? কুন্দ! পতঙ্গ যে পুড়িয়া মরে! কুন্দ তাই চায়। মনে করি-তেছে—"আমি পুড়িলাম, মরিলাম না কেন?" তার পর নগেন্দ্র সাসী বন্ধ করিয়া সরিয়া গেলেন। নির্দ্দয়! ইহাতে কি ক্ষতি? না—তোমার রাত্রি জাগিয়া কাজ নাই—নিদ্রা যাও শরীর অসুস্থ হইবে। কুন্দ-নন্দিনী মরে মরুক্। তোমার মাথা না ধরে, কুন্দনন্দিনীর কামনা এই।

সুতরাং হীরার গৃহে দুই দিন থাকিতে থাকিতেই কুন্দের লজ্জা স্রোতের উপরে প্রণয় স্রোত আসিয়া পড়িয়া পরস্পর প্রতিঘাতে যে প্রণয় প্রবাহকেই প্রবল করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ক্রমে সূর্য্যমুখীকৃত অপমান বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখী আর মনে স্থান পাইলেন না—নগেন্দ্রই সর্ব্বত্র। ক্রমে কুন্দ ভাবিতে লাগিল—"আমি কেন সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম? দুটো কথায় আমার কি ক্ষতি হইয়াছিল? আমি ত নগেন্দ্রকে দেখিতাম। এখানে

যে একবারও দেখিতে পাই না !” কুন্দ প্রেমে নবীনতার অদম্য চাঞ্চল্য নাই, সত্য ; কিন্তু যাহা আছে তাহা বুঝি আর কিছুতে নাই। এই প্রেমের অতলস্পর্শী গাম্ভীর্য্যে হৃদয় ভূমানন্দেও বিস্ময় রসে পরিপ্লুত হয়।

সূর্য্যমুখীর পলায়ন পরে নগেন্দ্র গৃহত্যাগ করিয়া প্রবাসে গেলেন। যেমন বালক চিত্রিত পুত্তলি লইয়া এক দিন ক্রীড়া করিয়া পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটীতে পড়িয়া থাকে, কুন্দনন্দিনী তেমনি নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃতা পুরী-মধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন। কুন্দ আপনার নৈরাশ্য আপনি সহিত। কি দোষে তাহাকে নগেন্দ্র পায়ে ঠেলিয়াছেন ? কুন্দ এই কথা রাত্র দিন ভাবে, রাত্র দিন কাঁদে। ভাল, নগেন্দ্র নাই ভালবাসুন—কুন্দকে নগেন্দ্র ভালবাসিবেন কুন্দের এমন কি ভাগ্য !——কিন্তু কুন্দ এক-বার তাঁকে দেখিতে পায় না কেন ? শুধু তাই কি ? তিনি ভাবেন. কুন্দই এই বিপত্তির মূল ; সবাই ভাবে, কুন্দই অনর্থের মূল—কুন্দ ভাবে, কি দোষে আমি সকল অনর্থের মূল ! আবার কুন্দ ভাবিত—“সূর্য্যমুখীর এই দুর্দ্দশা আমা হইতে হইল। সূর্য্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিত—তাহাকে পথের কাঙ্গালিনী করিলাম ! আমার মত অভাগিনী কি আর আছে ? আমি মরিলাম না কেন ? এখনও মরি না কেন ?” কিন্তু আবার কুন্দ ভাবিত, “এখনও মরিব না——তিনি আসুন—তাঁকে আর একবার দেখি—তিনি কি আর আসিবেন না ? যদি সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে, তবে মরিব—আর তার সুখের কাঁটা হইব না।”

চিত্তের এই অবস্থায়, আত্মবলি দিতে যখন কৃতসংকল্প, তখন শুষ্কমূর্ত্তি কুন্দ কমলের কাছে সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ শুনিল। কুন্দ সে সম্বাদে অকপটে কাঁদিল। এই সারল্য কুন্দ চরিত্রের ইন্দ্রজাল।

সূর্য্যমুখীর আবাল্যের স্নেহ তাহার মনে পড়িল—কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হইল। আপনি সূর্য্যমুখীর সকল দুঃখের কারণ, ইহা ভাবিয়া কুন্দনন্দিনী বড় ব্যাথিতা হইল। সতীনের জন্য সকলে কাঁদে না—কুন্দ অকপটে কাঁদিল। কুন্দচরিত্রে এই দেবী-মহত্ত্ব না দেখিলে আমরা ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম না।

নগেন্দ্র বাটী আসিয়া চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ মনোদুঃখে আপন শয়নাগারে উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল। কেবল বালিকাসুলভ রোদন নহে—মর্ম্মান্তিক পীড়িতা হইয়া রোদন করিল। যদি কেহ কাহাকে বাল্যকালে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া, যেখানে অমূল্য হৃদয় দিয়াছিল, সেখানে তাহার বিনিময়ে কেবল তাচ্ছিল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে সেই এ রোদনের মর্ম্মচ্ছেদকতা অনুভব করিবে। তখন কুন্দ পরিতাপ করিতে লাগিল, যে, কেন আমি স্বামি দর্শনলালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম? আরও ভাবিল যে, এখন কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি?

ফলতঃ নগেন্দ্রের তাচ্ছিল্য কুন্দের হৃদয়ে গভীর রেখা মুদ্রিত করিয়াছিল। তাহার ফলে, সমস্ত রাত্রি জাগরণ এবং রোদনের পর প্রভাত কালে তন্দ্রাভিভূতা কুন্দ দ্বিতীয় বার লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিল! সেই আলোকময়ী প্রশান্তমূর্ত্তি জননী এক অতি নিবিড় বর্ষণোন্মুখ নীল নীরদ মধ্যে অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার চতুঃপার্শ্বে অন্ধকারময় কৃষ্ণ বাষ্পের তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। এই ভীষণ দৃশ্যে কুন্দ, জননী রূপ অবলোকন করিলেন!—আরও এক হাস্যনিরত মূর্ত্তি দেখিলেন—হীরার! ঘটনা স্রোতের পৌনঃপুন্যে, দুঃখ রাশির উপর দুঃখে, কুন্দ জীবন এখন মসীময় হইয়াছিল। আশা ফুরাইয়াছিল, সুতরাং সবই ফুরাইয়াছিল। তাই যখন মাতা বলিলেন, "কুন্দ তখন

আমার সঙ্গে আসিলে না, আমার কথা শুনিলে না—এখন দুঃখ দেখিলে ত ?” তখন কুন্দ হৃদয়ঙ্গমিত্বের ফলে রোদন করিল। তাই আবার মাতা যখন বলিলেন যে——“এখন যদি সংসার সুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।” তখন কুন্দ অকপটে বলিল, “মা, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল—আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।” তাই কুন্দ, নিদ্রাভঙ্গ হইলে, স্বপ্ন স্মরণ করিয়া দেবতার নিকট ভিক্ষা চাহিল যে “এবার আমার স্বপ্ন সফল হউক।” তাই কুন্দ, হীরা রাক্ষসীর লোমহর্ষণ কথা ধীরতার সহিত, মৃদুতার সহিত, সৌৎসুক্যে শুনিয়াছিল। তাই একটু অবকাশ পাইয়াই আত্মহত্যায় দৃঢ় সংকল্পা কুন্দ বিষের মোড়ক চুরি করিয়া তাহা অবিলম্বে পান করিয়াছিল।

আমরা প্রথমতঃ দেখাইয়াছি যে, কুন্দচরিত্রের প্রধান মাধুর্য্য তাহার অলৌকিক সারল্য। সেই সারল্যের ফলে কুন্দ, মাতার ভীষণ স্বপ্ন ভুলিয়াছিল—নগেন্দ্রও হীরাকে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। কিন্তু শেষে আমরা সে ভাবের অপনয়ন দেখিতে পাই। ইহা কবির সৃষ্টি কৌশল। সত্য বটে যে, কাব্য যাহা স্বভাবাতিরিক্ত অথচ স্বভাবানুযায়ী তাহাই প্রশংসনীয় সৃষ্টি। কিন্তু স্বভাবাতিরিক্ততার ত সীমা আছে। প্রতিভাসম্পন্ন কবি দেখিবেন, তাঁহার চিত্র যেন অমানুষী না হয়। কুন্দচরিত্রের চরমোৎকর্ষ, তাহার সারল্যের সীমা। দুঃখ বা অভাবের পৌনঃপুন্যে, মাতার স্বপ্নে কুন্দের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল—তাই কুন্দ মরিল।

বিষ পান করিয়া কুন্দ খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া ভূতলে বসিয়াছিল—নগেন্দ্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার চক্ষের জল আপনি উছলিয়া উঠিল। নগেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে, কুন্দ ছিন্ন বল্লীবৎ তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র যখন গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, “একি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে আমায় ত্যাগ করিয়া যাই-

তেছ ?”—তখন বালিকা, অবাক্-পটু কুন্দ আজি অন্তিমকালে মুক্ত-কণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল—বলিল, “তুমি কি দোষে আমায় ত্যাগ করিয়াছ ?” কুন্দ আবার কহিল—আজি কথা কহিয়া তৃপ্তি হয় না—কহিল, “কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে, তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্প দিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি,—তোমাকে দেখিয়া আজিও আমার তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।” আবার কুন্দ নগেন্দ্রকে মনোব্যথায় জানুর উপর ললাট রক্ষা করিয়া নীরবে রঁহিতে দেখিয়া বলিল—“ছি! তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসি মুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণেও সুখ নাই।”

নগেন্দ্র তখন মর্ম্মপীড়িত হইয়া কাতর স্বরে কহিলেন—“কেন তুমি এমন কাজ করিলে ? তুমি আমায় এক বার কেন ডাকিলে না ?” কুন্দ বিলয়ভূয়িষ্ঠ জলদান্তর্বর্ত্তিনী বিদ্যুতের মত মৃদু মধুর দিব্য হাসি হাসিয়া কহিল “তাহা ভাবিও না। যাহা বলিলাম, তাহা কেবল মনের বেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমাকে দেখিয়া মরিব। মনে মনে স্থির করিয়াছি-লাম যে, দিদি যদি কখন ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁর সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।”

ক্রমে ক্রমে কুন্দ চৈতন্যভ্রষ্টা হইয়া স্বামী চরণ মধ্যে মুখ রাখিয়া নবীন যৌবনে প্রাণ ত্যাগ করিল। এত দিনে, অন্তিম কালে মুখ ফুটিয়াছিল—যেন ঈজিপ্তহংসী মরিবার আগে মর্ম্মভেদী গীতিপীযুষ বর্ষণ করিয়াছিল।

—

খণ্ড প্রলয়।

জগৎ সৃষ্টির অব্যবহিতকাল পরে একবার যে জলপ্লাবনে বসুমতী মগ্ন হইয়াছিল তাহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রকাশ হইতেছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র (পুরাতন ভাগ) অতি প্রাচীন গ্রন্থ। তাহাতে লিখিত আছে যে, ঈশ্বর মনুষ্যগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অনবরত জল বর্ষণ দ্বারা জীবন বিশিষ্ট সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ করেন, কেবল নোহ নামক জনৈক ধার্ম্মিক, পুত্র, পুত্র-বধুসহ ঈশ্বরাদিষ্ট নৌযানে পরিরক্ষিত হইয়াছিলেন। আমাদিগের কৃতবিদ্য ভ্রাতৃগণ ইহা স্বীকার করিতে পারেন না, কেননা উহা বাইবলের উক্তি। কিন্তু আমি আর্য্যশাস্ত্র মন্থন করিয়া পাঠকগণকে দেখাইতেছি যে, সৃষ্টির পরে বিশ্ববিপ্লাবী জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত জগৎ প্লাবিত হইয়াছিল।

ভগবান মনু এই জলপ্লাবনকে প্রলয়রূপে বর্ণন করিয়াছেন। "আসীদিদন্তমো ভূত মপ্রজ্ঞা তম লক্ষণং অপ্রতর্ক মবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্ত মিব সর্ব্বতঃ।" ।৫। মনু। অর্থাৎ প্রলয়কালে জগৎ এরূপ প্রকৃতিতে লীন ছিল যে, উহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিন প্রকার প্রমাণের বিষয় ছিল না,—সমস্ত জগৎ যে ননিদ্রিতাবস্থায় আছে ইহাই অনুমিত হইত।

এবং মৎস্য পুরাণেও এই খণ্ড-প্রলয়ের বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণিত আছে। আমরা পাঠকবর্গকে জলপ্লাবনের সমস্ত প্রমাণ এই মৎস্য পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

যৎকালে রাজর্ষি মনু পুত্রের হস্তে রাজ্য শাসনভার ন্যস্ত করিয়া শান্তি পথের পথিক হইয়া উগ্র তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যৎকালে ভগবান ব্রহ্মাও মনুর উগ্র তপস্যার ফলরূপে নিকটাগত হইয়া বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ভগবান মনু আগামী জলপ্লাবনরূপ বিশ্ববিনাশী ভয়াবহ ঘটনা হইতে যেন রক্ষিত হন, তাহাই প্রার্থনা করিলেন।

"পুরা রাজা মনুর্ণাম চীর্ণ বান্ বিপুলং তপঃ।
পুত্রে রাজ্যং সমারোপ্য ক্ষমা বান রবিনন্দন॥ ইত্যাদি
এবমুক্তো ব্রবীদ্রাজা প্রণম্য সপিতামহম্
এক মেবাহ মিচ্ছামি ত্বত্তো বরমনুত্তমম্।
ভূত গ্রামস্য সর্ব্বস্য স্থাবরস্য চরস্যচ।
ভবিতা রক্ষণায়ালং প্রলয়ে সমুপস্থিতে॥"

মৎস্য পুঃ। ১ অং।

পাঠক হয় তো বলিবেন, ঐ গুলিতো প্রলয়ের বচন; তবে প্রলয় কি ঠিক জলপ্লাবন? কিন্তু আমি ঐ প্রলয়ই যে জলপ্লাবন, তাহার ইতিহাস বিবৃত করিয়া সপ্রমাণ করিতেছি, এবং বাইবলোক্ত জলপ্লাবন যে মৎস্য পুরাণোক্ত প্লাবন এবং নোহই যে মনু, তাহা দেখাইব। যৎ-কালীন ভগবান মনু নিজ আশ্রমে পিতৃ তর্পণ করিতেছিলেন এমত সময় জলের সহিত একটী শফরী মৎস্য তাঁহার করতলে উৎপতিত হইল। পরম কারুণিক মহামতি মনু সেই মৎস্যটীর আকার প্রকার দেখিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইয়া তাহাকে একটী কমণ্ডলু মধ্যে স্থাপন করিলেন। মৎস্য এক দিবসের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ষোড়শাঙ্গুল বিস্তীর্ণ হইল এবং মনুকে কহিতে লাগিল "আমাকে রক্ষা কর।" তখন মনু একটী কুণ্ড মধ্যে তাহাকে স্থাপন করিলেন। মৎস্য কুণ্ড মধ্যে শরীরে বৃদ্ধি পাইয়া মনুর নিকট চীৎকার করিলে ভগবান মনু উহাকে কূপ মধ্যে পরিত্যাগ করেন। মৎস্য সত্বরেই কূপ জলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মনুর নিকট প্রার্থনা করেন, তদনুসারে মনু শফরীটীকে বৃহৎ সরোবরে পরিত্যাগ করেন। মৎস্য এই রূপ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইলে ভগবান মনু মৎস্যটীকে গঙ্গা গর্ভে, তৎপরে মহাসমুদ্রে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু মৎস্য দিবসের মধ্যেই সমুদ্রকে নিজ শরীর দ্বারায় আচ্ছাদিত করিলে ভগবান মনু বিস্ময়াম্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? বোধ

হয় তুমি বিষ্ণু হইবে।” তদুত্তরে শফরী বলিল, তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ। রাজন্! অতি সত্বরেই ভূমণ্ডল জলময় হইবে, কোনও সৃষ্ট বস্তু দৃষ্টিগোচর হইবে না। আমি তোমাকে এক খানি নৌকা প্রদান করিতেছি—সমুদায় দেবগণ সমবেত হইয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১। রাজন্! ইহা দ্বারা জীবগণ রক্ষিত হইবে, তুমি জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, ও উদ্ভিজ্জরূপ যে সকল জীবন বিশিষ্ট প্রাণী আছে, তাহাদের প্রত্যেককেই আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিবে। ২। ভূপতে! যখন অর্ণবপোত প্রলয় বায়ু কর্ত্তৃক অভিহত হইবে, তখন তুমি ইহা আমার শৃঙ্গে বান্ধিয়া রাখিবে। ৩। এবং প্রলয়াবসানে তুমিই প্রজাপতি হইবে। ৪। যথা—

(১) বাইবলে লিখিত আছে, নোহ ঈশ্বরাদেশে স্বয়ং নৌকা নির্ম্মাণ করেন। প্রভেদ এই।

(২) কেবল নোহ, তস্য পত্নী, ও পুত্রবধুগণসহ এবং শুচি পশুপক্ষ্যাদিতে নৌকাতে গ্রহণ করেন। ঠিক্।

(৩) সমস্ত স্থান জলমগ্ন হইলে আরারট পর্ব্বতের শৃঙ্গে নৌকা লাগিয়া থাকে। ঠিক্।

(৪) জলপ্লাবনে সমস্ত মানব নষ্ঠ হইলে পর নোহের বংশ দ্বারায় পুনরায় সমস্ত জগৎ মানবময় হয়। আবার আমাদিগের আর্য্য পুরুষেরা যে, মনুর বংশ, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনও শিক্ষিত পাঠক অস্বীকার করিতে পারেন না। ব্লুকমেন নামক পণ্ডিত মানব জাতিকে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা—ককেশীয়, মোগোলীয়, মালয়িক, মার্কিন, ও ইথিয়পীয়। তন্মধ্যে ককেশীয় বংশ জর্ম্মন্, কেলট্‌গণ আরমাণ ও ভারতবাসী। দেখা যায়, অতি প্রাচীন জাতি য়িহুদীতে ভারতবাসী আর্য্যগণে অনেক শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য আছে। বাইবলে লেখা আছে যে, নোহের পুত্র শেম হইতে য়িহুদী জাতি নির্গত হইয়াছে। পুরাণে লিখিত আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্র, এই চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে।

কদাচিদাশ্রমে তস্যকুর্ব্বতঃ পিতৃতর্পণম্। পপাত পাণ্যো রূপরিশফরী জল সংযুতা। দৃষ্টা তৎ শফরী রূপং সদয়ালু মহীপতিঃ, রক্ষণায়াক-রোদ্যত্নং সতস্মৈ করকোদরে। অহোরাত্রেণ চৈকেন ষোড়শাঙ্গুল বিস্তৃত, সোঽভবন্ মৎস্য রূপেণ পাহি পাহীতিচাব্রবীৎ। সত মাদায় মনিকে প্রাক্ষিপজ্জল চারিনম্. তত্রাপি চৈক রাত্রেণ হস্তত্রয় মবর্দ্ধত। পুনঃ প্রাহার্ত্তনাদেন সহস্র কিরণাত্মজম্. সমৎস্য পাহি পাহীতি ত্বামহং শরণং গতঃ। ত তঃসকূপে তং মৎস্যং প্রাহিণোদ্রবিনন্দনঃ। যদা ন যাতি তত্রাপি কূপে মৎস্যঃ সরোবরে। ক্ষিপ্তঃ সঃ পৃথুতা মাগাৎ পুন যোজন সম্মিতাম্। তত্রাপি পাহি পাহীতি ক্রন্দন্ মৎস্যঃ সরোবরে, ক্ষিপ্তঃ সংপূর্ণতা প্রাপ্তঃ পুন যোজন সম্মিতাম্। তত্রাপ্যাহ পুনর্দীনঃ পাহি পাহিনৃপোত্তমম্. ততঃ স মনুনা ক্ষিপ্তো গঙ্গায়া মপ্য বর্দ্ধত। যদা তদা সমুদ্রেতং প্রাক্ষিপন্—মেদিনী পতিঃ!

যদা সমুদ্র মখিলং ব্যাপ্যাসৌসমুপস্থিতঃ, তদা প্রাহমনুর্ভীতঃ কোঃ পিত্বমসুরেশ্বরঃ। অথবা বাসুদেবস্তমন্য ঈদৃক্কথং ভবেৎ। মৎস্যোবাচ। অচিরে নৈবকালেন মেদিণী মেদিনী পতি, ভবিষ্যতি জলে মগ্না সশৈলন বন কাননা। নৌরিয়ং সর্ব্ব দেবানাং নিকায়েন বিনির্ম্মিতা। মহাজীব নিকায়স্য রক্ষণার্থং মহীপতে। স্বেদাণ্ডজোদ্ভিদা যে বৈ যেচ জীবা জরায়ুজাঃ অস্যাং নিধায় সর্ব্বাং স্তান্ নৌকায়ং ত্রাহিসুব্রত। যুগান্ত বাতাভিহতা যদাভবতি নৌনৃপ, শৃঙ্গেঽস্মিন্ মম রাজেন্দ্র! তদেমাং সংয-মিষ্যহি। ততো লয়ান্তে সর্বস্য স্থাবরস্যচরস্যচ প্রজাপতি স্তং ভবিতা জগতঃ পৃথিবীপতে। মৎস্য পুং ১ অধ্যায় মনু বিষ্ণু সংবাদ

পাঠক! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বাইবলোক্ত জলপ্লাবন ঠিক্ মৎস্য পুরাণোক্ত জল প্লাবন কি না? যদি তাহা সত্য হয়, তবে বাই-বলোক্ত নোহ যে মৎস্য পুরাণোক্ত মনু তাহাতে আর সন্দেহই হইতে পারে না। (ক্রমশঃ।)

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন।

সতী দাহ।

(১)

কালজয়ী হ'য়ে কাল নদী কূলে,
কালজয়ী এক কীৰ্ত্তিস্তম্ভ তুলে,
কে তোরা রমণী চলিয়া গেলি !
কে তোরা জীবন্ত সোনার প্রতিমা,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ছড়ায়ে মহিমা
গেলিরে অনলে বিজলী খেলি !
স্তম্ভিত করিয়া দেবতা দানব,
স্তম্ভিত করিয়া কিন্নর মানব,
জীবলোকে প্রাণী যে আছে যেখানে,
স্তম্ভিত করিয়া তাহারে সেখানে,—
কে রে তোরা সাধ্বী কি সাধন বলে,
জীবন্ত পরাণ জ্বলন্ত অনলে,
হেলায় হাঁসিয়া দিলিরে ফেলি !

(২)

ত্যজিয়া সংসার ফুল্ল কারাগার,
পুত্র কন্যা স্নেহ নিগড় মায়ার,
অথবা নবীন জীবন্ত বসন্তে,
কে তোরা পসিলি অনন্ত জ্বলন্তে
সাধের পরাণ সপিলি কায় ?
কারে লো সপিলি এসাধের ধন,
বল চারুশীলে একি আকর্ষণ,
একি লো স্মুধুই পতঙ্গ পতন,
প্রদীপ্ত অনল মাঝারে হায় !

(৩)

কোথা লয়ে যাও বল চন্দ্রাননে,
কুসুমের মালা কাহার কারণে,
কোথা সে বঁধুয়া বসিয়া বিজনে,
বাঁশীতে মধুর মধুর গায় !

কোথা সে নিকুঞ্জ আর কোথা তোর,
নব নটবর আশায় বিভোর,
আর কোথা তোর এ ঘুমের ঘোর
না জানি প্রমদা ভাসিবে হায় !

হ্যাদে দ্যাখ্ চেয়ে ধীরে ধীরে ধীরে,
নাগরে ভেটিতে নিকুঞ্জ কুটীরে,
হাতে ফুল মালা ভাগীরথী তীরে
কোথা যেতে বালা কোথায় যায় ।

(৪)

ফিরারে ত্বরায় ফিরারে বালায়,
বুঝিবা মুগধা পথ ভুলে যায়,
ভুবন ভুলায় প্রেম প্রতিমায়,
সহচরী বুঝি গিয়াছে ফেলে ;

দেখ দেখ চেয়ে প্রেম পরায়ণা,
চিত্ত হারা হ'য়ে চলিছে ললনা,
কুসুম যুবতী অতৃপ্ত বাসনা
এখন (ও) যে আশা নয়নে খেলে ।

(৫)

এখন (ও) যে আশা খেলিছে নয়নে,
বিকাশে পূর্ণিমা পূর্ণ চন্দ্রাননে,

এখন (ও) যে সতী প্রিয় দরশনে,
চলিছে অন্তরে নাহিক ভয় ;
তত বাড়ে আশা যত অগ্রসর,
ততই সুন্দরী চলিছে সত্বর,
প্রেম সরসীর মধুর শিকর,
ততই যেন রে নিকট হয় ।

(৬)

সহসা কাঁপিল হৃদি-চন্দ্র তার,
করেতে কাঁপিল কুসুমের হার,
যেনবা নাগরে নেহারি বালার,
শরমে শিহরি উঠিল কায় !
হেরি সে বাঞ্ছিতে লাজে চন্দ্রাননে,
সে চন্দ্র বদন ঝাঁপিল বসনে,
শ্যাম সোহাগিনী শ্যাম দরশনে,
মনের বাসনা যেন লুকায় ;

(৭)

দাঁড়ায়ে সুন্দরী মুহূর্ত্তের তরে,
হেরিল আকাশ ভাবিল অন্তরে,
আবার চলিল দ্রুত পাদ ভরে,
তৃষায় কাতর হরিণী যেন,
মরীচিকা হেরি মরুভূমে হায়,
চলিতে চলিতে থমকি দাঁড়ায়,
ক্ষণেক নেহারি পুন ছুটে যায়,
কেনরে পিপাসা দারুণ হেন !

(৮)

এখন (ও) ফিরারে রমণী রতনে,
ভাঙ্গিছে বালার মোহের স্বপনে,
সোনার প্রতিমা ফিরারে যতনে,
বল্‌রে সে দেশ এদেশ নয়;
ননীর পুতলী প্রেমের চৈতন্য,
বিমুগ্ধ বিহ্বলা বিপথে বিপন্ন,
আপনা ভাবিয়া ক্ষণেকের জন্য,
ভাবেনা সে দেশ এদেশ নয়।

(৯)

তাই বলি হায় বলি দে বালায়,
প্রেম পাগলিনী কোথা চলি যায়,
এখন (ও) ফিরারে বলিদে বালায়,
ক্ষীর সরোবর এদেশে নাই;
এদেশে হবে না আশার সুসার
এদেশে হবে না নিকুঞ্জ বিহার,
এদেশে পাবে না দরশন তার,
এ বড় বিষম বিষম ঠাঁই।

(১০)

এদেশে প্রকৃতি অতি দীন হীনা,
বিরসে বিবর্ণ বিষাদে মলিনা,
নীরব রোদনে বিরাম বিহীনা,
অবসন্ন প্রাণে সতত বয়,
বার তিথি মাস এক দিন (ও) তরে,
এদেশে কভু না বসন্ত বিহরে,

শিহরি কোকিল যায় দেশান্তরে,
স্বর ভঙ্গ পাখী এদেশে হয়!

(১১)

এদেশে চাঁদের চাঁদনী বিকাশ,
নাহি হয় কভু না হাঁসে আকাশ,
এদেশে বহেনা মধুর বাতাস,
কখন এদেশে ফুটে না ফুল,
গিরিকন্দরের যত অন্ধকার,
এদেশ আঁধার ন গুণ তাহার,
রবির কিরণে না হয় সংহার,
বিহঙ্গ পতঙ্গ ভয়ে আকুল।

(১২)

এই সে ভয়াল ঘোর অন্ধকারে,
ঘুরিছে ভৈরব বিকট আকারে,
ঘন ঘন রব বিষম হুঙ্কারে,
অলক্ষ্যে বাজায়ে কালের ভেরী;
সে ভেরীর রবে বাসুকির শির,
উঠিতেছে কাঁপি ভুবন অস্থির,
স্মরণে দেবতা রোমাঞ্চ শরীর,
উঠিছে শবদ ব্রহ্মাণ্ড ঘেরি।

(১৩)

এদেশেতে আশা মধুর ভাষিণী,
না শুনায় কালে মধুর কাহিনী,
চির দয়াময়ী সাহস নন্দিনী,
আপনি এদেশে তরাস পায়,

এই দেশে এই কাল নদী জল,
অনন্ত সাগরে মিশিছে কেবল,
এই সে করাল কাল সন্ধিস্থল,
মহা কাল ছায়া কালের গায়।

(১৪)

বৃথা বিভীষিকা বৃথা এ শশ্মান,
বৃথা রে কালের বিজয় নিশান,
বৃথা এ শাণিত উলঙ্গ কৃপাণ,
ধরিলি বালার মাথার পরে;
ভ্রূক্ষেপে ভ্রূভঙ্গী করিয়া যে তায়,
ওই দ্যাখ_সেই নারী চলে যায়,
একটিও কেশ নড়েনা মাথায়,
সতী কি স্বর্গীয় শকতি ধরে।

(১৫)

ওই দ্যাখ_করে সেই ফুল্ল হার,
সেই প্রাণ পণ সেই মন তার,
সেই সে সুধাংশু বদনে বালার,
ফুটিছে অপূর্ব্ব প্রেমের ভাতি;
ওই দ্যাখ দেবী দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত,
অনল কুমারী সুধাতে পালিত,
ওই দ্যাখ_যায় চিত প্রফুল্লিত
নয়নে জ্বলিছে আশার বাতি।

(১৬)

এই কিরে সেই মরুর মাঝার,
মরীচিকা রূপ মৃগী ভুলাবার,

অথবা বঙ্গের বিধবা বালার,
প্রাণ জুড়াবার এই কি স্থান!
বলিহারি যাই প্রেম পরায়ণা,
বলিহারি যাই মোহ পরায়ণা,
বলিহারি যাই ভক্তি পরায়ণা,
বলিহারি যাই নারীর প্রাণ।

সমসাময়িক সাহিত্য।

মনুসংহিতার বাঙ্গালা অনুবাদ। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন অনুবাদক ও প্রকাশক। কলিযুগে ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে মনুসংহিতাই সর্ব্ব প্রধান। অন্যান্য সংহিতার সহিত মতবিরোধ হইলে মনুর বিধি অনুসারেই কার্য্য হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে মনুসংহিতা সরল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা এই অনুবাদের যে নমুনা দেখিয়াছি, তাহাতে এ কথা বলিতে পারি যে, অনুবাদ মূলানুযায়ী এবং প্রাঞ্জল হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে টীকা সন্নিবেশিত করিতেছেন, তাহাতে সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্যের নিকটও ইহা উপাদেয় হইতেছে। এই অনুবাদ বার খণ্ডে সমাপ্ত হইবে ; ইহার কারণ এই যে মূল সংহিতায় দ্বাদশটি অধ্যায় আছে। সাধারণে ইহা ক্রয় করিতে পারিবে, এরূপ আশা করা যায়, কেননা সমগ্র অনুবাদের মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র স্থির করা হইয়াছে। ইহাও একেবারে দিতে হইবে না, ত্রৈমাসিক অগ্রিম ॥৵০ আনা করিয়া দিলেও চলিবে। বহরমপুর অরুণোদয় যন্ত্র হইতে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

ভারতনলিনী। নাট্যগীতি। শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত বিরচিত। আলবার্ট প্রেস। ১২৮৬। মূল্য চারি আনা। ভারতনলিনীতে যে গুণ আছে, তাহার প্রশংসা কালিদাসের প্রাপ্য ; যে কিছু দোষ আছে—বড় কিছু নয়—তাহার জন্য গ্রন্থকার স্বয়ং দায়ী। এই নাট্যগীতি খানি "অভিজ্ঞান শকুন্তলার" মহর্ষি কণ্বের তপোবনে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রথম সন্দর্শন, অনুরাগসঞ্চার এবং মিলন লইয়া বিরচিত। যে টুকু অবিকল কালিদাসের অনুবাদ, সে টুকু ভাল হইয়াও ভাল হইতে পায় নাই—গ্রন্থকার নিজের কারিগরি খাটাইতে গিয়া গ্রন্থের, নিজের, কালিদাসের ও আমাদের মাথা খাইয়াছেন। গ্রন্থকার যে নাট্যগীতি রচনা করিবার আজিও সম্পূর্ণ অধিকারী নহেন, তাহার প্রমাণ একটা এই যে, কোন্ স্থলে গানের প্রয়োজন তাহা গ্রন্থকার আজিও বুঝেন না। উদাহরণ—

অনু। হ্যাঁ সখি! আমিও চমৎকৃত হয়েছি ; কিছু জিজ্ঞাসা করে দেখি। (প্রকাশ্যে)।

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

পারে কি ও পদে দাসী, সুধাতে এই কথা।
কি লাগি এ ক্লেশ সহি, আজি এসেছ হেথা॥
কোথায় বসতি কর, কি জাতি কি নাম ধর,
জানিতে বাসনা করি তোমার বারতা॥

অর্থাৎ অনসূয়া দুষ্মন্তকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি কে, তোমার বাড়ী কোথা, নাম কি, জাত কি, এখানে কেন এসেছ? ইহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সংগীতের কি প্রয়োজন ছিল? কে কোন্ কালে বেহাগ রাগিণীতে, আড়াঠেকা তালে অপরিচিত নবাগতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে? আবার দুষ্মন্ত যখন মাধব্যকে রাজধানী ফিরিয়া যাইতে

আদেশ করিতেছেন, তখনও গান। অনসূয়া তপোবনলালিতা, বনের পাখী—সময়ে অসময়ে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে গান করা তাহার পক্ষে কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইলেও, সসাগরা পৃথিবীপতি মহারাজা দুষ্মন্ত যে অনুচরদিগকে হুকুম করিতে হইলে তাল রাগিণী ঠিক করিয়া, সুর ভাঁজিয়া করিবেন, ইহার ন্যায় অসঙ্গত জগতে কিছু নাই।

নিশীথ-চিন্তা। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। এই গ্রন্থখানি উচ্চ অঙ্গের কাব্য না হইলেও, রচনা ও ভাব বিষয়ে অতি উত্তম হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবুর অন্যান্য গ্রন্থের রচনা যেমন শিথিল, ইহার সেরূপ নহে। ইহার রচনায় গাঢ়তা আছে। তদ্ব্যতীত কেমন একটু প্রশান্ত স্থৈর্য্য আছে, তাহাতে পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করে। এই গ্রন্থে "এই না সে নিশা" বলিয়া আরম্ভ করিয়া কতকগুলি অতি সুন্দর ভাব একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাঁহারা শেক্ষপীয়র প্রণীত "মারচ্যান্ট অব্ ভেনিস্" নাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন এ গুলিকে সেক্ষপীয়রের নকল বলিয়া উপেক্ষা না করেন। কেননা ইহার ভিতর গ্রন্থকারের নিজের ভাবও আছে; তাহা সেক্ষপীয়রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইলেও নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

শম্ভুবংশ চরিত। কাকিনীয়াধিপতি মহোদয়গণের বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শ্রীবনোয়ারি চন্দ্র চৌধুরি প্রণীত। শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত। এই রূপ গ্রন্থের আমরা বিশেষ সমাদর করি। যদি সকল উচ্চ পরিবারের বা রাজবংশের বিবরণ এই রূপে সংকলিত হয়, তাহা হইলে বঙ্গের লুপ্ত ইতিবৃত্তের অনেকটা উদ্ধার হয়, এবং প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থের অনেক ভ্রম সংশোধিত হয়। এই গ্রন্থের একটা প্রধান দোষ এই যে, পড়িলেই বোধ হয় যেন ইহা কোন নিতান্ত অনুগত, আশ্রিত লোকের লেখা। কিন্তু এ দোষ সত্ত্বেও আমরা শম্ভুবংশ চরিতের প্রশংসা ও সমাদর করি এবং বনওয়ারি বাবুর দৃষ্টান্ত অনুকৃত হয়, ইহা সর্ব্বথা ইচ্ছা করি।

বিজ্ঞাপন।

এ পর্য্যন্ত গ্রাহকগণ মধ্যে যাঁহারা মাসিক সমালোচকের মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহাদিগের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা যেন আর স্ব স্ব দেয় পাঠাইতে বিলম্ব না করেন। সমালোচক ধারে দিবার রীতি নাই।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় রচনা প্রবন্ধাদি, সমালোচ্য গ্রন্থাদি জিয়াগঞ্জ, বালুচর ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

ব্যারিং বা ইন্সফিসিয়েণ্ট পত্র আমারা গ্রহণ করিব না। যাঁহারা পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উত্তর লেখা যাইবে না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা ডাকের টিকিটে মূল্য পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় ৵০ আনা কমিসন দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট যেন কেহ না পাঠান। মনিঅর্ডারে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর ট্রেজরীতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন তাঁহাদিগের নিকট পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪৲ টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে সুতরা বিনা মূল্যে দেওয়া এক কালে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্র ৶০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ
মাসিক সমালোচক কার্য্যালয়
খাগড়া বহরমপুর।

(১ম খণ্ড।) (১০ম সংখ্যা।)

মাসিক সমালোচক।

(সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।)

সম্পাদক

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

সন ১২৮৬ সাল পৌষ।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

বহরমপুর,—অরুণোদয় যন্ত্রে

মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

মাসিক সমালোচক।

—:*:—

স্ত্রীচরিত্র।

স্ত্রীচরিত্রের আর একটা ভঙ্গী দেখ। শেক্স্‌পীয়রের দেসিদিমোনা সুন্দরী, যুবতী, উচ্চবংশসম্ভূতা—কত উচ্চবংশসম্ভূত, ধনবান, কুঞ্চিত কেশ, সুন্দর যুবা তাহার প্রণয়ের জন্য লালায়িত ছিল——দেসিদিমোনার কাহাকেও মনে ধরে নাই। আর ওথেলো মুরবংশীয়, কৃষ্ণকায়, বয়সে পৌঢ়——দেসিদিমোনার চিত্ত ওথেলোতে পড়িবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। সহজে ইহা বিশ্বাস হওয়াই দুষ্কর——অন্ততঃ দেসিদিমোনার পিতার বিশ্বাস হয় নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ওথেলো নিশ্চয় তাঁহার কন্যাকে মন্ত্রবলে মুগ্ধ করিয়াছে বা ঔষধ খাওয়াইয়া বশ করিয়াছে——নহিলে দেসিদিমোনা সুন্দরী কালো কুৎসিত ওথেলোর জন্য গৃহত্যাগিনী হইবে, ইহা বুদ্ধিতে ধরে না। শেষে ব্রাবান্‌সিওর চৈতন্য হইল। দেসিদিমোনা সভার মধ্যে, রাজার সম্মুখে, পিতার মুখের উপর বলিল—"আমি পিতৃগৃহ যাইব না; আমি ওথেলোর রূপ ওথেলোর চিত্তে দেখিয়াছি, তাঁহার গৌরব ও বীর্য্যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি, যেখানে ওথেলো যাইবে সেই খানে আমি যাইব।"

যে গভীরতত্ত্ব ওথেলো দেসিদিমোনার মিলনে পরিব্যক্ত হইয়াছে, মহাভারতকার দ্রৌপদীচরিত্রে সেই তত্ত্ব লুকাইয়া রাখিয়াছেন। পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের উপরই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসা ছিল; সেই জন্য দ্রৌপদীর সশরীরে স্বর্গে যাওয়া হইল না। শুদ্ধ তাহাই নহে। যে দ্রৌপদী সতী বলিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া মহেন্দ্র

তুল্য পাঁচ পাঁচ জন স্বামী থাকিতেও সেই পাঞ্চালী কর্ণের প্রতি আসক্ত ছিলেন——লুকাইয়া লুকাইয়া, মনে মনে তিনি কর্ণকে স্বামী প্রার্থনা করিতেন। কেন এমন হইল? কেন সর্ব্বজন কামনীয়া দেসিদিমোনা ওথেলোর জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইল? কেন সতী কুলের আদর্শ স্থানীয়া দ্রৌপদী কর্ণকে স্বামী প্রার্থনা করিতেন। চিন্তাশীল পাঠক বলিবেন, নারীহৃদয়ের উপর বীর্য্যের মোহ বড় প্রবল। কিন্তু কেন প্রবল?

আবার সেই আদিম কালের কথা মনে কর। অসভ্যাবস্থায়, যখন শ্রমবিভাগ বিস্তৃত হইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলেরও জীবনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয় নাই, যখন সমাজ বিধি পরিচালিত এবং শাসনবদ্ধ হইয়া পরস্বত্বের সম্মান করিতে শিখে নাই, তখন যে যেমন বীর্য্যবান ও ক্ষমতাশালী, জীবনে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা তাহার সেই রূপ। যে অধিক বীর্য্যবান, সে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবে——অধিক সংখ্যক বীর্য্যবান অপত্য প্রতিপালন ও সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। যে দুর্ব্বল, তাহার নিজের পেট চলাই দায়, তার অন্যের চালাইবে কি? কাজেই তাহার দৌর্ব্বল্য উত্তরাধিকার করিতে অধিক অপত্য সংরক্ষিত হইতে পায় নাই—হয় ত আদৌ অপত্য সংরক্ষণ হয় নাই। বংশ লোপ হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের যখন পুরুষের উপর নির্ভর, এবং পুরুষের কৃতকার্য্যতা বীর্য্যানুযায়ী, কাজেই তখন যে স্ত্রীলোক বীর্য্যবান পুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদেরই বংশাবলী জীবনসংগ্রামে রক্ষা পাইয়াছে এবং পিতৃমাতৃ প্রকৃতি উত্তরাধিকার করিয়া তত্তৎ দোষগুণের স্থায়িত্ব বিধান করিয়াছে। আবার দোষগুণের উত্তরাধিকার অনেকটা যৌন কারণে সংযমিত *—মাতার দোষগুণ

* See Sedgwick's Essays and Darwin's Animals and Plants under Domestication, vol II, ch. 12.

যতটা কন্যাতে বর্ত্তে পুত্রে তত নহে—পিতার দোষগুণ যতটা পুত্রে প্রাপ্ত হয় কন্যা তত নহে। সেই জন্য পুত্র যেমন পিতার বীর্য্যের অধিকারী হইয়াছে কন্যা তেমনি মাতার বীর্য্যানুরাগিতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে স্ত্রীলোক কেবল রূপ দেখিয়া বা অন্য কোন গুণে চিত্ত হারাইয়াছে, বীর্য্যের দিকে চাহে নাই, তাহাকে স্বতইঃ সংসারচক্রের তলে পড়িয়া দলিত হইতে হইয়াছে। যে অবস্থায় সামাজিক বৈষম্য এবং সাংসারিক কৃতকার্য্যতার একমাত্র মূল বীর্য্য, সে অবস্থায় পরপ্রত্যাশী এবং পরপ্রতিপাল্যদিগের সর্ব্বপ্রধান এবং অবশ্যম্ভাতব্য গুণ—বীর্য্যপক্ষপাতিতা; কেননা উহা জীবন সংরক্ষণের এবং বংশ প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়।

মনে কর, অতি প্রাচীন কাল হইতে স্ত্রীলোকেরা যদি পৌরুষ ও বীরত্ব পরিহার করিয়া দৌর্ব্বল্য ও ভীরুতার সহিত মিলিতা হইত—যাহারা সন্তান রক্ষণে অধিকতর ক্ষমবান তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, যাহারা অক্ষম বা অল্পক্ষম তাহাদের অদৃষ্টের সঙ্গে আপনার ও আপন বংশাবলীর অদৃষ্ট জড়াইত—তাহা হইলে, ফল কি দাঁড়াইত? তাহা হইলে মনুষ্যজাতি ক্রমেদুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া শেষে লোপ হইয়া যাইত। স্ত্রীজাতি তাহা করে নাই, না করিয়া বীর্য্যবানকে, ক্ষমতাশালীকে, মহৎকে আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মনুষ্যজাতির দিন দিন উন্নতি, দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। একাল পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতিতে সেই আদিম বীর্য্যানুরাগিতা দেদিপ্যমান—এখনও স্ত্রীর হৃদয়ে বীর্য্যের মোহ অত্যন্ত প্রবল; সৌন্দর্য্যের মোহ অনেক সময়ে তাহার নিকট পরাস্ত হয়—দৃষ্টান্ত, দেসিদিমোনা।

চিরকাল স্ত্রীজাতি সবল ও ক্ষমতাবানের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। সংস্কার বশতঃ এখনও ক্ষমতা দেখিলেই স্ত্রী হৃদয় আকৃষ্ট হয়। যেখানেই ক্ষমতার বিকাশ দেখে, সেই খানেই স্ত্রী হৃদয়

অবনত, অনুগত, পদানত হইয়া পড়ে। বেকন এক স্থলে বলিয়াছেন যে, দুর্ব্বিনীত লোকের পত্নী প্রায় সাধুশীলা হয় (১)। হর্বর্ট স্পেন্‌সর এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, তেজস্বী, ক্ষমতাশালী অথচ নিষ্ঠুর লোকের প্রতি স্ত্রীলোকের আসক্তি যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, দুর্ব্বল, নিস্তেজ অথচ সদ্ব্যবহারী লোকের প্রতি তত হয় না (২)। ইহার কারণ, এই বীর্য্যানুরাগ, এই ক্ষমতা-পক্ষপাতিতা, বহুকালের এই সবল নির্ভরের অভ্যাস।

মূলে এই রূপ ক্ষমতা——জীবনোপায় সংগ্রহের সহিত যে ক্ষমতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে——মূলে এই রূপ ক্ষমতাপক্ষপাতিতা হইতে ক্রমে স্ত্রীচরিত্রে সকল প্রকার শক্তির উপাসনা প্রবণতা স্থান লাভ করিয়াছে, বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে। কি ধর্ম্ম, কি রাজবিধি, কি সমাজ, যে দিকে চাহিয়া দেখিবে, সেই দিকেই শত সহস্র দৃষ্টান্ত, শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে।

ধর্ম্মে দেখ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম শাসনের অধিকতর অধীন——ব্রত, উপবাস, তপঃ, জপ স্ত্রীলোকে যত করে, পুরুষে তাহার এক পাইও করে না। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দেবতার সংখ্যাও অধিক——আমাদের তেত্রিশ কোটি ত আছেই, তাহার উপর ষষ্ঠি, মাকাল, মনসা, শীতলা, ইথু, সুবচনী, গোরু বাছুর, ছাই ভস্ম, স্ত্রীলোকের যে কত দেবতা আছে, আমার ঘরের লোক হইয়াও সকল খবর রাখি না, সকল কথা জানি না। গুরু, পুরোহিত, গণক ঠাকুর, তীর্থের পাণ্ডা, গৌরাঙ্গের চেলা——ইহাদের সুতা পুরুষের হাটে বড় বিকায় না, কিন্তু স্ত্রী মহলে ইহাদের একাধিপত্য। আলকক্‌ সাহেব বলেন, জাপানের দেবমন্দীর সকলে কেবল স্ত্রীলোক ও বালক দেখা যায়——পুরুষ অতি অল্প। জগন্নাথের যাত্রীদিগের পনর আনা

(১) Vide Becon's Essays.

(২) Vide Herbert Spencer'study of sociology.

উনিশ গণ্ডাই স্ত্রীলোক। গঙ্গাস্নানে যখন যাত্রী আসে, তখন ঘাটে ঘাটে, পথে মেয়ে ধরে না—তাহার মধ্যে পুরুষ, সমুদ্রে জলবিন্দুর ন্যায়, কোথায় পড়িয়া থাকে। সাগরসঙ্গমে স্ত্রীলোকের সন্তান ফেলিয়া দেওয়ার অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়—পুরুষে ফেলিয়াছে এরূপ কথা কখন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই পাশ্চাত্য ভাবপ্লাবিত বঙ্গদেশে আজিও যে দোল দুর্গোৎসব হয়;—আমাদের এই এংগ্লোবেঙ্গলার সমাজে, এই হ্যাট্‌ কোট্‌ মদ্য মাংসের মধ্যে আজিও যে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে, হোমাগ্নি জ্বলে, দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা হয়, অতিথি অভ্যাগত এক মুষ্ঠি অন্ন পায়, সে কেবল স্ত্রীলোকের প্রসাদাৎ। বাবু নিজে দেবতা ব্রাহ্মণের বড় একটা ধার ধারেন না, কিন্তু কি করেন—গৃহিণীর অনুরোধ, মহাগুরুর আজ্ঞা, না রাখিলে রক্ষা নাই। কিন্তু তাঁহার অনুরোধে রাখা পর্য্যন্তই—স্ত্রীলোকেরাই পূজার উদ্যোগ করিতেছে, উপবাস করিতেছে, সকল বিষয়ের তদারক রাখিতেছে; বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া, ইয়ার লইয়া, মদ খাইয়া বমি করিতেছেন, বালিশ ছিঁড়িয়া তুলা খাইতেছেন। যখন কোন দেশে ধর্ম্মসংস্কার হয়, স্ত্রীলোকেরা প্রাচীন ধর্ম্মবন্ধন পুরুষের ন্যায় সহজে ছিঁড়িতে পারে না। ইংলণ্ডে সংস্কৃত ধর্ম্ম পুরুষ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার অনেক দিন পর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা রোমান্‌ক্যাথলিক্ ছিল (৩)। ১৮৩৯ সালে দেখা গিয়াছিল, রবিবারের স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ছাত্রসংখ্যার ঠিক দ্বিগুণ হইয়াছিল, কেননা খ্রীষ্টিয়ানের নিকট রবিবার ঈশ্বরের দিন। (৪)

রাজশক্তি সম্বন্ধে দেখ। পুরুষে যেমন সহজে রাজনিয়ম ভঙ্গ করে, স্ত্রীলোকে তাহা পারে না, তাহা করে না। ইংলণ্ডে ফ্রান্সে অপরা-

(৩) Vide Hallam's Constitutional History of England, vol. I. P. 399.

(৪) Journal of statistical society. vol. II. P. 67.

রে তালিকা গৃহীত হইয়া দেখা গিয়াছে যে, অপরাধীর সংখ্যা অপরাধিনীর সংখ্যার প্রায় চতুর্গুণ, এবং অনেক বৎসর ধরিয়া হিসাব করিলেও দেখা যায় যে, ইহার অতি অল্পমাত্র ব্যত্যয় ঘটে (৫)। আবার অন্যত্র এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরুষের অপরাধ প্রবণতা স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক (৬)। যখন কোন দেশে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন স্ত্রীলোকেরা প্রায় প্রতিষ্ঠিত রাজশাসনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী থাকে। সমাজ দেখ। যত প্রকার সামাজিক শক্তি আছে, স্ত্রীজাতি সকলেরই ভক্ত। পুরুষ যে সামাজিক শক্তির দাস নহে, এরূপ বলিতেছি না; কিন্তু পুরুষের উপর ইহাদের যেরূপ প্রভুত্ব, স্ত্রীলোকের উপর তাহার সহস্র গুণ। ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত আমরা দিতেছি। ধন একটা সামাজিক শক্তি; বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান শক্তি। ধনের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে এমন কার্য্যই নাই, ধনের দ্বারা না ঢাকিতে পারে এমন পাপই নাই, ধনের দ্বারা আয়ত্ত করা না যাইতে পারে এমন পদার্থই নাই—সুতরাং ধনকে সর্ব্বপ্রধান শক্তি বলিতেছিলাম। স্ত্রীচরিত্রে দেখিবে, ঐশ্বর্য্যোপাসনার ভাব অত্যন্ত প্রবল। প্রবল বলিয়া লক্ষ্মী পূজায় স্ত্রীলোকের এত ভক্তি, অনন্তব্রতে এত আসক্তি। কন্যার বিবাহ দিতে, পিতা দেখেন, বর কেমন—মাতা দেখেন, ঘর কেমন—পিতার ইচ্ছা, পাত্রটি সুপাত্র হয়, সদ্বংশজাত হয়, সচ্চরিত্র

(৫) "Both in England and France the proportion of male to femali criminals is about four to one, and this result varies but slightly during several years."

Report of British Association for 1839. p. 117.

(৬) "The tendency to crime in the male sex is five times greater than in the female sex"

Journal of Statistical society. vol. XI. p. 153.

হয়, লেখাপড়া জানে; মাতার কামনা, বিলক্ষণ বিষয় আশয় থাকে, মেয়েটিকে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সোণা রূপায় ঢাকিয়া দেয়। স্ত্রীজাতি প্রচলিত যে সকল ব্রত অনুষ্ঠানে কথা, শুনিবার রীতি আছে, তাহার সকল কথাতেই, শুনিবে, ঐশ্বর্য্যলাভই চরম ফল। জীমূতবাহন, ইথু ষষ্ঠী—সকল অনুষ্ঠানেরই ইতিবৃত্ত বা কথা য় শুনিবে, ব্রতাকারিণী হয় রাজ্ঞী হইল, নয় অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিল, নয় ঘরে লক্ষ্মী অচলা হইলেন। লুসিয়ানের লাইসিয়া পরম সুন্দরী সর্ব্বজনস্পৃহনীয়া যুবতী;—অনেক সুন্দর, গুণবান যুবা তাহার পাণিপ্রার্থী ছিল; কিন্তু কাহাকেও লাইসিয়া পতিত্বে বরণ করিল না। এথিক্লিস, মেলিসস্ প্রভৃতি সকলকে পরিহার করিয়া অতি নীচ, কদাকার, কেশহীন পাশিয়সকে মনোনীত করিল, কেননা কিছু দিন পূর্ব্বে, মৃত্যুকালে, পাশিয়সের পিতা আপন বিপুল সম্পত্তি একা পাশিয়সকে দিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। রবর্ট বর্টন এক স্থলে লিখিয়াছেন—অনেক যৌবনশালিনী রূপসী, বৃদ্ধ, বুদ্ধিহীন, বিকলাঙ্গ অকর্ম্মণ্যের হাতে আপনাকে বিসর্জ্জন করে—হয় ত সে বাতে পঙ্গু, বিংশতি প্রকার পীড়ার আধার, এক চোক কানা, এক পা খোঁড়া, নাসিকার চিহ্ন মাত্রাবশিষ্ট, মস্তকে চুল নাই, মস্তিষ্কে রস নাই, সততা নাই; কিন্তু জমিদারী আছে, টাকা আছে, সুতরাং তাহার সব আছে, সুতরাং সে সকলের অগ্রে প্রার্থনীয় (৭)। রূপ, যৌবন, সুখ্যাতি, যশ—যে রমণী কিছুতেই ভুলে না, সেও অনেক সময়ে অর্থে বশ হয়। (৮)

যে চিরকাল বীর্য্যবানকে ভাল বাসিয়া আসিয়াছে বীরের অবশ্য-

(৭) Vide Burton's Anatomy of Melancholy. P. 5`9.

(৮) "Maids like Moths are ever caught by the glare,
And Mammon wins his way where Seraphs might despair."

Childe Harold's Pilgrimage.

ন্মতা গুণ সকলও সে ভাল বাসিবে এবং তাহার বিপরীত গুণ বা দোষ সুতরাং তাহার অপ্রীতিকর হইবে। একটা কথা দেখ। যে বীর সে উদার প্রকৃতি, উন্নত চরিত্র, প্রশস্ত হৃদয়। প্রকৃত বীরের হৃদয়ে নীচতা থাকে না। স্ত্রীচরিত্রে দেখিবে, নীচের প্রতি ঘৃণা দৃঢ়সম্বদ্ধ। তোমার প্রণয়িনী তোমার সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু তোমার নীচতা মার্জ্জনা করিবেন না। যে দিন তিনি তোমার নীচতা দেখিতে পাইবেন, সেই দিন নিশ্চয় জানিও তাঁহার ভাল বাসায় ভাঁটা ধরিয়াছে। তুমি যদি তাঁহাকে সহস্র অযত্ন কর, যদি তাঁহার প্রাণপণ প্রণয়ের বিনিময়ে তিনি তোমাকে একবার চক্ষের দেখাও দেখিতে না পান, একটু মুখের হাসির সম্বর্দ্ধনাও না পান, যদি তাঁহার উদ্বেগপূর্ণ দিবস, নিদ্রাশূন্য রাত্রি, অনুক্ষণ মর্ম্মদাহের বিনিময়ে কেমন আছ বলিয়া একটা কথার কথাও না সুধাও, তবু তিনি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী হইয়া থাকিবেন; কিন্তু তুমি যদি তাঁহার অনাদৃত প্রণয়ের কথা লইয়া গর্ব্ব বা উপহাস কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, সেই দিন হইতে তিনি তোমার শত্রু। লেডি লিউনিলে আপনার অঙ্গের অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া প্রণয়ীর অমিত ব্যয়িতার পোষকতা করিতে পারেন—লোক লাজ, কুলভয় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সহস্র অপকর্ম্ম করিতে পারেন; কিন্তু প্রণয়ীকে জালিয়াৎ জানিয়া আর তাহার চিত্তে চিত্ত বাঁধিয়া রাখিতে পারেন না। পশুপতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু মনোরমা তাঁহার হইতে চাহে না,—বঙ্গের রাজ্ঞী হইবার জন্যও বিশ্বাসঘাতকের বামে বসিতে চাহে না। ভগবান্, ক্লেরেন্‌ড্যাও, কন্‌রাড্—রমণীহৃদয় ডাকাইতের প্রেমে মজিয়াছে, ইহার অনেক নিদর্শন, অনেক দৃষ্টান্ত আছে (১), কিন্তু চোরের পক্ষপাতিনী হইয়াছে, এরূপ নিদর্শন কিছু নাই; কেননা ডাকাইতেও এক প্রকার

(১) Vide Sir Walter Scott's Pirate and Lord Byron's Corsair.

বীরত্ব আছে, কিন্তু চোরে —কেবল নীচতা আছে। যে দিন কলঙ্কী জয়চন্দ্র যবনের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ভারতের অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত করিতেছিল, সে দিন তাঁহার মহিষী বলিয়াছিলেন—

যবন আশ্রয় যদি প্রতিজ্ঞা তোমার,
তস্করের, পামরের, নীচের আশ্রয়—
কেশাগ্র দেখিতে মোর পাইবে না আর,
জনমের মত নাথ হইনু বিদায়।
বিধবা হয়েছি যবে করিব শ্রবণ,
সেই দিন পুনর্ব্বার জনমের তরে,
একত্রে চিতার বক্ষে করিব শয়ন
বক্ষে করি দেহ তব ডাকিব ঈশ্বরে—
এ জনমে এই শেষ যেন জন্মান্তরে
বীরপতি করি তোমা সমর্পেন মোরে।

হিন্দুর মেয়ে, ইহার অধিক আর কি বলিবে?

যে হৃদয় চিরকাল শক্তি ও ক্ষমতার অনুরাগী, ভীরুতা এবং দৌর্ব্বল্য অবশ্যই তাহার বিরাগভাজন ও ঘৃণাস্পদ হইবে। সেই জন্য মুখচোরা, মেয়েমুখো পুরুষ স্ত্রী লোকেরও উপহাসের পাত্র। স্ত্রী লোকে যে বৃদ্ধ স্বামীকে ঘৃণা করে, তাহাও এই কারণে। বার্দ্ধক্য দৌর্ব্বল্যের আধার, বার্দ্ধক্য দ্বিতীয় শৈশব—অলস, অবস, অসহায়, পরমুখাপেক্ষা, পরাধীন—শুতে পেলে বসতে চাহে না, বসিলে উঠিতে চাহে না, বিছানায় পড়ে আর ঘুমায়। আহার করিয়া উঠিয়া এক প্রহর কাল হাঁপাইয়া মরে; আবার তামাক খাইয়া যেরূপ মারত্মক কাশি কাশে, যে রকম সাংঘাতিক দম্ টানে, মনে হয় বুঝি বৈধব্য ঘটালে। বীর্য্য পক্ষপাতী রমনী হৃদয় কেন তাহাতে মজিবে? যুগে যুগে যে হৃদয় ক্ষমতা ও শক্তির পূজা করিয়া আসিয়াছে, সে হৃদয়

অকস্মাৎ চিরন্তন সংস্কার ভুলিয়া জরাও দৌর্ব্বল্যের উপাসনা কেন করিবে? নির্ব্বান দীপের দশালগ্ন আলোক বিন্দুতে ঘর আলো হইবে কি? কিন্তু তাই বলিয়া আমরা, যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নিন্দা করি না; যাঁহারা করিবার ইচ্ছা রাখেন, তাঁহাদিগকেও ভগ্নোদ্যম করিতে চাহি না, কেননা যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করেন তাঁহারা প্রায় ভালবাসার কামনায় করেন না—অসময়ে কে করিবে, এই বলিয়া করেন। আর হিন্দুর মেয়ে, প্রাণের দায়ে না হউক, অন্ততঃ ধর্ম্মের দায়েও অসময়ে করিবে, অসময়ে দেখিবে। তবে ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, বৃদ্ধ যদি ঠিক যুবা হইতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় যুবতী ভার্য্যার তত বিরাগভাজন হইতে হয় না। বৃদ্ধের শরীরে যদি যৌবনের সজীবতা, চপলতা, তেজস্বিতা, প্রফুল্লতা, ব্যগ্রতা, উদারতা, উদ্যমশীলতা, উৎসাহ পূর্ণতা, আশা, পিপাসা, আসঙ্গলিপ্সা থাকে, তাহা হইলে রমনী হৃদয়ও বোধ হয় বার্দ্ধক্য ভুলিয়া বৃদ্ধের বশ হয়। তা, না বার মন তৈলই পুড়িবে, না রাধাই নাচিবে। বৃদ্ধ জাকে ফেরাঁদ যে রাত্রে সিসিলির জন্য উন্মত্ত হইয়া, তাহার শয়ন কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল—"কি করিলে তুমি আমার হইবে সিসিলি? কেমন করিয়া তোমার চিত্ত আকর্ষণ করিব?" তখন চতুরা সিসিলি বলিল—"তুমি বৃদ্ধ মহাজন, বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই—তোমার কার্য্যও কি আমায় শিখাইয়া দিতে হইবে? তুমি বুড়া হইয়াছ—উদ্যমশীল হও; তোমার বার্দ্ধক্য ঢাকিয়া যাইবে। তোমায় দেখিলে ঘৃণা হয়—ভীষণ হও; আর তোমার প্রতি ঘৃণা থাকিবে না। বালকের ন্যায় রোদন করিলে কি হইবে? পত্নীগণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া যে অশ্ব সদর্পে হেষারব করে, যদি তাহার অনুরূপ না হইতে পার, তবু নির্ব্বোধ উষ্ট্র, যে জানু কুঞ্চিত করে এবং পৃষ্ঠ অবনত করে, তাহার ন্যায় হইও না। অন্ততঃ ব্যাঘ্রের অনুরূপ হও;—ব্যাঘ্র যখন স্বহস্তহত শীকার

ও স্বহস্ত পাতিত শোণিত প্রবাহ মধ্যে গর্জ্জন করে, তাহারও এক প্রকার সৌন্দর্য্য আছে—নিবিড় অরণ্যগর্ভ হইতে ব্যাঘ্রী প্রতি গর্জ্জন করিয়া তাহার গর্জ্জনের উত্তর দেয়।„ সিসিলি যদিও ফেরাঁদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রবঞ্চনার ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা গুলিতে বিলক্ষণ সার আছে।

এত ক্ষণ আমরা যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, তাহা যদি সত্য হয়, যদি সত্যই নারীহৃদয় তেজস্বিতা ও শক্তির পক্ষপাতী হয়, যদি বাস্তবিকই নারীপ্রকৃতিতে সকল প্রকার দৌর্ব্বল্যের প্রতি অশ্রদ্ধা বদ্ধমূল থাকে, তাহা হইলে স্ত্রৈণ পুরুষদিগকে আমরা একটু সাবধান হইতে বলি। স্ত্রৈণতা মানসিক দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে নিজে অক্ষম সেই অন্যের উপর নির্ভর করে; যে আপনার পথ আপনি দেখিতে পায় না, সেই পরপ্রদর্শিত পথে চলে। তাহার উপর আবার যে ব্যক্তি বর্ণজ্ঞান শূন্যা, সংসার বোধ বিবর্জ্জিতা, অন্তঃপুরবদ্ধা স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহার ন্যায় দুর্ব্বলচেতা আর কে? পুরুষের দ্বারায় স্ত্রীলোক পরিচালিতা, ইহাই স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক অবস্থা। পুরুষের উপর নির্ভর করিবার দিকে স্ত্রী প্রকৃতির নৈসর্গিক টান। সুতরাং পুরুষকে স্ত্রীলোকের আঁচলধরা হইতে দেখিলে স্ত্রীলোকে অবশ্যই তাহাকে মনে মনে অবজ্ঞা করিবে। যাঁহারা মনে করেন যে স্ত্রীর কাছে 'রামবল্লভ' হইয়া থাকিলে এবং স্ত্রীর সকল কথায় মোসাহেবের মতন আজ্ঞা হাঁ, করিলেই স্ত্রী বড় ভালবাসিবে, তাঁহারা বড় ভ্রান্ত। রামবল্লভ শ্রেণীর পুরুষকে কস্মিন্ কালে কোন স্ত্রীলোক ভালবাসিতে পারে না—ঢেঁকি স্বর্গেও ধান ভানে। তবে, আপনার প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য হয় ত বেশ্ খাতির যত্ন করিবে, ধর্ম্ম ভাবিয়া হয় ত বাহিরে শ্রদ্ধা করিবে; কিন্তু যাহার নাম ভালবাসা, যে মর্ম্মান্তিক নেশায় অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত বিভোর হইয়া থাকে, তাহা কস্মিন্

কালে কোন রামবল্লভ কোন স্ত্রীলোকের নিকট পায় নাই, পাইবে না। স্ত্রৈণতা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা আছে। সেই জন্য অদ্য এ বিষয়ে আর কিছু লিখিতে বিরত থাকিলাম। তবে, স্ত্রী যাঁহাদের মরণ কাঠি জীবন কাঠি, যাঁহারা স্ত্রীর কথা প্রত্যাদেশ হইতেও বড় বলিয়া জানেন, তাঁহারা একটু বুঝিয়া চলেন, এই অভিপ্রায়ে কথাটার উল্লেখ করিয়া রাখিলাম মাত্র।

(ক্রমশঃ।)

দুই ভগ্নী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কুপথ্য

"——hath the power to soften and tame
Severest temper, smooth the rugged'st brow,
Enerve, and with voluptuous hope dissolve,
Draw out with credulous desire, and lead
At will the manliest, resolutest breast,
As the magnetic hardest iron draws."

Milton. Paradise Regained.

দেখিতে দেখিতে ছয় দিন অতীত হইয়া গেল যোগেন্দ্র রুগ্ন শয্যায় শয়ান আছেন। চল পাঠক, তাঁহার সংবাদ লওয়া যাউক।

বড় গ্রীষ্ম। বেলা ৩টা। যোগেন্দ্র সেই প্রকোষ্ঠে সেই শয্যায় শয়ান। রোগী চক্ষু মুদিয়া আছেন। শয্যা পার্শ্বে বসিয়া এক জগন্মোহিনী সুন্দরী ধীরে ধীরে রোগীর শরীরে বায়ু সঞ্চালন করিতেছেন। সেই সুন্দরী কমলিনী। তাঁহার সমীপে, পর্য্যঙ্ক নিম্নে আর এক কামিনী উপবিষ্টা, সে মাধী। প্রকোষ্ঠে আর কেহ নাই। পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে এক খানি চেয়ারে বসিয়া সুরেশ ঘুমাইতেছেন। সেই ঘরে

সুরেশের সন্নিকটে আর একখানি চেয়ারে একটি বালক উপবিষ্ট, সে বালক নীলরতন—কমলিনীর ভাসুর পো।

ভবন-দ্বারের ছায়ায় এক খানি পাল্‌কি পড়িয়া আছে। পাল্‌কির সাথী দ্বারবান চোবে ঠাকুর দরওয়াজার ছায়ায় বসিয়া. থাম হেলান দিয়া নাক ডাকাইতেছেন। উড়িষ্যার আমদানি অলকা তিলকা নিশোভিত বাহক মহাশয়েরা রাস্তার অপর পারে ঘরের ছায়ায় কাপড় বিছাইয়া ঘুমাইতেছেন, কেবল এক জন বসিয়া তামাকু খাইতেছেন।

যোগেন্দ্র সমভাবে শয্যায় শুইয়া আছেন। কমলিনী অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে রোগীর বদন প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। যোগেন্দ্র এক বার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন—কমলিনীর পরম রমণীয় বদন তাঁহার নেত্র পথে পতিত হইল। কমল বলিলেন,—

"যোগিন্‌!"

যোগিন তখন আবার নয়ন মুদিত করিয়াছেন। হয়ত কমলিনীর সম্বোধন তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। কিন্তু অল্প বিলম্বেই যোগেন্দ্র আবার চাহিলেন। চাহিয়া বলিলেন,—

"কমল! তুমি?"

কমলিনী বলিলেন,—

"তোমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আসিয়াছি।"

যোগেন্দ্র। বিনোদ?

কমলিনী। বিনোদ ভাল আছে।

যোগেন্দ্র। আমার পত্র?

মাধী কমলিনীর গা টিপিল। কমলিনী বলিলেন,

"তোমার পত্র বিনোদিনীকে দেওয়া হয় নাই। বিনোদ অন্তঃস্বত্বা এ কুসংবাদ তাহাকে দেওয়া ভাল নয়।"

এত যাতনা স্বত্বেও যোগেন্দ্রের মুখে হাসি আসিল। মায়া! তোমার প্রভুত্ব অসীম! বলিলেন,—

"বেশ করিয়াছ।"

কমলিনী ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"পত্র আমার হাতে পড়িলে দেখিলাম লেখাটা আর এক হাতের। পাঠ করিলাম। চিন্তায় আমার নিদ্রা হইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভাত হইল। প্রত্যূষে সকলকে বলিলাম, আমার ভাসুর পোর সম্বন্ধে বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি অদ্যই তাহাকে দেখিতে যাইব। কেহই আপত্তি করিল না।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতায় কমলের শ্বশুরালয়—তিনি সেই সূত্রে সময়ে সময়ে কলিকাতায় যাওয়া আসা করিতেন। এবারেও সেই ছলনায় আসিলেন।

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"কমল! তোমার গুণের সীমা নাই। তোমার নিকট আমি যে ঋণে বদ্ধ কখনও তাহার পরিশোধ হয় না।"

কমলিনী বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! তোমার জন্যে আমার যে কষ্ট তাহা কি বলিব? ভগবান তোমায় নীরোগ করুন, সুখে রাখুন সেই আমার পরম লাভ।"

কমলিনীর নয়ন কোণে দুই বিন্দু অশ্রু আবির্ভূত হইল। যোগেন্দ্র তাহা দেখিতে পাইলেন না; কারণ তিনি ক্লান্তি হেতু পুনরায় চক্ষু মুদিলেন।

কমলিনী যোগেন্দ্রের মস্তকে হস্ত মার্জ্জন করিতে করিতে অতৃপ্ত নয়নে তাঁহার বদনশ্রী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—

শরীর রক্ত মাংসে গঠিত। হৃদয় মানব হৃদয়ের ক্ষীণ বৃত্তি সমূহে পূর্ণ। তবে কেমন করিয়া আমি এ লোভ সম্বরণ করিব? জগতে কোন্ রমণী এ লোভ দমন করিতে পারিয়াছে? যদি কেহ পারিয়া থাকে, সে দেবী। কিন্তু আমি সে দেবত্ব প্রার্থনা করি না। আমি এ অদম্য আকাঙ্ক্ষা কখন নিবারণ করিতে পারিব না। লোকে ইচ্ছা হয় আমাকে রাক্ষসী বলুক, ইচ্ছা হয় আমাকে পিশাচী বলুক, যদি এ পাপে অনন্ত কাল আমায় নরক ভোগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার. তথাপি এ লোভ ত্যাগ করা আমার অসাধ্য। বিনোদিনীর সর্ব্বনাশ হইবে। তাহাতে কি? এ জগতে কে কবে পরের সর্ব্বনাশ না করিয়া আত্ম সুখ সংস্থান করিয়াছে? কোন্ নরপতি মানবী শোণিতে পদ প্রক্ষালন না করিয়া মুকুটে মস্তক শোভিত করিয়াছেন? কিন্তু বিনোদ তো আমার পর নহে। বিনোদ পর নহে বটে, কিন্তু যোগেন্দ্রের সহিত তাহার চির-বিচ্ছেদ না ঘটিলে আমার আশা মিটে কই? তাহাতে আমার কি দোষ? কত বাদশা, কত নরপতি,পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃ হত্যা, পুত্র হত্যা করিয়া রাজপদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি সামান্য রাজপদ লোভে সেই সকল দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিয়া থাকেন,তবে আমি এই অতুলনীয় সম্পদ হইতে আমার ভগ্নীকে কেন বঞ্চিত করিতে পারিব না?

সুরেশ রুদ্ধ দ্বার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—

"ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে। আমার কাছে সিসি আছে তাহা হইতে এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দেউন।"

কমলিনী তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নূতন ব্যাধি।

"Out of my sight, thou serpent !
Milton :—Paradise lost.

কালেজের সাহেবের সুচিকিৎসায় এবং সুরেশ ও কমলিনীর যত্নে ক্রমশঃ যোগেন্দ্র রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। এক মাস পরে অদ্য আমাদের তাহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটিতেছে। এই এক মাসে তাঁহার এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তিনি যেন এক্ষণে আর সে যোগেন্দ্র নহেন। তাঁহার সে কান্তি, সে রূপ সকলই যেন রোগের কঠোর আক্রমণে বিনষ্ট হইয়াছে।

যোগেন্দ্র একাকী বসিয়া আছেন, এই রূপ সময়ে মাধী তথায় আগমন করিল। যোগেন্দ্র মাধীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কি সংবাদ ?"

"বড় দিদি এখনই অসিবেন; আমাকে আগে সংবাদ দিতে পাঠাইলেন।"

"তোমার বড় দিদির গুণের সীমা নাই। কিন্তু তোমার ছোট দিদিতো আমায় একবারে চরণে ঠেলেছেন।"

মাধী ঈষৎ হাসির সহিত বলিল,—

"সে কি কথা! মাথার জিনিষ কেউ কি চরণে ঠেল্‌তে পারে গা?

"তাইতো দেখ্‌ছি।"

"কেন জামাই বাবু?"

"তিনি আর আমার খবরও ন্যান না। ভাল, অন্তঃস্বত্ত্বা যেন হয়েছিল—তাকি আমার খবরটাও নিতে নাই?"

কথা শুনিয়া মাধী যেন আকাশ হইতে পড়িল। বিস্মিতের ন্যায় চক্ষু স্থির করিয়া বলিল,—

"অন্তঃস্বত্তা হয়েছেন, কে বলিল?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,

"বাঃ!—তোমার বড় দিদি।"

মাধী পূর্ব্বের ন্যায় চক্ষু স্থির করিয়া বলিল,—

"কি জানি বাবু? বাড়ীর কোন কথাই তো আমার ছাপা নাই। তা এত বড় খপরটা শুনলেম না—তা হবে।"

"বল কি?"

"আমি তো বেশ জানি ছোট দিদি পোয়াতি নন। কেন—আসিবার আগের দিনও তো ছোট দিদি ঠাকুরুণ তোমার পত্র হাতে করে এসে বড় দিদির সঙ্গে এক যুগ ধরে কথা কইলেন; তা এ কথার তো কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।"

যোগেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—

"আমার পত্র—আমার সকল পত্র কি তোমার ছোট দিদি পেয়েছেন?"

মাধী বলিল,—

"ওমা, এ আবার কি কথা! এ যে আমার ঘাড়ে দোষ পড়ে দেখ্‌ছি। পত্র সকলই তো আমিই তাঁকে হাতে করে দিইছি। পাবেন না কেন গা?"

যোগেন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিলেন। এ ব্যাপারে কোন্ কথা সত্য তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভাবিলেন—মাধীর কথাই মিথ্যা। তাঁহার হৃদয়ে একটু ক্রোধের আবির্ভাব হইল। কহিলেন,—

"মাধী তুই কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছিস্?"

মাধী সঙ্কুচিত ভাবে বলিল,—

"সে কি কথা জামাই বাবু? এমন কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে পরিহাস করা যায়?"

যোগেন্দ্রের আরও ক্রোধ হইল। তিনি কহিলেন,—

"তবে কি তোমার বড় দিদি মিথ্যাবাদিনী?"

"কেমন করে কি বলি?"

যোগেন্দ্রের ক্রোধ সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। তিনি কহিলেন,—

"মিথ্যাবাদিনী আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

মাধী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—

"আমার কি দোষ? আমায় না জিজ্ঞাসা করিলে আমি কিছুই বল্‌তেম না। আমি যা জানি তাই বলেছি এতে আমার অপরাধ কি?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তুমি পিশাচী, তুমি রাক্ষসী, তুমি সর্ব্বনাশিনী। তুমি এখনই আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।"

মাধী কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনুচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সে শব্দও যোগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন,—

"স্ত্রী রসনা, সমস্ত অনিষ্টের মূল।"

এই চেষ্টা জনিত ক্লেশে যোগেন্দ্র কাতর হইলেন। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথায় হাত দিয়া শয়ন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিকার।

"Is this the love, is this the recompense,
Of mine to thee, ingrateful Eve ?,.

Milton. Paradise lost.

প্রায় এক ঘণ্টা পরে কমলিনী ও নীলরতন যোগেন্দ্রের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগেন্দ্রের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কমলিনীর সহিত মাধীর সাক্ষাৎ হইল। মাধী অস্ফুট স্বরে কহিল,—

রোগ ধরিয়াছে।

"ঔষধ ?"

"এখন কেন—বাড়ুক।"

"আপনি বাড়িবে।"

"কুপথ্য চাই—আমি কিছু দিয়াছি, তুমি কিছু দেওগে।"

"কি রকম ?"

"যেমন যেমন কথা আছে। কিন্তু দেখ দিদি, তোমার জন্য আমি বুঝি মারা যাই। আমার উপর জামাই বাবুর রাগ। যতদূর হয়েছে তাই গেই ভাল, এখন আমি গরিব সরে দাঁড়াই—তোমরা যা জান তাই কর।"

"ভাবনা কি ? পেটে খেলেই পিটে সয়।"

"তোমার হাতে বিচার।"

যখন কমলিনী মাধীর সহিত কথাবার্ত্তায় নিযুক্তা ছিলেন, নীলরতন তখন উপরে গিয়া যোগেন্দ্র বাবুর সহিত কথা কহিতেছিল। এক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—

"খুড়ি মা ! আজ আবার যোগেন্দ্র বাবুর অসুখ হইয়াছে।"

কমলিনী ত্বরায় উপরে উঠিলেন।

যোগেন্দ্র বাবুর দুইটা বিলাতি কুকুর ছিল, নীলরতন তাহাদের শিকল খুলিয়া দিয়া খেলায় মত্ত হইল।

উপরে উঠিয়া কমলিনী দেখিলেন, যোগেন্দ্র শয্যায় নয়ন মুদিয়া শয়ন করিয়া আছেন। ডাকিলেন।

"যোগীন্!"

যোগেন্দ্র উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। কি বলিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কমলিনী জিজ্ঞাসিলেন,—

"যোগীন্! তোমার কি আজি অসুখ হইয়াছে?"

"হাঁ।"

"কেন এরূপ হইল?"

যোগেন্দ্র উদ্ধত ভাবে বলিলেন,—

"মাধী—তুমি জান না—মাধী সর্ব্বনাশিনী, মাধী অক্লেশে তোমার গলায় ছুরি দিতে পারে। তুমি এখনই তাহার সংস্রব ত্যাগ কর।"

কমলিনী বিস্মিতের ন্যায় বলিলেন,—

"কেন যোগেন্দ্র, মাধী কি করিয়াছে?"

তখন যোগেন্দ্র একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। শুনিয়া কমলিনী বলিলেন,—

"অতি অন্যায়, মাধী চাকরাণী। সে দাসীর মত থাকিবে। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, আমাদের ঘরাও কথায় তাহার থাকিবার কি দরকার? আমি এজন্য এখনই মাধীকে তাড়াইয়া দিব। কি ভয়ানক! বিনোদের কথায় মাধীর কি কাজ?

যোগেন্দ্র কিছু চঞ্চল হইলেন। ভাবিলেন ইহার মধ্যে কি একটা কথা আছে—কমলিনী তাহা গোপন করিতেছেন। বলিলেন,—

"হয়ত মাধী আমার সহিত পরিহাস করিয়াছে। তুমি এখন আমাকে ঠিক কথা বুঝাইয়া দেও।"

"এরূপ কথা বলিয়া তাহার পরিহাস করা অন্যায়। পরিহাসের কি অন্য কথা ছিল না? যাহা বলিবার নহে তাহা সে বলিল কেন?"

যোগেন্দ্রের মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ধীরতা সহকারে বলিলেন,—

"তবে কি তাহার কথা সত্য—সে যদি সত্য বলিয়া থাকে তবে তাহার দোষ কি?

কমলিনী রাগতস্বরে বলিলেন,—

"দোষ কি? সত্য হউক মিথ্যা হউক তাহাতে তাহার কি? বিনোদিনী ছেলে মানুষ, তাহার যদি কোন দোষই হইয়া থাকে, তাহা তোমাকে জানাইবার মাধীর কি দরকার ছিল? আমি আর মাধীর মুখ দেখিব না। তাহাকে এখনই তাড়াইয়া দিব?"

যোগেন্দ্রের চিত্ত যার পর নাই বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন যে, বিনোদের সম্বন্ধে কোন ভয়ানক কথা কমলিনী বলিতেছেন না। নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"বল, কমলিনী তোমার পায় পড়ি বল, ইহার মধ্যে কি কথা আছে?"

"কি বলিব যোগেন্দ্র?"

"বিনোদিনী অন্তঃস্বত্তা কি না?"

কমলিনী প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন,—

"দেখ যোগেন্দ্র, বিনোদিনী বালিকা। ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবার ক্ষমতা তাহার আজিও হয় না। তাহার কার্য্যে তোমার এখন মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"আহাঃ! সে অন্তঃসত্তা কি না? এ সুসংবাদ জানাও কি আমার উচিত নহে?"

কমলিনী আবার পূর্ব্বের ন্যায় অন্য কথায় প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর গোপন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—

"বিনোদ আমার ভগ্নী—আমি তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি। আমার কে আছে? আমি তাহাকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসি, তাহার যাহা দোষ অপরাধ তাহা আমি কিছুতেই বলিব না। আমার গলায় ছুরি দিলেও আমি বিনোদের বিরুদ্ধ কথা ব্যক্ত করিব না।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কমলিনীর নয়ন কোণে অশ্রুর আবির্ভাব হইল। যোগেন্দ্রের সন্দেহ, বিশ্বাস, কৌতূহল এতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, তিনি যেন ক্ষণে ক্ষণে আত্ম হৃদয়ের উপর প্রভুতা হারাইতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, বিনোদের সম্বন্ধে এমন কোন দোষের কথা আছে, যাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিলে বিনোদের অনিষ্ট হইতে পারে! কি ভয়ানক! অতি কাতরভাবে বলিলেন,—

"কমলিনী। বিনোদিনী তোমার অত্যন্ত যত্নের পাত্র তাহা কি আমি জানি না? কিন্তু আমিই কি তোমার পর? যে স্নেহ বলে বিনোদ তোমার আপনার, সে স্নেহে কি আমারও অধিকার নাই? মাধীর মুখে আমি যাহা শুনিলাম তাহাতে প্রকৃত কথা না জানিলে সন্দেহের যাতনায় আমার মৃত্যু হইবে। তুমি কি তাহা বুঝিতেছ না? তাহা বুঝিয়াও যদি তুমি আমাকে ভিতরকার কথা না বল, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব যে তুমি আমাকে স্নেহ কর? যদি আমাকে এ রূপ কষ্টে ফেলিয়া তুমি থাকিতে পার, তবে কেন তুমি আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আসিয়াছিলে? কেন আমাকে এত যত্ন করিয়া মৃত্যু মুখ হইতে বাঁচাইলে? তোমার স্নেহ কি কেবল মৌখিক? তুমি এত পাষাণ-হৃদয়া তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না! স্ত্রী চরিত্র এতাদৃশ দুরবগম্য তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।"

কমলিনীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, তিনি বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র তুমি আমার উপর অভিমান করিতে পার। তোমার প্রতি আমার যে কত ভাল বা—স্নেহ তাহা কি বলিয়া বুঝাইব? যোগেন্দ্র আমার হৃদয়ে যে—যে—যে—ভালবাসা আছে, তাহা তুমি কখনই বুঝিতে পার না। তাহা পার না—সেই জন্যই আমার দুঃখ। যোগিন্! তুমি আমার আপন হইতেও আপন। আমি বিনোদিনীকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া দিতে পারি, কিন্তু তোমার চরণে কুশাঙ্কুর বিঁধিলে তাহাও সহ্য করিতে পারি না। যোগিন্ আমাকে গালি দিও না। জগৎ নির্দ্দয়—তুমি নিষ্ঠুর—তুমি—"

কমলিনী আর বলিলেন না—বলিতে পারিলেনও না। মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দুঃখের বিষয় সকল মানবের মনের গতি এক নহে। কমলিনী যে কারণে ও যে প্রবৃত্তির উত্তেজনায় এত কথা বলিলেন, যোগেন্দ্রের মনের গতি অন্যবিধ হওয়ায় তিনি তাহার অন্যবিধ অর্থ করিয়া লই-লেন। তিনি বুঝিলেন যে, কমলিনীর ন্যায় উদার-স্বভাবা, স্নেহ পরায়ণা কামিনীকে পাষাণী বলিয়া দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করায়, তাঁহার মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে; সেই জন্য তিনি কাঁদিয়াছেন এবং আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছেন। ভাবিলেন কথাটা ভাল হয় নাই। বলিলেন,—

"কমলিনী আমার উপর রাগ করিও না, বিনোদিনী তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা তাহা আমি জানি। তাহার নিন্দাসূচক কোন কথা বলিতে তোমার অনেক কষ্ট সন্দেহ কি? কিন্তু আমি তাহা জানিবার জন্য যে রূপ ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা তোমায় বলিয়া কি বুঝাইব? সেই জন্যই যদি একটা রূঢ় কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া থাকে তবে আমায় ক্ষমা কর। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাই। আমাকে সমস্ত কথা বলিয়া এ যাতনা হইতে নিষ্কৃতি দেও।"

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—

"পাপ বিনোদিনী! বিনোদিনীর চিন্তায় তুমি ব্যাকুল হইয়াছে। বিনোদিনীকে না ভুলিলে—সে তোমার চক্ষে বিষ না হইলে, আমার আশা নাই। তাহাই করিব। আমার বাসনা পূর্ণ না হয় সেও ভাল, তথাপি তোমাকে আমি বিনোদিনীর থাকিতে দিব না।"

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! তুমি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে তাহা আমি বুঝিতেছি। তোমাকে এ কষ্ট হইতে উদ্ধার করিতেছি, কিন্তু তুমি বল যে, বিনোদিনীর কোন দোষ গ্রহণ করিবে না।"

যোগেন্দ্র জানিতেন না যে, কি রূপ ঘটনার প্রাবল্যে কি রূপ মানসিক প্রবৃত্তি কি রূপ পরিবর্ত্তন পরিগ্রহ করে। এই জন্যই বলিলেন,—

"এ বিষয়ে তোমার অনুরোধ করা বাহুল্য। বিনোদনী সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও আমার মার্জ্জনীয়া। আমার চক্ষে বিনোদ সততই অমৃতের আগার।"

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—

"যতক্ষণ সে বিষ না হয়, ততক্ষণ আমিই কোন্ ছাড়িব!"

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"ভগবানের কাছে প্রার্থনা, যেন তাহার প্রতি তোমার এইরূপ স্নেহই চির দিন থাকে। সে বালিকা—তাহার কোন দোষ হইলে তোমার মার্জ্জনা করাই উচিত। কোন্ সংবাদ তোমার প্রয়োজনীয় বল।"

"বল বিনোদ অন্তর্ব্বত্নী কি না।"

"না।"

যোগেন্দ্র চমকিয়া বলিলেন,—

তবে তুমি আমায় তাহা বলিয়াছিলে কেন?"

"তোমারই জন্য ;—একটা ওরূপ কথা না বলিলে তখন তোমার চিন্তা যায় না, সুতরাং রোগও সারে না।"

"বিনোদিনী ভাল আছে ?"

"আছে।"

"আমার পত্র তাহার হস্তগত হইয়াছে ?"

"আমি তো দেখিয়াছি, সে তোমার কয় খানি পত্র পাইয়াছে।"

যোগেন্দ্র কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—

"তাহার উত্তর দেয় নাই কেন বলিতে পার ?"

"জানি না। আমি এ কথা তাহাকে বার বার বলিয়াছি, কিন্তু কি জানি সে আজি কালি কি এক রকম হয়েছে।"

যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"দেখ কমলিনী, আমি অদ্য যাহা হইবার নহে, তাহাই শুনিতেছি। অন্যে এরূপ কথা বলিলে, আমার তাহা বিশ্বাসই হইত না। কিন্তু তুমি নিতান্ত অনিচ্ছায়, আমার বার বার অনুরোধে এ কথা বলিতেছ। আমার বোধ হয় বিনোদ বা পাগল হইয়াছে।"

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—

"বিনোদ! এ জগতে তুই সুখী। তোর প্রতি যোগেন্দ্রের ভালবাসার পরিমাণ নাই। কিন্তু আমি তাহা থাকিতে দিব না। কখনই না।"

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব ? বিনোদ সাংসারিক কোন কার্য্য ভুল করে না, কখন একটীও অসংলগ্ন কথা বলে না, হাস্য কৌতুকে তাহার বিরাম নাই, তবে কেমন করিয়া বলি বিনোদ পাগল হইয়াছে। তোমায় বলিতে কি যোগেন্দ্র, আমি বিনোদিনীর চিন্তায় অস্থির হইয়াছি, সুযোগ মতে, সময় ক্রমে তোমার সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ

করিব ভাবিয়াছিলাম, অদ্য ঘটনাক্রমে তাহা তুমি জানিতে পারিলে। ভালই হইল। এক্ষণে স্থির মনে তাহার দোষ গ্রহণ না করিয়া সুপরামর্শ স্থির কর। আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না। আমি আর কিছু জানি না—আর কিছু বলিবও না।'

যোগেন্দ্র হতাশের ন্যায় বলিলেনঃ—

"আমার আর কিছু জানিবার প্রয়োজন নাই। মাধীর দোষ নাই। আমি তাঁহার প্রতি অকারণ কটূক্তি করিয়াছি। তুমি তাহাকে আর কিছু বলিও না।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন,—

"আরও দুই একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব।"

"বিনোদের সম্বন্ধে?"

"হাঁ।"

"আর কেন? ভাই, রাগ করিও না। বিনোদ বালিকা।"

"কেন কমলিনী আমিত বলিয়াছি বিনোদের দোষ গ্রহণ করিব না, বিনোদ আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিল কি?"

"মাথা মুণ্ড তোমায় কি বলিব? তুমি কিই বা শুনিবে? আমি তখনই জানি, অভাগী বিনীর সর্ব্বনাশ শিয়রে। এখন দেখিতেছি, তোমার অনুরোধে পড়িয়া, আমি পোড়াকপালী তাহার সর্ব্বনাশ শীঘ্র ডাকিয়া আনিতেছি। যোগেন্দ্র! আমি যখন তোমাকে এত বলিয়াছি, তখন আরও যাহা জিজ্ঞাসিবে তাহাই বলিতেছি—কিন্তু তোমার এত অনুরোধ শুনিলাম তুমি আমার একটী অনুরোধ শুনিও। তুমি বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও ধীর। বিনোদ বালিকা। আমার মাথা খাও যোগেন্দ্র, আমার মরা মুখ দেখ, যদি তুমি তাহার প্রতি সহসা রাগ কর কি তাহার প্রতি কঠিন বিচার কর। আমি জন্ম-দুঃখিনী—আমার মুখ তাকাইয়া ভাই বিনোদের প্রতি রাগ করিও না!"

কমলিনীর চক্ষে জল আসিল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জন করিলেন।

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তাহাই হইবে—এক্ষণে বল বিনোদ আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিল কি না ?"

"সেই তো আমাকে রেজষ্টরি পত্রী দেখাইয়া বলিল, 'দিদি। এই সংবাদ আসিয়াছে, কি করা যায় ? কলিকাতার বাসায় যাওয়া সুবিধা নহে। বিশেষ আমার শরীরটা এক্ষণে বড় ভাল নয়। তিনি তিলকে তাল করেন ; হয়ত একটু অসুখ হইয়াছে, আপনিই সারিয়া যাইবে—আমি গিয়া কি করিব ?" তাহার কথা শুনিয়া আমি অবাক হইলাম। বলিলাম বিনী ! তোর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। তার পর আমি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।"

যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ কপোলে কর বিন্যাস করিয়া বসিয়া রহিলেন। সংসার অনন্ত সমুদ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, এই অনন্ত সমুদ্র মধ্যে তিনিই একমাত্র জীব। প্রতি মুহূর্ত্তেই তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত, বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া দূর দূরান্তরে গিয়া পড়িতেছেন। অনবরতই দেখিতেছেন এই অনন্তরূপী সংসারে আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই, বিপদের সীমা নাই—সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে অগণ্য হিংস্র বিকট-প্রাণী বদন ব্যাদান করিয়া গ্রাসিতে আসিতেছে।

কমলিনী ভাবিতে লাগিলেন,—'কুপথ্য যথেষ্ট হইল বটে, কিন্তু এও তো হইল না ; একটা বিরেচক দিলেই তো এ দোষ কাটিয়া যাইবে। আরও চাই।"

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"এখন ওকথায় আর কাজ নাই, অন্য কথা কহ।"

গম্ভীর স্বরে যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"পাষাণ নহি। এ প্রসঙ্গ জীবনে ছাড়িব না। তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করি, এখানে আসার পর বিনোদ তোমাকে কোন পত্র লিখিয়াছে ?"

কমলিনী যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় বলিলেন,—

"চিঠী—হাঁ—তা—দুই চারি খান লিখেছে বৈ কি ?

"তোমার সঙ্গে আছে ?"

"কেমন করিয়া থাকিবে ?"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"এখানে আসিবার সময় যখন গাড়ীতে উঠিয়াছি, তখন নীলরতন এক খানি পত্র দিয়াছিল। সে খানা ভাল করে পড়াও হয় নাই। তাহাই কেবল সঙ্গে আছে।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"আমাকে সেখানি দাও।"

কমলিনী বলিলেন,—

"তুমি তাহার কি দেখিবে ? আমি তাহা দিব না।"

যোগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কুপিত স্বরে বলিলেন,—

"আমাকে তাহা দিতে হইবে।"

কমলিনী পত্র বাহির করিয়া বলিলেন,—

"তোমায় পত্র দিব না। আমি ইহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছি!"

যোগেন্দ্র ব্যস্ততা সহ কমলিনীর হস্ত হইতে পত্র কাড়িয়া লইলেন। দেখিলেন, সেই হস্তাক্ষর—সেই চির-পরিচিত হস্তাকর! পত্র পাঠ করিলেন,—

(গোপনীয়)

"দিদি!

তুমি আর আমায় যোগেন্দ্রের সংবাদ দিও না। যদি

তাঁহার কাছে আমার কথা বলিতে হয় তবে বলিও আমি সুখে আছি। তিনি যেন আমার সুখের ব্যাঘাত না করেন। আমার কোন কথা তাঁহাকে না বলাই ভাল।,, ইতি

"বিনোদিনী।,,

"পুঃ তুমি কবে আসিবে ?..

যোগেন্দ্র একবার পত্র পাঠ করিলেন। ভাবিলেন, অসম্ভব। দ্বিতীয় বার পাঠ করিলেন। তৃতীয় বার পাঠ সময়ে পত্র হাতে হইতে পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

"কমলিনী! তোমার সংবাদ শুভ। আমি যে প্রতারণা জালে জড়িত ছিলাম, তাহা হইতে অদ্য তুমি আমায় মুক্ত করিলে। কে জানিত যে পৃথিবীতে এত পাপ থাকিতে পারে!"

যোগেন্দ্র অচেতনবৎ শয্যায় পড়িয়া গেলেন।

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—

"এতক্ষণে সম্পূর্ণ বিকার উপস্থিত।"

ভারতে বিদ্যালোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সমাজ সম্বন্ধে তাঁহারা যে সুশৃঙ্খলা বিনিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও আমাদিগের ক্ষুদ্র বিবেচনায় অপর কোন জাতি হইতেই নিকৃষ্ট নহে। অনেকে তাঁহাদিগের এই বলিয়া কুৎসা গাইয়া থাকেন, যে তাঁহাদিগের সমাজ শৃঙ্খলা যৎপরোনাস্তি ঘৃণার্হ ও পরিবর্জ্জনীয়স্থল। এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ শূদ্রদিগকে দাস করিয়া রাখিবার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁহারা একবারও বিবেচনা করেন না যে, কোন জেতৃ-জাতিই বিজিতদিগকে সসম্মানে গ্রহণ ও স্বপদোচিত মর্য্যাদা প্রদান করেন না। প্রত্যুত দাসানুদাস করিয়া রাখিতেই সচেষ্ট। তাঁহারা এক্ষণ

যে ইউরোপ ও আমেরিকার চরণ স্পর্শ করিয়া থাকেন, স্মরণ করিয়া দেখিবেন সেখানেও অদ্যাপি দাস ব্যবসায় প্রচলিত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতবাসিগণকেও ব্রিটিশ জাতি তদ্রূপ চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। আর্য্যগণ সমস্ত জাতিকে ব্যবসায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাগ চতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়া অসাধারণ জ্ঞানেরই পরিচয় প্রদান করিয়া ছিলেন। অন্যোন্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া সমাজ এক দিনও চলিতে পারে না। এক জনকে সমস্ত কার্য্য স্বীয় হস্তে সম্পাদন করিতে হইলে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে হয় এবং কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। এই জন্য পূর্ব্বকালে জাতি ভেদ রূপ অত্যুৎ-কৃষ্ট প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল। এরূপ না হইলে কখনও সমাজ সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হইত না। যিনি ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র-চর্চ্চা, তপস্যা, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। জাতি ভেদ প্রথা না থাকিলে এক দল কখনই নিরবচ্ছিন্ন শাস্ত্র চর্চ্চায় অবকাশ পাইতেন না, তাঁহাদিগকে আহারান্বেষণেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে হইত, সুতরাং যে শাস্ত্র চর্চ্চায় ভারতের এত গৌরব, তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইত। ক্ষত্রিয়, দেশ পালন ও রক্ষণ করি-বেন, তিনি রাজা। রাজা না থাকিলে সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিতে পারে, এজন্য এক দল লোকের হস্তে দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনের ভার সমর্পতি হইয়াছিল। বৈশ্য, হল চালনা ব্যবসায়ী, কৃষি কার্য্যই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের এক মাত্র উপায়। যে সমস্ত লোক কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায় দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সর্ব্ব সাধারণের উদর পোষণ করিতেন তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া অভিহিত হইতেন। শূদ্র দাস; দাসের বিস্তর প্রয়োজন আছে, দাস না থাকিলে সময়ে সময়ে বিস্তর কষ্টে পড়িতে হয়, অতীব হেয় কর্ম্মও স্বীয় হস্তে সম্পাদন করিতে হয়, ইচ্ছা করিয়া কেহ তাদৃশ কর্ম্মে হঠাৎ

স্বীকার হয় না সুতরাং যে সমস্ত লোক বিজিত সুতরাং পদানত. তাহারাই তদ্বিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইত। এই রূপ ব্যবসায় ভেদে শ্রেণীভেদ না থাকিলে কথনও সমাজ সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হইত না এবং সর্ব্বদাই বিবাদ ও বিসম্বাদ উপস্থিত হইত। এখন যেমন, তাঁতি, জুগী, রজক, মেথর প্রভৃতি হীন বংশজ ব্যক্তিগণ, লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া আর বস্ত্র বয়ন, বস্ত্র প্রক্ষালন, মল দূরীকরণ প্রভৃতি হীন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছে না এবং ভারতবাসিগণকে পরিধেয় বস্ত্রের নিমিত্তও মাঞ্চেষ্টরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতেছে, যদি কোম্পানি একবার বিপদগ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে হয়ত বিংশতি কোটী ভারতবাসীকে একবারে লগ্নাবস্থায় দিনাতিপাত করিতে হইবে! পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। আজ কাল যেরূপ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আর দুই বৎসর পরে ভৃত্যাভাবে স্বহস্তেই সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এইরূপ যে, যে ব্যবসায় করিবে তাহার কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম না থাকাতে ভারতের শোচনীয় অবস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আজ কাল এক জন ভদ্রলোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি হল চালনা করিয়া কৃষিকার্য্য করিবেন না। পূর্ব্বে বৈশ্যগণের এই ব্যবসায় এক চেটিয়া থাকাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যলাভে কাহারও অসুবিধা ঘটিত না। এক্ষণ তাহারাও ইহাতে হস্তার্পণ করা হেয় মনে করিয়া থাকে। অতএব বোধ হয় আর্য্যগণ পূর্ব্বাহ্লেই সমাজতন্ত্রের প্রগাঢ় আলোচনা করিয়া এ হেন সুশৃঙ্খলা সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তবে ভারতবর্ষে এই রূপ সমাজ বন্ধন সত্ত্বেও দুঃখ নিশির উদয় হইল কেন? উত্তর একতা নাই, সহানুভূতি নাই, একের বিপত্তিতে অন্যে দুঃখিত হইত না, তাহা এখনও হয় না।—

হিন্দু জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি,

যে, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, হিন্দু ধর্ম্মের তৎসমস্ত অপেক্ষা সুদৃঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি আছে। এমন কথা নাই যাহা হিন্দু ধর্ম্মে নাই, এমন শাস্ত্র নাই যাহা হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। অদ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্রবিদ্ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ত্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়াছিল, এবং জন সাধারণেও উহা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে! ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে মহা বিজ্ঞান কুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞান সঙ্গত এবং নৈসর্গিক। এক সর্ব্ব শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে বিজ্ঞান বিরুদ্ধ, তাহা সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল প্রমাণী কৃত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বঙ্গদর্শন চতুর্থ খণ্ড ১ম সংখ্যার "মিল ডার্বিন ও হিন্দু ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করিবেন। পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম উপধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, তৎসমস্তই হিন্দু ধর্ম্মের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিবা। বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্পষ্টতঃই হিন্দু ধর্ম্মের অনুকৃত, যীশুখ্রীষ্ট, হিন্দু উপদেষ্টার উপদেশ হইতেই আপনার সমস্ত উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন। কোরাণ, বাইবেলেরই অনুকৃতি সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে উহাও হিন্দু ধর্ম্ম হইতে গৃহীত। হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃতি আলোচনা করিলে বোধ হয়, এ ধর্ম্ম কস্মিন্‌কালে বিলুপ্ত হইবার নহে। যতকাল ভারতবর্ষ থাকিবে, ততকাল এই ধর্ম্ম থাকিবে। অনেকে বলেন, হিন্দুধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে, তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ অমূলক। এ ধর্ম্ম কে বিলুপ্ত করিতে পারে?

আমরা এতাবৎকাল ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের অসাধারণ জ্ঞান ও শাস্ত্র চর্চ্চার উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে কিরূপ অলৌকিক ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রদর্শন করিয়া সভ্যতার শীর্ষ দেশে বিরাজ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

যে লিখন প্রণালী সভ্যতার উন্মেষক তাহাও ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। মুদ্রা যন্ত্রের প্রচার হইবার পূর্ব্বে এক প্রকার লিপী প্রণালী প্রচলিত ছিল। যাহাকে ইউরোপীয়েরা 'হাইরোগ্লিফিক, (Hieroglyphic) কহেন। প্রথমে মনীষিগণ, আপনাদিগের মনের ভাব, বৃক্ষে, স্তম্ভে, ইষ্টকে, প্রস্তরে এবং কখন কখন মৃন্ময় পাত্রে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত করিতেন। প্রাচীন ভারত, মিসর, সিরিয়া, ফিনিসিয়া, আরব প্রভৃতি দেশে এই প্রথা বহুকাল প্রচলিত ছিল। সংস্কৃতে উহার নাম গরিষ্ঠলিপি। গরিষ্ঠ নামে ভারতীয় ঋষি সর্ব্ব প্রথম লিখন প্রণালীর আবিষ্কার করেন। মিসরে ইহা গ্যারিশলিপিস এবং আরবে "গারশালাপ" বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ক্রমে ইহা হইতেই গারগ্রাফি, হাইরোগ্রাফি প্রভৃতি নামের উদ্ভব হইয়াছে। মাষ্টার লেয়ার্ড, মশুর বোটা, মেজর শিপার্ট, কাউণ্ট ডিলেবর্ভী, প্রভৃতি বিচক্ষণ অনুসন্ধায়কগণ ভারতবর্ষ সিরিয়া, পালেষ্টিন, এবং নীল নদের তীরে অনেক গুলি "গরিষ্ঠ লিপিরিয়ম" এই রূপ লেখা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়াম চিত্র-শালায় অদ্যাপি হাইরোগ্লিফিক দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টির ১৮১১ এবং ১৮৬৫ সালে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে, সোমনাথ পত্তনে ও অন্যান্য স্থানে এই প্রকার বহুবিধ প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। কিন্তু কেহই তাহার মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই।

বহু কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে মুদ্রা যন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৮৭০ সালের ১লা মার্চ্চের জেণ্টলম্যানস্ জরনেলে প্রকাশিত হইয়াছে, যে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ভারত শাসন কালে তিনি দেখিতে পান যে বারানসী জেলার এক স্থলে মৃত্তিকার কিছু নিম্নে পশমের ন্যায় আঁশাল এক রূপ পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে। মেজর রুবেক ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া একটি খিলান দেখিতে পান। পরিশেষে খিলানের অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন যে, তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রা যন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল এ কালের নয়, অন্যূন এক সহস্র বৎসর এই অবস্থায় রহিয়াছে। আমাদিগের পূর্ব্ব

পুরুষেরা যে মুদ্রাযন্ত্র ও উপকরণাদি ব্যবহার করিতেন আমরা যবনাধিকারে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক সাময়িক পত্রে লিখিয়াছেন, খ্রীষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কাপড়ের ছিট প্রস্তুত করিবার প্রথা ছিল, তজ্জন্য মুদ্রাযন্ত্রের ন্যায় কাপড় ছাপাইবারও কল ছিল।

বৈদিক কালে আর্য্যেরা বন্দুক কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ব্রহ্ম অস্ত্র প্রভৃতি হইতে অগ্নি নির্গমের যে উল্লেখ আছে তাহাতে বোধ হয় উহা বন্দুকাদি কিছু হইবেক। অস্মদ্দেশে আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মানের নানাবিধ গ্রন্থও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বঙ্গদর্শন ৫ম খণ্ডে বাবু রামদাস সেন প্রণীত "হিন্দুদিগের আগ্নেয়াস্ত্র" শীর্ষক প্রস্তাব দেখিবেন।

অনেকেই জানকীর অগ্নি পরীক্ষার বিবরণ অবগত আছেন। তৎকালে এতদ্দেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত ঈদৃশ এক রূপ পরিচ্ছদ ছিল, যে তাহা পরিধান করিয়া অনায়াসে অগ্নির মধ্যে উপবেশন করা যাইতে পারিত। সংপ্রতি সুইডেনে ঐ রূপ একটী পরিচ্ছদ প্রকাশিত হইয়াছে। ধন্য আর্য্য প্রতিভা!

সংপ্রতি অস্মদ্দেশীয় সাধারণ লোকে লৌহবর্ত্ম, তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি দর্শন করিয়াই ইংরেজদিগকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন এবং অসাধারণ বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু স্বদেশ বৎসল ভারত সন্তান দেখিবেন, আর্য্যগণ বিজ্ঞান শাস্ত্রের এবম্বিধ যে অত্যাশ্চর্য্য কৌশল সকল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই লোকে কবিকল্পনা অথবা অমানুষিক বর্ণনা করিয়া বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সেই সময়ে বিজ্ঞান শাস্ত্রের এতাদৃশ উন্নতি হইয়াছিল যে এই সকলকে কবিকল্পিত বলিয়া কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। পুরাণে বর্ণিত আছে, দুর্য্যোধন রণে পরাস্ত হইয়া গদাঘাতে জলভেদ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ইহা অনেকেই কবির কল্পনা বলিয়া থাকেন, কিন্তু সংপ্রতি আমেরিকায় এক রূপ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অনেকক্ষণ জলে অবস্থিতি করা যায়। পুরাণে বর্ণিত রথের

সহিত আধুনিক ব্যোমযানের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

সংপ্রতি মরণকাটী ও জীবনকাটীর ন্যায় মরণ বৃক্ষ ও জীবন বৃক্ষের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার সাইনর বটুরা নামক এক জন বৈজ্ঞানিক উক্ত দুইটি বৃক্ষের আবিষ্কার করিয়াছেন। একটি বৃক্ষের রসে জীব নিমেষ মধ্যে মৃতাবস্থায় পতিত হয়, আবার দ্বিতীয় বৃক্ষের রসে সেই মৃত জীব পুনর্জীবিত হয়। তিনি ইহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। আমাদের দেশীয় বিশল্যকরণী প্রভৃতির সহিত ইহার তুলনা করা কর্ত্তব্য।

প্রাচীনা পিতামহীদিগের প্রস্তাবে এবং অনেক ব্রতের উপকথার মধ্যে প্রায়ই শ্রুত হওয়া যায় যে, কোন রাজ পুত্রের সহিত কোন রাজ কন্যার বিবাহ হইবে; কন্যা পক্ষীয়েরা বলিলেন, তোমার বাড়ীতে আমরি বাড়ীতে সূত্র টানাইবা, কদলী বৃক্ষ রোপণ করিবা ইত্যাদি। বিশ্বকর্ম্মার পূজার কথার মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় যে, একটী চিল পক্ষীর বৃক্ষ হইতে রাজ কন্যার বাটীতে সূত্র টাঙ্গান হইয়াছিল। ষষ্ঠী ব্রতের মধ্যেও শুনা যায়, কণ্টকী বৃক্ষ হইতে গৃহস্তের বাড়ী পর্য্যন্ত সূত্র টাঙ্গান হইয়াছিল, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ঐ সূত্র নড়িলেই সংবাদ পাইত। বোধ হয় এই সকল কথার মূলে এক গূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে। বোধ হয় পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে টেলীগ্রাফের নিয়ম প্রচলিত ছিল এবং সর্ব্বস্থলেই সংবাদ পাইবার নিমিত্ত টেলীগ্রাফ স্থাপিত হইত। ইহাই ক্রমে সূত রূপে পরিণত হইয়া বর্ত্তমানে একবারে অলীক উপকথা মধ্যে স্থান পাইয়াছে। অনেকে হয় ত বলিবেন, এদেশে যে টেলীগ্রাফ প্রচলিত ছিল তাহার বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ কোথায়? এতদ্বিষয় ত কোন পুস্তকাদি দৃষ্ট হয় না। আমরা বলি, অবশ্য এতদ্বিষয় কোন পুস্তকাদি ছিল এবং তাহা না থাকাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু দুঃখের সহিত বোধ হইতেছে যে যবনের ভীষণ অত্যাচারে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত হনুমানের পর্ব্বত মস্তকে ধারণ করিয়া আনয়ন ও সূর্য্যকে কক্ষতলস্থ করিবার মূলেও অতি গূঢ় রহস্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেবল আমাদিগের অনতি পরিস্ফুট সামান্য বুদ্ধিতে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। এই সকল বিবেচনা করিলে আর্য্যগণ বিজ্ঞান শা-

স্ত্রের কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক অনুভূত হইবেক। অনেক দিবস হইল শুনিয়াছিলাম, দাক্ষিণাত্যে টেমস নদীর ন্যায় কোন নদীর তলবর্ত্ম দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে আর কোন উচ্চ বাচ্য শুনা যায় নাই। বোধ হয় অমূলক হইবে, যাহা হউক, আর্য্যগণ একদা যাদৃশ উন্নত পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ একটি তলবর্ত্ম নির্ম্মিত হওয়া একাণ্ড অসম্ভব ব্যাপার নহে।

তাঁহারা যে সকল কথা ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তাঁহাদিগের অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সকল কথাই তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভূত করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কালে, যখন সমগ্র জগৎ সরলতা পূর্ণ ছিল তখন লোকের মনে ধর্ম্ম ধ্যান স্বতঃই জাগ্রত থাকিত, কিন্তু নীরস বিজ্ঞানেরদিকে বড় কেহ আদর প্রদর্শন করিত না। বরং উহাকে তুচ্ছ ভাবিয়া উপেক্ষা করিত। সুতরাং তৎকালে মনুষ্যকে বিজ্ঞানে বিশ্বস্ত করিবার জন্য উহার সহিত ধর্ম্মশাসন মিশ্রিত করিতে হইয়াছিল। সুচতুর ঋষিগণের এই প্রকার কৌশলে প্রাচীন সময়ে সকলে ধর্ম্মভীত হইয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য করিতে যত্নবান হইত। এই রূপে তাঁহারা ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞান মিশ্রিত করিয়া প্রচুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এস্থলে কতিপয় অতি সামান্য কথা লিখিত হইল; এতদ্দ্বারাই তাঁহাদিগের অসামান্য জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবেক। এখনও পৃথিবীতে কোন জাতি তদ্রূপ বিজ্ঞানবিদ্ হইতে পারেন নাই। সুতরাং তৎসমুদয় প্রকাশিত হইতেছে না। কালে যতই বিজ্ঞানের আলোচনা হইবে, ততই ভারতের অতি নিগূঢ় বৃত্তান্ত সমূহ প্রকাশিত হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের ইতিহাস নাই, যে অসামান্য মস্তিষ্ক জগতের সভ্যতা বর্দ্ধনে এত দূর সহায়তা করিয়াছে, তাহা ইতিহাস রচনে বিনিযোজিত হয় নাই। যদি ইতিহাস থাকিত, তাহা হইলে আর আমাদিগের বিদেশীয় জাতির নিকট স্পর্দ্ধা করিবার কোন প্রতিবন্ধকই বর্ত্তমান থাকিত না। যাহা হউক, আমরা ক্রমে আর্য্য জাতির গুণ গরিমার কতিপয় অতি যৎসামান্য প্রমাণ সঙ্কলন করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

শ্রীদাস।

প্রণয় সংগীত।

(১)

কত কাল আর, এ আশা তরুর
ছায়ায় রহিব বল ?
হিয়ার দাহনি, পরাণ কাঁদনি
সহিব কি চির কাল ?
বিলাস বিলোল, সুনীল নলিনী
নয়ন যুগল ভাবি ;
ভাবি সে মাধুরী, লবণ্য লহরী,
অতুল মুখের ছবি !
দেখি যত বার, বাসনা না মিটে ;—
দেখি ভাব নব নব।—
হায় কোন্ গুণে, বামন হইয়ে
চাঁদনি হাতেতে পাব ?

(২)

হায় লোকলাজ, কতকাল আর
রহিবি পৃথিবী বেপে ?
স্মরিলে রে তোরে, প্রণয়ীর হিয়া
ভয়ে দুরু দুরু কাঁপে !
স্বরূপতঃ জানি, প্রকৃতি মহিনী ;
তোরে কভু না সৃজিল ;
প্রণয় পয়োধি, সুশান্ত, সুনীল !—
তুই তার বাত্যা কাল !
নাহি কি রে কেহ, প্রণয়ী সংসারে
এমন হৃদয়বান্,
বৃথা লোক লাজ, শিরে হানে বাজ,
প্রণয় (ই) যাহার প্রাণ ?

(৩)

প্রণয়ি পরাণ, প্রেমই ধন, মান।
প্রেমই আশা বাসা যার

হেন গুণমণি, নাই কি সংসারে
সকল শোভার সার?
কে বলিল নাই? যত দিন হতে
গঠিত হয়েছে ধরা.
প্রেমের আকর, দেব সুধাকর,
তপন. আকাশ, তারা,
যত দিন ভবে; তত দিন হায়
এমনি প্রেমের ধারা!—
কি স্বার্থপরতা, কিবা লোকলাজ
না জানে প্রেমিক যারা!

(৪)

চাও কি আদর্শ, এমন প্রেমের,
অয়ি প্রেমময়ি প্রাণ?
অবনীর মাঝে, মানব জাতির
শুন সব প্রেম গান!
শ্যামের বাঁশরী, শুনিয়া কিশোরী
নারিল রহিতে গেহে;
যথা শ্যাম রবি, তথা রাধাশশী;
সদা উভে একি দেহে!
থাকো গুণবতী, রূপে জিনি রতি
বীণাপাণি প্রায় জ্ঞানী;
—যার প্রেম গীতে, বিভোর ধরণী—
প্রেমে পাগলিনী ধনী,
রতি পতি প্রায়, কেরন্ সুন্দরে
সঁপিল যৌবন ধন!—
প্রেমের কারণ, নভিল জনম,
প্রেমেতে ত্যাজিল প্রাণ!
প্রেম অনুরাগে, প্রেমগীতি গাহি
সুতুঙ্গ গহনে চড়ি
স্মরিয়া কেরন্, পরাণ ত্যজিতে
সুতনু দিল সে ছাড়ি!

সুনীল সাগর, ধরিল আদরে
প্রেমময়ী থাকো ধনী ;—
তদবধি হায়, প্রেমিক সংসারে
নিতি এ কাহিনী শুনি!

(৫)

হেন থাকো ধনী, তেমন কিশোরী
আরো কত শত ছিল ;—
আছে কি এমন? কে দিবে বলিয়া?
প্রিয়তমে, তুমি বল !

নাহি থাকু কেহ, আমরা তেমনি
প্রণয়ী যুগল হব ;
পোড়া লোকলাজ, পদেতে দলিব ;—
চির সুখী হয়ে রব !

অবোধ মানব প্রদানি যাতনা
সুখেতে ব্যাঘাত দিবে ?
কি কাজ সমাজ ? চল প্রিয় সখি,
বিজনে পশিলে উভে !

আমি সাজি যোগী, তুমি লো যোগিনী
বাকলে আবরি দেহ,
সুবাস বলিয়া রহিবে না ভয়,
হরিবে তস্করে কেহ !

খুলে ফেল প্রিয়ে, সুবর্ণ কুণ্ডল
সিঁতি, হার, বাজু, বালা ;—
কি কায ও সবে, বিজন বাসিনি,
প্রকৃতি প্রেমের বালা ?

ফুল আভরণে, সাজাব তোমায়
কুন্তল, শ্রবণ, গ্রীবা ;
প্রকৃতি রূপিনি প্রকৃতি ভূষণে
হইবে প্রকৃত শোভা !

কুরঙ্গ, করভ, আসিবে কুটীরে।
প্রেমের কুহক বলে
বিহঙ্গ, বিহঙ্গী, ছাড়ি গৃহ ভয়
অনাসে আসিবে চলে !

সুখের সংসার, হইবে প্রেয়সি
সুখে সুখী প্রতিবেশী ;—
স্বাধীন প্রণয়, তাদেরো এমনি
লোকলাজ ভয় নাশি।
শাখে বসি পাখি দম্পতী যুগলে
মুখে মুখ দিয়ে রবে!
মোহিতে উভয়ে, গাবে গীতি উভে
মধুর কাকুলী রবে!
সে সুখ লভিতে অনুকরণিব,—
চুম্বিব অধর তব ;
গাবে তুমি গীতি, প্রতি শব্দে প্রীতি
বুঝাবে যাহার ভাব!
ফল, মূল খাব, জীবের জীবন
কভু কেহ না নাশিব ;
শ্বাপদ জন্তুরে, সে প্রীতি কুহকে
অহিংসা শিখায়ে দিব!

(৬)

এই রূপে হায়, সর্ব্ব প্রেম ব্রতে
নির্ব্বাণ লভিব দোঁহে ;
মরত ছাড়িয়া, গগন নিবাসী
হইব উভে একি দেহে!
অসংখ্য তারকা, অসংখ্য জগৎ
সৌর জগৎ শত,
অনন্ত মণ্ডল, নিরখি নয়নে,
হইব বিস্মিত, প্রীত!
কোকিল, কোকিলা, যেমনি ধরায়
শিখায় প্রেমের গান ;—
তুমি আমি প্রাণ, তেমনি উভয়ে
ধরিব প্রেমের তান!
অনন্ত মণ্ডলে, অনন্ত জীবনী
সে গীতে মোহিত হবে ;
প্রেমের গাথায়, ভিজেনা অন্তর
কে কোথায় হেন জীবে?

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বিজ্ঞাপন।

এ পর্য্যন্ত গ্রাহকগণ মধ্যে যাঁহারা মাসিক সমালোচকের মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহাদিগের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা যেন আর স্ব স্ব দেয় পাঠাইতে বিলম্ব না করেন। সমালোচক ধারে দিবার রীতি নাই।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় রচনা প্রবন্ধাদি, সমালোচ্য গ্রন্থাদি জিয়াগঞ্জ, বালুচর ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

ব্যারং বা ইন্সফিসিয়েণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না। যাঁহারা পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উত্তর লেখা যাইবে না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা ডাকের টিকিটে মূল্য পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় /০ আনা কমিসন দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট যেন কেহ না পাঠান। মনিঅর্ডারে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর ট্রেজরীতে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন তাঁহাদিগের নিকট পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪৲ টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে, সুতরাং বিনা মূল্যে দেওয়া এক কালে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্র ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ
মাসিক সমালোচক কার্য্যালয়
খাগড়া, বহরমপুর।

[১ম খণ্ড।] [১১শ সংখ্যা।]

মাসিক সমালোচক।

(সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।)

সম্পাদক

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

১২৮৬, ফাল্গুন।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুর,—অরুণোদয় যন্ত্রে

মুদ্রিত।

—০—

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা প্রতি সংখ্যার মূল্য।৵০ আনা।

মাসিক সমালোচক।

—:*※*:—

দুই ভগ্নী।

নবম পরিচ্ছেদ।

আর এক দিক।

"Heav'n and Earth are colour'd with my woe"

Milton. Passion.

এই সময়ে একবার বিনোদিনীর তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক। তাঁহার অন্তরের কি অবস্থা, তাহা একবার জানা উচিত নয় কি?

বীরগ্রামের সেই ভবনের এক প্রকোষ্ঠে বিনোদিনী শয়ন করিয়া আছেন। প্রকোষ্ঠের দ্বারাদি সমস্ত উন্মুক্ত। হর্ম্ম্য সংলগ্ন সেই মনোহর উদ্যান বিনোদিনীর নেত্রপথে পতিত——কিন্তু তিনি উদ্যানের কিছুই দেখিতেছেন না। বিনোদিনী বিষণ্ণা—ঘোর উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে যার পর নাই কাতর করিয়াছে। তাঁহার শরীর রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল। তাঁহার দেহে লাবণ্য নাই, অঙ্গে ভূষণ নাই, কেশের পারিপাট্য নাই। সময় সময়ে এক এক বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়ন কোণে দেখা দিতেছে। বহুক্ষণ সমভাবে থাকিয়া বিনোদিনী "হা জগদীশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল?" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্ষণেক সমস্ত ভুলিবেন স্থির করিয়া সেই উদ্যানের প্রতি নিবিষ্টভাবে চাহিলেন। দেখিলেন— সরসী হৃদয়ে অমল ধবল মরালমালা বিকসিত প্রসূনের ন্যায় ভাসিতেছে। একটী পানিকৌড়ি বাতিকাশ্রিত ব্যক্তির ন্যায় অনবরত জলে ডুবিতেছে ও উঠিতেছে। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বক তটে উপবেশন করিয়া আয়ত্তাগত নিরীহ মৎস্য জীবন নাশের উপায় অন্বেষণ করিতেছে। সরোবর পার্শ্বস্থ অশোক বৃক্ষের শাখা

হইতে সহসা মৎস্যরঙ্গ জলে আসিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ একটী জীবন্ত সফরী চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া প্রস্থান করিল। সরোবরের চতুঃপার্শ্বে নানাবিধ ফুলের গাছ পর্য্যায়ক্রমে স্থাপিত, তৎসমস্তের পুষ্পসমস্ত বিবিধ বর্ণ সম্পন্ন। কাহার পুষ্প প্রস্ফুটিত, কাহারও বা মুকুলিত, কাহারও বা দলরাজিচ্যুত হইয়া ভূপতিত। স্থানে স্থানে মনোহর লতা সমস্ত নিকুঞ্জাকারে পরিণত। বিনোদিনী দেখিলেন, একটী নিকুঞ্জ মধ্যে দুইটী বুল্‌ বুল্‌ প্রবেশ করিল। একটী বুল্‌ বুল্‌ পার্শ্বস্থ লতিকায় যে লোহিত ফল লম্বিত ছিল তাহা ঠোক-রাইল, অপরটীও তদ্রূপ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে যেখানে ছিল সে স্থান হইতে তাহার চঞ্চু সীমা ফলসংলগ্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। সে ব্যর্থপ্রযত্ন হইয়া নিরস্ত হইল, অমনি প্রথম বুলবুলটি সরিয়া গিয়া দ্বিতীয়টীকে স্বীয় স্থান প্রদান করিল। দ্বিতীয়টী ফল না ঠোকরাইয়া প্রথমটীর চঞ্চু সহ স্বীয় চঞ্চু ঘর্ষণ করিল। প্রথম বুল্‌ বুল্‌ "পিকুড়ু, পিকড়ু" শব্দ করিল। সে শব্দের অর্থ কে বলিতে পারে? বুল বুল কি বলিল;—

"কি বলে বুঝাব প্রাণ তোমায় কত ভাল বাসি"? হইবে!!! মানবপ্রকৃতির উচ্চ মনোবৃত্তি কি বিহঙ্গম হৃদয়েও প্রবেশ করিয়াছে? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে হয়ত কোন বুলবুল দম্পতী রোমিও এবং য়ুলিয়েট, বা ওথেলো এবং দেসদিমোনা অথবা দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার স্থলাভিষিক্ত কোন কাব্য বিশেষের নায়ক নায়িকা রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া জগতে অমরতা লাভ করিতে পারে।

বিনোদিনী সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলেন কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, কিছুতেই তাহার শান্তি হইল না। তিনি সে দিক্‌ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বালিসের নীচে হইতে এক খানি পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিলেন,—

"প্রিয় ভগ্নি,

"ক্রমশঃই তোমার পত্র পাইতেছি ও তাহার উত্তরও লিখিতেছি। তুমি যে কষ্টে পড়িয়াছ তাহা আমি সবই বুঝিতেছি। কথাটা বড়ই কষ্টের কথা বটে। কিন্তু ভগ্নি, যৌবনে পুরুষের এ দোষ না হয় এমন নয়। আর একবার এ দোষ হইলে যে আর সারে না, এমনও নয়। আমার ভরসা আছে যে, আমি যে রূপ যত্ন করিতেছি তাহাতে যোগেন্দ্রের এ দোষ ক্রমে সারিরা যাইবে। তবে সম্প্রতি যোগেন্দ্রের যে প্রকার মনের গতি, তাহাতে তিনি যেন সেই বারনারীর দাসবৎ। এ জগতে তিনি যেন তাহার ভিন্ন আর কাহারও নহেন। শুনিতেছি, সম্প্রতি এক আইন হইয়াছে, তাহাতে বেশ্যারাও ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারে। সেই আইনের বলে, যোগেন্দ্র বাবু না কি সেই দুশ্চরিত্রাকে বিবাহ করিবেন! পোড়া কপাল!! আমি একবার সেই পাপিষ্ঠাকে দেখিতে পাই তো এক কিলে তাহার নাক ভাঙ্গিয়া দেই। তুমি এজন্য ভাবিও না। আমার বোধ হয় এরূপ নেশা অধিক দিন থাকিবে না। তোমার শেষ পত্র যোগেন্দ্রকে দেখাইয়াছিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "উত্তম।" বোধ হয় আমি শীঘ্রই বাটী যাইব। যদি পারি তবে যোগেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া যাইব। প্রধান অসুবিধা—প্রায় তাঁহার সাক্ষাৎ পওয়া যায় না। যখন যেমন হয় লিখিব। তুমি সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। তোমার চিন্তায় আমি বড়ই অস্থির আছি। ইতি

কমলিনী।"

বিনোদিনী পত্র পাঠ করিয়া বহুক্ষণ নীরবে রোদন করিলেন। ভাবিলেন,—

"সেই কামিনিই ধন্য! এ জগতে সেই পুণ্যবতী; তাহারই জন্ম সার্থক; সে যোগেন্দ্রের অক্ষয় প্রেম লাভ করিয়াছে। আর আমি?

আমি মন্দভাগিনী—আমাতে এমন কি গুণ আছে, যাহাতে সেই অমূল্য হৃদয় রাজ্যে আমি আধিপত্য লাভ করিতে পারি? প্রাণেশ্বর! তুমি বর্ত্তমান পদবীতে সুখে আছ। সুখে থাক; পাপ হউক, তাপ হউক নাথ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, জগতে তোমার সুখ যেন অব্যাহত হয়। কিন্তু আমার দশা! আমার এ যাতনা সহে না যে। আমি কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিই নাথ? স্বর্গ হইতে নরকে পড়িয়া বাঁচিব কেন হৃদয়েশ? কিন্তু বাঁচিয়াই বা কাজ কি? যোগীন সুখে আছেন বুঝিয়া মরিব—ইহার অপেক্ষা সুখের মরণ আর কি আছে? মরিবই স্থির; কিন্তু প্রাণেশ্বর! তোমার চরণ আর একবার না দেখিয়া মরিতেও পারি না তো।—"

একজন ঝি আসিয়া বলিল,—

"মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"তাঁহাকে আসিতে বল।"

অনতিবিলম্বে হরগোবিন্দ বাবু মাষ্টার মহাশয় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিনোদিনীর অবস্থা দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"এ কি মা! তোমার একি অবস্থা হয়েছে?"

বিনোদিনী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল অবনত মস্তকে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"কেন বিনোদ, কাঁদিতেছ কেন মা? তোমার কি হইয়াছে তাহা তো আমি কিছুই জানি না। যোগেন্দ্র ভাল আছেন তো?"

শেষ প্রশ্ন শুনিয়া বিনোদিনী আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

মাষ্টার মহাশয় কহিলেন,—

"সে কি! আমাকে কি কেবল তোমার কান্না দেখিতে ডাকিয়াছ?"

বিনোদিনী বালিসের নীচে হইতে এক তাড়া চিঠি বাহির করিয়া হরগোবিন্দ বাবুর হস্তে দিয়া অধোবদনে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরগোবিন্দ বাবু একে একে ছয় খানি পত্র পাঠ করিলেন। দেখিলেন, পত্র গুলি কমলিনীর হস্ত লিখিত। বলিলেন,—

"তা—ই—ত।"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন,—

"বিশ্বাস হয় না—কমলিনীর জানিবার ভুল।"

রোদন বিতাড়িত স্বরে বিনোদিনী বলিলেন,—

"তিনি আমাকে এক খানিও পত্র লেখেন নাই কেন?"

"এবার তুমি তাঁহার এক খানিও পত্র পাও নাই?"

"না। দিদির কাছেও তিনি আমার নাম করেন নাই। তিনি আমাকে এমন পর করিলেন কেন?"

আবার বিনোদিনী কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতরতায় মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষেও জল আসিল। তিনি আবার ধীরে ধীরে কহিলেন,

"তা—ই—ত।"

বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া হরগোবিন্দ বাবু তাঁহার অর্দ্ধধবল কেশরাশি একবার উভয় হস্ত দ্বারা আন্দোলন করিলেন; করিয়া বলিলেন,—

"আমি স্বয়ং ইহার অনুসন্ধান না লইয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"এ কথা ব্যক্ত করিবার নহে, কাহাকেও বলিবার নহে। সদুপায় ও সৎপরামর্শের জন্যেই আপনাকে বলিলাম। তিনি এবং আমি, আমরা উভয়েই আপনার সন্তান বলিলে হয়। এ বিপদ হইতে আপনি আমায় রক্ষা করুন, আমার কি হইবে?"

কাঁদিতে কাঁদিতে বিনোদিনী মাষ্টার মহাশয়ের পদস্পর্শ করিলেন।

হরগোবিন্দ তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন।„

“বাছা! কি বলিব বল? আজি যাহা শুনিতেছি, তাহা যার পর নাই অসম্ভব। আমি শীঘ্রই সমস্ত জানিতে পারিব। পত্র কয়খানি আমার নিকট থাকুক। এ সব আমার বোধ হয় কিছুই নয়—কমলিনীর জানিবার ভুল। কাঁদিও না—চিন্তা করিও না। আমি এখনই ইহার অনুসন্ধান করিতেছি।„

মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলেন। বিনোদিনী কপালে হাত দিয়া ভূমিতলে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার আবিন্যস্ত কেশরাশি ভূমিতলে লুটাইয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

অনেক দূর।

“——now the thought
Both of lost happiness, and lasting pain
Ferments him: round he throws his baleful eyes,
That witness'd huge affliction and dismay
Mix'd with obdurate pride and steadfast hate.”
Milton. Paradise Lost.

বেলা ৩ টার সময় কমলিনী ও মাধী যোগেন্দ্রের বাসায় আসিলেন। যোগেন্দ্রের চিত্তের অবস্থা বড়ই ভয়ানক! দারুণ সন্দেহে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। সেই বিনোদিনী—যাঁহার জীবনে তাঁহার জীবন, তাঁহার জীবনে যাঁহার জীবন—সে আজি এমন! ইহার অপেক্ষা ভয়ানক কথা আর কি আছে? যোগেন্দ্র কমলিনীকে দেখিয়া বলিলেন,—

“এমন হইবার পূর্ব্বে, এত কথা শুনিবার পূর্ব্বে কেন মরি নাই?”

কমলিনী বলিলেন,—

“যোগেন্দ্র! সর্ব্বদাই ঐ আলোচনা—ইহাতে শরীর থাকিবে কেন?”

নিতান্ত উদাসীনের ন্যায় যোগেন্দ্র বলিলেন,—

“শরীরে প্রয়োজন?”

“সে কি যোগিন্? তুমি বার বার বলিয়াছ কিছুতেই তাহার দোষ লইবে না। তবে এ ভাব কেন? যোগেন্দ্র কাতরতার সহিত বলিলেন,

কমলিনী! এ জগতে আমার আর কি সুখ আছে? আমি তাহার দোষ গ্রহণ করিতেছি না সত্য, কিন্তু আমার হৃদয় তো শূন্য। আমি কি বলিয়া মনকে বুঝাইব?”

কমলিনী বলিলেন,—

“একটা বালিকার ব্যবহারে কেন যোগেন্দ্র, তুমি আত্ম সুখ শান্তি নষ্ট করিতেছ? আমার অনুরোধ যোগেন্দ্র, তুমি এ সকল ভুলিয়া যাও। আমি তোমাকে বড় ভাল বাসি, তোমাকে কাতর দেখিলে আমি যে কষ্ট পাই তোমাকে কি বলিয়া বুঝাইব? যোগেন্দ্র! আমার কি অপরাধ? কেন তুমি এমন করিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছ? তুমি জান না, তোমার জন্য এ হৃদর কত দূর সহ্য করে। যোগেন্দ্র! তোমার হাতে ধরি—আমাকে উপেক্ষা করিও না—”

কমলিনী উন্মত্তার ন্যায় বলিতেছিলেন, কিন্তু মাধী তাঁহার গা টিপিল, নচেৎ এই বাক্যস্রোত কোথায় গিয়া থামিত, তাহা কে বলিতে পারে? যোগেন্দ্র অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

তাহাই হইবে। তোমার যাহাতে কষ্ট হয়, তাহা করিব না। তোমার সুখের কামনায় এ ব্যাপার যত দূর পারি, ভুলিতে চেষ্টা করিব।”

কমলিনীর অধর প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল। ভাবিলেন তাহার বাসনার পথ ক্রমেই সহজ হইয়া আসিতেছে। বলিলেন,—

"আমি তো কালি বাটী যাইব, তুমি কবে যাইবে বল।"

যোগেন্দ্র চমকিয়া বলিলেন,——

"আমি বাটী ?—এ জীবনে না।"

আবার সেই অমৃতময় স্বরে কমলিনী বলিলেন,—

"সে কি কথা যোগেন্দ্র ? এই তো তুমি বলিলে, আমার যাহাতে কষ্ট হয়, তাহা করিবে না। তোমার অদর্শনে আমি কি কষ্ট পাইব না ? যোগেন্দ্র ! জগতে আমার প্রধান দুঃখ, যে তুমি আমার চিত্ত বুঝিলে না।

কমলিনী মস্তক বিনত করিলেন। যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"তাহাও স্বীকার। বাটী যাইব। কিছু দিন বিলম্বে। একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিব আমাকে ভুলিয়া বিনোদিনী কেমন করিয়া আছে। ওঃ—"

"বেশ।"

কমলিনী অনেকক্ষণ মস্তক বিনত করিয়া চিন্তা করিলেন। পরে কহিলেন,—

"তবে যোগীন্ ! আমাদের বিদায় দেও।"

তাঁহার চক্ষে জল আসিল। গলদশ্রু লোচনে আবার বলিলেন,—

"তোমার সহিত সদ্ভাব যেন চিরদিন থাকে। এই অনুরাগ যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। তুমি যেন—"

আর কথা কমলিনী বলিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। যোগেন্দ্র ভাবিলেন, কমলিনী দেবী। আমার প্রতি তাঁহার কি অতুল ও অকৃত্রিম স্নেহ ! কমলিনী চলিয়া গেলে মাধী যোগেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিল,—

"জামাই বাবু দোষ অপরাধ নিও না ; কি বল্‌তে কি বলেছি।"

যোগেন্দ্র যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—

"আর সে কথা কেন ? আমারই বুঝিবার ভুল।,,

"তবে আসি গা জামাই বাবু ?"

"না তুমি আর একটু থেকে যাও। তোমার দিদি ঠাকুরাণীকে যেতে বল। তুমি একটু পরে যেও।"

মাধী বাহিরে আসিল। দেখিল দিদি ঠাকুরাণী একটী গৃহ প্রাচী-রের দিকে মুঁখ ফিরাইয়া রোদন করিতেছেন! কমলিনী রোদন করিতেছেন কেন ?

"যে আগুণ জ্বালিলাম, কে জানে তাহা কোথায় গিয়া থামিবে, কে জানে অদৃষ্টে কি আছে ? আমি তো চলিলাম—বিনোদিনীর মাথা যত দূর খাইতে পারা যায়, খাইলাম। কিন্তু তাহার দোষ কি ? সে সরলা বালিকা, স্নেহ তাহার জীবন, ভালবাসা তাহার সর্ব্বস্ব, তাহাকে তো অসুখের সাগরে ভাসাইলাম। সে তো আমার পর নয়। যাহার প্রতি স্নেহ স্বভাবের নিয়ম, যাহার প্রতি মমতা আপনি হয়, যাহাকে না ভাল বাসিয়া থাকা যায় না, তাহার প্রতি এ অত্যাচার কেন ? আমি যে তাহার এত সর্ব্বনাশ করিতেছি, সে কি তাহা জানে ? জানিলে—ওঃ—জানিলে ছিল ভাল। হায় কেন এ পাপ মতি হইল ? এখন—এখন করি কি ? জগদীশ্বর! না, এ পাপ হৃদয়ে, এ পাপ কার্য্যে তোমার নামে কাজ নাই। জগদীশ্বরে কাজ নাই. তোমাকে ডাকিব না, তুমি এ কার্য্য দেখিও না। কি যাতনা! ওঃ, কি করিব ? তবে কি ফিরিব ? অসম্ভব—এতদূর আসিয়া ফেরা অসম্ভব। সম্ভাবনা থাকিলেও কি ফিরিতে পারি ? না—না—না, স্নেহ—ধর্ম্ম—সমাজ কিসের জন্য ? আমি এ সুখের আশা ত্যাগ করিতে পারিব না। কিন্তু—কিন্তু ওঃ কি হইবে—যদি এ আগুণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া সব ভস্ম করিয়া ফেলে ? তবে ? করিয়াও যদি আশা না মিটে ? তবে ?

যদি—ওঃ—ওঃ—এ চিন্তা আগে হয় নাই কেন? কি করি? না, তাহা হইবে না—তাহা হইতে দিব না—এ বাসনা সফল করিতেই হইবে।—ওঃ—জগ—আঃ—আবার কেন? সে নাম আবার কেন? তবে কাহাকে ডাকিব? কে এ বিপদে আমার সহায় হইবে?”

কমলিনী এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে রোদন করিতেছেন, এমন সময় মাধী তাঁহার সমীপস্থ হইয়া একটু থাকিয়া যাইবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিল। কমলিনী তাহার কথা না শুনিয়া বলিলেন—

“মাধী! আমায় এ মৃত্যু যাতনা হইতে রক্ষা কর। আমার কি হইবে? আমি কি করিতে কি করিলাম? এ যাতনা সহে না আর মাধী।”

“এতদূর আসিয়া এ বিবেচনা মন্দ নয়।”

“যতদূর হইয়াছে সেই ভাল, আর না।”

“যতদূর হইয়াছে তাহাতে তোমার সাধ মিটে কই? তবে তুমি নিরস্ত হও।”

কমলিনী অনেক চিন্তা করিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি বাহিরিতে লাগিল। কহিলেন,—

“নিরস্ত হইব? তুই কি পাগল? নিরস্ত হইব—জীবন থাকিতে? না—না—ঐ আশা—ঐ ধ্যান—ঐ জ্ঞান। জীবন মরণের সহিত ও বাসনার সম্বন্ধ।”

“তবে এখনও কল পাতিতে হইবে। এখনও ঠিক হয় নাই—আরও বুদ্ধি খরচ করিতে হইবে।”

তখন শোণিতপিপাসু ভৈরবীর ন্যায় চক্ষু বিকট করিয়া, উন্মাদিনীর ন্যায় বিকৃত স্বরে কমলিনী বলিলেন,—

“তাহাই কর—অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে—তাহাই কর। ডুবিয়াছি তো পাতাল কতদূর দেখিব। বিনোদ আমার শত্রু। তাহার

হাড়ে হাড়ে আগুণ জ্বালাইয়া দেও—কিসের মায়া ?”

আর কথা কমলিনী বলিলেন না। ব্যস্ততা সহ গাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। মাধী গাড়ি পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিল। মাধী বলিল—

“তুমি যাও দিদি ঠাকুরুণ, আমি একটু পরে যাব।”

দ্বারবান কোচম্যান্‌কে গাড়ি চালাইতে বলিল। গাড়ি ক্রমে অদৃশ্য হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ওঃ !!!

“——high winds——
Began to rise ; high passions, anger, hate,
Mistrust, suspicion, discord ; and shook sore
Their inward state of mind, calm region once
And full of peace, now tost and turbulent :
For Understanding rul'd not, and the Will
Heard not her lore.”

Milton. Paradise Lost.

মাধী আসিয়া দেখিল, যোগেন্দ্র বাবু এক খানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসিল,—

“আমাকে কি বলিতেছিলেন ?”

যোগেন্দ্র একটু হাঁসিয়া বলিলেন,—

“মাধী ! বল্ দেখি সুখ কিসে হয় ?”

মাধীও একটু হাঁসিয়া উত্তর দিল,—

“সুখ ? অনেক টাকা কড়ি, ভাল ঘর বাড়ী, যথেষ্ট সোণা রূপা থাকিলে সুখ হয়।”

“তোর কি কি আছে ?”

"আমার? আমি গরিব মানুষ, আমার কি থাকুবে? এক খানি খড়ের ঘর, দুই এক খান কুচো গয়না, আর দু দশ টাকা নগদ আছে। তোমাদের চরণ ধরে আছি, তোমরা মনে করলে সবই হয়।"

কত টাকা হলে তোর পাকা বাড়ী হয়?"

"আমি রামজান মিস্ত্রীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলে দেড় হাজার টাকা হলে কোঠা বাড়ী হয়। তা কোথায় পাব জামাই বাবু? সে সুখ আর এ ফেরায় হলো না।"

"তোরে আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তুই যদি তার ঠিক জবাব দিস্, তবে আমি তোর কোঠা করে দেই।"

"তা আর বলবো না জামাই বাবু? কোঠা না করে দিলেই কি ঠিক কথা বলবো না গা? সে কি কথা?"

মাধী মনে মনে ভাবিল, তার কপালটা পাতা চাপা। একটু জোর হাওয়া লেগে পাতাটা হঠাৎ সরে গিয়াছে। বড় দিদি বলেছেন, বড় মানুষ করে দেবেন; আবার জামাই বাবু বলছেন কোঠা করে দেব। মন্দ নয়। জামাই বাবুও আমার কেহ নন, বড় দিদিও কেহ নন, ছোট দিদিও কেহ নন। আমার কোন রকমে কিছু হলেই হলো। তাঁহাদের যাহাই কেন হউক না—আমার তাহাতে কি? যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—

"আচ্ছা, বিনোদিনী কেন আমাকে পত্র লেখে না, কেন আমার নাম করে না, বলিতে পারিস্?"

মাধী বলিল,—

"তা—তা—তা—আমি—আমি কি জানি?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"মাধী আমি সব বুঝিতে পারি। কেন যে বিনোদিনী এমন হইয়াছে তাহা তোমার দিদিও জানেন, তুমিও জান। তোমার দিদি,

বিবেচনা কর, ভগ্নীর কথা বলিবেন কেন ? কিন্তু তোমার বলিতে দোষ কি ?”

মাধী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—

“তা বাবু—তা কি বলিব ?”

“যা জানিস্ তাই বল্। দেড় হাজার টাকার কোঠা হচ্ছে আর কি ?”

“বড় ঘরের বড় কথা জামাই বাবু। আমি গরিব—

“তোর কোন ভয় নাই—তুই বল্।”

“কথাটা বড় শক্ত। না বাবু আমার কোঠায় কাজ নাই—তোমার শুনেও কাজ নাই।”

“না মাধী বল্। আমি রাগ করিব না।”

“পোড়া লোকে কত কথা কয়—সব কি শুন্তে হয় ?”

“তোমার ছোট দিদির কথা কি বলে বলো।”

“তা বাবু আমি বলিতে পারিব না। আমি যাই বড় দিদি আবার রাগ করিবেন।”

মাধীর এই রূপ কৃত্রিম সংগোপন চেষ্টায় যোগেন্দ্রনাথের সন্দেহ ও কৌতূহল চরম সীমায় উঠিল। তিনি তখন বলিলেন,—

“মাধী! তুই আমার নিকট যাহা চাহিবি তোকে তাহাই দিব। তুই কি জানিস্ বল্।”

“না বাবু, আমি যাই—”

বলিয়া মাধী পা বাড়াইল। যোগেন্দ্র তখন অধীর হইয়াছেন। তিনি ব্যস্ততা সহ মাধীর সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—

“মাধী তোর পায়ে পড়ি, তুই যাহা বলিবি তাহাই দিব, তোর কোন ভয় নাই, তুই বল্।”

তখন মাধী বলিল,—

"কি আর বলিব মাথা মুণ্ড ? লোকে বলে ছোট দিদি ,,—

মাধী চুপ করিল। তখন যোগেন্দ্রনাথের শরীর কাঁপিতেছে; তিনি চক্ষু বিস্তৃত করিয়া মাধীর কথার শেষ অংশ শুনিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া আছেন। মাধী চুপ করিল দেখিয়া তিনি বলিলেন,—

"কি, কি লোকে কি বলে ? বল_ভয় কি ?"

"লোকে বলে ছোট দিদির স্বভাব ভাল নাই।"

কথা যোগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি প্রথমেই চমকিয়া উঠিলেন। সহসা সেই প্রকোষ্ঠে বজ্র পাড়লে, বা সহসা গলদেশে হলাহলধারী ভুজঙ্গম দেখিলেও যোগেন্দ্রনাথ তাদৃশ চমকিত হইতেন না। সেই শব্দ তাঁহার হৃৎপিণ্ড কাঁপাইয়া দিল। তাড়িত প্রবাহের ন্যায় সেই কথা তাঁহার সমস্ত শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিকম্পিত করিল। সংসার অন্ধকার দেখিলেন। বোধ হইল যেন অনন্ত অন্ধকারময় শূন্য রাজ্যে তিনি রহিয়াছেন। বোধ হইল, তাঁহার দেহে শোণিত নাই, অস্থি নাই, মজ্জা নাই, চর্ম্ম নাই, কিছুই নাই, কিন্তু তিনি আছেন। তাহার পর সংজ্ঞা, সংজ্ঞার প্রথম চিহ্ন—যাতনা। সে যাতনা— তাহার তুলনা নাই। শত সহস্র বৃশ্চিক, শত সহস্র ভুজঙ্গম, এক কালে দংশন করিলে বা শত সহস্র শাণিত অসি সহসা শরীরে বিদ্ধ হইলে, সে যাতনার সমান হয় না। বহুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তুমি যাও। আমার কথা হইয়াছে।"

মাধী চলিয়া গেল। কোঠার কথা বলিতে তাহার তখন সাহস হইল না। ভাবিল সময়ান্তরে সেই প্রস্তাব করা যাইবে। কি মনে হইল, যোগেন্দ্র উঠিয়া আবার চীৎকার করিতে লাগিলেন,—"মাধী, মাধী।" মাধী আবার আসিল।" যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—

"তাহার দোষের প্রমাণ দেখাইতে পার ?

তা বাবু—চেষ্টা করে দেখিলে বলা যায়। কেমন করিয়া বলি?

"কে এই কুলটার হৃদয়বল্লভ জান?

"কি জানি বাবু? লোকে বলে—হরগোবিন্দ বাবু, মাষ্টর মহাশয়।"

যোগেন্দ্র বক্ষের উপর হস্ত তাহার উপর আর এক হস্ত দিয়া উন্মাদের ন্যায় সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে অনেকক্ষণ ঘুরিলেন। মাধী সভয়ে দেখিল, তাঁহার লোচন যুগল রক্তবর্ণ, পল্লব শূন্য, তাঁহার মূর্ত্তি চিত্রিত পটের ন্যায়। ভাবিল কি সর্ব্বনাশ!" বলিল,—

"আমি চলিলাম জামাই বাবু।"

যোগেন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার তখন কথা কহিবার শক্তি নাই, হৃদয়ে হৃদয় নাই, তাঁহাতে তিনি নাই। মাধী চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল—যোগেন্দ্র সেইরূপ ভাবেই রহিয়াছেন। সাধু আসিয়া একটী সেজ জ্বালিয়া দিয়া গেল। আলোক দর্শনে যোগেন্দ্রের মনে বাহ্য জগতের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইল। তখন তিনি গৃহ মধ্যস্থ পর্য্যঙ্কে অধোবদনে শয়ন করিলেন—নিদ্রার জন্য নহে, আরামের জন্য নহে—অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত যদি হৃদয় একটুও শান্ত হয় সেই প্রত্যাশায়। ভ্রান্ত! শান্তি আর তোমার নিকট আসিবে না। যে চক্রে তুমি নিবদ্ধ হইয়া আবর্ত্তিত হইতেছ, কে জানে তাহা কোথায় গিয়া থামিবে। এ জগৎ সুখের স্থান নহে। ইহা পাপ, তাপ, দুষ্প্রবৃত্তি ও যাতনার আকর। কেন বৃথা শান্তির অন্বেষণ করিতেছ? এ জীবনে আর সে আশা করিও না। ভাঙ্গিতে সকলেই পারে, কিন্তু হায়! গঠন করা মানব সাধ্যের অতীত! সুতরাং যোগেন্দ্র! যাহা গিয়াছে, তাহা আর আসিবে না, যাহা ভাবিয়াছ, তাহা আর হইবে না। তবে কেন ভাই কষ্ট পাও? এ কথা কে বুঝে?

যোগেন্দ্র সেইরূপ শয়ন করিয়া আছেন। সাধু আসিয়া জিজ্ঞাসিল,—

"রাত্রে কি আহার হইবে?"

উত্তর হইল,—

"কিছু না,,

ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইল, কলিকাতা নিস্তব্ধ. জীবনের চিহ্ন যেন নগরী হইতে বিদূরিত হইয়াছে। মৃত্যু আসিয়া যেন সমস্ত নগরীকে গ্রাস করিয়াছে বোধ হইতে লাগিল। দূরস্থিত কল সকলের বিকট শব্দ যেন সেই বোধের আরও সহায়তা করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। সামান্য পরিবর্ত্তনেও হয়ত চিত্ত একটু স্থির হইবে ভাবিয়া যোগেন্দ্র পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রকোষ্ঠে এক খানি টেবিল। সেই টেবেলের উপর একটী আলোক জ্বলিতেছে ও কতকগুলি পুস্তক বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে ভিত্তি সমীপে চারিটী আলমারি। তাহার একটীতে কতকগুলি ঔষধ, একটীতে কতকগুলি চিকিৎসকের অস্ত্র ও যন্ত্র একটা বাকস প্রভৃতি এবং অপর দুইটা নানাবিধ পুস্তকে পরিপূর্ণ। টেবেলের এক দিকে এক খানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ ফলকের উপর একটী মানব কঙ্কাল দাঁড়াইয়া জগতের নশ্বরতার সাক্ষ্য দিতেছে, মৃত্যুর পরাক্রমকে উপহাস করিতেছে এবং মানবের অবস্থাকে বিদ্রূপ করিতেছে। টেবিলের অপর তিন দিকে তিন খানি চেয়ার পড়িয়া আছে। যোগেন্দ্র এক খানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্ত দিয়া মস্তকের চুল, গুলা এক বার আন্দোলন করিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস সহ বলিয়া উঠিলেন. 'ওঃ। একে একে গৃহ মধ্যস্থ সমস্ত দ্রব্যের প্রতি চাহিতে লাগিলেন—যদি কোন দ্রব্য ক্ষণেকের নিমিত্তও তাঁহার নেত্রকে শান্তি দিতে পারে, তাঁহার মনকে ভুলাইতে পারে। কোথাও তাহা হইল না। অবশেষে তাঁহার চক্ষু

সেই সংজ্ঞাশূন্য, চেতনাহীন, শূন্যগর্ভ, মানবকঙ্কালের প্রতি স্থির ভাবে চাহিল। তিনি তখন উন্মাদের ন্যায় বিকৃত স্বরে কহিলেন,—

"কঙ্কাল! এ জগতে তুমিই সুখী! তোমার অবস্থা এক্ষণে আমার প্রার্থনীয়। তোমার অভিজ্ঞতা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। তুমি জগতের কি না দেখিয়াছ? যে জগতে পাপ, তাপ, কপটতা বাস করে, সেই জগতে ভুগিয়া ভুগিয়া সে সকল পাদদলিত করিতে শিখিয়াছ। বলিয়া দেও, হে দেব, হে প্রভো! বলিয়া দেও, আমি কি উপায়ে, কি কৌশলে, এই যাতনা সমুদ্র পার হইতে পারি। তুমি যাহাকে তোমার আত্মা জানিয়া বসিয়াছ সে হয়ত তোমার হৃদয়ে ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। বল সর্ব্বজ্ঞ! তুমি কি উপায়ে সে যাতনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া এ জগতে বাস করিয়াছিলে। অথবা হে ভাগ্যবান্! হয়ত তোমার সুপ্রসন্ন অদৃষ্টে এ যম যন্ত্রণা দেখা দেয় নাই। তবে হে মহান্! বলিয়া দেও কি করিলে এ সংসারে ঐ সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। বল বন্ধো! তুমি এ জগতে রমণীর অপেক্ষা কোন অধিকতর ঘৃনিত জীব দেখিয়াছিলে কি না? হে সর্ব্বদর্শী! জগতে নারী-রসনা অপেক্ষা অধিকতর কালকুটময় পদার্থ দেখিয়াছিলে কি? রমণী প্রেমের ন্যায় অসার ক্ষণস্থায়ী আর কোন পদার্থ এ জগতে আছে কি? হে নির্ব্বাক! এক বার —তোমার চরণে ধরি, এক বার এই বিপন্ন মানবের ক্লেশ নিবারণার্থ দুই একটা উপদেশ দেও। বলিয়া দেও, মরণে কি সুখ? বল, মরিলে কি হয়? যদি কিছুই না বল, হে সুহৃদ! আমাকে তোমার সহচর কর; আমাকে তোমার অবস্থায় লইয়া যাও। হে প্রেত! হে ভয়ানক! হে অবশেষ! আমি আজি তোমার অবস্থায় উপস্থিত হইয়া সংসারকে উপেক্ষা করিতে বাসনা করি, তোমার মত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া মানব হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও কাতরতা দেখিয়া হাঁসিতে অভিলাষ করি, তোমার

মত সম্পর্কশূন্য সামগ্রী হইয়া নিস্তব্ধ ভাবে, অবিলিপ্ত অবস্থায় মানব মনের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিতান্ত সাধ করি। হে অতীত! আমাকে তোমার অবস্থায় যাইবার উপায় বলিয়া দেও, আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও।”

বলিতে বলিতে যোগেন্দ্র চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কঙ্কাল সন্নিধানে গমন করিলেন, বলিলেন,—

“বল নির্দ্দয়! আমায় তোমার সঙ্গী হইবার উপায় বল। তোমার হস্ত ধারণ করিয়া অনুরোধ করি মরণের উপায় বলিয়া দেও।”

যোগেন্দ্র ব্যগ্রতার সহিত কঙ্কালের হস্ত ধারণ করিলেন; কঙ্কাল খট্ খট্ শব্দ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেই শব্দে যোগেন্দ্রের চৈতন্য হইল। তিনি হতাশ হইয়া পুনরায় আসিয়া চেয়ারে বসিলেন।

সূর্য্যদেব ক্রমশঃ পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে দেখা দিলেন। উষার সম্মোহিনী সমীরণ জগতকে নূতন জীবন দিতে আসিল। এমন সময় এক ব্যক্তি ব্যস্ততা সহ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সে ব্যক্তি সুরেশ।

যোগেন্দ্র ব্যস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

“ভাই! তোমার কথাই সত্য—স্ত্রীলোকই সর্ব্বনাশের মূল।”

সুরেশ যোগেন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

“ওঃ!!!”

বেদ বিষয়ে দার্শনিকদিগের মত।

উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন।

এই দর্শন কারের নাম বাদরায়ন বা বেদব্যাস। ইনি উপরিচর রাজার দুহিতা সত্যবতীর গর্ভে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে বেদের বিভাগ করেন বলিয়া ইহাঁর অপর নাম বেদ ব্যাস হয়। এই মহর্ষি সর্ব্ব প্রথমে কুরু পাণ্ডব যুদ্ধের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া মহাভারত নাম অতি সুবিস্তীর্ণ, বহুগুণ যুক্ত, বহু রসাত্মক

কাব্য রচনা করেন; পরে পুরাণ, উপপুরাণ ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। আমরা ইহাঁর প্রণীত দর্শনের মত সমালোচন করিবার জন্য উপস্থিত প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। বেদান্ত দর্শনের মতে সকলই ব্রহ্ম, জগৎ ব্রহ্ম, জীবও ব্রহ্ম। এই মত আবার দুই ভাগে বিভক্ত; পরিণাম বাদ, এবং বিবর্ত্ত বাদ। ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ—এটী পরিণামবাদ। জগৎ রূপে ব্রহ্ম ব্যাবৃত্ত, এই বিবর্ত্তবাদ।

সার কথা এক মাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায়——মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। এই সকল বিষয় শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

উত্তর মীমাংসার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে "অথাতোব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।" উক্ত অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহা প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। পরে তৃতীয় পাদের ২৮সূত্রে "অতঃপ্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা বৈদিক শব্দ হইতে দেবগণের উৎপত্তি পরিস্ফুট করিয়াছেন। পরে বেদোৎপত্তি সম্বন্ধে—"শাস্ত্র যোনিত্বাৎ"। তৃতীয় সূত্রে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কেননা বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিত মেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সাম বেদোথর্ব্ব বেদ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ভাষ্যে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, "মহীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদি লক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞ গুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি" অর্থাৎ মহৎ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের প্রদীপের ন্যায় সর্ব্বার্থ ভাসকতা শক্তি দৃষ্ট হয়, ইহা বিবিধ বিদ্যা দ্বারা বর্দ্ধিত এবং সর্ব্বজ্ঞ কল্প, ঈদৃশ শাস্ত্রের সর্ব্বজ্ঞ গুণ বিশিষ্ট সর্ব্ববিৎ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য প্রণেতা কি সম্ভবে? সুতরাং বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।

বেদেতে উক্ত হইয়াছে যে ঋক, যজু ইত্যাদি বেদ চতুষ্টয় সেই মহৎ

পরব্রহ্ম হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় অবলীলা ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে পরব্রহ্ম সেই সকল বেদ রচনা করিয়াছেন কি না এই সকল সংশয় উপস্থিত হইলে প্রথমত ইহা নির্দ্ধারিত হয় যে, পরব্রহ্ম বেদ সকলের কর্ত্তা নহেন। যেহেতু শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বেদের নিত্যত্ব উক্ত হইয়াছে। ইহার উত্তরে “শাস্ত্র যোনিত্বাৎ,, তৃতীয় সূত্রে এই সিদ্ধান্ত হয় যে অর্থবোধ না করিয়া কেবল নিশ্বাসের ন্যায় অপ্রযত্নে উৎপত্তি হেতু এবং প্রতি কল্পে সমানভাবে উচ্চারণ বশত প্রবাহ রূপে নিত্য প্রযুক্ত. বেদ সকল পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ইহা সিদ্ধ। অতএব সমুদায় জগতের ব্যবস্থা সম্পাদক সেই বেদের কারণ হেতু পরব্রহ্মেরও সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইল।

যথা।

“নকর্ত্তৃব্রহ্ম বেদস্য কিম্বা কর্ত্তৃন কর্ত্তৃতৎ।
বিরূপ নিত্য য়া বাচেত্যেবং নিত্যত্ব কীর্ত্তনাৎ॥
কর্ত্তৃনিশ্বাসিতাৎ যুক্তেনিত্যত্বং পুর্ব্ব সাম্যতঃ।
সর্ব্বাবভাসিবেদস্য কর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্ববিত্তবেৎ। ৩।”

অধিকরণ মালা।

অতএব বেদান্ত দর্শন মতে বেদ ব্রহ্মকার্য্য। এক্ষণে ব্রহ্ম কে? ইহা বেদান্ত দর্শন এই রূপে মিমাংসা করিয়াছেন। যথা—

অস্য জগতো নাম রূপাভ্যাং ব্যাকৃত স্যানেক কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ সংযুক্তস্য প্রতি নিয়ত দেশকাল নিমিত্ত ক্রিয়া কলাশ্রয়স্য মনসাপ্যাচিন্ত্য রচনা রূপস্য জন্ম স্থিতি ভঙ্গংযতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্ব শক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ॥

অর্থাৎ নাম রূপ দ্বারা প্রকাশিত, অনেক কর্ত্তৃ ভোক্তৃ সংযুক্ত, প্রতি নিয়ত দেশ কাল নিমিত্ত ও ক্রিয়া কলের আশ্রয়, অচিন্ত্য রচনা

রূপ এই জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি মানের সর্ব্ব কারণ হইতে সম্পন্ন হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম।

আবার ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই ব্রহ্ম। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বেদান্ত সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য মতে ঈশ্বর সত্য আর সকলই অবিদ্যা বা মায়া। এই সৃষ্টি সেই অবিদ্যা প্রপঞ্চ মাত্র। জরা, মরণ, সুখ ও দুঃখাদি সকলই অবিদ্যাজনিত। বোধ হয় সমস্তই মায়া দ্বারা রচিত, ও জগৎ প্রপঞ্চে পরিপূরিত। ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ। যথা—"স্বমায়ায়া রচিতং বিশ্বং" "মহা নির্ব্বান তন্ত্র" অবিদ্যা দ্বারা জীবাত্মা আবদ্ধ হইতে পারেন কি না তা।০ সাংখ্য সূত্রের ২০।২১।২২।২৩।২৪ সূত্রে সুন্দর রূপে মীমাংসিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বৈদান্তিকদিগের মধ্যে দুইটী প্রসিদ্ধ বাদ আছে, একটী পরিণামবাদ ও অপরটী বিবর্ত্তবাদ। পরিণামবাদীরা বলেন যে, ব্রহ্মের পরিণামে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং সকলই ব্রহ্ম। বিবর্ত্ত বাদীরা জগতের বস্তুত্ব স্বীকার করেন। প্রথম বাদে পূজ্য পূজকের ভেদ নষ্ট। দ্বিতীয় বাদে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি ন-বস্তু হওয়াতে ইহাই সিদ্ধ যে ঈশ্বর কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। বোধ হয় তজ্জন্যই বিদ্বোন্মা দতরঙ্গিণী এই রূপ কটাক্ষ করিয়া নাস্তিক আস্তিকের উপাখ্যান অবলম্বন করত ভৎসনা করিয়াছেন যথা। নাস্তিক—

সাধুবর সাধু কিংচিন্মমতে প্রবিষ্টোসি।
জগন্মৃষৈবেতি ভবন্মতং চেৎকিংকল্পতে
ব্রহ্ম নিরর্থকংতৎ। আকার শূন্যেন
গত ক্রিয়েন কর্ত্তব্য মেতেন কিমস্তি লোকে।
ইত্যাকর্ণ চকিতে তুষ্ণীংভূতে বেদান্তিনি
সর্ম্মিতং সর্ব্বে তার্কিক মবলোকয়ন্তি।
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ মপ্যেত জ্জগন্মিথ্যেতি কীর্ত্তয়ন্

লজ্জা ভয়ো ভয় ত্যাগ নাস্তিকস্য প্রভুর্ভবান।
তার্কিক সহাসৎ এবং সতি ত্বমপিকঃ কিং ব্রুবীষি
কিম্বা ত্বদ্‌ব্রহ্ম সকলমপি মিথ্যৈব মিথ্যাবাদিনস্তে।

"শ্রুতিতে বা ইমানি ভূতানি জায়াতোস্তে যেন জাতানি জীবন্তে যত প্রযন্ত্যভি সম্বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্য তদ্ব্রহ্ম" যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, ও যাহাতে স্থিতি করে এবং অবশেষে যাহাতে যাইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। ভগবতগীতাতেও যথা—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" পুনশ্চ সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মান। রামানুজ স্বামীও জগৎ এবং ব্রহ্ম এক, এই উপদেশ পরিহার করিয়াছিলেন এবং প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে লীন হয় তাহাই মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। যথা—"নানারসা মধুনি ভিন্নতয়া তরুণা ত্রিদোষ হরণং কথমন্যথাস্যাৎ, জীবাস্তথা ভগবতি প্রলয়ে বিলীনা নৈক্যংগতাঃ, খলুযতঃ পৃথগেব সৃষ্টৌ। "নদী সমূদ্রয়োর্ভেদঃ, শুদ্ধোদ লবণাদয়ো।" তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ বিলক্ষণ গুণান্বিতৌ, নদ্যঃ সমুদ্রে মিলিতাঃ সমস্তান্নৈক্যংগতা বিভিন্ন তয়া ন ভান্তি, ক্ষীরোদ শুদ্ধোদ করিয়া র্বিভেদাদ্যাস্তে তয়ো বাস্তব এব ভেদঃ। দুগ্ধে তোয়ং মিলিত মপরে নৈব পশ্যন্তি ভেদং হংসস্তাবৎ সপাদ কুরুতে ক্ষীর নীরস্য ভেদং॥ এবং জীবা লয় মধি পরে ব্রহ্মনীশে বিলীনা, ভক্তা ভেদং বিদধতি গুরোবাক্য মাসাদ্য সদ্যঃ। দুগ্ধং দুগ্ধে মপি জলে মিলিতং সর্ব্বথা তন্নৈকীভূতং নিয়ত মুভয়ো মানস স্যৈব যস্মাৎ। এবং জীবা পরম পুরুষে ধ্যান যোগাদ্বিলীনা, নৈক্যং প্রাপ্তা বিমল মতয়ঃ সন্ত এবং বদন্তি" নানা জাতীয় বৃক্ষের নানাবিধ পুষ্পরস মিলিত হইয়া মধুরূপে পরিণত হইলে ত্রিদোষঘ্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব সকল প্রলয়াবস্থায় ভগবানে বিলীন ভাবে থাকে মাত্র, সৃষ্টি কালে পৃথক হইয়া উৎপন্ন

হয়, নদী ও সমুদ্রে ভেদ দেখা যায়, নদী সকল শুদ্ধ জলময়, কিন্তু সমুদ্র লবন জলে পরিপূর্ণ। তেমনি বিলক্ষণ গুণ নিবন্ধন জীব ও ঈশ্বরে ভেদ দৃষ্ট হয়, নদী সকল চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া সমুদ্রে মিলিতা হইলে যেমন কোনও ইতর বিশেষ করিতে পারা যায় না, অথচ তাহাতে লবণ ও শুদ্ধ জলের বস্তুত ভেদ থাকে, তেমনি জীব ও ঈশ্বর আপাততঃ একাকারে প্রতীয়মাণ হইলেও তাহাদের প্রকৃত ইতর বিশেষ ভাব থাকে। দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিলে তাহা পৃথক করা অপরের অসাধ্য হইলেও হংসগণ তৎক্ষণাৎ জল বিভাগ করিয়া দুগ্ধ পান করিতে সমর্থ হয়, তেমনি লোক সকল লয় কালে সর্ব্বেশ্বরে বিলীন থাকে, কিন্তু ভক্তেরা গুরূপদেশানুসারে তাহার ভেদ করিতে সত্বরেই সক্ষম হইয়া থাকে। নির্ম্মলান্তকরণ সাধু ব্যক্তিগণ বলেন, যখন আমরা উভয় বস্তুকেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, তখন দুগ্ধে দুগ্ধ ও জলে জল মিশ্রিত করিলেই যে কেবল দুগ্ধ ও জল অভিন্ন হইয়া যায়,তাহা হইতে পারে না, তদ্রূপ জীব সকল ধ্যান যোগ প্রভাবে পরম পুরুষে বিলীন হইলেও একতা পাইতে পারে না।

রামানুজ এই প্রকার অদ্বৈত বাদের বাধা দেখাইয়া দ্বৈতবাদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন, যথা—"অদ্বৈতাখ্যং মতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতি প্রবৃত্তো ভব। সোহং জ্ঞান মিদং ভ্রস্ত্যাজ ভজংত্বং পাদপদ্মং হরেঃ" অদ্বৈত বাদ নাস্তিকতার রূপান্তর মাত্র। "সোহহং" এবং সর্ব্বং খল্বিদং বিশ্বং" কতজনে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারে। অনেকে বেদান্ত সূত্রকে অদ্বৈত বাদের আদি কারণ বলেন, শঙ্করাচার্য্যের শারীরিক ভাষ্য অদ্বৈত বাদ স্থাপনের পক্ষপাতী, বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া এরূপ করিয়াছেন নচেৎ বেদান্তকে কেন অদ্বৈত বাদ বলিবেন ? যেহেতু বেদান্ত সূত্রগুলি শ্রুতির অনুগত, আবার সেই শ্রুতি বলিতেছেন যে—

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্য নশ্নন্ন ন্যোহভিচাকশীতি ॥

ঋগেদ ১ মণ্ডল ২২ অধ্যায় ১৬৪ সুক্ত, ২০ শ্লোক। অর্থাৎ দুই সুন্দর পক্ষী প্রণয়ে মিলিত হইয়া সখ্যভাবে এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন; এক জন সুস্বাদু ফল ভোজন করিতেছেন, অপরটী নিরাহারে থাকিয়া তাহা দর্শন করিতেছেন। এই দুটী পক্ষীর ফলাশীটা জীবাত্মা, নিরাহারিটী পরমাত্মা এ বচনটী কি অদ্বৈত বাদের? কখনই নয়, বরঞ্চ উহা দ্বৈত বাদের চরম উৎকর্ষ।

ব্রহ্ম মীমাংসার প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ত্রয়োবিংশ সূত্রে লিখিত আছে, ব্রহ্ম প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ। আমরা শঙ্কর ভাষ্যটী কেবল মাত্র বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠকবর্গের নিকটে উপস্থিত করিলাম যথা "যেমন অভ্যুদয়ের হেতু বলিয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, তেমনি নিঃশ্রেয়সের হেতু বলিয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাও হইয়া থাকে, যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় হইয়া থাকে তাঁহার নাম ব্রহ্ম, এই রূপে ব্রহ্মকে সামান্য কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, কিন্তু তিনি উপাদান কারণ কি নিমিত্ত কারণ তাহার কিছুই স্থির করা হয় নাই। ব্রাহ্মণে ঘট ও কুণ্ডলাদির প্রতি মৃত্তিকা ও সুবর্ণ যেমন উপাদান কারণ, জগতের প্রতি তিনিও কি তেমনি উপাদান কারণ অথবা কুলাল ও স্বর্ণকারাদির ন্যায় নিমিত্ত কারণ? কোন্ কারণ তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলিতে পারেন যখন, প্রত্যক্ষ শ্রুতি-যুক্তি এবং অনুভব দ্বারা পাওয়া যাইতেছে তখন ব্রহ্মকে নিমিত্ত কারণ ভিন্ন আর কোনও কারণই বলা যাইতে পারে না। কেননা তিনি আদৌ অভিধ্যান পূর্ব্বক প্রাণি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই রূপ শ্রুতি তাৎপর্য্যে তিনি অভিধ্যান পূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নিমিত্ত কারণত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হইতেছে, আর লোক ব্যবহারেও দেখা যাইতেছে যে ঘটাদির নিমিত্ত কারণ স্বরূপ কুলালাদিরা অভিধ্যান

পূর্ব্বকই সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তদনুসারে তাহারা যাহা যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয়। এক একটি ক্রিয়ার নিষ্পত্তির প্রতি অনেকগুলি কর্ত্তা আবশ্যক হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এই লৌকিক যুক্তি আদিকর্ত্তাতে ঘটাইলেও বস্তুতঃ কোনও হানি হইতে পারে না, তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্ব যখন প্রসিদ্ধ আছে তখন তাঁহার নিমিত্তকারণ হইবার ব্যাঘাত কি? বৈবস্বত প্রভৃতি রাজন্য-বর্গ যখন কেবল নিমিত্তকারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তখন পরমেশ্বর নিমিত্তকারণ রূপে গণ্য হওয়া অযুক্ত নহে। বিশেষতঃ উপাদান কারণ ও কার্য্য, এতদুভয়ের একরূপতা হওয়াই অনুভবসিদ্ধ ও সম্ভব। বিবেচনা করিয়া দেখ, এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগত যেমন সাবয়ব, অচেতন এবং অপরিশুদ্ধ দেখা যাইতেছে, তেমনি ইহার উপা-দান কারণও সাবয়ব, অচেতন এবং অপরিশুদ্ধ হইলেই শোভা পায়, ব্রহ্ম ত তাদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত নন, তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য এবং নিরঞ্জন বলিয়া শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, অতএব স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে প্রস্তাবিত অশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট, স্মৃতিপ্রতি-পাদিত ব্রহ্মেতর কোনও পদার্থ এই জগতের উপাদান কারণ হইবে। যদি বল শ্রুতিতে ব্রহ্মের কারণত্ব নির্দ্দেশ আছে, তাহার উত্তর কারণ, শ্রুতি সে নিমিত্ত কারণপর; কিন্তু আমরা এ বিরুদ্ধ মতে মত দিতে পারি না, বরং আমরা এই বলিয়া মীমাংসা করিতে চাই যে, ব্রহ্মই নিমিত্ত-কারণ এবং ব্রহ্মই উপাদান কারণ, নচেৎ শ্রুতিগত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়েতেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। শ্রুতিতে এরূপ প্রতিজ্ঞা দেখিতে পাই যে, তুমি আমার নিকট এমন একটী বস্তু প্রশ্ন করিয়া যাহা জানিতে পারিলে সেটী তোমার কখনই শুনা হয় নাই; যাহা কখনই চিন্তা কর নাই তাহা চিন্তা করিলে এবং যাহা কখনও জানিতে পার নাই তাহা সম্যক্ রূপে জ্ঞাত

হইলে। এস্থলে একটী বস্তুর বিজ্ঞানে যখন সকল পদার্থের জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা আছে, তখন উপাদান কারণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ফলতঃ কার্য্য মাত্রই উপাদান কারণ ভিন্ন কদাচ সম্ভবিতে পারে না। কিন্তু নিমিত্ত কারণের স্বরূপ তদ্রূপ নহে। কার্য্য এবং নিমিত্ত-কারণের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। প্রাসাদ ও প্রাসাদনির্ম্মাতাই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শ্রুতি স্পষ্টাভিধানেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রৌত দৃষ্টান্তের উদাহরণ এই যে, যেমন নিরবছিন্ন একমাত্র মৃত্তিকা পিণ্ড জানিতে পারিলে সকল মৃণ্ময় পদার্থ অবগত হইতে পারা যায়, এবং একখানি চুম্বক লৌহের স্বরূপ জানিতে পারিলে তাবৎ লৌহময় ও কাষ্ণায়স জানিতে পারিলে সমুদায় কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত দ্রব্য অবগত হইতে কিছু বাকি থাকে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ স্থলে উপাদান কারণ ও কার্য্যে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, এতদ্ভিন্ন যেমন পৃথিবীতেই ওষধের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এ দৃষ্টান্তও উপাদান কারণের উদ্বেবিক হইতে পারে। এই রূপ ব্রহ্মের উপাদান কারণত্বের প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত শ্রুতিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—যদি আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত, এবং বিজ্ঞাত হইতে পারে সন্দেহ নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব স্থির সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্ম অধিষ্ঠাতৃ বিহীন বলিয়া নিমিত্ত কারণ, এবং তাঁহার আর স্বতন্ত্র প্রকৃতি নাই বলিয়া উপাদান কারণও হন।

বেদান্ত মতে মায়াবাদ দ্বারা যাহাই কেন প্রতিপন্ন হউক না, আত্মা যে নিত্যমুক্ত তাহার সন্দেহ নাই। ভগবদ্গীতার আত্মা জীবশরীরস্থ হইয়াও কি রূপে নির্লিপ্ত ভাব যুক্ত, তাহা সাংখ্যের ছায়া আশ্রয় করিয়া বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে "প্রকৃত্যৈবচ কর্ম্মাণি।" আবার

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্ত সর্ব্ব বস্তুষু, কিন্তস্য বন্ধনং ইত্যাদি; অপিচ "অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি"; "সর্ব্বতঃ পানি পাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং"। যাহা হউক, এই মায়াবাদ এবং অদ্বৈত বাদের শাসন ত্যাগ করিলে কেবল যুক্ত্যনুযায়ী মায়াবাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

মহাত্মা শাক্য সিংহও শ্রুতি হইতেই মায়াবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিতগণ অদ্বৈত বাদের ঘোর প্রতিবাদী, যথা পদ্মপুরাণ "বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদ মবৈদিকং ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশ কারণম" অপিচ, রামানুজ স্বামীও জীব ব্রহ্ম এক, এই অদ্বৈত বাদকে এত দূর ঘৃণাচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া স্বমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তাহা পাঠকবর্গকে না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

যথা "জ্ঞানজ্ঞাজ্ঞানমেত দ্বয়মপি বিদিতং সর্ব্ব শাস্ত্রান্তরালে, ধর্ম্মা ধর্ম্মৌচবিদ্যা তদনুতদিতরা পৃষ্ঠলগ্না বিভাতি। এবং সর্ব্বত্রযুগ্মংভবতি খলু তথা ব্রহ্মজীবৌ প্রসিদ্ধৌ, কর্ম্মাদক্যংত্বয়োন্যাদকপটমনসা হন্ত সন্তো বদন্ত।

তচ্ছব্দার্থঃ প্রঘট পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধি
স্ত্বং শব্দার্থো ভবভয়ভর ব্যগ্রচিত্তোতি দুঃখি।
তস্মাদক্যং ন ভবতি তয়োর্ভিন্নয়ো র্বস্তুগত্যা,
ভেদঃ সেব্য সখলু জগতাং ত্বংহি দাসস্তদীয়ঃ।
নাভিধা সমবায়োবা হেত্বাভাবাচ্চ লক্ষণা,
মায়াবাদি মতে ব্রহ্মঃ বোধ্যতে কেন হেতুনা।
তং হেতুং মুখ্যয়া বৃত্তা জগৎকর্ত্তেতি কথ্যতে,
সকর্ত্তৃকত্ব মেতেষা মনুমানাচ্চ সিদ্ধ্যতি।
ইয়ং সকর্ত্তৃকা নুনং ক্ষিতির্ভবিতু মর্হতি,

কার্য্যত্বং তত্রহেতুস্যাৎ ঘটাদৌ দৃশ্যতে যথা।
তৎকথ্যতে ভগবতো মহদন্তরং যৎ,
কুদ্দাল দাত্র হল পানি ভৃতাং জনানাং।
এতে ষড়ূর্মি বিবশাঃ শ্রমোভারক্লিন্না,
ভ্রূভঙ্গ মাত্র বিষয়ে স করোতি সর্ব্বং।
তথাহি কর্ম্মাৎ প্রতিবিম্ব মাসিত্তস্যা পরিচ্ছিন্য নিবক্রনস্য।
জড়স্য কর্ম্মান্নিগমোক্ত ধর্ম্মা ধর্ম্মোচ তত্তৎ সুখ দুঃখ ভোগং।
প্রতিবিম্বংভবেন্নূনং পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ।
অপরিচ্ছিন্নতা পূর্ণা তস্যতন্তবিতা কথং॥
রামানুজঃশিষ্টগণাগ্রগণ্য নিনিন্দ বিম্ব প্রতিবিম্ব বাদং।
শিষ্টৈ গৃহীতং ন যতো মতংতৎ তস্মাত্তবেচ্চাকৃতরংন ন্যূনং॥
অহং সুখী ক্বাপি ভবামি দুঃখি সুখস্য রূপি সততং স আত্মা,
এবং হি ভেদ কথমৈক্যমেব ত্বয়োর্দ্বয়োর্ভিন্ন পদার্থয়োঃস্যাৎ।
নিত্যং স্বয়ংজ্যোতিরনাবৃতোসা বতীব শুদ্ধো জগদেকসাক্ষি॥
জীবস্তু নৈবংবিধয়েব তস্মাদভেদ বৃক্ষোপরিবজ্রপাত।
যেন ব্যাপ্ত মখণ্ড মণ্ডলমিদং ব্রাহ্মাণ্ডভাণ্ডাদিকং,
রেরে মন্দমতে! ত্বয়া কথ মহোসোঽহং বচংকথ্যসে।
পশ্যত্বং নিজবৈভবং স্বহৃদয়ে কৃত্বা মতিং নির্ম্মলাং,
বৃংহঃ কিংমশকোদরে প্রবিশতি প্রোদ্দাম দিগ্‌দন্তিনাং।
কস্যত্বং কুতরাগতঃ কথমরে সংসার বন্ধক্রম।
ত্বত্বংতৎপরিচিন্তয় স্বহৃদয়ে ভ্রান্তস্য মার্গংত্যজ।
ন্যস্তঃশ্রীপরমেশ্বরস্য কৃপয়া চৈতন্যলেশ স্ত্বয়ি,
ত্বংতস্মাৎ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহো নায়াপি বক্তুমৃশঠ।
লন্তাকশ্চ দুর্জ্জনঃ খলু যথা হস্ত্যশ্ব পাদাতকং,
ভূয়া দেব তদীশ রাজপদবীং চক্রে গৃহীতুং মনঃ।

কেচিদ্বাদবলা কুতর্ক জলধৌ মগ্নাঃ কুমার্গে রতা,
মিথ্যা জল্পন কল্পনা শ ন যুতা ভ্রান্তা জগদ্ভ্রামকাঃ।
ব্রহ্মৈবাহমিদং চরাচরমপি ব্রহ্মৈব দৃশ্যা খিলং,
প্রাদুর্ভূয় ত্বদস মনোরথ ইতি ব্যাখ্যাত মস্তস্ফুটং।
নৈর্গুন্য বাদো গুণসাগরেপি তেষামহো গড্ডারিকা প্রবাহঃ,
সূত্রস্য ভাষ্যং পৃথগেব কৃত্বা প্রতারয়ন্তি স্বমতপ্রপন্নান্।
ঐশ্বর্য্য কর্ত্তৃত্য মুখাঃ সমগ্রা নিত্যা গুণাস্তে পরমেশ্বরস্য,
অতো গুণি নির্গুণরেব কর্ম্মা নৈর্গুণ্য বাদস্তু বিবাদ এব।
প্রতীয়তে ক্বাপি ন বেদলোকে নির্ধর্ম্মকং বস্তু খপুষ্পতুল্যং,
প্রতীতি রাস্তে যদি তস্য বেদে বেদাঃপ্রমানং খলুনোতদাস্যাৎ।
প্রস্তরো যজমানোবৈ যথাত্র যজ্ঞ সাধনং,
ধর্ম্ম বাধং তথাত্রাপি নির্দ্ধর্ম্মস্তু প্রতীয়তে।

অর্থাৎ—যেমন জ্ঞান অজ্ঞান, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, বিদ্যা অবিদ্যা, দ্বন্দ্বভাবে পৃষ্ঠলগ্ন হইয়া সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত আছে, তেমনি জীব ও ব্রহ্ম শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। অতএব সরল হৃদয়ে সাধু মানবেরা বলুন যে তাঁহাদের কি রূপে ঐক্য সম্ভব হইতে পারে? জীব ব্রহ্মের ঐক্যমূলক মহাবাক্য স্থিত ত্বং অর্থাৎ পরমানন্দে পরিপূর্ণ অমৃতসিন্ধু এবং ত্বং অর্থাৎ সংসার ভয়ভরে ব্যগ্রচিত্ত অতি দুঃখি জীব। অতএব সেই ভিন্ন দুই পদার্থের কখনই একতা নাই। বস্তুগত্যা উভয়ের পরস্পর ভেদ ইহাতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রহ্ম জগতের অর্চ্চনীয়, তুমি তাঁহার উপাসক দাস। মায়াবাদীদিগির মতে কারণাভাবে ব্রহ্মকে কোন রূপ প্রমাণেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। উহাতে না আছে অভিধা শক্তি, না সমবায় সম্বন্ধ। আবার বিশেষ কারণাভাব প্রযুক্ত লক্ষণা বৃত্তিও স্বীকার করা যাইতে পারে না। কিন্তু আমরা অনায়াসেই মুখ্যবৃত্তি অভিধা ও যৌলিবৃত্তি লক্ষণা স্বীকার করিতে পারি। ব্রহ্ম যে

জগতের কর্ত্তা এবং এই জগৎ যে তাঁহা কর্ত্তৃক, ইহা অনুমান দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে। ঐ অনুমানের আকার এই যে, যে যে বস্তু. যে যে কার্য্য স্বকর্ত্তৃক তাহার কর্ত্তা আছে, যেমন ঘট। এরূপ প্রমান প্রয়োগে ইহাও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, পৃথিবী কার্য্যরূপ অতএব সকর্ত্তৃকা। কোথায় বা সেই হলদত্র কুন্দলধারী মানবগণ. আর কোথায় বা সর্ব্বশক্তিমাণ পরব্রহ্ম; বস্তুতঃ এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদের পরিসীমাই নাই। এমত্ত প্রকারে জীব ও পরব্রহ্মের ঐক্য-সাধন করিতে চেষ্টা পাওয়া অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। অহো ! আমরা নিতান্ত যার-পর নাই অধীন, শ্রমভরে খিদ্যমান কিন্তু তিনি ভ্রুভঙ্গি করিবা মাত্র এই সকল করিতে সমর্থ হন। এবম্বিধ প্রকারে জীব ও ব্রহ্মের একতার সম্ভাবনা কি? শিষ্টগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা রামানুজ স্বামী বিম্ব প্রতিবিম্ববাদকে নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। যথা

দেখ দেখি সেই অপরিচ্ছিন্ন নিরঞ্জন পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হওয়া কিরূপে সম্ভব হয়? যেমন জড় ব্যক্তির বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তত্তৎ-ফল সুখ দুঃখ ভোগ কোন রূপেই সম্ভবিতে পারে না। পরিচ্ছিন্ন বস্তুরইতো প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে, পূর্ণরূপ পরব্রহ্মের তাদৃশ পরি-চ্ছিন্নতা কোথায়? মহানুভব রামানুজের এই মতটি সাধুজন পরিগৃহীত না হইলেও কি বলিতে হইবে, যে ইহা মনোমত নয়। আমরা কখন বা সুখী. কখন বা দুঃখী হইয়া থাকি, কিন্তু সেই পরামাত্মা সতত আনন্দ ময়। যখন এতাদৃশ বিপরীত প্রভেদ দেদীপ্যমান রহি-য়াছে তখন কিরূপে সেই পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ দ্বয়ের (জীব ব্রহ্মের) ঐক্য সাধন হইতে পারে? পরমাত্মা নিত্য, স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়, উপাধি শূণ্য ও শুদ্ধ সত্য এবং এই জগতের এক মাত্র সাক্ষি; কিন্তু জীব সে প্রকার নহে। অতএব অভেদ বুক্ষোপরী সুতীক্ষ্ণ বজ্র পতিত হউক। রে মুর্খ, যিনি এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত

রহিয়াছেন, পরিচ্ছিন্ন হইয়া তিনিই আমি, একথা কোন সাহসে বলিব ? তুই একবার নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান নেত্রে আপন ঐশ্বর্য্য ভাবিয়া দেখ দেখি। মদোন্মত্ত দিগ্‌গজ কি কখন মশকের উদর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে ? তুই কে, কোথা হইতে আসিলি এবং কি প্রকারেই বা তোর এই শরীর পরিগ্রহ হইল, এ সমস্ত চিন্তা করিয়া দেখিয়া ভ্রান্তির পথ একেবারে পরিত্যাগ কর। ওরে পরমেশ্বরের কৃপায় তোতে চৈতন্যের লেশ মাত্রও অর্পিত হইয়াছে বলিয়া তোকে স্বয়ং পরমেশ্বর বলিতে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। অথবা দুর্জ্জন কৌশলে হস্তি, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রভুরই রাজ-পদবী লাভের চেষ্টা পাইয়া থাকে। কতকগুলি কুবুদ্ধি লোক এমন আছে যে তাহারা কেবল বাগ্‌বিতণ্ডাপরায়ণ ও কুতর্কসাগরে নিমগ্ন, কুমার্গগামী, মিথ্যা কল্পনাতৎপর, শত শত অনর্থ কল্পনাকারী ও নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া দিগ্‌বিজয়ীর ন্যায় নানা দেশ পরিভ্রমণ করত যথা তথা বলিয়া বেড়ায়, আমিই ব্রহ্ম এবং এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ ব্রহ্মময়। কিন্তু এ কথাটি তাহাদিগের মনোগত নহে। হৃদয়ের অসদভিপ্রায় বলিয়া এ রূপ স্থির করে তাহার সন্দেহ নাই। অহো! এমন গুণসাগরেতেও নির্গুণতাবাদ স্থাপন করিয়া কি অপূর্ব্ব গড্ডারিকা প্রবাহের স্বভাবেরই অনুকরণ করিয়াছে। শারিরীক সূত্রের নির্গুণ পক্ষে পৃথক্ ভাষ্য করিয়া স্বমতপ্রবিষ্টদিগকে কেমন আশ্চর্য্য রূপে প্রতারিত করিয়া গিয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি ঐশ্বর্য্য কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি নিত্য পরমেশ্বরের গুণরাশি সত্বে সেই পরমেশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া নৈর্গুণ্যবাদ প্রচার করা ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্যই বিবেচিত হইতে পারে না। ধর্ম্ম বিহীন আকাশ কুসুমতুল্য বস্তু এমন কথা বেদের কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না, আর যদি বেদে তেমন প্রমাণ থাকে তাহা হইলে সেই বেদও প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত

হইতে পারে না, অথবা অভিষবনার্থে পাষাণ যেমন যজ্ঞ সাধন, তদ্বৎ স্থলে যজমানও তদ্রূপ। তন্নিমিত্ত যেমন বেদে যজমানকে প্রস্তর বলা হইয়াছে, ধর্ম্মবোধ বিষয়ে পরমাত্মাকেও সেই রূপ ধর্ম্মহীন বলা হইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ তিনি তদ্ধর্ম্ম বিহীন নহেন। শ্রীপ্রঃ

ধর্ম্ম, নীতি এবং সভ্যতা।**

অনেক দিন হইতে মানব সমাজে, ধর্ম্ম ও নীতি প্রায় এক হইয়া পড়িয়াছে। মানবগণ, ধর্ম্মের অবমাননা করা হইলে, নীতির অবমাননা; এবং নীতির অবমাননা করা হইলে, ধর্ম্মের অবমাননা বোধ করিয়া থাকেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ সভ্যতার আলোকমালা মানব মনের চিরসঞ্চিত তামস দূরীভূত করিতে বদ্ধপরিকর। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতি, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতেছে। বিস্তীর্ণ সভ্যতায়—বিবিধ জ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতিতে, ধর্ম্ম ও নীতির যে স্বাতন্ত্র্য আমরা দেখিতে পাই, তাহা প্রতিপাদন করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে, বিবিধ মত, বিবিধ জাতি ও সমাজ মধ্যে প্রচলিত। তদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধনামা ডারউইন সাহেব স্বীয় প্রতিভা বলে বিশেষ যুক্তিসম্পন্ন আর একটী মত মানবসাধারণে আনয়ন করিয়াছেন। সুতরাং মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে যতগুলি মত, নানা ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে প্রকটিত, তাহার কোনটীই, নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমপরিশূন্য নহে। এই সকল মত ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য হউক বা না হউক, একথা সর্ব্বথা অপরিহার্য্য যে মানবগণ, কখনই আধুনিক

** নীতি [morality] কে, অনেকে ধর্ম্মনীতি নামে অভিহিত করেন। আমরা এখানে কেবল নীতি এবং [Religion] কে ধর্ম্ম পদে বাচ্য করিলাম।

সভ্যতাশীল মানব হইয়া পৃথিবীতে আইসে নাই। আদিম বা অসভ্য মানব, ক্রমে উন্নত হইয়া আধুনিক সভ্যতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

আদিম মানব অসভ্যতাকলঙ্কিত, মানসিক শক্তি নিচয় প্রাথমিক কালে অপরিমার্জ্জিত। আমাদের সভ্যতা পরিমার্জ্জিত মস্তিষ্ক যে সকল কার্য্য সম্পাদনে পারগ, আদিম মানবের মস্তিষ্ক সেই সকলে অবশ্য অপারগ ছিল। বিস্তীর্ণ সভ্যতা-প্রসূত জ্ঞানে অনভিজ্ঞ ছিল বলিয়া স্বভাব-প্রসূত কতকগুলি জ্ঞানের পরিচালনায় যে অক্ষম ছিল, এমত নহে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, প্রভৃতি স্বভাব প্রদত্ত কার্য্য পরিচালনে সক্ষম ছিল।

এগুলির মূলভাব চিরকাল প্রায় একরূপ। কিন্তু এই সকলের সহিত আমরা মানব মনে কোন ধর্ম্মভাব দেখিতে পাই না। সুতরাং ধর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত স্বভাব-প্রসূ কার্য্য নিচয়ের ন্যায় নহে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি মানবগণ যেমন স্বভাবতঃ করণে বাধ্য হইয়াছে, ধর্ম্মে সেরূপ নাই। তবে আদিম কালে অসভ্য মানবের হৃদয়ে ধর্ম্ম ভাব কেমনে উত্থিত হইল? ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কিরূপ করিয়া, কেন হইল? এতৎ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে—ধর্ম্মের উৎপত্তি-ভাব আমরা অগ্রে বিবৃত করণে যত্নশীল হইব।

প্রকৃতি বিবিধ সৌন্দর্য্যের আধার। মস্তকের উপরে—অনন্ত সুনীল নভোমণ্ডল, অসংখ্য নক্ষত্ররাজি, গ্রহ, উপগ্রহ, প্রভৃতিতে পরিব্যাপ্ত। চতুর্দ্দিকে শ্যামল ভূষণে বিভূষিত, বৃক্ষরাজি ও ললিত লতাবলী। সম্মুখে অনন্ত অসীম লবণাম্বুনিধি, সাগর, উপসাগর, তরঙ্গিনী। প্রাকৃতিক ঘটনার বিরাম নাই; প্রকৃতি দেখিতে আপাততঃ সুগম্ভীর বটে; কিন্তু স্বভাব একেবারে চঞ্চলতা পরিশূন্য নহে। তাহাতে আবার প্রাকৃতিক সচীবগণ প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন। প্রাকৃতিক সচীবগণ সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য সাধনে নিবিষ্টমনা, কিন্ত এত কর্ত্তব্য জ্ঞান

সত্বেও—একভাবে কর্ত্তব্য সাধন করিতে করিতে অকস্মাৎ ভীষণ মুর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠে। অনিল নিয়তই বহমান; হঠাৎ ভয়ানক মুর্ত্তি ধারণ করিল, তরুলতা প্রভৃতি ছিন্নমুল করিতে লাগিল, জীবকুল ভয়ে অধীর হইল। আদিম মানব এই সময়ে বিশ্বের ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভয়ে অভিভূত হইল। বুদ্ধিশক্তি সম্পূর্ণ অপ্রসারিত; কোনই কারণ নির্ণয় করিতে অক্ষম। স্বভাব প্রদত্ত ভয়ে মানব অস্থির; আশা, কেমন করিয়া এ বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে সুখে বসতি করিবে। আশাও মানব হৃদয়ে একটী স্বভাব প্রদত্ত সামগ্রী। আদিম যুগে মানবের হৃদয়ে আশা যেমন, সভ্যতম যুগেও তেমন। একদিকে ভয়ে ও অপরদিকে আশায় মানবগণ উত্তেজিত হইল। বুদ্ধিশক্তির অবিকাশ হেতু, অনিলের ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি ধারণের কোন কারণ স্থির করিতে অক্ষম হইয়া মনে করিল, এই স্তব বাক্য বলিলে—এই আহার করিতে দিলে—এই আসন বসিতে দিলে, হয়ত অনিল সুস্থির হইতে পারে। কার্য্যতঃ তাহাই করিল। এদিকে, অনিল প্রকৃতি কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া সুস্থির হইতেছিল; মানব মনে করিল, তাহার এবম্প্রকার কার্য্য সকলে অনিল সুস্থির হইয়াছে। পরিণামে তাহাই করিতে আরম্ভ করিল; সুতরাং অনিলকে উপাসনা করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল।

আদিম কালে উপাসনা করিবার প্রথা—ধর্ম্মের ভাব এবম্প্রকার কার্য্যাদি হইতে সমদ্ভুত। আধুনিক পরিমার্জ্জিত ধর্ম্মভাবের মুলভিত্তি ইহাকেই বলা যাইতে পারে। তন্নিমিত্তই আমরা প্রাচীন কালে, প্রাচীন গ্রীক ও ভারতবর্ষে চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল, তপন, মেঘ, গ্রহ,উপগ্রহ, প্রভৃতিকে দেবতা স্বরূপে উপাসনার বিধি দেখিতে পাই। যে আর্য্য-তাপসগণ, হিমালয় শিখর দেশে সমাসীন থাকিয়া অসংখ্য জ্ঞানরত্নের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারাও এ কুসংস্কার বিহীন নহেন।

ঋগ্‌বেদের অনেক স্থলেই এরূপ দেবতাদিগের উপাসনা বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক, লাটিন ও ভারতীয় দেব সংজ্ঞাবলীর মধ্যে এরূপ দেবতাদিগের যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

দার্শনিক হিউম (Hume) তদীয় Natural History of religion নামক গ্রন্থে ধর্ম্মের উৎপত্তি ভাব বিশদ্ রূপে বর্ণন করিয়াছেন। ধর্ম্ম ভাবের উৎপত্তি বিষয়ে, আমরা তাঁহার মত গুলি সারবান মনে করি। তিনি বলেন, ধর্ম্মের প্রাথমিক ভাব কেবল প্রাকৃতিক কার্য্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে; জীবনের ঘটনাবলী অবিশ্রান্ত প্রবাহশীল আশা ও ভয় মানব চিন্তাশক্তিকে বর্ত্তমান কার্য্যাবলী ব্যতীত কতকগুলি অদৃশ্য শক্তির অন্বেষণে [first inquiry] প্রবৃত্ত করিয়াছে। মানব এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত, কেবল বিচার শক্তির কৌতূহল অথবা আশ্চর্য্য কিম্বা সত্যের অনুরোধে হইয়াছে তাহা নহে, এরূপ অনুরোধ আদিম মানবের সংকীর্ণ মানসিক শক্তির সম্পূর্ণ অনুপযোগী। জীবনের প্রতি ভালবাসা, সুখেচ্ছা, মৃত্যুর ভয় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য কলাপ ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তি আদিম অসভ্যদিগকে এরূপ অন্বেষণে সহায়তা করে নাই। এইরূপ আশা ও ভয়ে মানব উত্তেজিত হইয়া বিবিধ ভবিষ্যত ঘটনাবলীর কারণ ইত্যাদি বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। আমরা এই স্থলে হিউমের সেই কথাগুলি উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় পাঠকগণের বিরক্তির কারণ হইবে না। হিউম বলিয়াছেন;—

*The first ideas of religion arose, not from a comtemplation of the works of nature, but from a concern with regard to the events of life, and from the incessant hopes and fears which actuated the human mind, in order to carry men's attention beyond the present course of things or lead them into any inference concerning invisible intelligent power, they must be actuated by some passion which prompt their thought and reflection, some motive which urges their first inquiry. But what

passion shall we have recourse to, for explaining an effect of such mighty consequence? not speculative curiosity merely or the pure love of truth. That motive is too refined for such gross apprehensions and would lead men into inquiries concerning the frame of nature, a subject too large and comprehensive for their narrow capacities. No passions therefore can be supposed to work on such barbarians, but the ordinary affections of human life, the anxious concern for happiness, the dread of future misery, the terror of death, the thirst of revenge, the appetite for food and other necessities. Agitated by hopes and fears of this nature, especially the latter, men scrutinize with a trembling curiosity the course of future causes, and examine the various and contrary events of human life. And in this disordered scene, with eyes still more disordered and astonished, they see the first obscure traces of divinity.

বস্তুতঃ আদিম মানব প্রাকৃতিক বিবিধ ঘটনাবলীর কোন কারণই নির্ণয় করিতে পারে নাই। তাহারা জানিতে পারে নাই যে প্রাকৃতিক নিয়মে অনিল ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; আবার প্রাকৃতিক নিয়মেই তুষ্টিভাব ধারণ করে। বেগবান্ আশা ও ভয়ে বিকল হইয়া অনিলকে দেবতা স্বরূপে আরাধনা আরম্ভ করিয়াছে। অনেকে আদিম মানব হৃদয়ের এইরূপ ভাবকে ধর্ম্মভাব বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা ইহাকে কখন ধর্ম্মভাব বলিতে পারি না। আদিম মানব হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার অসম্ভব। কেননা আদিম মানব হৃদয়ের যে ভাবকে লোকে ধর্ম্ম ভাব বলে, তাহা অধ্যাত্মিক, আদিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ ত্রয় হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা ব্যতীত অন্য কোন কিছু নহে। বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, ভয়; মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ; যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি হইতে যে দুঃখরাশি সমুৎপন্ন; তাহা হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা ও বাসনাকে কখন ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না। অবশ্য, এইরূপ পরিত্রাণের চেষ্টা হইতে, পরিদৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান কতকগুলি কার্য্যের উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর অথবা ধর্ম্ম তখনও জানিতে অথবা বুঝিতে পারে

নাই। তজ্জন্যই অসভ্যতম যুগে অমানুষিক ক্ষমতা সম্পন্ন বহুল দেবতা। অনন্ত নভোমণ্ডল পরিব্যপ্ত তারকাবলী; অরুণ, বরুণ প্রভৃতি সকলেই দেবতা।

আদিম মানব, আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধি দৈবিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ মানসে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিল; উত্তর কালে তাহাই ধর্ম্মের মুলভিত্তি হইয়াছে। কিন্তু এ ভিত্তি কখন পরিমার্জ্জিত অবদান পরম্পরায় সংরচিত নহে। ঋগ্‌বেদের সমসাময়িক আর্য্যেরা প্রথমে অধ্যাত্মিক আধিভৌতিক প্রভৃতি দুঃখ হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করেন। তন্নিমিত্তই জড় জগত প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান কতকগুলি পদার্থের উপাসনা আরম্ভ হইয়াছিল। কেবল ঈশ্বর—ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি যিনি, তিনিই যে একমাত্র শাস্তিদাতা—রোগ, শোক, দুঃখ, আধিব্যাধি নিবারণের অধিপতি, এ বিশ্বাস তখনও হইয়াছিল না। ঋগ্‌বেদে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞানের যে বিকাশ দেখিতে পাই, তাহা জড় জগত উপাসনার অব্যবহিত পশ্চাৎবর্ত্তী ফল। প্রথমে জড় জগতের উপাসনা, পরে সেই ভিত্তি হইতে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান-বল্লরী উর্দ্ধে উত্থিত। বস্তুতঃ আদিম যুগের মানব মনে এরূপ ভাবের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে। আদিম মানবের বুদ্ধি শক্তি সম্পূর্ণ বিকশিত না হওন প্রযুক্ত তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, আত্মবিশ্বাস, সংসারে জীবনের জন্য প্রতিদিবসের আবশ্যকীয় কার্য্যাবলী, সংক্ষেপেতঃ যে সকল শক্তি অনুসারে তাহারা পরিচালিত হইত, সমুদায়কে কোন প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন শ্রেষ্ঠতর শক্তি হইতে প্রদত্ত ব্যতীত অন্য কোন কিছু মনে করিত না। বিজ্ঞান— ভৌতিক ও রাসায়নিক শক্তির মূল জানিতে না পারিয়া, আশা ও ভয়ে (hopes and fears) পরিচালিত হইয়া ভৌতিক ও রাসায়নিক নিয়ম পরম্পরায় পর পর দৈনিক যে সকল ঘটনা সংঘটন হয়, তৎসমুদয়কে

ঈশ্বর কর্ত্তৃক অথবা ঐশীশক্তি কর্ত্তৃক সংঘটিত মনে করিত।

বর্ত্তমান সভ্যযুগে, মানব সমাজে আমরা যে পরিমার্জ্জিত ধর্ম্ম প্রণালী—একেশ্বর বাদ দেখিতে পাই; তাহার মূল-ভিত্তি সম্পূর্ণ রূপে আশা ও ভয়োৎপন্ন না বলিলেও, অনেক অংশে স্বীকার করা যুক্তি বিহীন নহে। কেন না এতদুভয় উৎপন্ন উপাসনা প্রণালীই আধুনিক ধর্ম্মের এক রূপ মূল ভিত্তি। আদিম যুগের অনিল, তপন, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির উপাসনা, সভ্যতম যুগে সভ্যতম মানব জাতির মধ্যে তদ্রূপ পরিলক্ষিত হয় না। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ অনিল, তপন, বারিদ, নক্ষত্র মণ্ডলীতে দেবভাব আরোপ করিয়া পূজা করিতেন। বিজ্ঞানের বহুল আলোচনায়—হৃদবৃত্তের প্রচুর উৎকর্ষতায়, আমরা এখন তদ্রূপ করিতে প্রস্তুত নহি।

ডেকার্ট (Descartes) যিনি আধ্যাত্মিক দর্শণ শাস্ত্রের মূল-ভিত্তি সংস্থাপক; তিনি বলেন, কোন কিছু যাহা আমরা বিশুদ্ধ ও বিশেষ রূপে অনুভব (apprehend) করিতে পারি তাহাই অবশ্য সত্য হইবে। এই মূল সূত্রানুসারে তিনি বলেন যে ঈশ্বরের ভাব (idea of god) আমাদিগের জ্ঞান বুদ্ধি ক্ষমতায় সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ; তজ্জন্য ইহার প্রতিরূপ সত্ত্বা (object) অবশ্য থাকিবে। এক সময়ে ডেকার্টের এই মত আধ্যাত্মিক দর্শণ শাস্ত্রের অস্থিমজ্জা স্বরূপ ছিল; এখনও একেশ্বরবাদীগণ এই মতকে প্রবলতর যুক্তি সম্পন্ন ও অখণ্ডনীয় মনে করেন। ন্যায় শাস্ত্রের বহুল আলোচনায়, বিশেষতঃ দর্শনবিদ প্রসিদ্ধ নামা হিউমের মত মানব সমাজে প্রবিষ্ট হওয়ায় ডেকার্টের এই মূল সূত্র শিথিল বন্ধন হইয়াছে। কোন কিছু, যাহা আমরা বিশেষ ও বিশুদ্ধ রূপে অনুভব করিতে পারি, তাহাই সত্য এবং তাহার কার্য্যের অলঙ্ঘনীয়তা প্রতিপাদন হয় না। বারান্তরে ডেকার্টের মতের বিশেষ আলোচনা করা আমাদিগের মানস রহিল।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভাব মানব মনে আজন্ম বসতি করে। পর্য্যবেক্ষণ ভূয়োদর্শণ বা অভ্যাসে ইহা কখন আনীত হয় না। অসভ্য জাতির মধ্যেও ধর্ম্ম ভাব এখন পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আদিম মানব হৃদয়ের যে ভাবকে লোকে ধর্ম্মভাব আখ্যা প্রদান করে, তাহা বস্তুতঃ ধর্ম্মভাব নহে। ঋক্ বেদের সমসাময়িক আর্য্যেরা প্রথমে জড় জগতের উপাসনা করেন। বহুল পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনে তাঁহারা অন্তর্জ্জগতের আরাধনায় উপনীত হয়েন। আদিম মানব যদি প্রথমেই অন্তর্জ্জগৎ— অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত; যদি ভূয়োদর্শনে হৃদবৃত্তের প্রসারণের পূর্ব্বেই, তাহাদিগের মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভাবের সঞ্চার হইত; তাহা হইলে ঈশ্বরের বিশ্বাস আজন্ম সিদ্ধ একথা স্বীকার করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। তবে আধুনিক সভ্যতম জাতির চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য আদিম জাতির মধ্যে আমরা যে ধর্ম্ম ভাব দেখিতে পাই, তাহা যে আজন্মজাত এরূপ নহে। এরূপ ঘটনাকে সভ্যতম জাতির ধর্ম্ম ভাবের অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। আমরা, আমাদিগের প্রতিবেশী অনক্ষর অসভ্যদিগের মনেও যে ধর্ম্ম ভাব—ঈশ্বরের সত্ত্বা দেখিতে পাই, তাহাও শিক্ষিত সম্প্রদায়—যাহারা কথঞ্চিত পর্য্যবেক্ষণে ঈশ্বরের সত্বা ও ধর্ম্মের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন, তাহাদিগের অনুকরণের ফল। অধিকন্ত অসভ্যদিগের মধ্যে যে ধর্ম্ম বিশ্বাস ও শাসনকর্ত্তা পরিলক্ষিত হয়, তাহাও বহু দর্শনের একেশ্বর নহে।

** The religious belief of savages is not belief in the god of natural theology, but a mere modification of the crude generalization which ascribes life, consciousness and will to all natural powers of which they cannot perceive the source

or control the operation. Three Essays on religion by J. S. Mill. P. 158.

ক্যাণ্টের [Kant] মতে ঈশ্বরের ভাব অথবা সত্ত্বা আমাদিগের মনোরাজ্যের অধিকারী। কারণ এই ভাবটী মনের স্বনিয়ম (own laws) দ্বারা সংগঠিত হয়; মনোজগৎ ইহার আশ্রয় দাতা। বহির্জগৎ অথবা অন্যত্র হইতে সমদ্ভূত হয় না। ঈশ্বর আমাদের সাক্ষাৎ চেতনার বিষয় (objectof direct consciousness) যুক্তি সিদ্ধান্ত নহে। নৈতিক নিয়মের বশীভূত হইয়া প্রয়োজনশীল অবলম্বন (necessary assumption) মাত্র। ক্যাণ্টের তর্ক-জটিলতা নিতান্ত সহজ নহে। মিল এই কথার জটিলতা পরিষ্কার করিতে গিয়া বলেন, কোন অনুজ্ঞা থাকিলে অনুজ্ঞাকর্ত্তা, অথবা কোন বিধান থাকিলে বিধানকর্ত্তা, সম্বন্ধে ক্যাণ্ট যে অর্থ নির্দ্দেশ করেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে পরিস্ফুত নহে। ক্যাণ্টের অর্থ পরিস্ফুত হউক বা না উহক, আমরা এখন তাহার বিশেষ পর্য্যালোচনা করিব না। আমাদিগের আপাততঃ দ্রষ্টব্য এই, কোন বিধান থাকিলে, বিধান কর্ত্তার অস্তিত্ব আদিম মানব হৃদয়ে অসম্ভব। আমরা পূর্ব্বে এক রূপ বলিয়াছি যে এ সকল ভাবের সঞ্চার হওয়া পর্য্যবেক্ষণের ফল। যদিও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে ঈশ্বর প্রয়োজনশীল অবলম্বন necessary assumption। তথাপি ইহা প্রমানী কৃত নহে যে অসভ্যেরা নৈতিক নিয়মে বাধ্য হইয়া—সমাজের প্রতি সদ্ব্যবহার—সামাজিক বিধান সমুহের উৎকর্ষতা সাধন জন্য প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছে। তাহাদিগের বহু ইশ্বর—জড় জগতের প্রত্যেক ক্ষমতাশীল পদার্থের ঐশ্বরিক ভাব প্রাকৃতির শক্তি নিচয়ের মুলান্বেষণে অনভিজ্ঞতার ফল মাত্র।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বিজ্ঞাপন।

এ পর্য্যন্ত গ্রাহকগণ মধ্যে যাঁহারা মাসিক সমালোচকের মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহাদিগের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা যেন আর স্ব স্ব দেয় পাঠাইতে বিলম্ব না করেন। সমালোচক ধারে দিবার রীতি নাই।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় রচনা প্রবন্ধাদি, সমালোচ্য গ্রন্থাদি বহরমপুর, খাগড়ার ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

ব্যারিং বা ইন্সফিসিয়েণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না। যাঁহারা পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উত্তর লেখা যাইবে না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা ডাকের টিকিটে মূল্য পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় ৴০ আনা কমিসন দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট যেন কেহ না পাঠান। মনিঅর্ডারে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর ট্রেজরীতে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন তাঁহাদিগের নিকট পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪৲ টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে, সুতরাং বিনা মূল্যে দেওয়া এক কালে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্র ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ
মাসিক সমালোচক কার্য্যালয়
খাগড়া, বহরমপুর

(৩য় খণ্ড।) (১ম সংখ্যা।)

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল

সংযোজিত।

—:*:—

(সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।)

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
সন ১২৮৯ সাল, বৈশাখ।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বহরমপুর,—অরুণোদয় যন্ত্রে
শ্রীভগবানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল।

—:*:—

দুই ভগ্নী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্য।

Be frustrate all ye stratagems of Hell,
And devilish machinations come to nought!
Milton. Paradise Regained.

প্রত্যূষে যোগেন্দ্র ভবন সংলগ্ন রাজ পথে ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা ছিল না। চক্ষু রক্তবর্ণ, উন্মত্তের ন্যায় স্থির, শরীর বলহীন ও কৃশ; বদন কালিমাযুক্ত। তিনি চিন্তা করিতেছেন—ভয়ানক! "হরগোবিন্দকে খুন্ করিব।" আবার ভাবিতেছেন, "হরগোবিন্দকে কেন? বিনী বিশ্বাসঘাতিনী, তাহাকেই নিপাত করিব।" আবার ভাবিতেছেন, মানব শোণিতে যদি হস্তকে রঞ্জিত করিতে হয়, তবে উভয়কেই বধ করিব। আবার ভাবিতেছেন, "উহারা পাপী, কিন্তু আমি উহাদের দণ্ড দিবার কে? উহাদের পাপোচিত শাস্তির অন্য ব্যবস্থা আছে, তাহাতে আমার কোনই অধিকার নাই। তবে আমি কেন কলঙ্কিত হই? আমি কেন এ সংসার ছাড়িয়া যাই না? এ সংসার আমার সুখের জন্য নহে। তবে কেন নরহত্যা করিয়া আমার নাম অনন্ত কালের নিমিত্ত নরঘাতীদিগের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখি? আবার ভাবিতেছেন, এ যাতনা যায় কিসে? সংসার ত্যাগ করিব, এ স্মৃতি তাহাতেও যাইবে না তো। মৃত্যু—মৃত্যুই আমার নিষ্কৃতির উপায়। মরিব—না মরিলে এ অনল নিবিবে না। আবার ভাবিতেছেন, "মরিব বটে। কিন্তু এই যে চিন্তা—আমি

যাহাকে—ওঃ—না, সে কথায় কাজ নাই—সে যে আমাকে প্রতারিত করিয়া পর—না—উঃ—উঃ—আমোদে মজিয়া আছে—এ চিন্তা মৃত্যুর পরও আমার আত্মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। না—তাহা হইবে না। উহারা বর্ত্তমান থাকিলে মরণেও আমার সুখ নাই। উহাদের না মারিয়া আমি মরিব না। কি জানি যদি বিঘ্ন ঘটে—অদ্যই। দুই জন—দুই জনকেই এক সঙ্গে। বিলম্বে কাজ নাই। আজিই—।, ভাবিতে ভাবিতে যোগেন্দ্র নাথের রক্তবর্ণ চক্ষু আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, যেন স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; শরীর কণ্টকিত হইল, কেশ সকল উচ্চ হইয়া উঠিল। হত্যা, মৃত্যু, পাপ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সমস্ত যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার চারি দিকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিল। দূরে যেন কোন দেহহীন মূর্ত্তি তাঁহাকে নিকটে আসিবার নিমিত্ত সঙ্কেত করিতে লাগিল; তাঁহার শূন্য হস্তে যেন তীক্ষ্ণধার অসি দিয়া গেল, কতক গুলি বীভৎস দেহহীন আকৃতি যেন তাঁহার চারি পার্শ্বে ঘুরিতে ঘুরিতে খল্ খল্ হাসিতে লাগিল এবং কোন উজ্জ্বল মূর্ত্তি যেন দূরে দাঁড়াইয়া বার বার বিনোদিনী ও হরগোবিন্দের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র যখন এইরূপ উন্মাদ, সেই সময়ে একটী লোক ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া ডাকিল,—

"যোগেন্দ্র!"

উত্তর নাই। আগন্তুক পুনরায় ডাকিল,—

যোগেন্দ্র!"

যোগেন্দ্রের জাগ্রত স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি সম্বোধনকারীর প্রতি চাহিলেন—দেখিলেন, হরগোবিন্দ বাবু। যোগেন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া হরগোবিন্দ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। যোগেন্দ্র নিরুত্তর। হরগোবিন্দ বাবু বলিলেন,—

"এ কি যোগেন্দ্র? তোমার এমন অবস্থা কেন?"

তখন যোগেন্দ্র উন্মাদের ন্যায় ক্ষণেক হরগোবিন্দের বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা উচ্চস্বরে বলিলেন,—

"যাও, আমার নিকট হইতে সরিয়া যাও, মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও, কুলটা বিনোদিনীকে প্রস্তুত হইতে বল।"

হরগোবিন্দ শিহরিলেন। দন্তে রসনা কাটিয়া বলিলেন,—

"ছিঃ! ছিঃ! যোগেন্দ্র! তুমি পাগল হইলে? তোমার মুখে এ কি কথা? বিনোদিনী—ছিঃ!"

তখন যোগেন্দ্র বজ্র-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—

"সরিয়া যাও—মৃত্যু সম্মুখে—দূর হও।"

হরগোবিন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। ভাবিলেন, এ কি? যোগেন্দ্র তো উন্মাদ! এখন বোধ হইতেছে, বিনোদিনীর চরিত্র সম্বন্ধে যোগেন্দ্রের সন্দেহ জন্মিয়াছে। কিন্তু আমার উপর ক্রোধ কেন? এখন তো অধিক কথারও সময় নহে। বলিলেন,—

"আমি তোমাকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা যদি তুমি না শুন, অন্ততঃ এই চিঠি গুলা পড়িও।"

কমলিনী বিনোদিনীকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রের তাড়াটা মাষ্টার মহাশয় যোগেন্দ্রের হস্তে দিলেন। যোগেন্দ্র পত্র লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হরগোবিন্দ বাবু বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে বাদানুবাদ করিতে গেলে অশুভ ভিন্ন শুভ ঘটিবে না। ইনি তো উন্মাদ। এ কথা এখনও বাটীর কেহ জানিতে পারে নাই, জানিলে কেহ না কেহ সঙ্গে থাকিত এবং আমিও সংবাদ পাইতাম। আমিও এখন এ কথা কাহাকে জানাইব না। জানাইলে কেবল গোল বৃদ্ধি। ইঁহাকে ছাড়িয়া যাওয়াও ভাল নয়, আবার আমি সম্মুখে থাকাও ভাল নয়। এইরূপ ভাবিয়া মাষ্টার মহাশয়, যোগেন্দ্রনাথের

পার্শ্ব দিয়া, চলিয়া গেলেন। যোগেন্দ্র তাঁহার প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন না।

যোগেন্দ্রনাথের পশ্চাতে একটি প্রাচীর ছিল ; হরগোবিন্দ বাবু সেই প্রাচীরের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেই প্রাচীরে একটি গবাক্ষ ছিল, সেই পথ দিয়া যোগেন্দ্রের ভাব দেখিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে যোগেন্দ্রনাথ পশ্চাতে চাহিলেন। দেখিলেন, পথ জনশূন্য। তখন যোগেন্দ্র মস্তকে হাত দিয়া বহুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইলেন। যেখানে চিঠি গুলা পড়িয়া ছিল, তাহার পাশ দিয়া যোগেন্দ্র দশ বার যাতায়াত করিলেন। ভাবিলেন, "এগুলা কি দেখিলাম না কেন? ইহার মধ্যে বিনোদিনীর কথা নাও থাকিতে পারে—হয় ত আমি ইহা দেখিলে কাহারও কোন উপকার হইতে পারে। আরও দোষ, হয় ত না দেখিলে কাহারও অনিষ্ট হইতে পারে।" ধীরে ধীরে যোগেন্দ্র চিঠি সকল হাতে করিয়া পড়ি কি না পড়ি ভাবিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হস্ত যেন মনের অজ্ঞাতসারে চিঠি গুলা খুলিয়া ফেলিল। তখন যোগেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে সেই চিঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। "যোগেন্দ্র" এই কথাটি তাঁহার নেত্রে পড়িল। দেখিলেন, চিঠি সকল কমলিনীর হস্তলিখিত। চিঠি না পড়িয়া থাকা অসম্ভব হইল। একখানি চিঠি পড়িতে লাগিলেন,—

"বিনোদিনী—

আমি কলিকাতায় আসিয়াই যোগেন্দ্রের সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে বাসায় দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার বাসার এক জন ঝির সহিত অনেক কথা বার্ত্তা হইল। তিনি যে এবার কেন তোমায় একখানিও পত্র লেখেন নাই, তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। যাহা যাহা শুনিলাম, তাহাতে যোগেন্দ্রের চরিত্র

মন্দ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। তুমি যোগেন্দ্রের জন্য যেরূপ ভাবিতা, তোমার প্রতি যেন যোগেন্দ্রের আর তেমন মায়া নাই। তুমি এজন্য চিন্তা করিও না। তুমি কাতর হইবে ভাবিয়া আমি তোমাকে এ সংবাদ জানাইব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম যে, হয়ত তোমার দ্বারা ইহার কোন প্রতিবিধান হইতে পারে। যাহা হউক, ভয় নাই। আমি শীঘ্রই যোগেন্দ্রকে বাটী লইয়া যাইবার উপায় করিতেছি। * * * * * * ইতি।

কমলিনী।৮-

যোগেন্দ্রনাথের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, চিঠি সকল তাঁহার হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। তিনি সেই স্থানে হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন। আকাশের প্রতি চাহিয়া করজোড়ে কহিলেন,—

"দয়াময়! তোমার সৃজিত অপরিসীম জগন্মধ্যে আমি একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণা মাত্র। বিধাতঃ, তুমিই জান, আমার শান্তি বিধ্বংসিত করিতে কতই কাণ্ড হইতেছে। বল জগদীশ! আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কি উপায়ে চিত্তকে স্থির রাখিয়া এই ভীষণ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাইব? কৃপাময়, আমাকে বল দেও, বুদ্ধি দেও, আমাকে এই ব্যাপারের রহস্যোদ্ভেদ করিতে ক্ষমতা দেও।„

আবার যোগেন্দ্র স্থির হইয়া আর এক খানি পত্র খুলিলেন এবং পড়িলেন।

"প্রিয় ভগ্নি,

তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যোগেন্দ নাথের স্বভাব মন্দ হইয়াছে। তিনি একটি কলঙ্কিনী কামিনীর কুহকে পড়িয়া সকল ভুলিয়াছেন। পড়া শুনা নাম মাত্র, কালেজে প্রায় যান না। বাসা কেবল লোক জানাইবার জন্য, সেখানে প্রায় থাকেন না। শুনিলাম, তাঁহার সেই নূতন রাণী কুৎসিতার একশেষ। তুমি এজন্য চিন্তা করিও না, কত

লোক এমন হয়, আবার বেশ ভাল হইয়া যায়। যোগেন্দ্রকে বাটী লইয়া যাওয়ার কি হয়, তাহা তোমায় পরে লিখিব। ***** ইতি।

কমলিনী।"

তখন যোগেন্দ্র উন্মাদের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—

"কে জানিত? কে জানিত, পরের সর্ব্বনাশ সাধিতে মানব এতই করিতে পারে? কমলিনী—কলঙ্কিনী—সর্ব্বনাশিনী। কমলিনি, তোমার এই কাজ? ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তুমি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ? দুইজন—দুইজন কেন—তিন জন নিরপরাধী ব্যক্তির শান্তি, সুখ, আশা, জীবন সমস্তই ধ্বংস করিয়াছ। ভগবান্! তোমার সৃষ্টির মর্ম্ম কে বুঝে? কমলিনীর ন্যায় সর্পীর সৃষ্টি করিয়া কি লাভ জগদীশ?"

যোগেন্দ্রনাথ আবার ভাবিলেন, হরগোবিন্দ—হরগোবিন্দের ব্যাপার টা কি? তাহাকে যে কল্য রাত্রে নির্জ্জন বিনোদিনীর সহিত আলাপ করিতে স্বচক্ষে দেখিলাম, তাহার মীমাংসা কই? যে আমাকে এই ব্যাপার বুঝাইয়া দিতে পারিবে, তাহার নিকট আমার জীবনের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে স্বীকার।

আবার আর একখানি পত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—

"বিনোদ,

কল্য বৈকালে যোগীনের সহিত সাক্ষাত হইয়াছিল, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়—দেখিলাম তিনি মদ খাইতে শিখিয়াছেন।"

যোগেন্দ্র বলিলেন—

"কি ভয়ানক! আমি মদ্যপ?"

আবার পড়িতে লাগিলেন—

"আমার সহিত যখন দেখা হইল, তখন তাঁহার নেশা ছিল। তোমার পত্রের কথা মাগী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমিও জিজ্ঞাসা করি-

লাম। তিনি তোমার সমস্ত পত্রই পাইয়াছেন; বলিলেন উত্তর দিতে সময় হয় নাই।”

আবার যোগেন্দ্র বলিলেন—

“ধন্য তোমার উদ্ভাবিনী শক্তি! ধন্য তোমার কৌশল! বিনোদ তবে আমাকে পত্র লিখিয়াছিল; কিন্তু আমি তাহা পাই নাই কেন? সেও কমলিনী ও মাধীর কৌশল।”

আবার পড়িতে লাগিল,—

“বাটী যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, তাঁহার বাটী যাইতে মন নাই। তোমার চিন্তা নাই, আমি তাঁহাকে না লইয়া বাটী যাইব না। * * * * * * ইতি।

কমলিনী।

তখন যোগেন্দ্র বুঝিলেন, বিনোদিনী তাঁহাকে নিয়ম মত পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা পান নাই; তিনিও বিনোদিনীকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, বিনোদনীও তাহা পান নাই। কমলিনী ও মাধীই তাহার কারণ। সুতরাং কমলিনী ও মাধী যাহা বলিয়াছে, সে সমস্তই অলীক অথবা অবিশ্বাস্য। তখন আহ্লাদ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তি সমস্ত মিলিয়া যোগেন্দ্র নাথের হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা উত্থাপিত করিল। তিনি পত্র সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার বদনের সে তীব্র ভাব অনেক কমিয়া গেল। হরগোবিন্দ বাবু এই সকল ব্যাপার অন্তরাল হইতে দেখিলেন। তিনি ধীরে ধীরে আবার যোগেন্দ্র নাথের সমীপে আসিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ব্যস্ততা সহ তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং বালকের ন্যায় সরল ভাবে বলিলেন।

“মাষ্টার মহাশয়, আপনি শিক্ষক, আপনি প্রধান সুহৃদ, আপনি প্রবীণ, আপনি আমার পিতৃস্থানীয়। আমি জানি না।

আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র হইয়াছে। আপনি আমায় পরামর্শ দিন। আমার সাধ্য নাই যে, আমি এই ব্যাপারের মর্ম্মভেদ করিতে পারি। আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিউন। আমায় রক্ষা করুন।

হরগোবিন্দ বাবু যোগেন্দ্র নাথের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন।

"কি হইয়াছে ? ।"

তখন যোগেন্দ্র নাথ তাঁহাকে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। কলিকাতা গমন—বিনোদিনীর সংবাদ অভাবে দারুণ উদ্বেগ—পীড়া—কমলিনী ও মাধীর আগমন——হরগোবিন্দ ও বিনোদিনীকে রাত্রি কালে একত্র দর্শন—বিনোদিনীকে পদাঘাত—কমলিনীর প্রেমের কথা—অদ্য এই সমস্ত পত্র পাঠ, সমস্ত ব্যাপার যোগেন্দ্র বিনা সঙ্কোচে মাষ্টার মহাশয়ের গোচর করিলেন। সমস্ত শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,

"যোগেন্দ্র তুমি নির্ব্বোধ নহ। এখন আর কি বুঝিতে বাকি থাকিতে পারে ? মাধী চিরকাল বিনোদিনীর পত্র ডাকে দিয়া থাকে এবং ডাক ঘর হইতে আনিয়া বিনোদিনীর নিকট দেয়। মাধী ও কমলিনী একযোগ, তাহা বুঝিতে পারিতেছ। সুতরাং তোমার পত্র কেন বিনোদ পায় নাই এবং বিনোদিনীর পত্র কেন তুমি পাও নাই, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কমলিনীর জঘন্য কদর্য্য স্পৃহাই সমস্ত অনিষ্টের মূল বলিয়া বুঝা যাইতেছে। তোমার চক্ষে বিনোদকে বিষ করিয়া না তুলিলে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া সেই মাধীর সহিত চক্রান্ত করিয়া বিনোদের সম্বন্ধে নানাবিধ ঘৃণিত সংবাদ রচনা করিয়াছে। বুঝিতেছ না যে, সে সমস্তই অলীক কথা। বিনোদ যখন তোমার সংবাদ না পাইয়া অধীরা, সেই সময় কমল তাহাকে কলিকাতা হইতে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তোমার চরিত্র মন্দ হইয়াছে।

তুমি বুঝিতেছ, এ সংবাদে বিনোদিনীর কি যন্ত্রণা জন্মিল। এই সংবাদ ক্রমাগত নানারূপে আসিতে লাগিল। সে সকল লিখিবার এমনই ভঙ্গী যে, তাহা আর না বিশ্বাস করিয়া চলে না। তখন সেই ক্ষুদ্র বালিকা অনন্যোপায় হইয়া আমাকে সমস্ত জানাইল এবং আমার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ সকল বিনোদিনীই আমাকে দিয়াছে। আমি কোন ক্রমেই পত্র সকলের সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যোগেন্দ্র, আমিতো তোমার ন্যায় বালক নহি—সে, দুইটা প্রমাণ উপস্থিত করিয়া একটা কথা বলিলেই, সম্ভব, অসম্ভব বিবেচনা না করিয়াই একেবারেই তাহা বিশ্বাস করিব।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"আপনি আমায় তিরস্কার করিতে পারেন, কিন্তু যেরূপে কমলিনী ও মামী আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস না করা অসম্ভব।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,

"তাহার পর আমি বিনোদিনীকে অনেক আশ্বাস দিলাম। বলিলাম, শীঘ্রই তাহাকে প্রকৃত সংবাদ আনিয়া দিব। সে আজি পোনের দিন হইল। বিনোদিনী কেবল আমার কথার ভরসাতেই বাঁচিয়া আছে, নচেৎ তুমি তাহাকে এত দিন দেখিতেও পাইতে না। তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, সে কেবল কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছে।

তখন যোগেন্দ্রের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় বলিতে লাগিলেন।—

"তাহার পর কল্য তুমি বাটী আসিয়াছ, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাত কর নাই। ভাবিয়া দেখ যোগেন্দ্র, তাহাতে তাহার কি কষ্ট হইয়াছে। সে যখন দেখিল, রাত্রি দশটা বাজিল তথাপি তুমি তাহার নিকটে আসিলে না, তখন সে আমায় ডাকিয়া পাঠাইল। তাহার সে মুর্ত্তি, তাহার সে রোদন পাষাণকেও দ্রব করিতে পারে।"

বলিতে বলিতে মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। যোগেন্দ্রের নেত্র দিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। হরগোবিন্দ বাবু বলিতে লাগিলেন,—

"আমি তাহাকে অনেক ভরসা দিলাম। আজি প্রাতে তাহাকে সুসংবাদ দিব বলিয়া তাহার নিটক কথা দিয়া আসিয়াছি। সুসংবাদ আর কি দিব ? চল, যোগেন্দ্র, তোমাকেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই।"

তখন যোগেন্দ্র মাষ্টার মহাশয়ের চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ হইতে পারে না। আপনি আমার বিনোদকে এত দিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন—নচেৎ বিনোদ এই কষ্ট সহিয়া কখনই এত দিন বাঁচিত না—।"

মাষ্টার মহাশয় যোগেন্দ্রের হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং বলিলেন,—

"তোমারই বা দোষ কি ? তোমাকে যেমন যেমন ভাবে যে যে কথা বলিয়াছে, তাহাতে কাজেই তোমার মনে সকল সন্দেহ হয়। যাহা হউক, এখন আইস।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"চলুন। আমার মনে কিন্তু বড়ই আশঙ্কা হইতেছে। কল্য যে আমি বিনোদের সহিত যার পর নাই দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে হতাশ ও অভিমানিনী বিনোদিনী নিশ্চয়ই অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। কি জানি অদৃষ্টে কি আছে।"

উভয়ে দ্রুত চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"মাষ্টার মহাশয় ! আমি অদ্যকার এই শুভদিন চির স্মরণীয় করিবার জন্য পাঁচটী জলহীন স্থানে পাঁচটী সরোবর খনন করাইব—তাহার

নাম রাখিব বিনোদবাপী; কলিকাতার মধ্যে সাধারণের ব্যবহারার্থ—এক রম্য কানন সংস্থাপন করিব—তাহার নাম রাখিব আনন্দ কানন; এবং বর্ষে বর্ষে এই দিনে এই প্রদেশের দীনহীন দম্পতী সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া নানা উপচারে আহার করাইব এবং সমস্ত দিন তাহাদিগকে আনন্দে নিমগ্ন রাখিব। এই মহোৎসবের নাম রাখিব মিলনমহোৎসব।

মাষ্টার মহাশয় মনে মনে বলিলেন,—

"এমন যোগেন্দ্রও কি কখন মন্দ হইতে পারে?"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিষ, না অমৃত।

"———, her rash hand in evil hour
Forth reaching to the Fruit, she plucked,
she eat;"

Milton:—Paradise Lost.

সেই প্রত্যূষে অন্তঃপুরের একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে আর এক প্রকার কার্য্য চলিতেছিল। বিনোদিনী সেই প্রত্যূষে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে বসিয়া এক খানি পত্র লিখিতেছিলেন। এমন সময়, তথায় মাধী আসিল। তাহাকে দেখিয়া বিনোদিনী পত্র লেখা বন্ধ করিলেন। ভাবিলেন, ভালই হইল, মাধীর দ্বারাই কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। জিজ্ঞাসিলেন,—

"মাধী যে এত ভোরে?"

মাধী বলিল,—

"ভোরে না আসিলে সব কাজ হয় কই? তুমি কি ঘুমাও নাই? ও কি, তোমার চোখ অত লাল কেন?"

বিনোদিনী বলিলেন।—

"সুখ কি আছে ?"

তখন মাধী বলিল,—

"এখন দেখিলে দিদি, আমিতো আগেই বলেছিলাম যে, জামাই বাবু এবার আর এক বিনোদিনী জুটাইয়াছেন। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে মিষ্ট লাগে।"

বিনোদিনী একটু বিষণ্ণ হাসির হাসিতে বলিলেন,—

"তা বেশ তো!"

কিন্তু তুমি যাই বলো দিদি, স্বামীর সোহাগ ছাড়া হওয়ার চেয়ে মেয়ে মানুষের আর অধিক দুঃখ কিছুই নাই। তোমাকে দিয়েই তার স্বাক্ষী দেখা যাচ্চে। যারা সারা দিন দেখছে,তারা ছাড়া আর কার সাধ্য এখন তোমাকে চিনতে পারে। ও সোজা কথা কিনা ? বলো কি ? আহা! এই দুঃখেই যার চাটুয্যেদের মেজো বউটা বিষ খেয়ে মলো। আহা! সোণার প্রতিমা। বয়স কি ? এই তোমার বয়স। কেন তুমিত তাকে দেখেছ ?

"হ্যাঁ শুনেছি বটে—বিষ খেয়ে মলো! অ্যাঁ ?

"হ্যাঁ—কাকেও বলা নেই, কহা নেই—বিষ এনে খেয়ে বসে আছে। তার পর যখন পড়ে গেলো, তখন সব লোকে জানিতে পারিল। আর তখন কি হাত ? তা, সে বলে কেন, কত জন এমনি করে আত্ম-হত্যা করেছে।"

বিনোদিনী ভাবিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুকুল কথাটাই উঠিয়াছে। আত্ম অভিসন্ধি গোপন করিয়া বলিলেন,—

"তাদের কিন্তু ধন্য সাহস। স্বামী না হয় মন্দই হলো, তা মরে কি হবে ?"

মাধী মনে মনে বলিল,—'তা বটেইতো ? তুমিতো দুধের মেয়ে, তুমি এত চালাক! মাধী মনে মনে জানিত যে স্বামিপ্রেমের

মহিমা যদি কেহ বুঝে, সে বিনোদিনী। তদভাবে বিনোদিনী যে এক দিনও বাঁচিতে পারেন না, তাহাও সে বুঝত। প্রকাশ্যে বলিল,—

"কে জানে ভাই!" বিনোদিনী বিস্মিতের ন্যায় বলিলেন—

"আচ্ছা তারা এ সব বিষটিষ পায় কোথা? সর্ব্বনাশ!"

মাধী মনে ভাবিল, আর কতক্ষণ চাতুরী! বিষ মাধী দিতে পারে। প্রকাশ্যে বলিল,—

"তা আমি কেমন করিয়া বলিব? শুনেছি চাঁড়াল বাড়ী পয়সা দিলে পাওয়া যায়।"

"চাঁড়ালদের তো ভারি অন্যায়। বিষ বেচা নিষেধ। থানার লোক জানিতে পারিলে তাহাদের খুব সাজা দিয়া দেয়।"

মাধী হাসিয়া বলিল,—

"তাদের কি ভয় নাই দিদি? লোক জানিতে না পারে এমনি সাবধান হয়ে তারা কাজ করে।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"যার হাত দিয়া লোকে বিষ আনায়, সে ক্রমে গল্প করে এ কথা প্রকাশ করে দিতে পারে।"

"যারা বিষ আনায়, তারা তেমনি লোকের হাতেই আনায়।"

"আমাদের যেমন মাধী।"

মাধী বলিল,—

"আমি তেমনি বিশ্বাসী বটি, কিন্তু ও রকম কাজে যেন আমার কখন থাকিতে না হয়।"

"কিন্তু মাধী আমার একটু বিষ রাখিতে ইচ্ছা আছে।"

"ছিঃ! ওকি রাখতে আছে? না।"

"রাখিলে একটু উপকার হতে পারে। এক দিন না এক দিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিবেনই করিবেন। আমি তাঁহাকে সেই

দিব দেখাইয়া বলিব যে, তুমি যদি আর এমন করিয়া আমাকে জ্বালাও তাহা হইলে আমি বিষ খাইয়া মরিব। তিনি হাজার মন্দ হউন, আমি জানি, তিনি বড় ভীত লোক। মনে ইচ্ছা থাকিলেও তিনি এই ভয়ে মন্দ স্বভাব ছেড়ে দিবেন।,,

মাধী খানিকটা ভাবিয়া বলিল,

"পরামর্শ করেছ ভাল। কিন্তু ও জিনিষ রাখতে নাই। কি জানি, মন না মতি।"

"তুই কি পাগল? আমি তেমন লোক নই। মাধী, তুই মনে করিলে আমায় একটু বিষ এনে দিতে পারিবি।

"না ভাই, সে আমার কর্ম্ম নয়।,,

"তোর কোন ভয় নাই। আমি তোকে দশ খানা সোণার গহনা দিব। এমন সুযোগ কি ছাড়িতে আছে?,,

"তা বটে। কিন্তু আমি গরিব মানুষ।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"মাধী ওজর করিস না। এমন সদুপায় আর কিছুই নাই। একটু বিষ আমার হস্তগত হলে আমার সকল দুঃখই দূর হয়। এমন কাজে ওজর করা মাধী তোর কি উচিত?

,,তোমার জন্য দিদি আমি সব করিতে পারি। তুমি যেরূপ বলছো, তাতে জলে ডুবতে বলিলেও আমাকে ডুবতে হয়। তা—আমি নাকি,—

বিনোদিনী বাধা দিয়া বলিলেন,,—

"তুই যা—তুই—যা—।"

এই বলিয়া বিনোদিনী মাধীর হস্তে একটি টাকা গুঁজিয়া দিলেন। মাধী "তা—দেখি—তা" বলিয়া চলিয়া গেল। তখন বিনোদিনী সজলনয়নে করজোড় করিয়া কহিলেন।—

"হে করুণাময়! মাধী যেন নিষ্ফল হইয়া না আইসে। এ জগতে—মন্দ-ভাগিনীর সমস্ত শান্তি বিষেই আছে। দয়াময়! সে শান্তিতে যেন বঞ্চিত না—।"

বিষ আনিতে মাধীর চাঁড়াল বাটীতেও যাইতে হয় নাই, কোন চেষ্টাও করিতে হয় নাই—। সে এ দিক ওদিক খানিকটা ঘুরিয়া আধ ঘণ্টা খানিক পরে আসিল। তাহাকে দেখিয়া বিনোদিনী সমুৎসাহে তাহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"কই মাধী কই ?"

তখন মাধী চারি দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কাপড়ের মধ্যে হইতে একটা কলার পাতে মণ্ডিত মৃৎপাত্র বিনোদিনীর হস্তে দিয়া বলিল,—

"কত কষ্টে যে এনেছি, তা আর কি বল্‌বো ? তোমার জন্য বলেই এত করিছি। তা না হলে কি এমন কাজ করি ? কিন্তু দেখো দিদি—সাবধান যেন আমায় মজিও না।" বিনোদিনী অতুল সম্পত্তি ভাবিয়া সেই পাত্র হস্তে লইলেন এবং বলিলেন,

"ভয় কি ? তুই কি পাগল ?"

তাহার পর বাক্স খুলিয়া তাহার মধ্যে অতি যত্নে সেই বিষপাত্র স্থাপিত করিলেন এবং সাবধানতা সহ বাক্সের চাবি বন্ধ করিয়া যত্নে সেই চাবি বস্ত্রাগ্রে বাঁধিলেন।

তখন মাধী বলিল,—

"ও কাকেও কি দেয় ? যে কষ্ট করে এনেছি তা আর কি বল্‌বো ?"

বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"মাধী যত্ন করিলেই রত্ন মিলে।"

এই বলিয়া বিনোদিনী আপনার অলঙ্কারের বাক্স আনিলেন এবং তাহার চাবী খুলিয়া বলিলেন,—

"মাধী কি লইবি ?"

মাধী সেই সমস্ত উজ্জ্বল অলঙ্কারের শোভা দেখিয়া লোভে অস্থির হইল। বলিল,—

"কি লইব ?"

যাহা ইচ্ছা।"

এই বলিয়া বিনোদিনী মাধীর সম্মুখে সেই বাক্স খুলিয়া ধরিয়া রহিলেন। তখন মাধীর ইচ্ছা যে সে বাক্সটা সমেত সব লয়, কিন্তু লইয়া যায় কেমন করিয়া ? ছোট দিদি এক বাক্স গহনা দিয়াছেন বলিলে কেহ তো বিশ্বাস করিবে না। অতএব যাহা লুকাইয়া চলে, তাহাই লওয়া ভাল ভাবিয়া মাধী বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি অলঙ্কার লইল। এক এক বার বিনোদিনীর মুখের প্রতি চাহিতে লাগিল। ভাবিল তিনি বুঝি বিরক্ত হইতেছেন। বিনোদিনী বলিলেন,—

"আরও লও না।"

মাধী বলিল,

"না দিদি। আমি গরিব মানুষ, আমার আর কেন ?"

তখন মাধী প্রায় দেড় সহস্র টাকার অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়াছে। কিন্তু লোভ এখনও সম্পূর্ণ প্রবল, লওয়াও অসম্ভব। দীর্ঘ নিশ্বাস সহ বলিল,

"আর না, আমার কোন পুরুষে এত সোণা দেখে নাই।"

মাধী হাত তুলিল। বাক্সটার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিল। এক পদ পিছাইয়া গেল। চারি দিকে একবার সভয়ে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল,

"তবে এখন আসি দিদি ? বিষটুকু সাবধানে রেখো। খুব সাবধান।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"তা আর বল্‌তে ? খুব যত্নে রাখিব।"

মাধী চলিয়া গেল। সে জানিত, তাহার বিষ কি কাজে লাগিবে। সে যাহা ভাবিয়া প্রভাতে বিনোদিনীর ঘরে আসিয়াছিল, তাহাতে তাহার জয় হইল। যত দূর তাহাকে দেখা যায়, তত দূর তাহাকে বিনোদিনী নয়ন দ্বারা অনুসরণ করিলেন। সে অদৃশ্য হইলে বলিলেন,—

"মাধী যে উপকার করিল, অলঙ্কারে তাহার কি প্রতিশোধ হয় ?"

তখন বিনোদিনী বাক্স খুলিয়া সেই বিষপাত্র বাহির করিলেন, ভূতলে জানু পাতিয়া বসিলেন এবং বিষপাত্র-হস্তে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—

"জগদীশ! এ ক্ষুদ্র প্রদীপ আমি স্বেচ্ছায় নিবাইতেছি—ইহাতে কাহারও দোষ নাই। দয়াময়! তোমার দয়ার সীমা নাই। তুমি মানব-জীবন যেমন অনন্ত যাতনায় ডুবাইয়াছ—তেমনি যখন ইচ্ছা তখনই তাহার শেষ করিবার উপায় মনুষ্যের হস্তেই দিয়াছ। তবে কেন মানব যন্ত্রণার সময় এই সর্ব্বসন্তাপনাশক মহৌষধি সেবন করিবে না ? যোগেন্দ্র! দুঃখিনীর হৃদয়-রত্ন! তুমি কি ভাবিয়াছ, আমি তোমাতে বঞ্চিত হইয়াও জীবন ধারণ করিতে পারি ? চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া যাউক, পৃথিবী কক্ষভ্রষ্ট হউক, মহাসমুদ্র আসিয়া জনস্থান অধিকার করুক, তথাপি হয়ত এ প্রাণ থাকিবে। কিন্তু তোমার অদর্শনেও কি বিনোদিনী বাঁচিয়া থাকিবে ? কি দায় ? কেন ?"

তখন সেই কুন্দকুসুমাঙ্গী নবীনা বালা অমৃতের ন্যায় সমাদরে সেই পাত্রস্থ বিষ গলাধঃ করিলেন!!! সমস্ত পান করিয়া ভাবিলেন,—"কতটুকু বিষ খাইলে মানুষ মরে, তাহাতো জানি না—।"

তখন আবার গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া করজোড়ে কহিলেন,—"কৃপাময় জগদীশ, এই কর, যেন অভাগিনীর উদরে গিয়া বিষেরও বিষত্ব না যায়।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"Deservedly thoū griev' st, compos 'd of lies
From the beginning, and in lies wilt end,"
MILTON:—PARADISE REGAINED.

যখন হরগোবিন্দ বাবু ও যোগেন্দ্রনাথ খিড়কী দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন সেই দ্বার দিয়া মাধী বাহিরে আসিতেছিল। এ জগতে পাপের ভার বৃদ্ধি করিতেই মাধীর ন্যায় জীবের জন্ম। যদিও পাপ মাত্রই তাহার অভ্যস্ত বিদ্যা, তথাপি সে এখনই যে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহা পাপের পরাকাষ্ঠা। পাপে পাপে যদিও তাহার হৃদয় পাষাণবৎ হইয়া গিয়াছে, তথাপি যে পরের সুখ ও ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত স্বহস্তে জানিয়া শুনিয়া অপর এক জনের জন্য বিষ আনিয়া দিতে পারে, সে না পারে কি? মাধী এখনই বিনোদিনীর নিমিত্ত বিষ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত অলঙ্কারগুলি সাবধানে ঢাকিয়া লইয়া বাটী যাইতেছে! সেই জন্যই তাহার মনটা একটু আশঙ্কিত হইয়াছে। তাহার গতি সেই জন্যই অনিয়মিত, বদন সেই জন্যই বিমর্ষ, দৃষ্টি সেই জন্যই সঙ্কুচিত, সর্ব্বাবয়বের সেই জন্যই ভীত ভাব। তাহাকে দর্শনমাত্র যোগেন্দ্রনাথের ক্রোধ নবীনভাবে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"মাধী তোর মৃত্যু নিকট।"

মাধী চমকিয়া উঠিল। কোন উত্তর করিল না। যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তুই জানিস্‌, তুই কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্‌।"

মাধী ভাবিল, কি সর্ব্বনাশ! তবেতো সব জানিয়াছে! সাহসে ভর করিয়া বলিল,—

"আমি কি করিয়াছি?"

যোগেন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—

"আমি কি করিয়াছি? মিথ্যাবাদিনী, সর্ব্বনাশিনী, তুমি কি করিয়াছ? তুমি কি করিয়াছ, তাহা তোমায় দেখাইতেছি। তুমি স্ত্রীলোক বলিয়া তোমায় ক্ষমা করিব না।"

মাধী ভয়ে অবসন্ন হইল। বুঝিল সমস্তইতো জানিয়াছে। যখন জানিয়াছে, তখন সবই করিতে পারে। চাপ্‌টা একটু পাৎলাইয়া দিবার আশায় বলিল,—

"আমার কি দোষ? আমি কি জানি?"

তখন যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তোর মিথ্যা কথার আদি নাই, অন্ত নাই। তুই কিছুই জানিস্‌ না? বিনোদ আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সে সকল আমি পাই নাই কেন তুই জানিস্‌ না? আমি যে সকল পত্র লিখিয়াছি, তাহা বিনোদ পান নাই কেন তুই জানিস্‌ না? তুই কিছু জানিস্‌ কি না, তাহা যখন তোর হাড় গুঁড়া করিয়া বুঝাইয়া দিব, তখন বুঝিতে পারিবি।"

মাধী প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—

"আমি কি ইচ্ছায় করিয়াছি? বড় দিদি—,"

যোগেন্দ্র আরও ক্রোধের সহিত বলিলেন,—

"আবার মিথ্যা কথা? আবার মিথ্যা কথা? এত দুষ্ট বুদ্ধি তোমার বড় দিদির নাই। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিব তবে ছাড়িব।"

তখন মাধী কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি তখনই জানি, কারও কিছু হবে না, মারা যেতে আমি গরিব মারা যাবো।"

তখন যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তোর মত ভয়ানক লোক এ পৃথিবীতে আর কোথায় নাই। তুই—তুই আমাকে নিজ মুখে বলিয়াছিস্, বিনোদিনী অসতী, আর এই মাষ্টার মহাশয় তাঁহার প্রাণবল্লভ। তোর ঐ মুখ আমি খণ্ড খণ্ড করিব; তোকে কুকুর দিয়া খাওয়াইব। তখন হরগোবিন্দ বাবু বলিলেন,—

"মাধী! জগতে এমন কোন শাস্তি নাই, যাহা তোর উপযুক্ত।"

তখন মাধী দেখিল, তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত বটে; সকল কথা-ইতো উঁহারা জানিয়াছে। এমন কোন উপায় তখন মাধীর মনে আসিল না, যাহাতে তাহার নিষ্কৃতি হয়। তাহার হিতাহিত বুদ্ধির লোপ হইল। বলিল,—

"সকলই সত্য, কিন্তু সকলই বড় দিদির জন্য। তোমরা আমায় ক্ষমা কর—আমার কোন দোষ নাই। বড় দিদি জামাই বাবুর জন্য পাগল, আমি কি করিব?"

এই বলিয়া মাধী কাঁদিতে কাঁদিতে মাষ্টার মহাশয়ের চরণে পড়িল। কাপড়ের মধ্যে যে সকল গহনা ছিল, তাহার কথা মাধীর মনে হইল না। গহনাগুলা বাহির হইয়া পড়িল। যোগেন্দ্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এ সকল অলঙ্কার বিনোদিনীর। ব্যস্ততা সহ জিজ্ঞাসিলেন,—

"এ আবার কি মাধী? এ আবার কি সর্ব্বনাশের কল?"

তখন মাধী বুঝিল; তাহার কপাল একেবারেই পুড়িয়াছে। কারণ সে অলঙ্কারগুলা লুকাইতে পারে নাই। অলঙ্কার আমার হাতে

কেন আসিল, সন্ধান করিলেই জানিবে, ছোট দিদি দিয়াছেন, ছোট দিদি কেন দিলেন, খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবে. আমি উঁহার দিব আনিয়া দিয়াছি, তখন সে মাষ্টার মহাশয়ের পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিল এবং বলিল,—

“আমার পাপের সীমা নাই। আমার কপাল পুড়িয়াছে। তোমরা আমার যা খুসি কর।”

এই সময়ে বাটির মধ্যে একটা তুমুল ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল। সেই গোল শুনিয়া হরগোবিন্দ বাবু ও যোগেন্দ্রনাথ বেগে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাধী অলঙ্কারগুলা সেই স্থানে ফেলিয়াই চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে প্রতিবাসীরা দেখিল মাধীর মৃতদেহ রায়েদের পুষ্করিণীর জলে ভাসিতেছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব মিলন।

“——I with thee have fix't my lot,
Certain to undergo like doom ; if death
Consort with thee, death is to me as life ;
So forcible within my heart I feel
The bond of nature draw me to my own.
My own in thee, for what thou art is mine ;
Our state cannot be sever'd ; we are one,
One flesh ; to lose thee were to lose myself.
MILTON;—PARADISE LOST.

মাষ্টার মহাশয় ও যোগেন্দ্র বাবু বাটির মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন, বিনোদিনীর প্রকোষ্ঠ হইতেই অতি ভীষণ ক্রন্দন উঠিতেছে। মাষ্টার মহাশয় সভয়ে বলিলেন,—

"কি সর্ব্বনাশ!

যোগেন্দ্র বলিলেন;—

"বিনোদ বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়া পলাইতেছেন! নির্ব্বোধ! কোথায় যাইবে?"

তাঁহারা সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় হইয়া বিনোদিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—কি সর্ব্বনাশ! বিনোদিনী ভূশয্যায় শয়ানা। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার মাতা ও পুরনারীগণ আর্ত্তনাদ করিতেছেন। তাঁহারা তথায় প্রবেশ করায় সেই ক্রন্দনধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। বিনোদিনীর মাতা আছড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন,—

"যোগিন্! বাবা! বিনী আমার বিষ খাইয়াছে।"

তখন যোগেন্দ্রের চক্ষে জলবিন্দুও নাই। তাঁহার গাত্র চেতনাহীন মনুষ্যের ন্যায় বিকল। তাঁহার নেত্র স্থির, উজ্জ্বল ও আয়ত। যোগেন্দ্রের নাম বিনোদিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। বিনোদিনী গৃহের চতুর্দ্দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। তখন যোগেন্দ্রনাথ যন্ত্রচালিত পুত্তলীর ন্যায় ধীরে ধীরে গিয়া বিনোদিনীর শিয়রে বসিলেন। তখন বিনোদিনীর সেই মুকুলিত নেত্রের সহিত যোগেন্দ্রনাথের সেই স্থির নেত্রের মিলন হইল। তখন বিনোদিনী হস্ত দ্বয় বিস্তার করিয়া যোগেন্দ্রের পদদ্বয় ধারণ করিলেন। তখন সেই মৃত্যু-পীড়িত বদনে হাস্যের জ্যোতিঃ দেখা দিল!!!

মাষ্টার মহাশয় বিনোদিনীর মাতার হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরে আনিলেন এবং পুরনারীগণকে বাহিরে আসিতে বলিলেন। সকলকেই গোল করিতে বারণ করিলেন।

তখন বিনোদিনী বলিলেন,—

"আমাকে ক্ষমা কর।"

তখন যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—

"পাগলিনি! এ দুর্ম্মতি কেন? আমাকে ফেলিয়া যাইবার যো আছে?"

বিনোদিনী নয়ন মুদিয়া বলিলেন;

"ছিঃ! তোমরা বড় প্রতারক।"

তখন যোগেন্দ্র বলিলেন—

"না; তোমার যোগেন্দ্র প্রতারক নহে।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ সমস্ত ঘটনা অতি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। সমস্ত শুনিয়া বিনোদিনীর চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। যোগেন্দ্র বলিলেন,—

কাঁদিতেছ কেন?"

বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"এক ঘণ্টা আগে কেহ যদি আমাকে এই কথা এমনি করিয়া বলিত, তাহা হইলে আমার এ রক্ত ছুড়িতে হইত না। কিন্তু এখন তো আর বাঁচিবার উপায় নাই।"

"ছাড়িবে কেন বিনোদ? যদি তোমার আর বাঁচিবার উপায় না থাকে, আমার তবে বাঁচিবার উপায় আছে।"

তখন বিনোদ সজলনয়নে যোগেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"ছি! তাহা মনেও করিও না। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে সংসারের অনেক উপকার।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

তাহাতে আমার কি?"

তখন বিনোদিনী বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! আমারতো আর বিলম্ব নাই। আমার যোগীন্দ্র আমারই আছেন জানিয়া মরণ এখন বড় সুখের বটে, কিন্তু আগে যদি আমি ইহা একটুও বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে যোগিন্দ্র! আমি

মরিবার কথা একবার মনেও করিতাম না। জগদীশ্বর,—

সুন্দরী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে আবার কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,

"আমার এখন কথা কহিতে বড় কষ্ট হইতেছে। আমার যোগেন্দ্রের সহিত আমি আর কথা কহিতে পারিব না!—ওঃ! যোগেন্দ্র।"

তখন যোগেন্দ্র নাথ বিনোদিনীর মস্তক আপন উরুর উপর স্থাপন করাইলেন এবং তাঁহার শীতল ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"দুঃখ কি? জীবন কত ক্ষণের? এবার যে জীবনে প্রবেশ করিতেছ, তাহার শেষ নাই। সংসার দেখিলে তো—ইহা পাপের পুরী। এখানে আত্ম নাই, পর নাই। কেবল স্বার্থই লক্ষ্য। এবার যে রাজ্যে যাইব, তথায় হিংসা নাই, শত্রুতা নাই। তবে ভয় কি?"

তখন বিনোদিনী ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—

"পরমেশ্বর; যাহাদের জন্য আমাদের এই বিচ্ছেদ, তাহাদের যেন এজন্য পাপ না স্পর্শে।"

বিনোদিনী চুপ করিলেন। তিনি যোগেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নেত্রে দিয়া জল পড়িয়া যোগেন্দ্রের উরু ভাসাইতে লাগিল। যোগেন্দ্রের চক্ষে এখনও জল নাই। সেই বিনোদিনী, তাঁহার সেই বিনোদিনী তাঁহার ক্রোড়ে পড়িয়া কাঁদিতেছে, মৃত্যু আসিয়া সেই নবীনার নবীন জীবন প্রায় অধিকার করিয়াছে, যোগেন্দ্রনাথ সমস্তই দেখিতেছেন, সমস্তই বুঝিতেছেন, কিন্তু কাঁদিতেছেন না বা কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন না। কিন্তু ওঃ! তাঁহার মূর্ত্তি কি ভয়ানক!!! তাঁহাকে দেখিলে ভয় হয়, বোধ হয় যেন প্রাণহীন দেহ বসিয়া আছে! তাঁহার নেত্র শবের ন্যায় স্থির অথচ নিষ্প্রভ, তাঁহার বদন শবের ন্যায় বিশুষ্ক ও কাতর এবং তাঁহার অঙ্গাদি যেন শবের ন্যায় কঠিন ও অসাড়।

যোগেন্দ্র দেখিতেছিলেন, বিনোদিনীর জীবনলীলার অবসান হইতে আর বিলম্ব নাই। বিনোদিনী এক বার কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভাল করিয়া কথা মুখ দিয়া বাহিরিল না। তখন তিনি স্বীয় শক্তিশূন্য হস্ত ধীরে ধীরে উঠাইলেন। সেই হস্ত যোগেন্দ্রের কণ্ঠে পড়িল। তখন যোগেন্দ্র হস্ত দ্বারা বিনোদিনীকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার বক্ষের উপর পড়িয়া গেলেন। তখন বিনোদিনীর বদনে মৃত্যু-চিহ্ন সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে বদন দিয়া একটী অস্ফুট বাক্য বাহিরিল। সে বাক্য,—

"যো—গি—"

এ জগতে সেই পতিগতপ্রাণা সাধ্বী বিনোদিনী আর কথা কহিতে পাইল না!

মৃতার বক্ষস্থলস্থ ব্যক্তি একবার মাত্র স্বীয় মস্তক আন্দোলন করিয়া একটা কথা বলিতে প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু কথা বাহিরিল না। একটা অপরিস্ফুট ধ্বনি মাত্র বুঝা গেল।

এ জগতে আর সেই নিষ্কলঙ্ক দেহে সংজ্ঞা আসিল না!

অচিরে হরগোবিন্দ বাবু সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখি-লেন—কি? দেখিলেন—সেই দুই প্রেমময় পক্ষী পলাইয়া গিয়াছে! তাহাদের সেই নবীন দেহপিঞ্জর মাত্র ধরণীতে পড়িয়া রহিয়াছে! সংসারের প্রবল ঝটিকায় সেই দুইটী সুকুমার কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া শুকাইয়াছে! তখন হরগোবিন্দ বাবু সেই দুই প্রেমপুত্তলীর সমীপে বসিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে তথায় আলুলায়িত কুন্তলা কমলিনী উন্মাদিনীর ন্যায় বেগে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই কালামুখী আপনার কীর্ত্তি দেখিল। সহসা উচ্চরবে হাস্য করিয়া করতালি দিতে দিতে কহিল,—

"বেশ! বেশ! বেশ!"

তাহার পর? তাহার পর রায়েদের এই সোণার সংসার ছাই হইয়া গেল। ইতি

সমাপ্ত।

ছোট বউর ঝাঁপি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিবাহ।

এস দেখি, দুষ্ট বাণী, চাপ দেখি ঘাড়ে,
একবার চাপ দেখি ঘাড়ে।

আমার অসাড় কলম, তুমি ছাড়া কার বাপেতে নাড়ে
বল, কার বাপেতে নাড়ে!

আ মরি, কি খোস চেহারা, ধবল সকল গায়,
মা, তোর ধবল সকল গায়।

হবে তোমায় আমায় বোঝা পাড়া, আজ কলমের ঘায়,
ওমা, আজ কলমের ঘায়।

যদি তোমার বরে আজ আমি মা, বুলবুলির ঠোঁট পাই?
ঝুঁটো বুলবুলির ঠোঁট পাই;

তবে কাব্যবনে তেলাকুচো, মনের সাধে খাই,
ঠুকরে মনের সাধে খাই।

গান্ধারেতে গাইব আমি, হাল ফ্যাসনের বিয়ে,
ওমা, হাল ফ্যাসনের বিয়ে,

ঘুর্ ঘুরিয়ে নাচাও কলম, মোচেতে বসিয়ে,
পেনের মোচেতে বসিয়ে।

(১)

রামদাস দাস, হ'ল বি, এ, পাস,
ঢিঢি নাম দেশ ময়;

নাচিয়ে নাচিয়ে, ছুটিয়ে ছুটিয়ে,
পবন সৌরভ বয়।

রামের জনক, পুলকে থমক,
কহিছে সবার কাছে ;
রামের মতন, গুণের রতন,
আর কি ধরায় আছে ?
গুণের গরিমা, নাহি দিতে সীমা,
বিদ্যার নাহিক বাকি ;
কি চাকুরি দেবে, তাই ভেবে ভেবে,
সাহেব পাগল নাকি !
বিলাতে কুইন, তারে এক দিন,
শুনিতেছি লয়ে যাবে ;
সর্ব্ব গুণধাম, সরস্বতী রাম,
বুঝি রাজ পাট পাবে।
পাস করা ছেলে, এমন কি মেলে,
কার এ কপাল জোর ;
শেষ হ'লে বি, এ, এইবার বিয়ে,
দেওয়াব চাঁদের মোর।
যার মেয়ে আছে, এস মোর কাছে ;
বলিতেছি খুলে সব,
মিলাইয়া তৌলে নিকুতির তৌলে,
ছেলে জুকে সোণা লব।
রামের বিবাহ, হইবে নির্ব্বাহ,
দেশ জুড়ে পড়ে সাড়া ;
লাখে লাখে লাখে, ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে,
ভাঙ্গিল ঘটক পাড়া।

(২)

গরিবের ছেলে এই বি,এ,রামদাস.
মাসেতে পোনের দিন হ'ত উপবাস।
একখানি ভাঙ্গা ঘর খড় নাহি তায়,
কোনরূপে দিন যেত পরের দয়ায়।
সেই গ্রামে ছিল এক বুনিয়াদি ঘর,
তারানাথ বাবু নাম—স্বভাব সুন্দর।
রামেদের দশা দেখি, দয়া করি মনে,
সতত দিতেন দান গোপনে যতনে।
রামের পড়ার যত খরচ লাগিত,
তারানাথ বাবু তাহা সব জোগাইত।
এ বাবুর সব ভাল শুধু এক দোষ——
সাবেক চলন চা'লে বড়ই আক্রোশ;
ইয়ং বেঙ্গল ঢঙ্গে টল মল মন,
হাঁচিতে কাসিতে তাঁর সাহেবি চলন।
সন্তানের পক্ষে তাঁর একটি দুহিতা,
রূপে গুণে ঠিক যেন জনকের সীতা।
কলকেতায় বাস তাঁর সতত হইত,
রামদাস সেই বাসে থাকিয়া পড়িত;
রামের নিকটে প্রভা দুসন্ধ্যা দুবেলা,
পড়িত শুনিত কভু খেলিত বা খেলা।
ভাবিতেন তারানাথ দেখিয়া তাহায়,
হইতেছে কোর্টসিপ রাম ও প্রভায়;
ভাবিতেন মনে মনে মুখপানে চেয়ে,
রামেরে বেসেছে ভাল প্রভাবতী মেয়ে,

হলে পরে বি.এ. পাস রামদাস করে,
করিব দুহিতা দান পরম আদরে।
তাই রামদাস প্রতি একান্ত যতন,
পড়ার খরচ ছলে দিতেন **দাদন**।

---

(৩)

বি, এ. পাস করি, দীর্ঘ লেজ ধরি,
রামদাস এল ঘরে,
তারানাথ আসি, হাসি হাসি হাসি,
রামেরে সম্ভাষ করে;
হাতে হাত দিয়ে, নাড়িয়ে চাড়িয়ে,
সেকহ্যাণ্ড করি কয়,
কি কব অধিক, রাম হে তোমায়,
ভাল দিলে পরিচয়।
"অল রাইট" রাম, তুমি গুণধাম,
জেনেছি হে ভাল মনে,
এস এস ধর, প্রভাবতী-কর,
সুঁপি আজি শুভক্ষণে।
হেরিয়া তোমায়, "ট্রাবলের" দায়,
পড়েছে "ডটার" মোর;
অন্ন হানি করে কান্না নাহি ঘুচে,
ঘেরেছে বিরহ ঘোর।
টেকা দিয়ে কুলে, বালিকা ইস্কুলে,
মা মোর পড়েছে কত;

জ্যামিতি ভূগোল, নভেল নাটক,
ঠোঁটের আগায় যত।
পড়ে শুনে ছুঁড়ি বিদ্যা ভুড় ভুড়ি,
হইয়া বসেছে দেশে;
জ্যাকেট কামেজে, রাত দিন সাজে,
এলবার্ট কাটি কেশে;
সব ভাল তার, শুধু এক দোষ,
অধিক বুদ্ধিতে দড়;
বসেছিল করি, ধনু ভাঙ্গা পণ,
নাটুকে প্রণয়ে পড়ি।
ভেবেছিনু আমি, বুঝি তার স্বামী,
বিধাতা মিলান নাই;
কিন্তু রাম তোরে, কি আর বলিব,
বালাই লইয়া যাই।
বড় বলে লোকে, প্রকৃত গরিব,
তাহাতে মেয়ের বিয়ে;
ভাবিয়াছ যত, দেওয়া থোওয়া তত,
হবে না আমায় দিয়ে।
মেয়ে ভাল বাসে,— বাস,—সেই আশে,
বিয়ে কর বাপ, তুমি,
পাটের বসন, বার টাকা পণ,
দিব বার কুড়া ভুমি।
শুনি রাম কয়, ছি ছি মহাশয়,
আমারে বল কি ভাবে।
বাবা বেঁচে আছে, যাও তার কাছে,
মিট মাট হয়ে যাবে।

(৪)

আবার তাও বলি ;—

ভারত-সাগরে আমি বিদ্যার জাহাজ হে—

তুলিয়া বাদাম,

একমনে চলে যাই, আশপাশ নাহি চাই,

কখন ফিরিয়া আমি দেখি না কাহায়,

পাছেতে কাতার দিয়ে, কন্যা "জলিবোট" নিয়ে,

কত বেটা বাবু ভেয়ে, পড়িতেছে পায়,

আমি দেখি না কাহায়।

বলেছেন বাবা এই বিবাহের ছলে—হে—

গুছায়ে লইব,

তালুক মুলুক আর ; সোনা রূপা ভারে ভার,

হীরা মতি পান্না চুনি, চুনি চুনি লব,

আমি নবরত্ন ছেলে, উঠিব "একসচেঞ্জ সেলে"

"হাইয়েষ্ট বিডারে" আমি বিকায়ে যাইব,

টাকা বাজায়ে লইব।

কি হবে মেয়ের রূপে, মুটো ভরা টাকা—হে,

পাই যদি আমি,

অন্ধ দন্ত হীন বুড়ি, চিকুর শোনের নুড়ি,

গ্রহণ করিতে পারি, নাহিক বিকার।

আমি হে সুখের মাছি, খাঁদা কানা নাহি বাছি,

টাকার ওজনে করি, রূপের বিচার।

টাকা দুনিয়ার সার।

কিছু উপকার তুমি করেছিলে বটে—হে,
পড়াতে আমায়।
তাই বলে হেন কাজ, খাইয়ে আপন লাজ,
করিতে প্রস্তাব করা উচিত না হয়;
এতো নয় যে সে কর্ম্ম, জানতো বিয়ের মর্ম্ম,
ছিটে ভিটে বেচে কর ফকিরি আশ্রয়।
তবে কন্যা দান হয়।

সস্তায় কোথায় মেলে পাস করা ছেলে—হে—
আমার মতন,
এণ্ট্রান্স পাস যারা, হাজারে বিকায় তারা,
জাচাই কর না কেন কি বাজার দর?
এল, এ, ফেল হলে ছেলে, আড়াই হাজারে মেলে,
বিয়ের বাজারে বি, এ, পরশ পাত্তর,
তার কতই আদর।

বিশেষ একত্র বাস করিয়া জেনেছি—হে
গোড়ার খবর,
তোমার গৃহিণী যিনি, সাবেক ধরণে তিনি,
সভ্যতা কাহাকে বলে কিছুই জানে না।
হেন ঘরে করি বিয়ে, সেকেলে শ্বাশুড়ি নিয়ে,
প্রকৃত বিয়ের মজা হতেই পারে না।
তাই অন্তর সরে না।

ভেবে দেখ "হনিমুন" করিয়া "ওভার"—হে
আসিব যখন,

শ্বশুড়ীর হাতে ধরি, সাদরে পীড়ন করি,
হেসে যবে জিজ্ঞাসিব কুশল তাঁহার,
তিনি অম্নি ভীতা হয়ে, পলাবেন ঘোমটা দিয়ে,
লাভে হতে হবে মোর অপযশ সার,
তাই অমত আমার।

তোমার আলয় হতে বিদায় হইয়ে—হে
যখন যাইব,
শ্বশুড়ীর কাছে গিয়ে, গালখানি পেতে দিয়ে,
বিদায় চুম্বন দেও, বলিব যখন,
হয়তো বাধায়ে গোল, পাড়ায় বাজাবে ঢোল,
আমি বেটা ভেকা হয়ে রহিব তখন,
যেন চোরের মতন।

শুনি তারা নাথ বাবু অবাক হইয়ে,
আকাশ পাতাল ভাবে নাকে হাত দিয়ে।

ধর্ম্ম, নীতি, সভ্যতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা বিগত বারে আদিম মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি—জড় জগতের বিবিধ পদার্থে ঐশী শক্তির আরোপ,—মানসিক কোন্ কোন্ ভাব হইতে সমুত্থিত, তদাভাস প্রদর্শন করিতে যত্ন করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি, আদিম মানবের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির লক্ষ্য পদার্থ, জড় জগতের বিবিধ পদার্থনিচয়;—তপন, পবন, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতিতে দেব

ভাবের আরোপণ, আধিভৌতিকাদি ভয় ও আশা হইতে সমুৎপন্ন বস্তুতঃ আদিম মানবের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে—পুরাকালীয় সভ্যতম জাতিসমূহের ধর্ম্ম গ্রন্থ বিলোড়ন করিলে, এতৎ দৃষ্টান্তরাশি অনায়াসলভ্য। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যের ঋগ্-বেদসংহিতায় এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ অবলক্ষিত হয়। ভারতীয় আর্য্যেরা আধি-ভৌতিক প্রভৃতি ভয় হইতে যে প্রাকৃতিক বিবিধ পদার্থের—তরু, লতা, তপন, পবন, প্রভৃতির—উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, ঋগ্ বেদের অনেক স্তোত্রই তৎপ্রতিপাদনে সমর্থ। ভারতীয় আর্য্যেরা ভয়বিহ্বল হইয়া প্রাকৃতিক ঘটনারাশির কারণ পরম্পরা নির্ণয়ে সমর্থ না হইয়া, তদুপাসনা আরম্ভ করিলেন কেন? এক দিকে যেমন ভয়, অপর দিকে তেমনি জীবিতাশা, সুখের আশা, হৃদয়ে খরতর হইয়া উঠিল। ভাবি-লেন, ইহারা যেমন দুর্দ্দান্ত, তাহাতে ইহাদিগের উপাসনা ব্যতীত সংসারে শান্তির আশা নাই। কোন প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন পদার্থ দেখিলে, তদুপাসনা করা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তাঁহারা আরো ভাবিলেন, এই জগত নিতান্ত নিরাপদ স্থান নহে। এ সংসারে প্রতি পাদবিক্ষেপণে পদ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়—রুধির-ধারায় ধরা-তল প্লাবিত হইয়া পড়ে। সর্ব্বদাই সন্ত্রাসিত হইয়া বিপদ-পাতের প্রতিক্ষায় কালক্ষেপণ করিতে হয়। কি জানি, কখন্ কোন্ প্রাকৃ-তিক শক্তি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইবে। আশা-সাগর প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান প্রাকৃতিক ঘটনা-তুফান-সংস্পর্শে ভীমবেগে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। ইহ জগতের ক্ষণিক সুখসম্পদে হৃদয় শান্ত হইল না। আশা-সাগর মন্থন-কালে রোগশোকদুঃখবিশ্লিষ্ট, শান্তিময়, পবিত্র অমৃত সঞ্চিত জগত কল্পিত হইল। এই কল্পিত অন্যজগত ইহ জগত হইতে সম্পূর্ণ পৃথগীভুত উপাদান পরম্পরায় বিনির্ম্মিত। ইহলোক সুখের আকর নহে, তজ্জন্যই পরলোকের সৃষ্টি। পরলোক

সুখসম্পদে ইহলোক হইতে ধনবান্। প্রথমে পরলোক নিরবচ্ছিন্ন সুখের ভবন বলিয়া কল্পিত. তদনন্তর জ্ঞানোন্নতিতে কর্ম্মায়ত্ত ফল স্বীকৃত। এই কর্ম্মায়ত্ত ফলের কথা হইলে সুতরাং তৎকালে, পরলোক কেবল মাত্র সুখের না হইয়া, কথঞ্চিৎ দুঃখেরও বটে। কারণ পরলোকে আবার নরকও আছে। ভারতীয় আর্য্যেরা যে অন্য জগত কল্পনা করিলেন, তাহা পুণ্য নিকেতন—প্রেমিকের নিকেতন। অন্যজগতের স্নিগ্ধ বিমল শান্তির নিমিত্ত যিনি লোলুপ, তিনি যোগাসনে বসিয়া নিমীলিত-নয়নে অনন্যমনে, তাঁহারই ধ্যান করুন। ভারতীয় আর্য্যেরা বিমল শান্তির আশায় হিমালয়ের শিখরদেশে ধ্যানস্তিমিত রহিলেন। প্রাচীন ভারত যে আধ্যাত্মিকতায় উৎকর্ষ স্থানীয়, তৎকারণও ইহাই বটে। তাঁহারা শান্তির আশায় প্রধাবিত হইয়া কখন ঈষদ্ আলোক দেখিলেন ; কখন বা সমুদয়ই ভয়ানক অন্ধকারময় মনে করিলেন। বস্তুতঃ মন মধ্যে এরূপ ভাবের সঞ্চার হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ইহলোক সুখের নহে ; আশা নিয়ত সুখের জন্যই লালায়িত ; সুতরাং জগদন্তর কেবল সুখের আশায় পরিপূর্ণ। ইহ জগতে থাকিয়া, প্রত্যক্ষতঃ অন্যজগতের কোন সুখ উপলব্ধি করা যায় না। তাঁহারা যে শক্তিকে সম্পূর্ণ সুখের নিদানস্বরূপ মনে করিয়াছিলেন, তাহা অপরিজ্ঞেয়—তাহাকে জানা যায় না। তাঁহারা বলিলেন—

"যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য নবেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম বিজানতাং॥ ১১ ॥"

যাহার ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে জানা যায় না, তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন। আর যাহার এরূপ নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি, তিনি তাঁহাকে জানেন নাই। জ্ঞানী ব্যক্তির বিশ্বাস এই, ব্রহ্ম কখন জ্ঞেয় হয়েন না।

আবার ভাবিলেন, তবে রোগ-দুঃখ-পরিপূর্ণ, আপদ-বিপদ-সংকুল সংসারে শান্তি কোথায়? ইহজগত সুতীক্ষ্ণ কণ্টকে আবৃত,—দারুণ দুঃখজালে বিজড়িত! জীবনে সুখের আশা, পরলোকে দীর্ঘ জীবন ও সুখভোগের লালসা হৃদয় মন্থন করিতে লাগিল, আবার ভাবিলেন;—

"প্রতি বোধ বিদিত; মতম মৃত ত্বংহি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতে মৃতং ॥ ১২ ॥"

"যখন প্রত্যেক বোধের জ্ঞাতা করিয়া ব্রহ্মকে জানা যায়, তখনই তিনি বিদিত হয়েন। এইরূপে তাঁহাকে জানিলে জীব অমৃত হয়। আর যত্নের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সফল হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা জীব অমৃত হয়।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বেদোপনিষদ্—তলব কারো-পনিষদ্ দেখুন। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে, একই ঋগবেদ সংহি-তায় ভারতীয় আর্য্যের বিভিন্ন মানসিক ভাব।

একেশ্বর অপেক্ষা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রাথমিক মানবের পক্ষে অনেকাংশে স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্য্যে বৈষম্য পরিদৃষ্ট করিলে এই ভাব মনে স্বতঃই সমুদিত হয়। পরিদৃশ্যমান বিশাল প্রকৃতি কেবল বৈষম্যজালে বিজড়িত।—বৈষম্যই সংসা-রের বৈচিত্র! অনিল নিরন্তর মৃদুমৃদু প্রবহমান. অকস্মাৎ তরুলতা সমুলোৎপাটনপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা প্রদর্শন করে। এরূপ বৈষম্য স্থূলদৃষ্টিতে অবলোকন করিলে, অনিল দুইটী বিভিন্ন শক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত, অথবা একজন স্বেচ্ছাধীন প্রাকৃতিক সচীব বলিয়া অনুমিত হয়। পৌরাণিক ভারতে জগতকার্য্য তিনটী শক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল।—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,

তিনজন ত্রিবিধ কার্য্যে নিয়োজিত। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, মহেশ্বর সংহারকর্ত্তা! পৌরাণিকের এ কল্পনা নিতান্ত অসম্ভব নহে। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই আবার সংহারক, ইহা অপেক্ষা সংসারের বৈষম্য দেখিয়া, ত্রিবিধ কার্য্যে, তিনজন নিয়োগ, এ বিশ্বাস অনেকাংশে স্বাভাবিক বটে। আমরা আদিমকালে, বহু ঈশ্বরের যে এত প্রাচুর্য্য অবলোকন করিয়া থাকি, তাহার কারণও প্রাকৃতিক বৈষম্যজনিত ফল হইতে সমুৎপন্ন। প্রাকৃতিক বৈষম্যে ও তজ্জাত কারণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা হইতে নিরর্থক কল্পনা ও অযথান্বেষণ অবশ্যম্ভাবী ফল।

প্রাচীন ভারতের একেশ্বরবাদ অথবা আধুনিক ইয়োরোপের প্রচলিত একেশ্বরবাদ জ্ঞানোন্নতির ফল। যেপর্য্যন্ত মানবহৃদয়ে জ্ঞানোন্নতির প্রদীপ্ত অনলশীখা ধুধু করিয়া প্রজ্বলনশীল না হইয়াছে, সেপর্য্যন্ত একেশ্বরবাদ কি, জড়জগৎ হইতে স্বতন্ত্র ঐশী শক্তিই বা কি, তাহা অবধারিত হয় নাই। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আমরা যে আলোচনা করিলাম, তাহাতে এই কথাই প্রমাণীকৃত হয়। পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, ঋক বেদের সম-সাময়িক আর্য্যেরা প্রথমে যে জড়জগতের উপাসনা—তরু, লতা, তপন, পবন, অনল, মেঘ প্রভৃতির পূজা—আরম্ভ করেন, ধরিতে গেলে, মানবের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক। প্রথমে আর্য্যেরা জড়জগতের উপাসনা আরম্ভ করেন, জ্ঞানোন্নতিতে পরিণামে একেশ্বর কল্পিত হয়। আমাদিগের মতে তরুলতার পূজাই মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। এ পূজা ভয়, আশা, বিস্ময়, কৌতুহল, হইতে উদ্ভূত বলিয়াই স্বাভাবিক। কেহ বলিয়া দিতে আইসে নাই; চিন্তাশক্তি জ্ঞানালোকের প্রদীপ্ত কিরণমালায় প্রতিভাত হয় নাই; সুতরাং স্বতঃই ভয়, আশা, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যে উপাসনা করা হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক না হইলে, তোমার একেশ্বরের পূজা কি স্বাভাবিক?

আমরা একেশ্বরে বিশ্বাসকে স্বাভাবিক বলিতে প্রস্তুত নহি। কেন?—না, এই বিশ্বাস অভ্যাসজাত। অভ্যাসজাত কেন হইল? মানবের স্বাধীন চিন্তা শক্তিজ কল্পনা হইতে প্রসূত বলিয়া। তরু, লতাকে পূজা করিবার সময় মানবের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও কল্পনার কোন আবশ্যক হয় নাই; একেশ্বর আরাধনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্রমিক জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তির সুদীর্ঘ প্রসর অবশ্যম্ভাবী। মানবের যে পর্য্যন্ত জ্ঞানোন্নত না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত, একেশ্বর কল্পনাও হয় নাই। প্রাচীন ভারতের ক্রমিক অবস্থানিচয় পর্য্যালোচনা করিলেই, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

প্রকৃতিজাত কার্য্য তাহাকেই বলা যাইতে পারে, যাহার কারণ প্রকৃতিতেই বর্ত্তমান আছে। যেমন আহার, নিদ্রা, মৈথুন প্রভৃতির মূলভাব, মানব প্রকৃতিতে স্বতঃই নিহিত বলিয়া, এগুলি প্রাকৃতিক। আহার করা প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া আধুনিক সভ্যতা পরিমার্জ্জিত আহার্য্যমাত্রেই প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে সমুত্থিত নহে। আদিম মানব ফলমূল আমমাংস ভক্ষণ করিতে নিয়োজিত। আদিম মানবের পক্ষে আমমাংস ভক্ষণই প্রাকৃতিক। জ্ঞানোন্নতির ফল, রন্ধন শিল্পের আশ্চর্য্য উৎকর্ষে আমরা পাকমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকি। পাকমাংস ভক্ষণ করা প্রাকৃতিক নিয়মের ফল নহে; ধরিতে গেলে, এটী আমাদিগের জ্ঞানোন্নতি ও তজ্জাত ফলপ্রসূ। রন্ধনশিল্পের আবিষ্ক্রিয়া জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন অসম্ভব। রন্ধন-শিল্প সভ্যতার ফল; মানবচিন্তাশক্তির উৎকর্ষের ফল। রন্ধন-শিল্পটী মানবের স্বাধীন চিন্তাশক্তিপ্রসূত। মানবের স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রথমেই সম্পূর্ণ পরিমার্জ্জিত হইতে পারে নাই; তজ্জন্য প্রথম রন্ধনটী নিরবচ্ছিন্নরূপে সুখাদ্য হয় নাই; পর পর রন্ধনগুলিই সুখাদ্য হওয়া সম্ভবনীয়। এইরূপ নিয়মের ফলে, তরুলতার উপাসনা যদিচ

স্বাভাবিক বটে, কিন্তু আম মাংশ ভক্ষণের ন্যায়; একেশ্বরের ভাবটী রন্ধনশিল্পের ন্যায়, এখনও চরম উৎকর্ষে উপনীত হয় নাই। রন্ধন-শিল্পটী আবার সভ্যতার উন্নতি ও জঠরানল নিবারণের নিমিত্ত। পৃথিবীস্থ মানবজাতি মাত্রেরই প্রতিভার ন্যূনাতিরেক ও দেশভেদে রুচিভেদ বিদ্যমান আছে। এই বৈষম্যজনিত ফলেই সর্ব্বদেশের রন্ধনশিল্প একরূপ নহে। রন্ধনশিল্পটি কেবলমাত্র মানব চিন্তা-শক্তিসংজাত হইলেও তৎলক্ষ সাক্ষাতভাবে জঠরানল নিবৃত্তি করা। একেশ্বরের চিন্তাটী অপর একটী অদৃষ্ট চিন্তা মাত্র। রন্ধনশিল্প অস্বাভাবিক হইলেও তাহার প্রতিরূপ কার্য্যস্থল, স্বাভাবিক জঠরানল নিবৃত্তি করা। তজ্জন্য একেবারে অস্বাভাবিক নহে, আবশ্যকীয় ও সঙ্গত বটে। একেশ্বরের চিন্তাটী অপর একটী শূন্যগর্ভ চিন্তা হওয়ায় অমূলক চিন্তা ব্যতীত কিছুই নহে। এই কারণে অস্বাভাবিক হই-তেও অস্বাভাবিকতর।

মানবের স্বাধীন চিন্তাশক্তি হইতে যাহাই উদ্ভূত, তাহাকেই আমরা শিল্প নামে অভিহিত করিলাম। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সকলেই শিল্পচাতুরী। মানবশিল্পের মধ্যে সকল গুলিই বিশেষ বিবেচিত ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীসহ সাদৃশ্যমান নহে। যে গুলি যতই প্রাকৃতিক ঘটনার বিশেষ সম্বন্ধ রাখিয়া অস্তিত্বে পরিণত, সেগুলি ততই প্রামাণীকৃত। যদিচ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীস্থ কোন দেশেরই রাজনীতি শীর্ষস্থানীয় নহে, কিন্তু তাই বলিয়া যে বিষয়টি অসঙ্গত, তাহা নহে। রাজনীতি মানবসমাজের প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ। ইহার ফল প্রত্যক্ষ, হাতে হাতে। সামাজিক সুখ সন্তোষের নিমিত্ত, শ্রমবিভাগপ্রসূত সামগ্রী ব্যক্তিগত অধিকারে সংরক্ষণ করিবার নিমিত্ত, রাজনীতি না থাকিলে চলিবে কেন? বিজ্ঞান

একটি প্রামাণিক শিল্প। বিজ্ঞানের মৌলিকত্ব আশ্চর্য্য প্রামাণিকতা! ক্ষেত্রতত্ত্ব ন্যায়দর্শনের অবলম্বনসিদ্ধ বিজ্ঞান; তজ্জন্যই ক্ষেত্রতত্ত্ব ঠিক প্রকৃতির সহিত সাদৃশ্য না থাকিলেও প্রামাণিক ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রামাণিক; ক্ষেত্রতত্ত্বের বিষয়গুলি প্রমাণের উপযোগী বলিয়া। বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিষয় সকল প্রমাণের উপযোগী বলিয়া, বিজ্ঞান প্রামাণিক শিল্প। দর্শনশিল্পের প্রমাণের কোন প্রত্যক্ষ বিষয় নাই। একটী অবয়বহীন কল্পনা দ্বারা অপর একটি অবয়বহীন কাল্পনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ডেকার্টের দার্শনিক মত এই কাল্পনিক সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত স্থল। প্রত্যক্ষ প্রামাণিকতা দর্শনশিল্পের মৌলিকত্ব নহে। কাযেই দর্শনশিল্প নিরর্থক মনগড়া কথা—অপ্রামাণিক!

ধর্ম্মের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র মানব সমাজে উপনীত। জ্ঞানোন্নতির উৎকর্ষে—বিভিন্নজাতির বিভিন্ন প্রতিভার ওজস্বিতায়,—ধর্ম্মজ্ঞানের বিবিধ ভাবরাশি মস্তিষ্ক বিলোড়নে প্রসূত। প্রতিভার ন্যূনাতিরেক সঞ্চালনে, ধর্ম্মও কোন স্থানে সর্ব্ববাদি সম্মত, অথবা কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিভার দ্বারা পরিচালিত। কোন কোন সম্প্রদায়ে, এক এক জন অমানুষিক প্রতিভাবলে, সম্প্রদায় বিশেষে পূজনীয়। ঈশ্বরের সহিত সম্মিলনজনিত সুখের আশা ধর্ম্ম-পিপাসাকাতর ব্যক্তিমাত্রেরই সমান নহে। একেশ্বরবাদীদিগের মধ্যেও এ বিষয়ের মতদ্বৈধ অবলক্ষিত হয়। প্রতিভার ন্যূনাতিরেক সঞ্চালনে, মতদ্বৈধ অবশ্যম্ভাবী ফল। এইরূপ মতদ্বৈধ নিরাকরণের নিমিত্ত অনেকেই কোন একটী মত অবলম্বনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতে যত্ন করিয়াছেন। ইহার পরিণাম ফল, বিবিধ দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি।—বিবিধ কাল্পনিক মত লইয়া ঘোরতর সমরানল উৎক্ষিপ্ত!

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

নানা কার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় এত দিন মাসিক সমালোচক প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেইজন্য বৎসরাধিক হইল, ইহা প্রকাশ হয় নাই। বস্তুতঃ, মাসিক সমালোচক এত দিন নিদ্রিত ছিল মাত্র, একেবারে গতায়ু হয় নাই। এক্ষণে কয়েক জন কৃতবিদ্য ও সুলেখক ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। চন্দ্রশেখর বাবু যদিও ইহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার নিয়মিত লেখকশ্রেণীভুক্ত থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইহাতে যাঁহারা লিখিতেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই এক্ষণে ইহাতে লিখিতে সম্মত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরো কতকগুলি কৃতবিদ্য ইহার লেখকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, মাসিক সমালোচক পূর্ব্বাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন হইবে না। এখন ভরসা করি, ইহার গ্রাহকগণ পূর্ব্বে ইহার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করিতেন, এক্ষণেও সেইরূপ করিবেন।

দুই ভগ্নীর গল্পটি যদিও ইতিপূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি সমালোচকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমান সংখ্যায় তাহার শেষ ভাগ টুকু প্রকাশিত হইল।

সমালোচকের গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা মূল্য দিয়া পুস্তক পান নাই, তাঁহাদিগকে আর নূতন করিয়া মূল্য দিতে হইবে না। সেই মূল্য শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিকট নিয়মিতরূপে সমালোচক প্রেরিত হইবে। ভরসা করি, যাঁহাদিগের নিকট সমালোচকের মূল্য প্রাপ্য আছে, তাঁহারা এখন স্ব স্ব দেয় টাকা প্রেরণে বাধিত করিবেন।

মাসিক সমালোচক যে সময়ে প্রথম প্রকাশিত হয়, সেই সময় হইতে অত্রত্য বৈতনিক অভিনয়-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "খেয়াল" নামে একখানি পাক্ষিকপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিছু দিন হইতে তাহাও বন্ধ রহিয়াছে। এক্ষণে মাসিক সমালোচক খেয়ালসহ সংযুক্ত হইয়া একত্রে প্রকাশিত হইতে চলিল। ভরসা করি, তাহার এই নূতন রূপে কেহ বিরক্ত হইবেন না। খেয়াল বড়লোকের সংসর্গে আত্মবিস্মৃত হইবার ছেলে নহে, তাহার প্রকৃতির কিছুতেই পরিবর্ত্তন হইবে না।

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়,

প্রকাশক।

মাসিক সমালোচক ও পেয়াল সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় রচনা, প্রবন্ধাদি, সমালোচ্য গ্রন্থাদি ও কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

ব্যারিং বা ইন্সফিসিয়েণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না। যাঁহারা পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উত্তর লেখা যাইবে না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা ডাকের টিকিটে মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় ৵০ আনা কাবনান দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট যেন কেহ না পাঠান। মনিঅর্ডারে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর ডাকঘরে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন, তাঁহাদিগের নিকট পশ্চাদেয় হিসাবে ৪৲ টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে, সুতরাং বিনা মূল্যে দেওয়া এক কালে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্রে ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

উকীলাবাদ,
বহরমপুর।
১৮৮৯ সাল,
১৫ই বৈশাখ।

শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী।

(৩য় খণ্ড ।) (২য় সংখ্যা ।)

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল

সংযোজিত।

— *:*:* —

(সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।)

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১২৮৯ সাল. জ্যৈষ্ঠ।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

ভেছেন

র আভা।

স কৃষ্ণাভ হইল, এক.

বহরমপুর —অক্ক আকাশে নক্ষত্ররাজি প্রস্ফুটি-

ত ভাগীরথীর নীলজলে রজতছটা বিকীর্ণ করিয়া পুন-

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল।

—:*:—

ছোটবৌর ঝাঁপি।

—:—

গরলে অমৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নদী-তটে।

নিদাঘ-প্রদোষে গঙ্গাবক্ষ মন্দ মন্দ বিচঞ্চল করিয়া শীতল সান্ধ্য পবন মৃদু মৃদু বহিতেছে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত পশ্চিম-গগণ সুন্দর সিন্দুর-রেখায় রঞ্জিত রহিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত পশ্চিমাকাশের দুই একখানি কাল মেঘে স্বর্ণছটা প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বাকাশও অপরিষ্কার নহে, সেখানেও অতুল শোভা, অতুল সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির বিশ্ববিমোহন হাসি। কিন্তু এ শোভা সে প্রাতঃকালের শোভা নহে, প্রকৃতি তখনও হাসিয়াছিলেন, এখনও হাসিতেছেন, কিন্তু এ দুই হাসিতে কত প্রভেদ। এই সায়ংকালে পূর্ণেন্দু ললাটে ধারণ করিয়া প্রকৃতি যে হাসি হাসিতেছেন—মরি, মরি, সে হাসির কি শোভা, কি স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, কি বিমল আভা।

রক্তাভ পশ্চিম গগণ ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণাভ হইল, একটি, দুইটি, তিনটি, দেখিতে দেখিতে কদম্ব কুসুমের ন্যায় আকাশে নক্ষত্ররাজি প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইল, জাহ্নবীর নীলজলে রজতছটা বিকীর্ণ করিয়া পুণ-

চন্দ্র তর তর বেগে নীলাকাশতলে ছুটিতে লাগিল। এই সময়ে রাজমহলের বালুকাময় সৈকতমূলে একখানি তরণী আসিয়া ভিড়িল। মাঝিরা নৌকা বান্ধিয়া আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত হইল, নৌকার মধ্য হইতে একটি ভদ্র লোক, একটি তিন বৎসরের শিশুর হস্ত ধারণ করিয়া জ্যোৎস্নাময়, শ্বেত সৈকতে নামিয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে করিতে উপরে উঠিতে লাগিলেন।

ভদ্র লোকটি এক জন বঙ্গদেশীয় কায়স্থ, কানপুরে চাকুরি করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কলের গাড়ী হয় নাই, সেইজন্য ইনি নৌকাযানে পরিবার লইয়া চাকুরিস্থানে যাইতেছেন। নৌকার ভিতর, ভদ্র লোকটির গৃহিণী, পরিচারক পরিচারিকা রহিয়াছেন—আর গৃহিণীর অঙ্কে একটি শ্বেত-শতদল-কোরক সদৃশ এক বৎসরের কন্যা ক্রীড়া করিতেছে। সকলেই প্রথমে ভাবিবেন, গৃহিণীই কন্যাটির প্রসূতী, আমরাও প্রথমে তাহাই ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু পরে যাহা জানিলাম, তাহা বলিলে, হয় ত পাঠক হাসিবেন, বিদ্রূপ করিবেন—বলিবেন—"এ আবার কোন্ খেয়াল।" কিন্তু হাসিতে হয় হাসুন; আমরা বিদ্রূপের ভয়ে সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না—কন্যাটির প্রকৃত পরিচয় দিব।

নৌকারোহী ভদ্র লোকের নাম রাধানাথ দত্ত, ইহাঁর নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত বৃহন্নপল্লী গ্রাম। সেই গ্রামের রাধাবিনোদ মিত্র রাধানাথের বাল-সহচর ও অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। রাধাবিনোদের স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন, শোকে দুঃখে নিতান্ত জড়ীভূত হইয়া রাধাবিনোদ আপন অকৃত্রিম বন্ধুকে এই দুঃখের সময়ে দেশে আসিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। রাধানাথ সেই অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া সপরিবারে দেশে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের অত্যল্প দিবস পরেই রাধাবিনোদ এক উৎকট রোগাক্রান্ত

হন, এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। রাধাবিনোদ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া রাধানাথের হস্ত ধরিয়া আপনার বালা কন্যাটিকে সমর্পণ করিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে নয়ন মুদ্রিত করেন। রাধাবিনোদের গৃহে আর কেহই ছিল না, সুতরাং রাধানাথ বাবু কন্যাটিকে গৃহে আনিলেন। কন্যাটি পাইয়া তাঁহার গৃহিণীর হৃদয়ে একটি নবীন ভাবের তরঙ্গ উঠিল—সেই ভাবের প্রভাবে—পাঠক বলিতে লজ্জা করে—ঐ তিন বৎসরের ছেলের জীবনে ঐ ক্রোড়স্থিতা বালিকা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ।—

পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া সৈকতে ভ্রমণ করিতে করিতে রাধানাথ বাবু নৌকাস্থিত ব্যক্তিগণের নয়নাতীত হইয়াছেন, এমন সময়ে, আর দুইখানি ছাপ্পরহীন নৌকা সন্ সন্ করিয়া তীরবেগে ঐ নৌকার নিকটে আসিয়া লাগিল। যাত্রীর নৌকার লোকেরা আগন্তুকগণকে দেখিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। দস্যুদিগের মুখ বস্ত্রাবৃত, কাহার হস্তে লাঠি, কাহার হস্তে তরবারি, কাহার হস্তে বল্লম। ইহারা নৌকার নিকটবর্ত্তী হইয়া একে একে লম্ফ দিয়া যাত্রীর নৌকায় উঠিতে লাগিল ও যতগুলি পুরুষ দেখিতে পাইল, অস্ত্রাঘাতে সকলেরই প্রাণ নষ্ট করিল, শেষে তাহারা নৌকার কাছি কাটিয়া দিল ও আপনাদের দুই খানি নৌকার সঙ্গে ওখানিও বাঁধিয়া লইয়া অজ্ঞাত স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিল।

নিমেষমধ্যে এই সমস্ত ঘটনা নিঃশেষ হইয়া গেল, রাধানাথ বাবু উপর হইতে নৌকাবাসিগণের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন, তিনি বিপদাশঙ্কা করিয়া পুত্র-ক্রোড়ে প্রাণ-পণে বালুকাময় সৈকত অতিক্রম করিয়া নৌকাভিমুখে ছুটিতেছেন, এমত সময়ে কোন কঠিন দ্রব্যসংস্পর্শে তাঁহার পদস্খলিত হইল, চরণে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, অর্দ্ধ-পথে আসিয়া গতিশক্তি-বিহীন হইয়া বসিয়া পড়িলেন। পিতার

ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া ক্রোড়স্থিত বালক রোদন করিয়া উঠিল, কিন্তু রাধানাথ বাবুর যে যন্ত্রণা তাহা কোন্ কবি বর্ণনা করিবে, কোন্ চিত্রকর চিত্রিত করিবে?——তাঁহার জীবনাধিক ধন দস্যু হস্তে পতিত, ইচ্ছা, বায়ুগতিতে যাইয়া প্রাণপ্রতিমাকে ক্রোড়ে লইয়া অভয় প্রদান করেন, কিম্বা এক সঙ্গে দুই জনে জীবন বিসর্জ্জন করেন, কিন্তু বিধাতা প্রতিবাদী; তিনি উপায়-বিরহিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পৃথিবী তাঁহার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল, জগৎ সংসার শূন্য দেখিতে লাগিলেন, ক্রোড়স্থিত বালককে ক্রোড়ে ধরিয়া তিনি সেই বালুশয্যায় নিস্পন্দ ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

যখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, তখন সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি সোৎসাহে অথচ ধীরগতিতে যেখানে নৌকা বাঁধা ছিল, সেইখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—হরি, হরি, সর্ব্বনাশ!!—প্রবল ঝটিকা সুন্দর কুসুমকানন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, হরিদ্বর্ণ শাখা-পল্লবাদি বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছে। পূর্ব্বে যেখানে তাঁহার হৃদয়ের আশা, নয়নের জ্যোতিঃ, প্রাণের পিপাসা, নিশার চন্দ্র, জীবনের সর্ব্বস্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে সে স্থান তাঁহার চক্ষে ভয়ঙ্কর শশ্মান-প্রায় ধূ ধূ করিতেছে। রাধানাথের হৃদয়ে হতাশা আসিয়া তীব্রস্বরে কথা কহিল, তাঁহার হৃদয় ভেদ হইয়া গেল, উন্মত্তের ন্যায় শূন্যদৃষ্টিতে যে পথে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া দস্যুরা চলিয়া গিয়াছে, সেই পথ প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি কতক্ষণ দেখিলেন, কতক্ষণ সেই শশ্মানসৈকতে বসিয়া ভাবিলেন, তাহা আমরা ঠিক্ বলিতে পারি না—পর দিবস সূর্য্যোদয়ে আমরা দেখিলাম, কর্দ্দমাভিষিক্ত মলিনবেশ একটি ভদ্র লোক একটি বালুধূসরিত বালক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া প্রকৃত উন্মাদের ন্যায় রাজমহলের পথে বিচরণ করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাগ্যপট।

বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে। রাজগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশ্যনের পশ্চিম ধারে যে অত্যুচ্চ গিরি-শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার শিরো-দেশে অস্তাচলগমনোন্মুখ সূর্য্যের সুবর্ণ রশ্মি পতিত হইয়া অতুল শোভা ধারণ করিয়াছে। পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে শালবৃক্ষের ঘন শ্রেণী উচ্চ-শিরে যেন গমনোদ্যমান সূর্য্যের গন্তব্য পথ অনুসন্ধান করিতেছে। এই সময় এক জন গৃহস্থাশ্রমী বৈষ্ণব—সর্ব্বাঙ্গে হরি নামের ছাপা, গাত্রে নামাবলী, হাতে জপের মালা—অধ্বশ্রমে কাতর হইয়া, শাল-বনের পাদমূল দিয়া যে স্থানে একটী বিমল-সলিলা নির্ঝরিণী কুল কুল রবে বহিয়া যাইতেছে, তথায় আসিয়া বসিলেন। পার্ব্বতীয় প্রদেশের সায়ংকালীন শোভ দর্শনে বৈষ্ণবের মন একবারে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়াছে, তিনি ঊর্দ্ধমুখে নৈসর্গিক শোভারাশি দর্শন করিতেছেন ও দুই গণ্ড বহিয়া তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু বিনির্গত হইতেছে, এমন সময় তাঁহার কর্ণে একটি কোমল ও করুণ শব্দ প্রবেশ করিল—হরি হরি—এ যে শিশুর রোদন!! এ লোক-বিরহিত স্থানে শিশু কোথা হইতে আসিল? বৈষ্ণব উৎকর্ণ হইয়া বসিলেন, যে দিক হইতে শব্দ আসিয়া-ছিল, সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন—আবার সেই রোদন ধ্বনি। বৈষ্ণব চূড়ামণি উঠিলেন, রোদন-শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন, ঘন শালতরুশ্রেণী অতিক্রম করিয়া যেখানে কাঞ্চন পাহাড়ী আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পাদমূলে আসিয়া তাঁহার গতি রোধ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একখানি প্রতিপদের চন্দ্র পড়িয়া আছে,—একটি এক বৎসরের বালিকা একাকিনী অসহায়া ধূলায় পড়িয়া রোদন করি-তেছে। সে দৃশ্যে ভক্ত বৈষ্ণবের হৃদয় গলিল; তিনি দ্রুতবেগে বালিকার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া প্রথমে সান্ত্বনা করি-

লেন, পরে কাহার বালিকা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত অন্বেষণ বিফল হইল, এ দিক ও দিক অনেক স্থান অনুসন্ধান করিলেন, চীৎকার করিয়া "কন্যাটীর কে এখানে আছ" বলিয়া অনেক ডাকিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথার কোন উত্তর দিল না। বৈষ্ণবটি বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, তিনি অসহায় শিশুর একমাত্র সহায় হইয়াছেন, কেমন করিয়া এই বিপদসঙ্কুল নির্জ্জন স্থানে তাহাকে ফেলিয়া যান, আবার কি বলিয়াই বা পরের কন্যাকে আপন ঘরে লইয়া যান। তাঁহার ভাবিবার সময় আর অধিক নাই, যে বেলাটুকু ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সরিতেছে, সেখানে আর অধিক ক্ষণ থাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না, কন্যাটিকেও একা ফেলিয়া যাইতে তাঁহার মন সরিল না; শেষে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে সেই বাসন্তী কলিকা ক্রোড়ে ধারণ করিয়া অনিমেষ-লোচনে সেই অতুল্য অস্ফুট রূপরাশি দর্শন করিতে করিতে নিজ গৃহে উপস্থিত হইলেন।

"গোসাঞি, এ অমিল ফুল কোথায় পেলেন?" বৈষ্ণব গৃহে আসিবামাত্র তাঁহার গৃহিণী এই প্রশ্ন করিলেন।

বৈষ্ণব বলিলেন, "ভগবান্, আমায় নিঃসন্তান দেখে, দয়া করে এই অমূল্য রত্নটি কাঞ্চনপাহাড়ীতে প্রদান করেছেন, ইহার নাম কাঞ্চনমালা রাখিলাম, যত্নে আপনার সন্তানের ন্যায় ইহাকে প্রতিপালন কর।"

কাঞ্চনমালা বৈষ্ণবগৃহে যত্নে, স্নেহে, আদরে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার সাত বৎসর বয়ঃক্রম, তখন এক দিন তাঁহাদের আশ্রমের অনতিদূরে পথপার্শ্বে একটি বৃদ্ধা বসিয়া আছে, গ্রামের অনেক লোক, বিশেষ বালক বালিকারা, বৃদ্ধারে ঘিরিয়া মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়াছে, বৃদ্ধা এক এক করিয়া সকলের হাত দেখিতেছেন ও অদৃষ্টের ফলাফল গণিয়া বলিতেছেন। আমাদের কাঞ্চনমালাও বাল্য-

ভাববশতঃ বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইলেন ও অপরের দেখাদেখি আপনার রক্তপদ্মদলের ন্যায় টুক টুকে ছোট হাতখানি বৃদ্ধার সম্মুখে বাড়াইয়া দিলেন। বৃদ্ধা হাত ধরিলেন, এক বার, দুই বার, তিন বার দেখিলেন, বালার মুখ প্রতি চাহিলেন, আবার হাতখানি দেখিলেন, শেষে একেবারে আমাদের কাঞ্চনমালাকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার থুতি ধরিয়া বলিলেন, "মা, তুমি তো সামান্য নও, তুমি যে রাজার গলার মালা দেবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"এ আবার কি খেলা ?"

মুরশীদাবাদ জেলার উত্তরাংশে গঙ্গাদহ একখানি প্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রাম। এখানে কায়স্থ কুলোদ্ভূত সেনবংশীয়েরা বহুকাল হইতে সাঁওতাল পরগণার মধ্যে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন; ইহাঁদের ঐশ্বর্য্য অতুল, ক্ষমতা অপ্রতিহত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মহারাজা জয়হরিচন্দ্র গঙ্গাদহের সিংহাসন শোভা করিতেছিলেন, ইহাঁর তাৎকালীক বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর। পাঁচ বৎসর হইল, তাঁহার জীবনসঙ্গিনী সতী প্রণয়ের নিশানস্বরূপ একটি মাত্র দশমবর্ষীয়া বালিকা জয়হরিচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, সুতরাং ঐ বালিকাটিই এক্ষণে জয়হরিচন্দ্রের একমাত্র স্নেহ, ভালবাসার আধার। উপযুক্ত পাত্র অভাবেই হউক, অথবা পৃথিবীর একমাত্র স্নেহরজ্জু ছিন্ন করিতে অনিচ্ছাবশতঃই হউক, জয়হরিচন্দ্র এ পর্য্যন্ত তাঁহার দুহিতার বিবাহ দেন নাই—পঞ্চদশবর্ষীয়া জয়াবতী যৌবনভরে টল টল করিতেছেন।

জয়াবতীর বর্ণ গৌর নহে, অথচ কালও নহে, যে প্রকার বর্ণকে আমাদের বঙ্গবধূরা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বা, "মাটা মাটা" রং বলেন, জয়া-

বতীর বর্ণ সেই প্রকার। ইহাঁর শরীরের গঠন নিটোল ও সৌষ্ঠবপূর্ণ, কটিদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব ও উরু মাংসল, বক্ষস্থল বিশাল। তাঁহার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ আনিতম্ব লম্বমান, মুখখানির গঠনে ও ভাবে এমন একটু চমৎকার কোমলতা নিহিত আছে যে, তাঁহাকে দেখিলেই ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে; চক্ষু দুটি যদিও আকর্ণবিশ্রান্ত নহে, তথাপি নিতান্ত ক্ষুদ্রও নহে, বিশেষ সেই ভাসা ভাসা চক্ষু দুটিতে কেমন যে এক নৈসর্গিক ভাব আছে, দেখিলেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে, ভ্রূদুটিও যেন সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকাপ্রসূত। জয়াবতী সুন্দরী; যদিও এক এক করিয়া প্রত্যেক অঙ্গ বিচার করিতে গেলে তাঁহার শরীরে কিঞ্চিৎ দোষ বাহির হইতে পারে, তথাপি আমাদের জয়াবতী সুন্দরী।

আজ দোলপূর্ণিমা। জয়াবতী সমস্ত বিকাল সমবয়স্কা বালাগণের সহিত আবীর কুঙ্কুম খেলিয়াছেন, এক্ষণে সন্ধ্যার আগমন দেখিয়া সকলে খেলা ভাঙ্গিয়া আপনাপন গৃহে চলিয়া গেলেন, জয়াবতী যেন কি একটি যত্নের সামগ্রীর অন্বেষণে একাকিনী অন্তঃপুর-উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। বসন্তাগমে উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষলতা হাসিয়া উঠিয়াছে, সুশীতল সান্ধ্য বায়ু এতক্ষণ পুষ্পলতাদির সহিত ক্রীড়া করিতেছিল; এক্ষণে জয়াবতীর চূর্ণকুন্তল অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিল, পূর্ব্বগগণে পূর্ণ শশধর আপনার রূপের ছটা বিকীর্ণ করিয়া হাসিয়া উঠিল। জয়ার বসনাঞ্চলে আবীর, হস্তে কুঙ্কুম; পা টিপিয়া টিপিয়া পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটের দিকে যাইতেছেন, আবার এক একবার বদন ফিরাইয়া বাসন্তীপূর্ণিমার প্রদোষ শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। সহসা জয়ার গতি রোধ হইল; হৃদয় যেন ভাবতরঙ্গে নাচিয়া উঠিল, উরুদ্বয় যেন মুহূর্ত্তের জন্য কম্পিত হইল। জয়া কি দেখিলেন? ঘাটের আলিসার উপর তাঁহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া যে একটী অনিন্দ্যকান্তি যুবা-পুরুষ একাকী বসিয়া সরসীর স্বচ্ছ সলিলে কৌমুদী ক্রীড়া দর্শন করি-

তেছিলেন, জয়া নিঃশব্দে অনিমেষলোচনে সেই অতুল রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। ইহাঁরই অন্বেষণে জয়া আবীর-কুঙ্কুম-হস্তে একাকিনী উদ্যানে আসিয়াছিলেন; ইচ্ছা, ত্বরিতপদে নিকটে যাইয়া মনের সাধে সেই দেবশরীর আবীর-কুঙ্কুমে ভূষিত করেন; কিন্তু মনে আবার কত প্রকার ভাব উত্থিত হইতে লাগিল,—যেন চরণে চরণ ঠেকিতে লাগিল, হস্ত উঠে না, সেই আবেশময় চক্ষের পাতা দুখানি পড়িয়া গেল। জয়া!—তোমার এ ভাব কেন? হৃদয় কাঁপিতেছে কেন? চিবুক ও গ্রীবাদেশ অকম্পিত কেন? থাকিয়া থাকিয়া বঙ্কিম-নয়নে ও দেবকান্তির প্রতি চাহিতেছ কেন? জয়া!—সাবধান, তোমারি সম্মুখে ও বিশাল প্রজ্বলিত অনলকুণ্ড, তুমি পতঙ্গ, যেন ভ্রান্তিবশে ও অনলে আত্মসমর্পণ করিও না। তুমি বালিকা, এই নবীন বয়সে প্রেম কাহাকে বলে জানিয়াছ কি?—সর্ব্বনাশ! করিয়াছ কি! কে তোমায় এ ব্রত অবলম্বন করিতে বলিয়াছিল? কাহার কথায় তুমি এ অনন্ত সাগরে ডুবিলে? ডুবিয়াছ—কেবল মরিতে বাকী!!

জয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে যুবার মনোহর কান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, শেষে তাঁহার মনে আবার কি একটি ভাবের তরঙ্গ উঠিল, অঞ্চলের আবীর হস্তে লইলেন, পা টিপিয়া টিপিয়া আলিসার নিকট যুবার পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আবার তাঁহার বিপদ উপস্থিত হইল, আবার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, আবার চরণে চরণ বাধিল। যুবা একচিত্তে কৌমুদী-শোভা দেখিতেছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তিনি তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই। জয়া তিন চারি বার অগ্রসর হইলেন, তিন চারি বার ফিরিলেন, শেষে নিজের অজ্ঞাতসারে কলের পুত্তলিকার ন্যায় যুবকের গাত্রে হস্তস্থিত আবীর ছুড়িয়া মারিলেন; সকল তাঁহার অঙ্গে লাগিল না, অধিকাংশ আলিসার উপর পড়িয়া গেল, অমনি বিজাতীয় লজ্জা

আসিয়া জয়াকে গ্রাস করিল, তিনি ধরাবদ্ধ-দৃষ্টিতে জড়সড় হইয়া আলিসার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। এবার যুবকের চমক ভাঙ্গিল, তিনি মুখ ফিরাইলেন, জয়ার কার্য্যের ভাব বুঝিলেন, তাঁহার সঙ্কুচিত মন প্রফুল্ল করিবার জন্য হাসিয়া বলিলেন—"এ আবার কি খেলা ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অশ্বারোহী।

গঙ্গাদহের পশ্চিমে যে অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে, তাহার অংশ মাত্রের নাম সতীপাহাড়ী। সতীপাড়ী অতি রমণীয় স্থান। ইহার উত্তর ভাগে, তলদেশ হইতে শিখর পর্য্যন্ত, ঘন শালশ্রেণী ক্রমে উচ্চ হইয়া স্তরে স্তরে শোভা পাইতেছে ; দক্ষিণ পার্শ্বে কেবল বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড একখানি আর এক খানিব গায়ে পড়িয়া আছে, কোন খানি বা উচ্চ শিখর হইতে গড়াইতে গড়াইতে মধ্য পথে, যেন গিরিসঙ্কটের শোভা দর্শন করিয়া, অচল হইয়া রহিয়াছে। এই দিকটি এত উচ্চ যে, শিখর হইতে তলদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইলে মস্তক ঘুরিয়া যায়। এই উচ্চ স্থান হইতে দুইটি বিমলসলিলা নির্ঝরিণী অনবরত কুল কুল রবে উপত্যকা ভূমিতে গড়াইয়া পড়িতেছে ; বস্তুতঃ এই স্থানটি নিরীক্ষণ করিলে মনে ভয়, বিস্ময় ও আনন্দ যুগপৎ উদয় হয়! পাহাড়ীর পূর্ব্ব পার্শ্ব অতিশয় রমণীয় স্থান, ইহা ক্রমে নিম্ন হইয়া দুই ক্রোশ অন্তরে গঙ্গাদহ গ্রামের সমতল ভূমির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। সমস্ত পাহাড়ীর বর্ণ রক্তাভ। গঙ্গাদহের রাজারা গঙ্গাদহ গ্রাম হইতে সতীপাহাড়ীর পূর্ব্ব ভাগের শিখরদেশ পর্য্যন্ত একটি সুবিস্তৃত পরিষ্কার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন ; তাহার উভয় পার্শ্বে ঝাউ ও দেবদারু বৃক্ষের শ্রেণী।

বসন্ত পূর্ণিমার প্রদোষ; দক্ষিণ পবন রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে, পথিপার্শ্বস্থ গম্ভীর দেবদারু বৃক্ষের পাতা সকল বায়ু-ভরে মধুর মধুর দুলিতেছে, অশান্ত ঝাউ সাঁ সাঁ রবে দেশ মাতায় করিয়াছে, পার্শ্বস্থিত লতা সকল আমূল কুসুমাস্তরণে সজ্জিতা হইয়া বঙ্গকুলবধুদিগের ন্যায় গুপ্তভাবে ব্রীড়াসঙ্কুচিতা অনুপমা কান্তি প্রকাশ করিতেছে। পক্ষিগণ দিগ্‌দিক্ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৃক্ষের উচ্চ উচ্চ শাখা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, ও কে কোন দিকে গিয়াছিল, কোকিল মহাশয় কত বিরহিণীকে জ্বালাইয়াছেন, বৌ-কথা-ক কত বৌর মান ভাঙ্গিয়াছেন, ধূর্ত্ত কাক কত ছেলের নিকট মোয়া ভুলাইয়া লইয়াছে, এক্ষণে সকলে চীৎকার করিয়া যেন তাহারই পরিচয় দিতেছে। কৃষকেরা সমস্ত দিন ভূমি কর্ষণ করিয়া এক্ষণে লাঙ্গল ছাড়িয়া বাড়ী আসিতেছে, তাহাদের অগ্রে অগ্রে বলদগুলি লাঙ্গুল দোলাইতে দোলাইতে, আফিসের কেরাণী বাবুগুলির মত, গৃহে চলিতেছে—আনন্দ আজিকার মত রোজ বাজান হইল—আর প্রভুর সুমিষ্ট গালি আহার করিতে হইবে না।

এই সময় এই পথে একটি যুবা পুরুষ একটি সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে আরূঢ় হইয়া ধীরগতিতে চলিয়াছেন; অশ্ব থাকিয়া থাকিয়া বক্রগ্রীব হইয়া মুখোস চিবাইতেছে ও, যেন আপন আরোহীর অনন্ত গুণে একান্ত বশীভূত হইয়া, থাকিয়া থাকিয়া ইতস্ততঃ লাঙ্গুল প্রক্ষেপণচ্ছলে চামরবাজন দ্বারা স্বীয় কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। যুবা আপন মনে চলিয়াছেন, বসন্তপূর্ণিমার প্রদোষ-দর্শন করিতে করিতে আপন মনে চলিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার কর্ণে অন্য এক অশ্বের পদশব্দ প্রবেশ করিল; তিনি মস্তক ফিরাইলেন, দেখিলেন গাট্রে সাহেব দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিয়া তাঁহারই দিকে আসিতেছেন। নিমেষ মধ্যে সাহেব যুবার নিকট উপস্থিত হইলেন ও অশ্বের গতিরোধ করিয়া দক্ষিণ হস্তে টুপিটি ঈষৎ উত্তোলন করিয়া তাঁহাদের জাতীয় ভাবে

যুবাকে সায়াহ্নিক অভ্যর্থনা করিলেন। যুবা অভ্যর্থনা প্রতিদান করিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার তো আজ আসিবার কথা ছিল না।"

সা। ছিল না বটে, কিন্তু একটি বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই আসিয়াছিলাম, কিন্তু আসা না আসা সমান হইল।

যু। কেন?

সা। আপনি ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, সুতরাং মহারাজার সহিত আমার কোন কথা হইল না। আর কে আমার কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন? এত বড় রাজ-সংসারে এক আপনি ব্যতীত ইংরাজি ভাষাজ্ঞ দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

গাট্রে সাহেবের এই শ্লেষবাক্যটি যুবার কর্ণে বাজিল, তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎ রক্তিম হইল, ভ্রূভুটী ও প্রশস্ত ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, তথাপি অধর প্রান্তে একটু সুমধুর হাস্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"সাহেব, বঙ্গসন্তানে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উত্তম জানিলেই তাঁহাদের যথেষ্ট গৌরব, ইংরাজি জানা না জানায় সে গৌরবের বিশেষ কিছুই তারতম্য নাই।"

সাহেবও স্বাধীন জাতি, তাঁহার সমস্ত স্বাধীন চিন্তা, তিনি স্বাধীনভাবে বলিলেন—"বলেন কি, ইংরাজি ভাষা সাহিত্যের ভাণ্ডার, বিজ্ঞানের খনি, দর্শন শাস্ত্রের আধার। ইহা গণিতের সার, জ্যোতিষের মূল, অলঙ্কারের জীবন। যে ইংরাজি শিক্ষা না করিল, তাহার জীবনই বৃথা, বাঙ্গালা তো ভূতের ভাষা।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সাহেব একবার যুবার প্রতি অর্দ্ধাপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন যুবার গম্ভীর বদন আরও গম্ভীর হইয়াছে, যেন কি বলিবেন বলিয়া তাঁহার অধর ঈষৎ প্রস্ফুরিত হইয়াছে। কিন্তু সাহেব যে অভিসন্ধিতে মহারাজা জয় হরিচন্দ্রের নিকট গমনাগমন

করিতেছেন, সে কার্য্যসিদ্ধির জন্য যুবার সহায়তা অতি আবশ্যক, এইজন্য যুবার অন্তরে কোনরূপ বেদনা দেওয়া সাহেবের কোন মতেই অভিপ্রেত নহে, সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব কথাগুলি যুবার হৃদয়ে লাগিয়াছে জানিয়া তিনি অমনি আর এক ভাবে যুবার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য জাতি আবশ্যক হইলে এই বিদ্যায় অতি নিপুণ। সাহেব বলিতে লাগিলেন—আপনার নিজের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন, ইংরাজি শিখিয়াছেন বলিয়া আপনি এ দেশের অলঙ্কার, সমাজের চূড়া, সভ্যতার আদর্শস্থল হইয়াছেন, আপনার কুসংস্কারাবিষ্ট দেশীয়গণের সহিত আপনার তুলনা করিলে, আপনিই বলুন দেখি, কত ভেদ দৃষ্ট হয়।—

সাহেবের কথায় বাধা দিয়া যুবা বলিলেন, "মিষ্টার গাট্রে—যথেষ্ট হইয়াছে, আমি দেশীয় আত্ম কুটুম্ব, এমন কি, গুরুজনগণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া উচ্চে উঠিতে চাহি না, আমার প্রশংসা করিতে আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি অমনি করুন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি যাঁহাদিগকে পূজা করি; তাঁহাদের নিন্দা শুনিলে আমার হৃদয়ে আঘাত লাগে। আপনি যাঁহাদিগকে কুসংস্কারাবিষ্ট বলিয়া শ্লেষ করিতেছেন, তাঁহাদের অন্তরে যে কত গুণ আছে, তাহা যদি আপনি একবার দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে আপনি যে এত সভ্যতাভিমানী মিষ্টার গাট্রে, আপনিও স্বহস্তে কুসুম চন্দন লইয়া তাঁহাদের চরণ পূজা করিতেন।

যুবার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাহেব কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতের, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের ন্যায়, বলিলেন—"যোগেশ বাবু! যদি আমি আমার অসম্বদ্ধ কথায় আপনাকে কোনরূপ ক্লেশ দিয়া থাকি, আমি ভরসা করি, আপনি আমাকে মার্জ্জনা করিবেন"। হিন্দুসংসারে যেরূপ গোময়, সাহেবসংসারে সেইরূপ "ভরসা" ও "মার্জ্জনা"। কোন হিন্দু অখাদ্য

ভোজন অথবা কোন নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়া এক ছটাক গোময় ভক্ষণ করিলেন, তাঁহার সমস্ত অপরাধ ধুইয়া গেল, সেইরূপ কোন সাহেব কোন ব্যক্তির মস্তকে পদাঘাত করিলেন, তাহার জীবনের সুখের পথে কণ্টক হইলেন; শেষে যখন বিপদে পড়িলেন, তখনি ভরসা করিলেন যে, যে ব্যক্তিকে তিনি এত দিন চরণে দলিত করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে মার্জ্জনা করিবেন। যাহা হউক, উপস্থিত বিষয়ে গাট্রে সাহেবের ভরসা ভাসিয়া গেল না, তিনি যাহা ভরসা করিয়াছিলেন, যোগেশ বাবুর নিকট তাহা পাইলেন। তাঁহাদের দুইটি অশ্ব ধীরগতিতে পাশাপাশি চলিতেছিল, সাহেবের মুখে মার্জ্জনার কথা শুনিয়াই যোগেশ বাবু সস্মিতবদনে আপনার দক্ষিণ হস্তখানি সাহেবের দিকে বাড়াইয়া দিলেন, সাহেব অমনি সাগ্রহে নিজ দক্ষিণ হস্তে সেই হস্তখানি ধরিয়া সবলে পীড়ন করিলেন। ক্ষণ পরেই সাহেব বলিলেন "অদ্য অসময় হইয়াছে, যে কারণে আজ আসিয়াছিলাম, তাহা কল্য আসিয়া নিবেদন করিব"। এই বলিয়া যথেষ্ট ভদ্রতার সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়া সাহেব নিজ অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন, যোগেশচন্দ্র সেই স্থানে একাকী দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

পাঠক জানিয়াছেন, অশ্বারোহী যুবার নাম যোগেশচন্দ্র, কিন্তু এই যুবাকে তিনি আর কখন দেখিয়াছেন কি না, তাহা আমরা এতক্ষণ বলি নাই, এখন বলিব। গত পরিচ্ছেদে পুষ্করিণীর আলিসার উপর যে যুবকের গাত্রে জয়াবতী আবীর ফেলিয়াছিলেন, অশ্বারোহী সেই যুবক। সংসারে ইহাঁর পিতা ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না, বাল্যকাল অবধি যোগেশ আপন পিতার নিকটেই থাকিতেন; তাঁহার পিতা মহারাজা জয়হরিচন্দ্রের অতিশয় বিশ্বস্ত প্রধান অমাত্য, বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ছিল; যোগেশ আশৈশব জয়হরিচ-

ন্দ্রের গৃহে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা ছিলেন না বলিয়া জয়াবতীর গর্ভধারিণী তাঁহাকে আপন সন্তানের ন্যায় দেখিতেন। যদিও জয়া যোগেশ অপেক্ষা ৬।৭ বৎসরের ছোট, তথাপি তাঁহারা উভয়ে একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একত্র ক্রীড়া করিতেন। সময় স্রোতে সব ভাসিয়া যায়, জয়াবতীর গর্ভধারিণী সেই স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন, জয়ার ও যোগেশের বাল্যকাল ভাসিয়া গিয়াছে, এক্ষণে উভয়ের অঙ্গেই যৌবন ফুটিয়াছে। যৌবন ফুটিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে জয়াবতীর কোমল হৃদয়েও একটি সুতীক্ষ্ণ কণ্টক ফুটিয়াছে, আমাদের পাঠক পাঠিকারা তাহার কতক আভাস পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

সাহেব চলিয়া গেলেন, যুবক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার অশ্বের গতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিলেন, শেষে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আপন মনে বলিলেন, "আমাদের অভিমান করাই বৃথা, তোমরা প্রকৃতই আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ, বিশেষ শক্তি না থাকিলেই বা এত দূর দেশে আসিয়া এ প্রকার অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজত্ব করিবে কেন ?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যুবা অশ্বের মুখ ফিরাইলেন ও সন্ধ্যার সমাগম দেখিয়া দ্রুত যাইবার জন্য অশ্বকে ইঙ্গিত করিলেন। রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া যোগেশচন্দ্র অশ্ববেগ সম্বরণ করিলেন, ও মস্তকোত্তোলন করিয়া সম্মুখস্থ সৌধরাজির প্রতি দৃষ্টি করিলেন। একটি প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ উন্মুক্ত ছিল, যুবা সেই দিকে চাহিবামাত্র দেখিলেন, ইন্দীবরাক্ষী জয়াবতী বিশাললোচনে একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছেন, তাঁহাদের চারি চক্ষু একত্রিত হইবামাত্র জয়া একটু হাসিলেন, তাঁহার গণ্ড ও স্কন্ধ দেশ একটু অকম্পিত হইল, আবার তখনি সেই আয়ত নয়নের পাতা দুখানি নিচের দিকে ঝুলিয়া পড়িল। যোগেশ জয়ার এই সমস্ত ভাবগুলি দেখিলেন, সবগুলি এক এক করিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল, তাঁহার মুখকান্তি গম্ভীর হইল, কপালে বিন্দু

বিন্দু স্বেদবারি বহির্গত হইতে লাগিল, তিনি রেকাবে ভর দিয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে একবার সোজা হইয়া বসিলেন, ও মনে মনে বলিলেনঃ—"প্রাণের ভগিনী জয়', তোমার সুখের জন্য এ হৃদয় এখনি স্বহস্তে দ্বিখণ্ড করিতে পারি, কিন্তু তথাপি তোমার হস্তে ইহাকে অর্পণ করিতে পারি না কেন?—বুঝি, আমার কপালে সুখ নাই।"—এই বলিয়া যোগেশ-চন্দ্র দ্রুতগতি সদর বাটীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৃক্ষমূলে।

রাজগ্রামের পশ্চিমাংশে কাঞ্চনপাহাড়ী মহারাজ জয়হরিচন্দ্রের জমিদারিভুক্ত। গার্ট্রে সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, এই স্থানের মৃত্তিকায় লৌহ প্রস্তুত হইতে পারে, এইজন্য ঐ স্থানটি জমা করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে তিনি গঙ্গাদহে যাতায়াত করিতেন। সাহেব কিন্তু নিজ গূঢ় অভিপ্রায় জয়হরিচন্দ্র কি যোগেশচন্দ্রকে অবগত করান নাই, তাঁহার সেই স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা, এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। পতিত পার্ব্বতীয় ভূমির জন্য এক জন সাহেব ব্যগ্র হইয়াছেন, বিশেষ যে স্থান হইতে কোন কালে কপর্দ্দকমাত্র আয় হয় নাই, সাহেব সেই স্থানের জন্য প্রচুর করপ্রদানে সম্মত আছেন, ইত্যাদি প্রকার বিবেচনায় জয়হরিচন্দ্র ও তাঁহার সুদক্ষ দেওয়ান কথার প্রস্তা-বনাতেই সাহেবকে ঐ জমি পাট্টা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু যোগেশচন্দ্র শিক্ষা-প্রভাবে পাশ্চাত্য চাতুরী ভেদ করিতে পারি-তেন। সাহেবেরা যে, উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন কার্য্যেই প্রাণপণ যত্ন করেন না, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, এই কারণে তিনি মহারাজকে সহসা সাহেবের কথায় সম্মত হইতে নিরস্ত করিয়া প্রকৃত কারণের অন্বে-ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতি অল্প দিবসেই পর্ব্বতের লৌহ-প্রসবিনী

শকির বিষয় অবগত হইয়া তিনি মহারাজকে স্বয়ং 'ঐ' স্থানে একটি কারখানা খুলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, মহারাজও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু লৌহ প্রস্তুতিকৌশল সাহেব ব্যতীত তাঁহারা স্বয়ং জানিতেন না বলিয়া সাহেব এই কারখানায় এক জন শূন্যভাগী হইলেন। গাট্রে ইহাতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু এই সময় হইতে যোগেশ চন্দ্রের উপর তিনি জাতক্রোধ হইলেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, যোগেশ বর্ত্তমানে তাঁহার নিজ অভীষ্ঠ সুচারুরূপে সিদ্ধ হইবে না, ক্রমে ক্রমে তিনি যোগেশের এক জন জাতশত্রু হইয়া উঠিলেন। এ দিকে কারখানায় মহা ধূম ধামে কার্য্য চলিতে লাগিল। প্রথম বৎসরে বিলক্ষণ লাভ হইল; মহারাজ জয়হরিচন্দ্র কাঞ্চন পাহাড়ীর তলদেশে একটি সুরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার কাঞ্চনভবন নাম প্রদান করিলেন ও সমস্ত কারখানার তত্ত্বাবধানের ভার যোগেশের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহার বাস জন্য ঐ ভবন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। যোগেশ চন্দ্র এই সময় হইতে বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই কেবল গঙ্গাদহে গমন করিতেন, নতুবা অধিকাংশ কালই কাঞ্চনভবনে অতিবাহিত করিতেন। যোগেশ সমস্ত কার্য্য নিজ চক্ষে সন্দর্শন করিতেন, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গাট্রের নিকট হিসাব বুঝিয়া লইতেন, এই কারণে সাহেব বাহাদুর যোগেশের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন।

শীতকালের বেলা, প্রায় চারিটা বাজিয়াছে, সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে যোগেশচন্দ্র অশ্বারোহণে কাঞ্চন পাহাড়ীর শিখরদেশে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পর্ব্বতমূলে লতাপল্লবাচ্ছাদিত একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে দুইটি রমণী-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন। রমণীদ্বয়ের মধ্যে প্রথমা প্রবীণা, যোগিনীবেশধারিণী, বৃক্ষস্কন্ধে পৃষ্ঠদেশ হেলাইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার সম্মুখে একটি ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী,

ভূপৃষ্ঠে জানু রক্ষা করিয়া, আলুলায়িতকেশে, যুগ্মকরে, ঊর্দ্ধমুখে, নীলাকাশ প্রতি চাহিয়া আছেন। মরি, মরি, সে কি মূর্ত্তি! যোগেশচন্দ্র অশ্ববেগ সংবরণ করিয়া একমনে স্থিরদৃষ্টিতে সেই অপার রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। যুবতীর বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, জানুভরে উপবেশন করায় নিবীড় সুচিকণ কেশদাম পৃষ্ঠদেশ ঝাঁপিয়া নিতম্ব নিম্নে মৃত্তিকা চুম্বন করিতেছে; দুই এক গাছি চূর্ণ কুন্তল বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া নিটোল উজ্জ্বল ললাটখানিতে ও গোলাপকুসুম-বিনিন্দিত চিবুকে আসিয়া ক্রীড়া করিতেছে। কামিনীর চক্ষু দুটি যেন সুধার সরোবর—মরি, মরি, সে চক্ষুর কি তুলনা আছে—সে স্থূল-সুষম, সুবঙ্কিম, ঘনকৃষ্ণ ভ্রূতলে সেই পক্ষ্মশোভিত চক্ষের কি তুলনা আছে! —যোগেশচন্দ্র সেই নীলোজ্জ্বল, আবেশময় কৃষ্ণতার চক্ষু দুটি দেখিলেন, সেই অতল অসীম রূপরাশিতে ডুবিলেন, সেই দেববাঞ্ছিত লাবণ্যসাগরে চিরজীবনের মত নিমগ্ন হইলেন। অভাগিনী জয়াবতী! এ সময় কোথায় তুমি? অনন্ত সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে যে তৃণ অবলম্বন করিয়া তুমি এত দিন জীবিত ছিলে, তাহা আজ হারাইলে; তুমি যে একটিমাত্র নক্ষত্রের আলোক অবলম্বন করিয়া নিবীড় ঘনান্ধকারবেষ্টিত দুর্গম বন্ধুর পথে গমন করিতেছিলে, ঐ সে নক্ষত্র মেঘান্তরালে লুকাইল; তোমার শূন্য হৃদয়ে যে একটিমাত্র আশার দীপ আজিও পর্য্যন্ত জ্বলিতেছিল, পার্ব্বতীয় সমীরণে অদ্য তাহা নির্ব্বাপিত হইল।—মুগ্ধে! তুমি হৃদয়, প্রাণ, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা পৃথিবীর যাহা কিছু সমস্ত প্রদান করিয়া যে হৃদয়ের প্রেমতন্ত্রী উত্তেজিত করিতে পার নাই, ঐ দেখ, এক জন অপরিচিতা বালা কেবল আপনার অলৌকিক রূপরাশি-প্রভাবে অলক্ষ্যে, নিজ অজ্ঞাতসারে, সেই হৃদয়ের সেই তন্ত্রীতে সবলে আঘাত করিতেছে। যোগেশচন্দ্র সেই স্থানে বিশ্বসংসারের সমস্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে

অভূতপূর্ব্ব নব নব ভাবতরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল. তিনি কলের পুত্তলিকার ন্যায় অশ্ববল্গা হস্তে করিয়া সেই স্নিগ্ধ রূপের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

নবীনা যেরূপ আরাধনার ভাবে বসিয়াছিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ভাবে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বদনখানি নামাইলেন ও যোগিনীর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, মধুরকণ্ঠে বলিলেন—"দেবি, আমি পারিলাম না, সংসারে আমার কোন বন্ধন নাই, তথাপি এ সংসার পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না ;—কি জন্য তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু অভাগিনী হইয়াও আমার এ সংসার পরিত্যাগ করিতে মন চাহিতেছে না—বুঝি বা অদৃষ্টে আরও অনেক দুঃখ আছে।"—এই কথা বলিতে বলিতে বালার নয়নদ্বয় দিয়া মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাঁহার নমিত বদনখানি সম্মুখে ঈষৎ হেলিল, শ্বাসপ্রবাহে উচ্চ বক্ষস্থল আন্দোলিত হইতে লাগিল। যোগিনী তখন সুন্দরীর মস্তকখানি আপন বক্ষমধ্যে স্থাপন করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন—"সংসারে কোন্ সাহসে থাকিবে ? আমিই বা কাহার হস্তে তোমায় রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব ? যে ভেলা বাঁধিয়াছিলাম, সংসারসাগরে তাহা ডুবিয়াছে, এখন এই পথই অবলম্বন কর।" সুন্দরী বলিলেন—"মা, সব বুঝিতেছি, কিন্তু কি জানি কেন মন বুঝিতেছে না, মনকে বুঝাইবারও প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু তথাপি মন বুঝিতেছে না।" তাঁহাদের এই প্রকার কথোপকথন হইতে হইতে সূর্য্যদেব অস্তাচল গমন করিলেন, সন্ধ্যা আগত দেখিয়া যোগিনী যুবতীকে বলিলেন—"বাছা, তবে আজ গৃহে গমন কর, কাল যাহা হয় মীমাংসা করিব"। পর্ব্বতের শিখরদেশে যোগেশচন্দ্র এখনও পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আছেন, অন্ধকার হইয়াছে, তথাপি অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই অনিন্দ্য রূপরাশি দেখিবার প্রয়াস পাইতেছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিতে

পাইলেন যে, যে স্থানে যোগিনী ও যুবতী বসিয়া আছেন, তাহার অনতিদূরে একটি বৃক্ষতলে দুইটি লোক প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া কি কথোপকথন করিতেছে; যোগেশচন্দ্র পরিচ্ছদ-দর্শনে জানিতে পারিলেন যে, উহাদের মধ্যে এক জন গার্টে্র সাহেব। যোগেশের মন তখন যুবতীময় হইয়াছিল, তিনি গার্টে্রকে দেখিলেন, কিন্তু সে সেই সময়ে প্রচ্ছন্নভাবে যুবতীর নিকট কি জন্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহার অভিসন্ধি কি, তাহা ভাবিবার সময় পাইলেন না, তৎক্ষণাৎ নয়ন ফিরাইয়া সেই যুবতীর অন্বেষণে দৃষ্টি নিয়োজিত করিলেন। রমণীদ্বয় কথোপকথন সমাপ্ত করিয়া উঠিলেন, যোগিনী যুবতীর প্রফুল্ল চিবুক হস্তে ধারণ করিয়া সেই অমল শ্বেত শতদলবদনে চুম্বন করিলেন, সেই নবনী-বিনিন্দিত কনকলতা একবার স্নেহভরে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং পরক্ষণেই পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন; যুবতী মন্থরগমনে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই পর্ব্বতের গুহা মধ্যে যোগিনী অদৃশ্য হইলেন, যুবতীও সম্মুখে গমন করিতেছেন দেখিয়া যোগেশচন্দ্র সুপ্তোত্থিতের ন্যায় প্রেমমোহ হইতে জাগরিত হইয়া আপন অশ্ব পুনশ্চালন করিলেন। অশ্ব চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু যোগেশের নয়ন যুবতীর প্রতি স্থাপিত রহিল। অশ্ব দুই চারি পদ গমন করিয়াছে, এমন সময় যোগেশচন্দ্র অশ্ব পৃষ্ঠে চমকিয়া উঠিলেন; তিনি দেখিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি যে গার্টে্র ও তাহার অন্য এক জন সঙ্গীকে বৃক্ষমূলে দেখিয়াছিলেন, তাহারা অলক্ষিতভাবে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সুন্দরী যুবতীর উপর আক্রমণ করিয়াছে, বালা ভয়বিহ্বলা হরিণীর ন্যায় ছটফট করিতেছে ও উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে। যোগেশচন্দ্রের প্রতিধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রবল হইয়া উঠিল, মুখখানি আরক্ত হইল, ক্রোধে হস্তে দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ হইল। তিনি দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া বালার নিষ্কৃতির জন্য বায়ুবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন, ও নিমেষ মধ্যে

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে গাট্রেকে বলিলেন—দুরাত্মন্! এই তোর খৃষ্টীয় শাস্ত্রের ধর্ম্মপরায়ণতা। যোগেশকে দেখিবামাত্র গাট্রের সহচর যুবতীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, গাট্রেও বিফলমনোরথ হইয়া যোগেশের মুখপ্রতি ক্ষুভিত ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রতিহিংসাপূর্ণচক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল। যোগেশ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রমণীকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া দেখেন, সে কুসুমিত শারদ লতিকা হতচেতন হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছেন।

ছোট বৌর ঝাঁপি।

ভুলেছি তাহায়।

১

আর কেন তার কথা, তুলিস স্বজনি?
ভুলেছি সে চারু মুখ,
ভুলেছি সে প্রেম-সুখ,
ভুলেছি সে চারু চোরা আঁখির চাহনি,
আর কেন তার কথা তুলিস স্বজনি?

২

ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর, ভেঙ্গেছে স্বপন,
ভেঙ্গেছে সুখের আশা,
ভেঙ্গেছে সে ভালবাসা,
ভেঙ্গেছে মিলন-সাধ, প্রেম-আকিঞ্চন,
ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর, ভেঙ্গেছে স্বপন।

৩

চিনেছি লো ভাল ক'রে, সে জন যেমন,

নবীন কুসুম-পাশে
সদা ফেরে মধু আশে,
বাসি ফুলে মন তার বসে না কখন,
চিনেছি লো ভাল করে সে জন যেমন।

৪

ঘুচেছে "আমার" বলা মিছে অভিমান,
আমি জানিতাম ভাল,
সে আমারে বাসে ভাল,
তাই তো জীবন তারে করেছিনু দান,
ঘুচেছে "আমার" বলা মিছে অভিমান।

৫

যে দিন জেনেছি, সখি, শঠের চাতুরী,
যে মুখ-পূর্ণিমা-শশি
নয়নে থাকিত পশি,
মুছেছি নয়ন হ'তে সে রূপ-মাধুরী,
যে দিন জেনেছি, সখি, শঠের চাতুরী।

৬

সে রূপ ভুলেছি, সখি, হৃদয় হইতে,
প্রেম-সাধনের ধন
করিয়াছি বিসর্জ্জন,
রেখেছি নিরাশ কুম্ভ মানস বেদীতে,
সে রূপ ভুলেছি, সখি, হৃদয় হইতে।

৭

আর কি প্রাণের টান থাকে তার প্রতি?
ভুলেছি সে অনুরাগ,
ভুলেছি প্রেমের দাগ,

মুছেছি হৃদয় হ'তে তার সে মুরতি,
আর কি প্রাণের টান থাকে তার প্রতি ?

৮

দেখা হলে, সখি, তুই বলিস তাহারে,
আর যেন রসে ভেসে,
হেসে হেসে কাছে এসে,
জ্বালার উপরে জ্বালা না দেয় আমারে,
দেখা হলে, সখি, তুই বলিস তাহারে।

৯

মাতা খাস, এই কথা রাখিস আমার,
কি জানি হেরে সে মুখ,
পাছে লো বিদরে বুক,
পাছে লো শিথিল হয় এ পণ আবার,
মাতা খাস, এই কথা রাখিস আমার।

তারে ভুলিবে কেমনে?

১

কেমনে ভুলিবে, সখি, মন-চোরা ধনে ?
হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে,
শোণিতের মাঝে মাঝে;
মিশায়ে রেখেছ তারে নাহি কি তা মনে ?
কেমনে ভুলিবে, সখি, মনচোরা ধনে ?

২

ভুলিলে কি ভোলা যায় সে চারু বদন ?

যে রূপ বারেক হেরে,
পড়িয়া প্রেমের ফেরে,
আপনা ভুলিয়া প্রাণ করেছ অর্পণ,
ভুলিলে কি ভোলা যায় সে চারু বদন।

৩

ভালবাসা পাবে ব'লে বাসনি তো ভাল,
তবে অন্য কুলগত,
দেখি কেন মানে রত ?
বলিতে তো তার ভাল যাতে, তাই ভাল,
ভালবাসা পাবে ব'লে বাসনি তো ভাল।

৪

চাঁদেতে কলঙ্ক আছে সবাই জেনেছে,
তবু তো চকোরী ধায়,
তবু কুমুদিনী চায়,
ভুলিতে সে চাঁদমুখ কভু কি পেরেছে ?
চাঁদেতে কলঙ্ক আছে, সবাই জেনেছে।

৫

ও মন তোমার নয়——মিছে অভিমান,
ভেবে দেখ মনে মনে,
কি আর রেখেছ মনে ?
নিঙ্গুড়ি নিঙ্গুড়ি মন করিয়াছ দান,
ও মন তোমার নয়——মিছে অভিমান।

৬

নেবে বলে প্রাণ তারে দেওনি তো সই,
রাগ, পণ, অভিমান,
সব যে করেছ দান,

ভেবে দেখ দেখি প্রাণে, প্রাণ আর কই ?
নেবে ব'লে প্রাণ তারে দেওনি তো সই ?

৭

যা বল তা আজ বল অভিমান-ভরে,
এখনি গলিবে মন,
এখনি ভুলিবে পণ.
আঁখি জলে জল হবে দেখা হলে পরে,
যা বল তা আজ বল অভিমান ভরে।

৮

এ শুধু লো প্রতারণা আপনার মনে,
একবার মুদে আঁখি,
হৃদয়ে হৃদয় রাখি,
দেখ দেখি কার রূপ জাগে ঐ মনে ?
এ শুধু লো প্রতারণা আপনার মনে।

৯

হবে না, রবে না যাহা, ভেব না তা চিতে,
জ্বালিছ যত আগুন,
বরষিবে শত গুণ,
ক'জন পারে লো মন দিয়ে ফিরে নিতে ?
হবে না, রবে না যাহা, ভেব না তা চিতে।

——••——

বঙ্গীয় লেখক।*

ঊনবিংশ শতাব্দীর অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালাভাষা যুগান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। যে বঙ্গভাষা পূর্ব্বে অতি দীন, ক্ষীণ ও মলিন বেশে পৃথিবীর এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, আজ ইয়ুরোপীয় বিদ্যালোক-সম্পন্ন তাঁহার সন্ততিবর্গ সেই বঙ্গভাষার কতই না উন্নতি সংসাধন করিয়াছেন। আজ বঙ্গভাষা ভাষামধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য হইয়াছে ; ইতঃপূর্ব্বে ইহার বিন্দুমাত্রও সমাদর ছিল না। কেহ ভ্রমাক্ষরেও একবার বঙ্গভাষার নাম করিতেন কি না সন্দেহ, অধিক কি, যে সন্তানগণের যত্ন, উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ে ইহার বিমল জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারাই পূর্ব্বে সম্মানহানির আশঙ্কায় বঙ্গভাষা সম্পর্কীয় কোন কথা মুখে আনয়ন করিতেও সাহসী হইতেন না। ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভাষার যে শোচনীয় দুরবস্থা ছিল, তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প হইয়া থাকে। লোকলজ্জাভয়ে সকলেই পাশ্চাত্য বিদ্যাবিভূষিত হইয়া বঙ্গভাষার প্রতি অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাতেই মনোগত ভাব-প্রকাশে অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রাপ্ত হইতেন। আমাদিগের মাতৃভাষার ঈদৃশী দশা-বিপর্য্যয় সংঘটিত হওয়াতে আমরা নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি এবং কায়মনোবাক্যে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করিতেছি। যাহাতে ইহার অঙ্গে কোনরূপ কলঙ্ক প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, তৎপক্ষে আমরা সাতিশয় দৃষ্টি রাখিয়া থাকি। অদ্য আমরা ভাষার এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কথঞ্চিৎ অবনতির সূত্র-দর্শনে তদ্বিষয়ে সাবধান করিতে অগ্রসর হইলাম। ভরসা করি, সকলেই আমাদিগের সারাংশ গ্রহণপূর্ব্বক তন্নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইবেন।

*আমরা অনেক বার বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি, আমরা লেখক-গণের মতামতের জন্য দায়ী নহি।

ইদানীন্তন কালে বাঙ্গালাভাষায় সাময়িক পত্রের আর অপ্রতুল নাই। দিনে দিনে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বঙ্গীয় যন্ত্রালয়সমূহ অজস্রধারে পত্রিকা উদ্গীরণ করিতেছে; বস্তুতঃ আজ কাল নাটক লিখা আর পত্রিকা প্রচার প্রায় সমশ্রেণীস্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুশিক্ষিতগণ পত্রিকা প্রচার দ্বারা ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদিত এবং অশিক্ষিতগণ তদ্দ্বারা ভাষার আবর্জ্জনা পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন। মনুষ্য মাত্রেরই স্বাধীন মন; কেহ কাহারও ধার ধারেন না, যাঁহার মনে যখন যে ভাবের সঞ্চার হইতেছে, তিনি তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। অন্যের তাহাতে প্রতিকূলতাচরণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। আপনার পয়সা খরচ করিয়া যে যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাতে অপরের কি ক্ষতি? এই যুক্তিসূত্রের উপর নির্ভর করিয়া আজ কাল সকলেই পত্রিকাসম্পাদক হইয়া দেশ বিদেশে নাম জাঁকানের সদুপায় (!) অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রথায়, এই সন্নীতি অনুমোদিত কার্য্য-তৎপরতায় (!) দেশ যে সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে, তৎপ্রতি সাধারণের দৃষ্টি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অশিক্ষিতেরা মনে করেন, আমার যাহা ইচ্ছা হইল লিখিলাম, মুদ্রাঙ্কিত করিলাম, দেশে দেশে প্রচার করিলাম, তাহাতে অন্যের কি ক্ষতি? অন্যে তাহাতে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে আসিবে কেন? আমরা বলি, ইহাতে অন্যের ক্ষতি আছে বলিয়াই অন্যের বাধা জন্মাইবারও আবশ্যকতা আছে। তোমার যাহা ইচ্ছা হইল, দশটা ছাই ভস্ম পরিপূর্ণ দেশের অহিতকর প্রস্তাব প্রকটিত করিলে, কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইল, তাহা তুমি ভ্রমেও একবার মনে করিলে না; তাহা যে দেশের কত অনিষ্টকর হইল, তাহা তুমি দেখিয়াও দেখিলে না। এইরূপ অলস এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ হইতে বঙ্গভাষার অবনতি হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে যাহাতে প্রাগুক্ত পথ হইতে নিবৃত্ত করা

যায়, বঙ্গবাসী এক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তিও আজ পর্য্যন্ত এমত উপায় অবলম্বন করিলেন না। বাঙ্গালি বাহিরে আপনার সভ্যতা ও উন্নতি লইয়া যথেষ্ট গর্ব্ব করিতে পারেন, কিন্তু উঁহার অভ্যন্তরে যে কত পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনারাশি স্তূপীভূত হইয়া দেশের এবং দেশস্থ জনগণের অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তৎপ্রতি এক জনে একবার ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করেন না। কয় জন এইরূপ ভাষাকে লাঞ্ছিত, পাদদলিত, মর্দ্দিত এবং অবহেলিত দেখিয়া তাহার উন্নতি-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন? বঙ্গদেশের বর্ত্তমান নানাবিধ বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক দুরবস্থা দেখিয়া কয় জনের হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে? কয় জনে তাহার প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইয়াছেন?

আমরা অনেক দিন হইতে বঙ্গবাসীদিগের এইরূপ মোহাচ্ছন্নতা প্রত্যক্ষ করিতেছি, অনেকবার অনেককে যথেষ্ট অনুরোধ অনুযোগও করিয়াছি, কিন্তু কেহই এপর্য্যন্ত ভাষার বা দেশের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিলেন না। যাঁহারা বাহিরে দেশহিতৈষিতা দেশহিতৈষিতা বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও অভ্যন্তরে যেই সেই রহিয়াছেন। তবে আর কিরূপে এই দুর্দ্দশান্বিত সমাজের পুনরুন্নতি সংসাধিত হইবে? কিরূপে বঙ্গীয় সমাজ পুনর্ব্বার উন্নতাসনে আসীন হইয়া জ্ঞানালোক বিতরণে প্রবৃত্ত হইবে? আমরা এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া এবং বাঙ্গালীগণের আলস্যপরতন্ত্রতা ও দীর্ঘসূত্রতা দেখিয়া আর বহুকাল মূকভাব অবলম্বন শ্রেয়ঃ মনে করিলাম না। আশা করিয়াছিলাম, গোপনেই কার্য্য সম্পাদিত করিব, কিন্তু দুর্ভাগ্য বাঙ্গালি জাতির ভাগ্যে অভিলাষানুরূপ ফল ঘটিয়া উঠে না। বহু যত্ন, বহু আয়াস এবং বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও যখন তাঁহাদিগদ্বারা অভীপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখিলাম না, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়াই প্রকাশ্য রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইতে হইল।

অধুনা বঙ্গভাষা নাটকোপন্যাসে পরিপ্লাবিত। ঝুরি ঝুরি বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্য হইতেও একখানা সদ্‌গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেখানে যাও, সেখানেই শুনিবে, "অদ্য একখান নূতন নাটক প্রকাশিত হইয়াছে"—যেখানে যাও, সেখানেই শুনিবে, "এই উপন্যাস খানা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে"! দেশে, বিদেশে, নগরে, গ্রামে, আপণে, বিপণীতে সর্ব্বত্রই নাটকোপন্যাসের ছড়া ছড়ি। বাঙ্গালা দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা যিনিই একটুকু লিখিতে এবং পড়িতে শিখিয়াছেন, তাঁহারই ঘরে একখানা নাটক কি উপন্যাস দেখিতে পাইবে। ঈদৃশ নাটকোপন্যাসের বাহুল্যে বঙ্গীয় সাহিত্যের বিন্দুমাত্রও উন্নতির সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত এতদ্দ্বারা বঙ্গভাষা এবং বঙ্গদেশের ভূয়সী অবনতি সংসাধিত হইতেছে। অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, যখন বিদেশীয় সমুন্নত ভাষামণ্ডলী মধ্যে উপন্যাসের প্রাচুর্য্য দেখিতেছি, তখন আমাদিগের মাতৃভাষায় তাহার বহুল প্রচার দূষণীয় হইবে কেন? আমরা বলি, তাদৃশ বিষয়ের আলোচনা দেশের সাময়িক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি আজ ভারতবর্ষের অবস্থা ইংলণ্ড কি অন্যান্য দেশের ন্যায় সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও স্বাধীন হইত, তাহা হইলে তাদৃশ বিষয়ের আলোচনায় কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মর্ম্মে যার পীড়া, গাত্রে যার কষাঘাত, সে কেন গলি গলি আধ্‌ধার তালে ঝিঁঝিট খাম্বাজ গাইয়া বেড়ায়? এক্ষণ তরুণ সম্প্রদায়ের উপরই বঙ্গদেশের ভাবী আশা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কতকগুলি বঙ্গীয় গ্রন্থকার এবং পত্রিকাসম্পাদক উপদেষ্টৃস্থলে অভিষিক্ত হইয়া নিয়তই বিকৃত রুচির পরিচায়ক জঘন্য নাটকোপন্যাস সমূহ তাঁহাদিগের পাঠনীয় সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদিগের ঈদৃশ ব্যবহারে বঙ্গীয় অধিকাংশ পাঠকই এখন নাটকোপন্যাসের এত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, আজ কাল কোন অভিনব মাসিকপত্র প্রচার করিতে হইলে বাধ্য

হইয়াই উপন্যাস লিখিতে হয়। উপন্যাস প্রকাশ না করিলে বঙ্গবাসী পত্রিকা পড়িবেন না। এমন কি, যে পত্রিকা উপন্যাস অপ্রকটিত রাখিতে কৃতসংকল্প হন, তাঁহাকে অচিরেই সাহিত্য-সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। ইহা কি নিতান্ত দুঃখ এবং অসৌভাগ্যের বিষয় নহে? উপন্যাসের ঈদৃশ বাহুল্যে তরলমতি যুবকগণ ক্রমশঃ চিন্তায় অশক্ত হইয়া পড়িতেছেন, এবং কল্পিত গল্পপাঠে তাঁহাদিগের মানসিক বৃত্তিনিচয় এত দূর নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে যে, আর কোন প্রগাঢ় চিন্তাসাধ্য বিষয়েই তাঁহারা মনঃসংযোগ করিতে পারেন না। বঙ্গীয় অলসা কুলবধূগণও যদি একটু আধটু লিখিতে কি পড়িতে শিখিলেন, অমনি একখানা নাটক কি উপন্যাস লইয়া বসিলেন, আর প্রাণনাথ, প্রাণেশ্বর বলিয়া পত্র প্রচার আরম্ভ করিলেন। সুতরাং এইরূপ ভাবে চলিলে আর বিংশতি বৎসর পরে এই দুর্ভাগ্য দেশের যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া উঠিবে, তাহা কল্পনায়ও স্থান পায় না।

বঙ্গদেশে এক সময়ে নাটকের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল ; ভালই হউক, আর মন্দই হউক, নাটক ব্যতীত অন্য গ্রন্থ বাঙ্গালী চক্ষে দেখিত না, অন্য কথা তাহার নিকট বিষের ন্যায় বোধ হইত। অধুনাতন নব্য সভ্য সম্প্রদায় নাটক পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন। কুক্ষণে বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিলেন, আর অমনি চতুর্দ্দিক হইতে "বাহবা"র ধ্বনি উঠিতে লাগিল। কেহ বলিল "এমন গ্রন্থ আর হয় নাই"। কেহ বলিল, "ঈদৃশ গ্রন্থকার বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে সর্ব্বোচ্চাসন প্রাপণের সর্ব্বথা উপযুক্ত। বাঙ্গালাভাষার সৌভাগ্য যে এহেন সুরুচি-সম্পন্ন স্বদেশ হিতৈষী ভাষার পুষ্টিসাধক অনন্যসাধারণ, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বঙ্গভাষায় লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন।

[১] বাস্তবিক বলিতে গেলে আমাদিগের মতে বঙ্কিমবাবু দ্বারা বঙ্গ ভাষার যত দূর অবনতি সাধিত হইয়াছে, এত আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, পিতা মাতা কি গুরু শিক্ষকের ভয়ে নাটক পড়িতে সাহস পাইত না। এক্ষণে স্বীয় জনক অথবা বিদ্যালয়ের মাষ্টার মহাশয় সসম্ভ্রমে একখানা গ্রন্থ হস্তে করিয়া পুত্র অথবা শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ বঙ্কিমবাবু এবার কি অপূর্ব্ব গ্রন্থই বিরচন করিয়াছেন, একখানি গ্রন্থের মধ্যে কতই রসাভাস পরিপূর্ণ সুললিত বচন পরম্পরা, কতই ঘটনা-বৈচিত্র্য, সৃষ্টি বৈচিত্র্য এবং কল্পনার লীলাখেলা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি ভরসা করি, তুমি অবশ্যই অভিনিবেশ সহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিবে।" সুযোগ্য পুত্র অথবা শিষ্যও উপদেশানুরূপ কার্য্য করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত (!) হইলেন। ফলতঃ বঙ্কিমবাবুকে সাহিত্য সমাজে অনুচিত প্রাধান্য প্রদান করিয়া বঙ্গবাসিগণ আপনার শত্রু আপনি ডাকিয়া আনিয়াছেন, আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু যে কেবল অল্পবয়স্ক বালক বালিকা এবং যুবকবৃন্দের মাথা খাইয়াই নিরস্ত রহিয়াছেন, এমন নহে। তিনি ভাষারও বিশেষ অনিষ্ট সংসাধিত করিয়াছেন। তাঁহাদ্বারা ভাষার যত দূর কলঙ্ক হইয়াছে, অন্য কাহারও দ্বারা তত দূর হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ এতদ্দ্বারাই লেখকের ভাষাজ্ঞান ও ব্যাকরণাভিজ্ঞতা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

---

[১] ব্যক্তিগত দোষের উল্লেখে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু যাহার সহিত সমাজের ঘনিষ্ট সম্পর্ক তাহার দোষোল্লেখ অযুক্তিসঙ্গত নহে। পরন্তু বঙ্কিম বাবু দ্বারা যে দেশের কোন উপকার হয় নাই, ইহা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। তাঁহাদ্বারা ভাষার যতদূর উপকার হইয়াছে, অপকার তাহার চতুর্গুণ হইয়াছে।

"সেই রাত্রের প্রভাতে শয্যাগৃহে মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

"দেখিলেন, সেই শ্যামা সুন্দরী, যাহার সর্ব্বাবয়ব সুললিত গঠন ছিল, এক্ষণে বিশুষ্কবদন, শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ন-নয়নেন্দীবর।"

ঐ

"কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে আমাকে ত্যাগ করিবে?"

ঐ

"তিনি গৃহপ্রবেশদ্বারের কবাট, খিল, কব্জা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন।"

ঐ

"এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে অভিনব সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ইহার সুশীতল ছায়ায় এই তপ্ত ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হউক।"

বঙ্গদর্শন, ৫ম খণ্ড।

"শুনিয়া ক্রোধে হীরার পদ্মপলাস চক্ষু রক্ত-ময় হইল। কর্ণরন্ধ্রে অগ্নিবৃষ্টি হইল।

বিষবৃক্ষ।

"অতএব এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বলিবে, যদি মাথা বাড়াইয়া দাও, এক্সপেরিমেণ্ট করিব। দেখিবে, গ্রাবিটেসনের বলে এই সকল নারিকেলাদি তোমার মস্তকে পড়িবে, পর্কশন নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে এবং দেখিবে, তোমার মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত করিবে।"

কমলাকান্তের দপ্তর।

"যদি স্বচ্ছ সরোবরে শরচ্চন্দ্রের কিরণ-সম্পাতে যে ভাব-ব্যক্তি তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিবে।"

বিষবৃক্ষ।

"তাঁহারা যতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিলেন, ততক্ষণে সহসা গৃহ আলোকপূর্ণ হইল।"

চন্দ্রশেখর।

"দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী—দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্বসঞ্চালন করিলেন।"

দুর্গেশনন্দিনী।

"ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে, এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লম্ফত্যাগে ভূতলে অবতরণ করিলেন।"

ঐ

"যদি ইঙ্গিতে বা ছলনাক্রমে যুবককে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে পারি, তবে তাহা কর্ত্তব্য বটে, এই ভাবিয়া নারীস্বভাবসিদ্ধ চতুরতার সহিত বলিলেন।"

ঐ

"এমত নহে যে একেবারে বায়ু বহিতেছিল না। মধুমাসের দেহ-স্নিগ্ধকর বায়ু অতি মন্দ, একান্ত নিঃশব্দ বায়ুমাত্র। তাহাতে কেবলমাত্র বৃক্ষের সর্ব্বাগ্রভাগারূঢ় পত্র গুলিন হেলিতেছিল, কেবলমাত্র আভূমি প্রণত শ্যামলতা দুলিতেছিল"।

কপালকুণ্ডলা।

"আপনি রাজনীতি বিশারদ, এক্ষণে ভূমণ্ডলে যত রাজগণ আছেন, সর্ব্বাপেক্ষা বহুদর্শী, প্রজাপালক, আপনিই আজন্ম রাজ"।

মৃণালিনী।

"যে দিন প্রদোষকালে যমুনার উপকূলে, নৈদাঘানিল সন্তাড়িত বকুলতলে দাঁড়াইয়া নীলাম্বুময়ীর চঞ্চল তরঙ্গশিরে নক্ষত্র-রশ্মির প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে২ উভয়ে উভয়ের নিকট সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পর এই সাক্ষাৎ হইল,,।

মৃণালিনী।

বঙ্গ দেশোদ্ভূত অপর কোন লেখক যদি ঈদৃশ জঘন্য ভাষায় স্বকীয় গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও বক্তব্য ছিল না। কিন্তু বঙ্কিম বাবু সাহিত্য-সমাজের যে উচ্চাসনে আসীন হইয়া অবিশ্রান্ত এতাদৃশ নীচভাষায় গ্রন্থ প্রচার দ্বারা বঙ্গভাষার সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তাদৃশ আসনের অবমাননা হয় বলিয়া বিশেষতঃ বঙ্গবাসী নব্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশকেই উঁহার পশ্চাদনুবর্ত্তী দেখিয়া আমাদিগকে তৎসম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিতে হইল।

(ক্রমশঃ)

শিবের ষষ্ঠীবাটা।

"আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর
ভাবিয়া দেখহ, প্রভু, অনেক অন্তর।,,

জ্যৈষ্ঠ মাস। কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেবের কলমের বাগানে আম ও লিচু গাছের সবুজ পাতার মধ্যদিয়া রাঙ্গা রাঙ্গা ফলের থোকাগুলি, যেন শ্যামাঙ্গী সুন্দরীর কাণে ইয়ারিঙ্গের মত, মৃদু মৃদু দুলছে। বাগানের উত্তর কোণে ভৃঙ্গী দাদা কুঁড়ের সম্মুখে বসে সিদ্ধি ঘুঁটছেন, আর এক এক বার এ পাশ ও পাশ চেয়ে বাগান চৌকি দিচ্ছেন। শিব আশুতোষ, ভোলানাথ, যে এসে দুটো ভাল কথা বলে, তাকেই

সর্ব্বস্ব দিয়ে বসেন; সুতরাং হাকিম ও টাকাওয়ালা বড় বড় লোকের বাড়ী ডালি দিতে শেষে টানা টানি পড়ে ? তাই এবার শিবানী ভৃঙ্গীকে ডেকে কড়া হুকুম দিয়েছেন,—"যেন বাজে লোকে (যাদের টাকা নেই) গাছের একটি ফলে হাতটি না দেয়, সব বড় লোকের বাড়ী ডালি যাবে, বাকি ফল তিনি ষষ্ঠীবাটার দিন যখন জোড়ে বাপের বাড়ী যাবেন, তখন হিমালয়ে চালান হবে।"

শ্বশুরবাড়ীর ভাল মন্দ জিনিস বাপের বাড়ী পাঠান স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। আমাদেরও বাটীর রাঙ্গা বউ নূতন বরের নূতন গিন্নী হয়েছেন, ভাঁড়ারের চাবি তাঁর নিজের হাতে, খাবার জিনিস পত্রে পচে গন্ধ উঠবে, তবু তাহা বাড়ীর একটি প্রাণী পাবে না—২০।২৫ দিন অন্তর, "কন্‌সারভেন্‌সির" কিসর মত, ভারে ভারে বাপের বাড়ী চালান হবে। শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর, ননদ—স্বামীর কুটুম্ব—পর বই তো নয়, সুতরাং, তাদের দেওয়া কেবল জলে ফেলা; আপনার মা, বাপ, ভাই, ভগিনীকে না দিতে পারিলে প্রাণ শীতল হয় কৈ ?

কৈলাসের ভৌতিক ঘড়িতে দেখতে দেখতে বিকটস্বরে ৫টা বেজে গেল, অমি নন্দী কোচম্যান হরপার্ব্বতীর হাওয়া খাবার জন্য চা'র বলদের ফেটিংখানি বিল্বকুঞ্জের সদর গেটে এনে লাগা'ল। ভাং-প্রমত্ত ভোলানাথ পার্ব্বতীর হাতখানি ধ'রে টলতে টলতে ঢুলু ঢুলু চখে গাড়িতে এসে উঠলেন।

শ্বেতাঙ্গ মহাদেবের বামে গৌরাঙ্গী পার্ব্বতীঃ—যেন খইয়ের গাদার পাশে ছাঁচি আকের গুড়। দুজনে ভাল বাসায় মাখামাখি হয়ে হাঁসতে খেলতে চলেছেন, এমন সময় রাস্তার ধারে খেজুরগাছে লাল টুকটুকে খেজুরের কাঁদিগুলি ঝুলছে দেখে পার্ব্বতীর হঠাৎ মনে হল, জামাই ষষ্ঠী আগত। এবারে বিজয়ার দিন বাপের বাড়ী হতে আ'সবার সময় মেনকা অনেক ক'রে ব'লে দিয়ে-

ছিলেন"—মা, এবার জ্যৈষ্ঠ মাসে, আমের সময় একবার অবিশ্যি ক'রে আসিস। কর্ত্তা মালদহের কতগুলি আমের কলম করেছেন—আহা, সে আম তো নয়, যেন পেনিটীর গুপো মোণ্ড; খাই আর ভাবি, যদি আমার উমা এর এক চাকলা খেত। এক এক বার ভাবি, একটা লোক পাঠিয়ে চা'রটি আম দিয়ে তত্ত্ব করি, কিন্তু, মা, আবার ভাবি, তা পাঠিয়েই বা হবে কি, পরের ছেলে শিব পাঁচ মুখে সব দিয়ে ব'সে থাক্‌বে, আমার মা একটু পাবে না। তাই, মা, আমার মাতা খা'স, এবার জ্যৈষ্ঠমাসে আসিস্‌। একা আস্‌তে পারিস্‌ তো ভালই হয়, কিন্তু শিব যদি নিতান্তই না ছাড়ে, তবে অগত্যা ষষ্ঠীবাটার নাম করে শিবকে শুদ্ধ আনিস্‌।"

শাশুড়ীর কাছে জামাইয়ের আদর সর্ব্বত্রই এইরূপ। শাশুড়ী মুখে বলেন—"জামাই ঘরের ছেলে" কিন্তু মনে মনে বলেন "আমার চখের বালি, কাণের কাণকোটারি, বিছানার ছার পোকা"। জামাই শ্বশুর বাড়ীর দুয়ারে পদার্পণ করিবামাত্র বাড়ীর চাকরাণী মনে মনে বলে—"মর মিন্‌সে আবার উড়ো ছাই গায়ে এসে বস্‌ল, এখনি খেটে খেটে মর্‌তে হবে"। শালাজ ভাবেন—"আপনার ঘর কন্না নিয়েই ব্যস্ত, এর উপর আবার ওদের সেবা চালায় কে?" শালা ভাবেন—"ও শালা ঘন ঘন গতায়াত করে কেন, আমার জিনিস পত্রের কিছু ভাগ নেবে নাকি? শ্বশুরের চিন্তা "এই এলেন, এখনই টাকা দাও, কাপড় দাও··· বেটার কেবল আদায় ক'রতে আসা"। শ্বশুরী মনে মনে বলেন "এসে তো উপস্থিত, এখন ক দিন থাকবেন, তা কি জানি"। শ্বশুরবাড়ীর সুবাদ আর পানের চুন দুইই সমান, ওজন বুঝে চলতে পারলে মিষ্ট লাগে, নচেৎ একটু কম হলেই ঝাল লাগে, বেশী হলেই গাল পুরে যায়।

শ্বশুরবাড়ীর আদর—হাজার হলেও কেমন তেলা তেলা, কেমন উপর উপর, কেমন ভাসা ভাসা। যেখানে রক্তে ভাগ, নাড়ীর টান নেই,

সেখানে যে প্রকৃত স্নেহের আশা করে, সে মুর্খ, মুর্খানাম্ মুর্খ। আপনারা বলতে পারেন—“তবে জামাই শ্বশুর বাড়ী থাকে কেন?—”সেটা জামাইয়ের অধর্ম্ম, পূর্ব্ব জন্মের পাপের ভোগ। তবে একটা কথা, যে মাতখেগোরে জামাই, বিলে শেয়ালার ন্যায়, হুঁকায় বন্দচের ন্যায়, কুকুরের আটুলির ন্যায়, শ্বশুর বাড়ী না-ছোড় হয়ে লেগে থাকে, পুষতে পুষতে বাড়ীর কুকুরটা বিড়ালটার ন্যায়, তার উপরও একটু মায়া হয়,—বাড়ীর কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে বেলা, তৃতীয় প্রহর হয়ে গেলে সে জামাইকে শাশুড়ী এক আধ বার দয়া করে বলে থাকেন - “ওগো, বেলা যে গেল, আর কতক্ষণ তোমার জন্যে হাঁড়ী নিয়ে বসে থাকবে, এই বেলা স্নান কর।”

ষষ্ঠীবাটার কথা মনে করেই পার্ব্বতী শিবের কাছে থেকে ঈষৎ সরে মুখখানি ঈষৎ ভারি করে বসলেন, শিব তখন সিদ্ধিতে ভোর হয়ে থাবা থাবা নসরাই গোলাপের ঝাড় দেখছিলেন, আর পার্ব্বতীর সঙ্গে প্রাণ খুলে তিন শ রগড়ের গল্প উড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ পার্ব্বতীর সাড়া না পেয়ে চেয়ে দেখেন, তাঁর ভিক্ষার ঝুলি, হাড়ের মালা, মুখের শিঙ্গা, হাতের ডমরু, মুখ ভারি করে বসে আছেন। দক্ষালয়ে সতীর মৃত্যুর পর শিব বৃদ্ধবয়সে দ্বিতীয় পক্ষে উমাকে বিবাহ করেছিলেন, দোজবরে, বিশেষতঃ বৃদ্ধ স্বামীর উপর তরুণী ভার্য্যার যে কতখানি আধিপত্য, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেউ যথার্থ হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পারে না। এই সব মহালক্ষ্মীরা স্বামীর তৃষ্ণার জল, করশীর নল, বাক্সের টাকা, গাড়ীর চাকা, ক্ষুধার ভাত, কিস্তীমাত; স্বামীর সোনার গুঁড়ি রূপার ডাল, হীরার পাতা, মুক্তার ফল, স্বামীর সর্ব্বস্ব। এঁরা ঘরে বসেই একগাছি লোহার শিকল গলায় দিয়ে বুড়া বেটাকে কাটি বাজিয়ে নাচাতে থাকেন—স্বামীর প্রপিতামহের সাধ্য কি, সে শ্রীমুখের কথা লঙ্ঘন করে।

পার্ব্বতীর মুখ ভারি দেখে শিবের মাথায় একেবারে আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, মুখখানিতে ধুল বেটে গেল, চখ দুটি ছল ছল করে শিবানীর হাত

মুখখানি ধরে বলতে লাগলেনঃ—আমার সোনার বালা, জপের মালা, স্বর্ণ-লতা, শীতের কাঁথা, গোলামের উপর কি রাগ হয়েছে? পার্ব্বতীর ভারি মুখখানি আর একটু ভারি হ'ল, তিনি শিবের কাছে হতে আর একটু স'রে ব'সে বল্‌লেন—“যাও, তোমার আর সোহাগ কর্ত্তে হবে না।”।

শিব অবাক্—আকাশ পাতাল ভেবেও প্রেয়সীর অনর্থক অভিমানের কারণ বুঝে উঠ্‌তে পারলেন না, আবার জটা চুলকা'তে চুলকা'তে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেনঃ—“আমার পাকা নোনা, বেলের পানা, কাঁচা মিঠে, আস্কে পিঠে, তুমি বই আর আমার কে আছে? সংসারে মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বুন নাই; যদি থাক্তেন, তা হ'লে তোমার মনস্তুষ্টির জন্য তাদের সমুদ্র পার করে দিয়ে আ'সতাম; স্ত্রীর কাছে কি আর কেউ? আমি আজ হ'তে নিয়ম ক'রে দেব, পৃথিবীর সকল লোকে কেবল স্ত্রীর কেনা গোলাম হয়ে থাকবে, পরিবার বল্লে কেবল স্ত্রীকে বুঝা'বে—মা, বাপ, ভাই বুন, এঁরা সেই পরিবারের মন যোগাতে পারেন থাকবেন, না পারেন, ঠ্যাংভাঙ্গা ছাগলের মত কেবল কেঁদে কেঁদে বেড়াবেন।”

ঔষধ ধরে এসেছে বুঝে পার্ব্বতী মৃদু মৃদু বলতে লাগিলেন—“মেয়ে জন্মের মত দুঃখের আর কিছুই নয়; ভেবে দেখদেখি, সেই কবে মা বাপকে ছেড়ে এসেছি, তাঁদের দে'খবার জন্যে কি প্রাণ কেমন করে না?” শিবানী যে তবে তাঁর উপর রাগ করেন নি, তা শুনে শিব অনেক আশ্বস্ত হলেন, শেষে সেই চাঁদ-বদনের থুঁতিখানিতে হাত দিয়ে আদর-মাখা-সুরে বলতে লাগলেন—“প্রিয়ে, তার জন্যে দুঃখ কেন? সম্মুখের এই বর্ষা কয় মাস গেলেই শরদকালে বাপের বাড়ী যাবে, এর মধ্যে তোমায় পাঠালে চলে কৈ? তুমি যে আমার এক ঘরের একা গিন্নী, একা শিবের একা শিবানী; বিশেষ তোমার জন্যে কুবের কোম্পানীর কাছে যে সব নুতন বিবিয়ানা অলঙ্কারের ফরমাইস দিইছি, তাও সেই শরৎকাল ভিন্ন আসবে না। শিবানী এবার প্রকৃত রাগের ভরে

বল্লেনঃ—"মুখে আগুন তোমার কুবের কোম্পানীর! লক্ষ্মীর পায়ে ডায়মন কাটা মল দেখে, ঠিক সেই রকম কর্ত্তে তারে বায়না দিলাম, তা ছাই সরু করে যেন কাটি কাটি করে দিয়েছে। ও মল তো আমি নেব না, সাত জন্ম শুধু পায় থাকি, সেও ভাল, তবুও অমন কাঙ্গালা কাঙ্গলা গহনা পরতে পারি নে। যেমন অদৃষ্ট ইন্দ্রাণীর, তোর ভারি ভারি গহনাগুলি করেছে।—তা আমার গহনা না হোক, আমি শুধু গায়েই এবার বাপের বাড়ী যাব"।

আম্‌তা আম্‌তা করে, থতমত খেয়ে, শিব বলতে লাগলেনঃ—

"তা এখন,—অসময়ে—বিনা পরবে—কেমন করে—"

রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে ফুলিয়ে শিবানী বল্লেনঃ—

"বিনা পরবে?—বটেই তো! সে জ্ঞান যদি তোমার থাকবে, তা হ'লে আর আমার দুঃখ কিসের? এই তো কয় দিন পরে জামাই ষষ্ঠী; কত দেশ থেকে, কত জামাই শ্বশুর বাড়ী যাবে, তা তুমিও কেন আমার সঙ্গে চল না"?

শিব বল্‌লেন—"সে শ্বশুরবাড়ী, ষষ্ঠী-বাটায়, বিনা নিমন্ত্রণে কেমন ক'রে যাব?—তাতে যে অপমান হবে।"

সারস পাখীর মত ঘাড়টি হেলিয়ে শিবানী বলে উঠলেনঃ—

"ওরে আমার মানের ডালি! চিরকালই বুঝি শ্বশুর বাড়ী হতে নিমন্ত্রণ হবে? মা বাপে সেয়ানা ছেলের হাতে দিয়েছেন কেন? ছেলে মানুষ জামাই হত, শ্বশুর শাশুড়ীতে সাধ আহ্লাদ কর্ত্তো, তাঁরা দোজবরের হাতে দিয়েছেন, তোমারই উচিত তাঁদের দেওয়া। আহা, মার মুখখানি মনে হ'লে প্রাণ ফেটে যায়।"—

এই কথা বলেই সিদ্ধেশ্বরীর ডাগর চ'খে টস্ টস্ ক'রে জল পড়তে লাগল।

যাঁরা রমণী-বাজারে, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য, কেনা বেচা করেছেন, তাঁরাই জানেন, স্ত্রীলোকের অভীষ্ঠ-সিদ্ধির জন্য চখের জ

কেমন অমোঘ ঔষধ। পদ্মমুখীর পদ্ম—চখে জলের কোট—স্বামীর চন্দ্রায়ণ, সপিণ্ডকরণ, মুণ্ডপাত। আদরিণী স্বামীর সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছিলেন, স্বামী তাঁর মাতাখেতে তাই দুটো কথা বলেছিলেন, অমি সোহাগিনীর সোনা মুখে গোমুখীর ধারা বইতে লাগ্‌ল, স্বামীর রাগ, শাসন, উপদেশ সেই স্রোতের মুখে, ঐরাবতের ন্যায়, ভেসে গেল। স্ত্রীলোকের চোখ আর সনদ্বীপের চড়; দেশে দুবে হাওয়া না উঠ্‌তে উঠ্‌তে জলে জলাময় হয়ে যায়। ললনে! পৃথিবীতে যে তোমার মহিমা না জানে, সে মূর্খ, পামর, নরাধম, কেবলমাত্র এক চখের ইঙ্গিতে তুমি চৌদ্দভুবন নাচিয়ে নিয়ে বেড়াও, তথাপি ভ্রান্ত মানব তোমায় বলে—অবলা! হে স্বামিহৃদি-বিলাসিনী, পদ্মপলাশ লোচনা অঙ্গনাগণ, যে চোক্‌খেগো মিনসেরা তোমাদের না চেনে, তারাই যেন তোমাদের বিষনয়নে পড়ে, আমরা তোমাদের বিশেষ ক'রে জানি, তোমাদের পূজা না করে জল গ্রহণ করি না, অতএব দয়া ক'রে ও চটুল চাহনির চোরা বাণে যেন আমাদিগকে বাণী বধ ক'র না।

পার্ব্বতীর পটল চেরা চখে জলের ধারা দেখে শিবের হৃদয় দুঃখে আপসোসে একেবারে ফুট কড়াই ফাটা হয়ে গেল। আর প্রিয়তমার কথায় অমত কর্ত্তে সাহসী হলেন না। উমার খোপাবাঁধা মাথাটি আপনার বুকের ভিতর টেনে এনে সোহাগের ভরে বলতে লাগলেন:—

"আমার তৃষ্ণার তরমুজ, পাকা খরমুজ! তুমি আমার ব্রজের কলি, সিদ্ধির বুলি; তোমার অমত কি আমি চলতে পারি? শ্বশুরবাড়ী তো সুখের স্থান, তুমি হুকুম কল্লে শীতের রাত্রে জলে ডুবতে পারি।"

সেই দিন স্থির হয়ে গেল, শিবদুর্গা ষষ্ঠীর দিন হিমালয়ে যাবেন, খানসামা নন্দীর ভক্ত রং বরঙের বাঘছালে বুরুষ দিতে লাগ্‌ল, জয়া বিজয়া শিবানীর ছেঁড়া গহনাগুলি গাঁথতে আরম্ভ করলে:—কৈলাসে হুলস্থূল গোল পড়ে গেল। (ক্রমশঃ)

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

গত সংখ্যায় বিশেষ বিজ্ঞাপনে যেরূপ লেখা হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ পায়, যেন সম্পাদক মহাশয়ের দোষেই মাসিক সমালোচক এত দিন বন্ধ হইয়া ছিল। ভ্রমবশতঃই এরূপ কথা লেখা হয়। তাহাতে যে শুদ্ধ তাঁহারই দোষ ছিল, এমত নহে; প্রকাশকও তাহাতে অনেকটা দোষী। ভরসা করি, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রমাদমূলক উক্তির জন্য দুঃখিত হন নাই।

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশক।

———

মাসিক সমালোচক ও খেয়াল সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় রচনা, প্রবন্ধাদি, সমালোচ্য গ্রন্থাদি ও কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

ব্যারিং বা ইনসফিসয়েণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না। যাঁহারা পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উত্তর লেখা যাইবে না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা ডাকের টিকিট মূল্য পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে প্রতি টাকার /০ আনা কমিশন দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট যেন কেহ না পাঠান। মনি আর্ডরে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর ডাকঘরে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন, তাঁহাদিগের নিকট পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪৲ টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে, সুতরাং বিনা মূল্যে দেওয়া এক কালে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্র /০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

সৈদাবাদ
বহরমপুর।
১২৮৯ সাল,
১৫ই বৈশাখ।

শ্রী[illegible]নাথ গোস্বামী।

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল

সংযোজিত।

(সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।)

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১২৮৯ সাল, আষাঢ়।

বহরমপুর,—অরুণোদয় যন্ত্রে

শ্রীভগবানচন্দ্র রায় দ্বারা

মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵ আনা।

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল।

—*:❀:*—

ছোট বৌর ঝাঁপি।

গরলে অমৃত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শৈল-মূলে।

আমাদের পূর্ব্বকথিত ঘটনাবলী পরিষ্কার করিবার জন্য আমরা এই স্থানে পূর্ব্বেকার দুই চারিটি কথা বলিব। সকলের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই কাঞ্চন পাহাড়ীর তলদেশে রাজগ্রামের এক জন বৈষ্ণব একটি অপগণ্ড বালিকা কুড়াইয়া পান এবং তাহাকে আপন ভবনে লইয়া গিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে কাঞ্চনমালা নামে প্রতিপালন করেন। বৈষ্ণব সংস্কৃত বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন; বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাঞ্চনমালার অলৌকিক রূপরাশি যতই প্রস্ফু-টিত হইতে লাগিল, সেই স্বর্ণলতায় মুক্তাফল প্রসব করাইবার বাসনা বৈষ্ণবের মনে ততই বলবতী হইতে লাগিল। তিনি বহু যত্ন করিয়া সংস্কৃত কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র সকল কাঞ্চনমালাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সুধার আস্বাদন একবার পাইলে কে তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতে চাহে? কাঞ্চনমালাও অনন্যমনে

বৈষ্ণবের সহিত দিবারাত্র সেই সমস্ত শাস্ত্রালোচনাতেই ব্যাপৃতা থাকিতেন; অন্যান্য বালিকার ন্যায় বৃথা ক্রীড়ায় বা অন্যান্য আমোদে কথনই সময় অতিবাহিত করিতেন না। কাঞ্চনমালার প্রতি বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর এতাদৃশ স্নেহানুরাগ হইয়াছিল যে, কাঞ্চনমালা যে তাঁহাদের প্রকৃত সন্তান নহেন, এ কথা তিনি কখনই জানিতে পারেন নাই।

এই বৈষ্ণব-দম্পতী ভিন্ন অভাগিনী কাঞ্চনমালাকে আর এক জন মায়ের মতন স্নেহ করিতেন—তিনি যোগিনী। কাঞ্চনমালাকে গৃহে আনিবার ১৫ দিবস পরে এক দিন বৈষ্ণবী স্নানান্তে গৃহে আসিয়া দেখেন, একটি যোগিনী-বেশধারিণী, পরমসুন্দরী রমণী তাঁহার গৃহের পিঁড়ায় বসিয়া কাঞ্চনমালাকে ক্রোড়ে করিয়া সেই অনিন্দ্য বদনে বারম্বার চুম্বন করিতেছেন ও দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; বালা কাঞ্চনমালাও যেন পূর্ব্বপরিচিতার ন্যায় যোগিনীর স্তন লইয়া ক্রীড়া করিতেছে ও মাঝে মাঝে যোগিনীর মুখের প্রতি নয়ন স্থাপন করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে। এই কাণ্ড দেখিয়া বৈষ্ণবী প্রথমে ক্ষণেক অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে সম্মুখে আসিয়া যোগিনীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। যোগিনী এতক্ষণ কাঞ্চন-মালাকে ক্রোড়ে করিয়া পৃথিবীর সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বৈষ্ণবীকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, কাঞ্চনমালাকে বক্ষে করিয়াই উঠিলেন ও অতি মধুস্বরে বলিলেন,—“মা, এটি তোমার মেয়ে? আহা! পরমেশ্বর তোমায় সুখে রাখুন, তোমার মেয়ে দেখিয়া আজ যোগিনীর কঠিন প্রাণও কোমল হইয়াছে; মা, আজ অবধি আমিও তোমার মেয়ের ধর্ম্ম-মা হইলাম, আমি প্রতি মাসে এক একবার আসিয়া তোমার এই ননীর পুতল কোলে করিয়া যাইব—এই আমার ভিক্ষা।„—সেই অবধি এই বৈষ্ণব-সংসারে যোগিনীর পরিচয়।

যোগিনীর গুণে বৈষ্ণব-দম্পতী ক্রমে ক্রমে এত দূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে ইষ্ট দেবীর ন্যায় দেখিতেন, তাঁহার অমতে তাঁহারা কোন কর্ম্ম করিতেন না। কাঞ্চনমালা বয়স্থা হইলে তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে বৈষ্ণব কতবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু, কি জানি কিসের জন্য,—হয় তো বা সেই গণৎকার বৃদ্ধা রমণীর মুগ্ধ আশায় ভুলিয়া—যোগিনী ক্রমাগতই কাঞ্চনমালার বিবাহে অমত করিয়া আসিতেন; সুতরাং কাঞ্চনমালার এপর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। যোগিনীর হস্তে কাঞ্চনমালাকে রক্ষা করিয়া বৈষ্ণবদম্পতী জগন্নাথ-ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে এক দল, দুই দল করিয়া যাত্রী ফিরিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কাঞ্চনমালা যাঁহাদের জন্য আশাপথ চাহিয়া আছেন,তাঁহারা ফিরিতেছেন না। ক্রমে ক্রমে শেষ দল পর্য্যন্ত পৌঁছিল, তথাপি তাঁহাদের দেখা নাই—শেষে কাঞ্চনমালা শুনিলেন যে, পথি-মধ্যে সর্পাঘাতে বৈষ্ণবের মৃত্যু হইয়াছে, সতী বৈষ্ণবী বিসুচিকা-রোগে পতির অনুগামিনী হইয়াছেন।

কাঞ্চনমালাকে অচেতনাবস্থায় দেখিয়া যোগেশ বিষম বিপদে পতিত হইলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, নিকটে জনমানব নাই, একবার চারি দিকে চাহিলেন, দেখিলেন কেবল দুরন্ত অন্ধকার বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া দিগন্ত গ্রাস করিতে ছুটিতেছে। কাঞ্চনমালার অলৌকিক রূপরাশি দর্শন করিয়া যোগেশের অন্তঃকরণে প্রথমে যে প্রেমমোহ উত্থিত হইয়াছিল,এক্ষণে সে ভাব সম্পূর্ণ অন্ত-র্হিত হইল, সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় ছাইয়া গেল, নয়ন হইতে দুই চারি বিন্দু অশ্রুও নিপতিত হইল। মাতঙ্গ-দলিতা ফুল্ল নলিনী হীনপ্রভা হইয়া সরোবরতীরে পতিতা দেখিলে ভাবুক কবির অন্তরে যে ভাব হয়, উপাস্য ইষ্টদেবীর প্রতিমূর্ত্তি যবনদলিত হইতে দেখিলে ভক্ত হিন্দুর যেরূপ মনোকষ্ট উপস্থিত হয়, হৃদয়-বিমোহন শ্রবণতৃপ্তিকর মধুর লয়ের

মধ্যস্থলে মধুর ঝঙ্কারিণী বীণা ছিন্নতার হইলে সঙ্গীতামোদীর অন্তর যেরূপ ক্ষুব্ধ হয়, প্রবল প্রভঞ্জন-বিতাড়িতা, কলনাদিনী, উন্মাদিনী, স্রোতস্বতীর ফেনচূড় তরঙ্গাভিঘাতে তরণীবক্ষ বিদীর্ণ হইলে আরোহীর অন্তর যেরূপ নিষ্পেষিত হইয়া যায়, সেই সমস্ত ভাবের সমষ্টি যোগেশের অন্তরে উদয় হইতে লাগিল। যুবতীর বক্ষান্দোলনে যোগেশ বুঝিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে, কিন্তু এখনও সে নয়ন মুদ্রিত, এখনও সমস্ত অঙ্গ অবশ, এখনও সে শারদীয় পূর্ণচন্দ্র মেঘাচ্ছাদিত; সুকোমল লজ্জাবতীলতা মানবকর স্পৃষ্টা হইয়া মুমূর্ষু প্রায় জ্যোতিঃহীনা হইয়া আছে। যোগেশ যুবতীর শিরোদেশে বসিলেন, সেই ধরাবলুণ্ঠিত ঘন চিকুরজাল সযত্নে সন্নিবেশিত করিলেন, পরে সেই ঘন শৈবালবেষ্টিত মুদ্রিত কমলটি দুই হস্তে আস্তে আস্তে ধরিয়া আপন বক্ষে স্থাপন করিলেন। যোগেশচন্দ্র!—কাঞ্চনমালার মস্তকখানি—কাঞ্চনলতায় ও হীরক কুসুমটি—কি তোমার নিকট এত গুরু বোধ হইল, তুমি প্রতিদিন প্রতি হস্তে দুই মণ লৌহ মুদ্গার লইয়া, বালকের ক্রীড়ার সামগ্রীর ন্যায়,অবাধে অক্লেশে ব্যায়াম কর, আজ কাঞ্চনমালার মস্তকখানি অঙ্কদেশে উঠাইতে তোমার হস্ত কাঁপিল কেন? তোমার কপোলদেশে স্বেদবারি বহির্গত হইল কেন? কোন্ গুরু বস্তুর প্রতিঘাতে তোমার হৃদয় এমন ঘনঘন কাঁপিতেছে? বুঝিয়াছি, তুমি আমাদের ভুলাইয়াছিলে, আমরা মিথ্যা কথা বলিয়াছি, তোমার মনে শুধু সমবেদনা নহে—তোমার হৃদয়ের হৃদয়ে, প্রাণের প্রাণে, মর্ম্মের মর্ম্মে,জীবনের প্রতি গ্রন্থিতে ও কি কোমল স্বর বাজিতেছে,—আর লুকাইবে কি—যোগেশ,জানিয়াছি, তোমার হৃদয়ের প্রেমতন্ত্রী বাজিয়াছে।

যুবতীর মস্তক অঙ্কে করিয়া যোগেশচন্দ্র ৩।৪ মিনিট বসিয়া আছেন ও সেই সুপ্ত বদনের ভাব একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় তিনি দেখিলেন, যুবতীর অধরদ্বয় ঈষৎ প্রস্ফুরিত হইল, ও নয়নাবরণ

মুখানি ঈষদুন্মুক্ত হইল। যুবতীর জ্ঞান সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া যোগেশের বিষণ্ণ বদনও হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি সোৎসুক-নয়নে এক-দৃষ্টে সেই বিকাশোন্মুখ বদনের লক্ষণ সকল দেখিতে লাগিলেন। যুবতী ধীরে ধীরে চাহিলেন, একবার এ দিক ও দিক দেখিলেন, যেন কি স্মরণ করিতেছেন বলিয়া বোধ হইল এবং পর ক্ষণেই আপনাকে অপরিচিত পুরুষের ক্রোড়ে শয়িতা দেখিয়া তীরবেগে উঠিলেন— যোগেশ কথাটি কহিবার অবকাশ পাইলেন না।

কিন্তু যুবতী যেমন উঠিবেন, অমনি নিকটস্থ একখানি উপলখণ্ডে তাঁহার চরণ স্খলন হইল, মস্তক ঘুরিল, যোগেশচন্দ্র সাহায্যার্থ যাইতে না যাইতে অন্য একখানি প্রস্তরের উপর পড়িয়া গেলেন। যোগেশ বিদ্যুৎ-গতিতে যুবতীর নিকট গমন করিয়া দেখেন, যুবতী নিস্পন্দ; প্রস্তরাঘাতে তাঁহার কপোলদেশ, নাশা ও অধর ক্ষত হইয়াছে ও রক্তস্রোতে যুবতীর সমস্ত শরীর ভাসিয়া যাইতেছে। যোগেশেরও মস্তক ঘুরিল, তিনি পুনরায় যুবতীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন ও রক্তস্রাব নিবারণের উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ যত্নের পর যোগেশ রক্তস্রাব নিবারণ করিলেন বটে, কিন্তু যুবতীর চৈতন্যোদয় হইল না, যোগেশ বসিয়া কি উপায় করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় তিনি অদূরে একটি বংশীরব শ্রবণ করিলেন। বংশীরব ক্রমে ক্রমে নিকট হইতে লাগিল, যোগেশ শুনিতে লাগিলেন, সেই মধুর বংশীর মধুর রব গগন ছাইয়া উঠিল, সপ্তস্বরে পর্ব্বতশিখর, পর্ব্বতগুহা পূরিয়া গেল, ক্ষিপ্ত পবন সেই মধুর স্বরে উন্মত্ত হইয়া সেই সুধাময় স্বরলহরী বক্ষে ধরিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিতে লাগিল। বংশীবাদককে নিকটে ডাকিতে একবার যোগেশের ইচ্ছা হইল, কিন্তু পরক্ষণে আবার ভাবিলেন, পাছে তাঁহার চীৎকারে যুবতীর চৈতন্যোদয় হয়, এবং চৈতন্য হইলে পাছে তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া পূর্ব্ববৎ আবার কোন বিপদ

উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় যোগেশ বংশীবাদকের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। হৃদয়-উন্মাদক বংশীরব একবার নীচে পড়িতে লাগিল, একবার মধ্যমে দুলিতে লাগিল, আবার এক একবার তিন গ্রাম একত্রে মিশিয়া একসঙ্গে একতালে নাচিতে লাগিল। যোগেশ যে বংশীরব প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, সে রব ক্রমে ক্রমে থামিল,—এবং পরক্ষণেই এক জন রমণী বলিলঃ—"থামিলে কেন? আমি তোমার বাঁশীর এই গানটি শুনিতে বড় ভালবাসি—"

বংশীবাদক বলিল—"বংশী অপেক্ষা আর একটি মধুর স্বর শুনিব বলিয়া থামিলাম—আমার হৃদয়ের হিরেমন!—একবার তোমার ঐ মধুর কণ্ঠে সেই মধুর বুলিটি বলো তো—যেটি আমি গঙ্গাদহে গেলে তুমি আমারই জন্য প্রস্তুত করেছিলে।"—কিছুক্ষণ পরেই মধুর রমণী-কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কারে আবার দিক ছাইয়া গেল; আবার গগন ভেদ করিয়া মধুর স্বর উঠিতে লাগিল, আবার বায়ুহিল্লোলে মধুর স্বর দুলিতে লাগিল। বংশীবাদক ও গায়িকা যোগেশের নিতান্ত অনুগত সাঁওতাল যুবক বুদ্ধিচাঙ্গ ও তাহার অকৃত্রিম প্রণয়ানুরাগিণী—মাঝি কন্যা স্বরণী।

আমাদের পাঠক পাঠিকার মধ্যে বোধ হয় সকলেই জানেন যে, সাঁওতালদিগের মণ্ডলের নাম মাঝি। ১০। ১৫, সময়ে সময়ে, ২০।২৫ কি ততোধিক গ্রাম এক জন মাঝির অধীনে থাকে। ঐ সমস্ত গ্রামে ঐ মাঝির ক্ষমতা অপ্রতিহত, তাহাকে ঐ সমস্ত গ্রামের জমিদার বা তালুকদার বলা যাইতেও পারে। রাজদ্বারে বা জমিদারগৃহে অন্যান্য সাঁওতালেরা স্বয়ং কোন কথা বলিবে না, বা কোন কার্য্য করিবে না, তাহাদের মাঝি যাহা বলিবে, যাহা করিবে, তাহাই তাহাদের নিজকৃত বলিয়া তাহারা স্বীকার করিবে। তাহাদের মাঝির উপর অটল বিশ্বাস। এমন কি, যদি মাঝি কাহাকে মরিতে বলে, তবে সে তৎক্ষণাৎ বিনা

বাক্যব্যয়ে মরিতে প্রস্তুত হইবে। আমাদের পূর্ব্বকথিত বুদ্ধিচাঙ্গ মাঝিপুত্র। বুদ্ধি চাঙ্গের বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর, শরীর দীর্ঘায়ত, সরল ও সর্ব্বপ্রকারে বীরলক্ষণাক্রান্ত। যখন বুদ্ধিচাঙ্গের বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয় এবং সমস্ত সাঁওতাল এক-মত হইয়া স্বরণীর পিতা মাঙ্গুককে মাঝিপদে প্রতিষ্ঠিত করে। মাঙ্গুকর স্বরণী ব্যতীত অন্য সন্তান ছিল না, সে বুদ্ধিচাঙ্গকে নিজ পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিত, সর্ব্বদা তাহাকে নিজের নিকটে রাখিত, স্বয়ং তাহাকে ধনুর্ব্বিদ্যা ও শীকার শিখাইত এবং যেখানে যাইত, সেই-খানেই বুদ্ধিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত। বুদ্ধির প্রতি স্বরণীর দিন দিন অনুরাগ জন্মিতে লাগিল, বুদ্ধিও স্বরণীর গুণে মোহিত হইয়া আপন নবীন হৃদয় স্বরণীর হস্তে প্রদান করিল। মাঙ্গুক ও তাহার স্ত্রী এই যুবক যুবতীর প্রণয়ের প্রথম সূত্র হইতে সমস্তই অবগত ছিল, এরূপ মিলন স্পৃহণীয় বলিয়া তাহারা ইহাতে উৎসাহ দান ব্যতীত কখনই বাধা প্রদান করে নাই। সেইজন্য অবসর পাইলেই বুদ্ধিচাঙ্গ ও স্বরণী শৈলমূলে, পর্ব্বত-শিখরে, পর্ব্বত-গুহায়, নির্ঝরিণী-তীরে আপনাদের হৃদয় খুলিয়া প্রেমালাপন করিত, সরলমতি সাঁওতাল-গণের মধ্যে কেহ তাহাতে কোনরূপ কটাক্ষ করিত না।

গীত সমাপ্ত করিয়া স্বরণীর মনে লজ্জা হইল, অমনি দুই হস্তে বুদ্ধিচাঙ্গের স্কন্ধদেশ বেষ্টন করিয়া তাহার বাহুমূলে বদনখানি লুকা-ইল, বুদ্ধি সাদরে সস্নেহে বাম হস্তে স্বরণীর কটিবেষ্টন করিয়া ধরিয়া ধীরগতিতে চলিল। কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াই বুদ্ধি চাঙ্গ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল ও নিমেষ মধ্যে পৃষ্ঠস্থিত ধনুক বামকরে লইয়া তাহাতে গুণ প্রদান করিল। পরে তুণ হইতে তীর লইয়া তাহাতে যোজনা করিবে, এমন সময় স্বরণী তাহার দুই হস্ত ধরিয়া কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল—"কাহাকে মারিতেছ, আহা মের না, বুদ্ধি, আমাদের মত হয় তো উহারাও প্রেম আলাপন করিতেছে।"

বুদ্ধি বলিল, আমার বোধ হইতেছে হরিণ—

স্মরণী খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বুদ্ধির হস্ত হইতে ধনুক কাড়িয়া লইয়া দুরে নিক্ষেপ করিল, এবং আপনার হস্তের একটি ছোট চড় বুদ্ধির গালের কাছে উঠাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলঃ—"আমার সরল মাণিক।—এই ঘোর যৌবনে চ'খে চাল্‌শে—"——

বুদ্ধি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া স্মরণীর গাল টিপিয়া দিল এবং পরক্ষণেই তাহার কপোলদেশে একটি চুম্বন করিয়া বলিল—"আমার ভ্রান্তিনাশিনী বিপদহারিণী! কি বিপদেই রক্ষা করিয়াছে—সম্মুখে ও মানুষই বটে!"

যোগেশচন্দ্র এতক্ষণ অনন্যমনে নির্নিমেষ-নয়নে অবাক্ হইয়া নক্ষত্রালোকে ক্রোড়স্থিতা সেই অনিন্দ্যরূপিণীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহার মন সেই অসীম রূপসাগরে সন্তরণ করিতেছিল, বুদ্ধি যে তাঁহাকে লক্ষ করিয়া শরত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, স্মরণী যে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে, তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই—শেষে যখন বুদ্ধিচাঙ্গ নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া "কেও" বলিল, তখন তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিলেন—"কে বুদ্ধি—বড় বিপদে পড়েছি।"

যোগেশ সংক্ষেপে কাঞ্চনমালা সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা বুদ্ধি ও স্মরণীকে বুঝাইয়া দিলেন। সরলা স্মরণী সমস্ত না শুনিতেই বুদ্ধির পার্শ্ব হইতে হরিণীর ন্যায় দ্রুতপদে কাঞ্চনমালার নিকট গমন করিয়া সেই সুবর্ণ-প্রতিমা যোগেশের ক্রোড় হইতে নিজ ক্রোড়ে লইয়া বসিল। তখন বুদ্ধি যে তাঁহার জীবনহন্তা হইতে বসিয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত যোগেশকে বলিয়া যোগেশের ক্ষমা ভিক্ষা করিলে, যোগেশ বুদ্ধির হস্ত লইয়া সাদরে পীড়ন করিলেন ও স্মরণীর নিকটে গিয়া তাঁহার হস্ত দুখানি লইয়া—"আমার জীবনদায়িনী, এমন কত ঋণে

আমায় আবদ্ধ করিবে” বলিয়া স্বরণীর হস্ত চুম্বন করিলেন; সরলা স্বরণী ও বুদ্ধি আদরে একেবারে গলিয়া গেল।

কাঞ্চনমালা তখনও অচেতন, সাঁওতাল কন্যা স্বরণী সেই পূর্ণ যুবতীকে শিশু কন্যার ন্যায় আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইল এবং বুদ্ধি ও যোগেশ কর্ত্তৃক অনুসারিতা হইয়া আপন কুটিরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এই কি প্রেম?

মাঙ্গুরু মাঝির বাড়ীর দক্ষিণদ্বারী ঘরে কাঞ্চনমালা রুগ্নশয্যায় শুইয়া আছেন, স্বরণী পার্শ্বে বসিয়া সুশ্রূষা করিতেছে। আজ তিন দিবস হইল, স্বরণী শৈলমূল হইতে ইহাঁকে গৃহে আনিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাঞ্চনমালা নয়ন উন্মীলন বা একটি মাত্র কথা কহেন নাই; শরীরে ঘোর উত্তাপ, নাড়ী বিলক্ষণ প্রবলা, যোগেশচন্দ্র চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন, চিকিৎসক ভাবগতিক দেখিয়া বিকারের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন।

মাঙ্গুরু সপরিবারে কৃষিকর্ম্মে বহির্গত হইয়াছে, বুদ্ধিচাঙ্গ যোগেশ-চন্দ্রের লৌহ-কারখানায় কাজ করিতে গিয়াছে, সুতরাং আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে স্বরণী ভিন্ন কাঞ্চনমালার নিকট অন্য কেহ নাই।

চিকিৎসক যে ঔষধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, স্বরণী মধ্যে মধ্যে তাহাই কাঞ্চনমালাকে সেবন করাইতেছে ও সোৎসুকনয়নে মুখের কোনরূপ পরিবর্ত্তন-চিহ্ন লক্ষ্য করিতেছে। অনেক ক্ষণের পর অতি ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া কাঞ্চনমালার চক্ষের পাতা দুখানি

খুলিতে লাগিল, তিন দিবস হইতে যে ইন্দীবর দুইটি মুদ্রিত হইয়া আছে, তাহা ঈষদুন্মুক্ত হইল, আহ্লাদে স্বরণীর চক্ষু ও হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। কাঞ্চনমালা চক্ষু চাহিলেন, ঘার ফিরাইয়া ঘরের এ দিক ও দিক দেখিলেন; কিন্তু সে শূন্য দৃষ্টি, আবার নয়ন মুদিত করি লেন। স্বরণী আর একবার ঔষধি সেবন করাইল, তাহার ক্ষণেক পরে কাঞ্চনমালা আবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন, আবার ঘরের চারি দিক চাহিতে লাগিলেন; যেন কি দেখিবার আশা করিতেছেন, তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, যেন কাহার অন্বেষণ করিতেছেন, তাহাকে মিলিতেছে না, যেন কি বলিবেন বলিবেন ভাবিতেছেন, তাহা স্মরণ হইতেছে না। এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া কাঞ্চনমালা পুনরায় ঘাড় ফিরাইয়া ধীরে ধীরে স্বরণীর দিকে চাহিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মুখের উপর নয়ন দুইটি ঘুরাইলেন, আবার যেন তাহা মনোমত হইল না, যেন ঈষৎ বিরক্তির সহিত চক্ষের পাতা দুখানি ফেলিয়া দিলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে যেন পার্শ্ব ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, উদ্যম বুঝিয়া স্বরণী অতি কোমলহস্তে, সন্তর্পণে কাঞ্চনমালার পার্শ্ব ফিরাইয়া দিল; কাঞ্চনমালা এবারে আপন ক্ষীণ হস্তে স্বরণীর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ ধারণ করিলেন, স্বরণী হাতখানি বাড়াইয়া দিল, কাঞ্চনমালা অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই হাতখানির এ পিট ও পিট দেখিতে লাগিলেন! অনেকক্ষণের পর কাঞ্চনমালা আবার স্বরণীর মুখের প্রতি চাহিলেন। এবারে তাঁহার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, যেন কিছু বলিবার প্রয়াস পাইতেছেন বুঝিয়া, স্বরণী বলিল—"চুপ কর, কথা কহিও না, তুমি বড় কাহিল, ভয় নাই—তুমি বন্ধুগৃহে আছ, তোমার শত্রুরা এখানে আসিতে পারিবে না।"

কাঞ্চনমালা, আপন মনে "বন্ধু" "শত্রু" এই দুইটি কথা আস্তে আস্তে উচ্চারণ করিলেন, আবার যেন কি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে

লাগিলেন ;——অনেকক্ষণের পর এবারে বলিলেন :——"তবে কি সে স্বপ্ন" ?

স্বরণী দেখিলেন, প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনমালার নয়ন প্রান্তে অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছে—দয়াবতী সাঁওতাল কন্যা সস্নেহে সে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া মধুরস্বরে বলিল—"কি স্বপ্ন, দিদি ?"—

পূর্ব্ববৎ ক্ষীণস্বরে কাঞ্চনমালা বলিল—"সেই, দেবতা !"—

স্বর কাঞ্চনমালার কণ্ঠে জড়িয়া গেল, আবার তাঁহার চক্ষে আবল্য উপস্থিত হইল, আবার তিনি নীরব হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

স্বরণী করতলে গণ্ডদেশ রক্ষা করিয়া একদৃষ্টে কাঞ্চনমালার মুখের প্রতি চাহিয়া আছে. এমন সময়ে গৃহদ্বারের পার্শ্বদেশে পদশব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া মস্তক ফিরাইল, চিকিৎসক সমভিব্যাহারে যোগেশচন্দ্র গৃহদ্বারে উপস্থিত। যোগেশকে দেখিবামাত্র সরলা স্বরণীর তাৎকালিক স্থির গম্ভীর মুখে একটু হাস্য প্রকাশ পাইল, সে শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া যোগেশের নিকট উপস্থিত হইল এবং যোগেশচন্দ্রের হস্ত ধরিয়া বাহিরে আনিয়া সহাস্যবদনে বলিল—"দাদা, আজ সুখবর—"

আমরা এইখানে বলিয়া রাখি—স্বরণী ও তাহার সমবয়স্কা ও কনিষ্ঠা অন্যান্য সাঁওতাল কন্যাগণ যে যোগেশকে "দাদা" বলিয়া ডাকিত, তাহা যোগেশচন্দ্রের নিজের শিখান।

যোগেশচন্দ্র সস্নেহে স্বরণীর কপোলদেশের কেশদাম সরাইয়া বলিলেন—"কি সুখবর দিদি, আজ বুদ্ধি বুঝি ভাল শীকার করেছে ?"

কথাটি শুনিয়া লজ্জায় স্বরণীর চক্ষের পাতা দুখানি পড়িয়া গেল, সে একটু আবদারের স্বরে বলিল—"হ্যাঁ দাদা, আমি বুঝি তাই বল্‌ছি—"এবং তৎক্ষণাৎ আবার গম্ভীরবদনে গৃহের দিকে অঙ্গুলি

নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"আমি ওঁর কথা বলছি—হ্যাঁ দাদা—তুমি যে ওঁর জন্য এত যত্ন করছো—উনি তোমার কে হন?

লজ্জা এইবার স্বরণীকে পরিত্যাগ করিয়া যোগেশচন্দ্রকে আক্রমণ করিল।—"উনি তোমার কে হন"—প্রশ্নটি যোগেশের পদনখ হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত তড়িংগতিতে প্রবেশ করিল, তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, আবার কি ভাব আসিয়া তাঁহার চিবুক ও স্কন্ধদেশ অকম্পিত করিল। "উনি আমার কে হন?" যোগেশ একবার, দুইবার, তিনবার, কত বার মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উনি আমার কে হন?" এত দিন এ প্রশ্ন যোগেশের মনে উদয় হয় নাই—আজ স্বরণীর কথায় জ্ঞান হইল—"উনি আমার কে হন?" একবার ভাবিলেন, স্বরণীকে বলি, উনি আমার কেহ হন না, আবার তখনি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হৃদয় তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"ছি, এ কথা কেমন করিয়া বলিবে, দৃষ্টিমাত্র যাহার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, যাহার রূপের সাগরে চিরজীবনের মত ডুবিয়াছ, যাহাকে জীবন-সঙ্গিনী করিবার আশাতেই জীবন ধারণ করিয়া আছ——কোন্ মুখে বলিবে, তিনি তোমার কেহ হন না!" যোগেশ একবার ভাবিলেন, স্বরণীকে বলি—"উনি আমার নিদ্রার স্বপ্ন, জাগ্রতের মোহ, জীবনের উদ্দেশ্য, প্রাণের আশা, হৃদয়ের ভরসা; উনি, আমার দরিদ্রের রত্ন, বিয়োগীর মিলন, তৃষিতের জল, মরুভূমির জলাশয়—উনি আমার কি ন'ন!—উনি আমার সর্ব্বস্ব।" আবার লজ্জায় তাঁহার মুখ রক্তাভ হইল, মনের কথা মনেই মিশিয়া গেল, স্বরণীর হাতখানি ধরিয়া গম্ভীরবদনে কেবল মাত্র বলিলেন—"দিদি, যদি কখন বলিবার হয়, তখন বলিব, উনি আমার কে। তুমি উহাঁর সম্বন্ধে কি না বলছিলে?"

স্বরণী বলিলেন—"উনি আজ কথা কহিয়াছিলেন।"

যোগেশের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল, তিনি তৎক্ষণাৎ এ সুসংবাদ কবিরাজকে জানাইলেন ; কবিরাজ নাড়ী দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল-বদনে বলিলেন, "আর ভয় নাই, এই বটিকাটি দিয়া যাই, ইহা এখনি একবার মাতঙ্গীলতার মূল দিয়া খাওয়াইয়া দিবেন।"

অন্যান্য কার্য্যবশতঃ কবিরাজ ঔষধি দিয়া চলিয়া গেলেন, যোগেশচন্দ্র ঔষধি ভক্ষণ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গীলতা নিকটে ছিল না, যোগেশও তাহা চিনিতেন না, সুতরাং স্বরণী লতার অন্বেষণে চলিয়া গেল ; যোগেশচন্দ্র তাঁহার হৃদয়-প্রতিমার শিয়রদেশে বসিয়া রহিলেন।

ধীরে ধীরে একটু করিয়া আবার কাঞ্চনমালার নয়নাবরণ খুলিতে লাগিল, যোগেশচন্দ্র নির্নিমেষ-নয়নে সেই স্ফুটনোন্মুখ নয়নের প্রতি চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে সেই মুদ্রিত ইন্দীবর পূর্ণ বিকসিত হইল। কাঞ্চনমালা নয়ন চাহিয়াই যোগেশকে দেখিলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিলেন, যেন তাঁহাকে চিনি চিনি ভাবে দেখিতে লাগিলেন, চাহিয়া চাহিয়া আবার চক্ষু দুটি নামাইলেন, অন্য দিকে চাহিলেন, সে দিকে যেন দেখিবার কিছুই নাই, অথবা কিছুই দেখিতে ভাল লাগিল না, পুনরায় যোগেশের মুখে সেই সরল সুধাপ্লুত দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। যোগেশের মুখে কথাটি নাই, তিনি বিশ্বাস পর্য্যন্ত প্রায় রুদ্ধ করিয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় কেবল সেই দৃষ্টির গতি নিরীক্ষণ করিতেছেন। কাঞ্চনমালা অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া শেষে অতি ক্ষীণ-স্বরে বলিলেন——"তবে প্রলাপ নয়।"

যোগেশ সেই বীণাকণ্ঠের এই প্রথম ঝঙ্কার শুনিলেন, তাঁহার হৃদয়-বীণা বাজিয়া উঠিল, মন নাচিয়া উঠিল ; কিন্তু যুবতীর সহিত এ সময় কথা কহা যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনায়, তিনি সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। কাঞ্চনমালার এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, তিনি

সেই অর্দ্ধচৈতন্যাবস্থায় আবল্যমাখা চক্ষে আবার যোগেশের মুখ প্রতি চাহিতে লাগিলেন ও মনে মনে অসম্বদ্ধ প্রলাপের ভাবে বলিতে লাগিলেন,——“চিনেছি, তুমি আমার সেই দেবতা—

ঠিক এই সময়ে স্বরণী লতামুল লইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, সে বাহির হইতেই কাঞ্চনমালার ক্ষীণ স্বরের কথাগুলি শুনিয়াছিল; একণে গৃহ প্রবেশ করিয়া তাহার বদন ঈষৎ গম্ভীর হইল, একবার বিদ্যুৎগতিতে যোগেশের ও কাঞ্চনমালার দুইখানি মুখ দেখিয়া লইল এবং পরক্ষণেই নিজের মনে মনে বলিল “এই কি প্রেম ?„

ক্রমে ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, কাঞ্চনমালা এক্ষণে নয়ন চাহিতে-ছেন,কিন্তু আবল্য কাটিতেছে না, জ্ঞান হইতেছে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত যোগেশচন্দ্র তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিতেন, তিনি একদৃষ্টে কেবল তাঁহার মুখখানি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন, আবার যোগেশ কার্য্যা-ন্তরে গমন করিলে, তিনি যে স্থানটিতে বসিয়া থাকিতেন, কাঞ্চন-মালার চক্ষুদুইটি সেইস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত, যেন কি হারানিধির অন্বে-ষণ করিত, তাহা না পাইলেই মুখে সাতিশয় বিরক্তিলক্ষণ প্রকাশ পাইত, রোগের যন্ত্রণা প্রবল হইত। স্বরনী সমস্ত কথা যোগেশকে খুলিয়া বলিল, যোগেশ সেই দিন হইতে অন্যান্য কার্য্যের অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিয়া অধিকাংশ সময়ই কাঞ্চনমালার শয্যাপার্শ্বেই অতি-বাহিত করিতেন। রোগের ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে যোগেশকে দেখিলেই যুবতীর সেই কাতরতাব্যঞ্জক মুখ প্রফুল্ল হইত, ঈষদ্ধাস্যে বিম্বোষ্ঠ দুখানি ঈষৎ নাচিয়া উঠিত।

দেখিতে দেখিতে মাঘ মাস কাটিয়া গেল, দুরন্ত শীত ধীরে ধীরে আপন ছাউনী উঠাইবার আদেশ প্রচার করিলেন, পরিবর্ত্তনশীল পবন, বসন্তের গবর্ণমেণ্ট দেখিয়া, সেক্রেটারি মহাশয়গণের ন্যায়, আপন “পলিষি„ পরিবর্ত্তন করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে ভর করিয়া বসিলেন।

সিমুল, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষগণ লোহিত ধ্বজা মস্তকে করিয়া, লোহিত-চূড় পুলিষ কর্ম্মচারীর ন্যায়, নুতন রাজত্ব ঘোষণা করিতে লাগিল, শ্রাদ্ধবাড়ীর ভাট ব্রাহ্মণের ন্যায়, বৃথা চীৎকারে কোকিল মহাশয় আপন গলা ভাঙ্গিতে বসিলেন। অশ্বত্থাদি পাদপকুল গোঁড়া হিন্দু, অন্ত্যজ শীত-যবনে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া, তাহারা পুরাতন পত্রপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া নবীন সাজে সাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, দেখা দেখি লতাবধূগণও হাসিয়া দিক আমোদ করিতেছে।

শীত-পীড়িতা লতা বধূগণ নবীন ভাবে মাতিল, নব মুকুলে নব পল্লবে সাজিল, নবীন রসে ভাসিল। আমাদের কাঞ্চনলতার মুখেও নবজীবনের নবীন হাসি প্রস্ফুটিত হইল। কাঞ্চনমালার পীড়ার সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে, এখন অল্প অল্প করিয়া এ দিক ও দিক বেড়াইতে পারেন; তিনি অনেক বার আপন আবাসে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কবিরাজ তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করায় যোগেশচন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হন নাই, মাঙ্গুকর গৃহেই তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য পাচিকা ও দাসী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কাঞ্চনমালার আগমনাবধি স্বরণী প্রায়ই তাঁহার নিকটে থাকিত, স্বরণীর সরলতাগুণে কাঞ্চনমালা একান্ত বশীভূতা হইয়াছিলেন।

এক দিবস অপরাহ্নে মাঙ্গুকর বাটীর বহির্ভাগে একটি বৃক্ষতলে কাঞ্চনমালা একাকিনী বসিয়া আছেন, যোগেশচন্দ্রের অনন্ত গুণ মনে মনে ভাবিতেছেন,—আমি এই বিশ্বসংসারে 'আশ্রয়হীন', অনাথিনী, কাঙ্গালিনী, পথের ভিখারিণী! যোগেশচন্দ্র কেন আমার প্রতি এত দয়া প্রকাশ করিতেছেন? কি উচ্চ হৃদয়, কি দয়ার শরীর——কি অনন্ত গুণ!——পরের দুঃখে—বিশেষ কাঙ্গালিনীর দুঃখে—জগতে কাহার হৃদয় এমন করিয়া গলে, কে এমন করিয়া দুঃখিনীর দুঃখে নয়ন-জল ফেলিতে পারে—কে অভাগিনীর জন্য এমন সমবেদনা দেখা-

ইতে যায়? যোগেশচন্দ্র—দয়ার পয়োধি, সরলতার আধার, উচ্চতায় হিমাদ্রিশেখর! মরি, মরি, সে কি হৃদয়। স্নেহের ভাণ্ডার, মমতার খনি, মঙ্গল পারাবার! শোকীর সান্ত্বনা, দুঃখীর ভরসা, অনাথের বন্ধু। আমরি মরি, এমন গুণ কি সংসারে আর আছে? আমি তাঁহার নিকট কি?—সৈকতের বালুকা, পথের কর্দ্দম, ধূলার কীট। সে উচ্চ হৃদয়ের নিকট এ ছার জীবন গৃহের জঞ্জাল, কাননের কণ্টকী, বংশের অঙ্গার, তাঁহার সহিত তুলনায় আমি বারিহীন সরোবর, গন্ধহীন কুসুম, কুসুমহীন লতা! তথাপি আমার প্রতি তাঁহার কত দয়া। দুঃখীর প্রতি দয়া করাই যে তাঁহার স্বভাব—শুধু আমি বলিয়া নহে, তিনি সকলকেই এমনি দয়া করেন, সকলকেই এইরূপ বিপদে রক্ষা করেন, সকলকেই এইরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসেন।—তিনি যে জগদ্বন্ধু! যোগেশ-চন্দ্র,—যোগেশচন্দ্র—আমার যোগেশচন্দ্র »

সহসা কাঞ্চনমালা চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল, উচ্চ বক্ষস্থল শ্বাস-প্রবাহে স্ফীত হইয়া উঠিল; গ্রীবা, চিবুক ও কপোল-দেশ আরক্ত হইল এবং পরক্ষণেই নয়ন দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—«কি দুরাশা——কূপোদক কোথায় সাগর স্পর্শ করিতে পারে? আমার অদৃষ্ট দুস্তর মরুভূমি —ইহাতে আবার মৃগ-তৃষ্ণা কেন? স্বহস্তে বক্ষ বিদীর্ণ করিব, হৃদয় টানিয়া বাহির করিব, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিব,——ও পোড়া ভাব যেন আর কখন হৃদয়ে না আইসে; তিনি দেবতা——আমি পাপীয়সী,——অভাগিনী——জন্মদুঃখিনী।»

কাঞ্চনমালা নয়নে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ একাকিনী বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন, এমন সময় এক জন অতি কোমলভাবে তাঁহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিল, কাঞ্চনমালা সচকিতে মস্তক ফিরাইয়া দেখেন—স্বরণী।

স্বর্ণী হাসিতে হাসিতে আসিতেছিল, কিন্তু কাঞ্চনমালার মুখ ও চক্ষের ভাব দেখিয়া তাহার হাসি অধরে মিশাইয়া গেল, তাঁহার মুখ-কান্তি গম্ভীর হইল। সে সস্নেহে কাঞ্চনমালার হস্তখানি ধরিয়া কোমল-কণ্ঠে বলিল—"দিদি,—তুমি কাঁদ'ছ ?—

সরলা কাঞ্চনমালা কোন কথা লুকাইতে জানিতেন না; তিনি স্বর্ণীকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ দিদি, একলাটি বসিয়া মনে দুঃখ হইয়াছিল, তাই কাঁদিতেছিলাম, এখন তুমি আসিয়াছ, আর কাঁদিব না।" স্বর্ণী কাঞ্চনমালার মুখের প্রতি নয়ন স্থাপন করিয়া গদ গদ স্বরে বলিল—"দিদি, আর আমি তোমায় ছাড়িয়া কোথাও যাইব না, আমায় না দেখিলে কি তুমি কাঁদ ?" কাঞ্চনমালা বলিলেন, ——"যাহারে মন ভাল বাসে, তাহারে না পাইলে কাঁদিতে হয় বৈ কি।" স্বর্ণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল——"আমি ভাবিতাম, কেবল দাদাকে না দেখিলেই তুমি কাঁদ।"

আবার কাঞ্চনমালার চিবুক অকম্পিত হইল, আবার তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইল, আবার তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তিনি সে ভাব দমন করিয়া, অধরে একটু হাসি আনিয়া, স্বর্ণীর চিবুক ধরিয়া বলিলেন——"আমার সরলতার খনি! আমি যে তোমার দাদাকে না দেখে কাঁদি, তোমায় কে বল্লে ?"

স্বর্ণী বলিল——"কেন, তোমার পীড়ার সময়, অজ্ঞানাবস্থায় তুমি আপনিই তার পরিচয় দিয়াছ। ভাল দিদি, দাদা তোমার কে হন ? আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তা তিনি বল্লেন না—"

প্রশ্নে কাঞ্চনমালার বক্ষ গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল, নয়ন ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল, কষ্টে সে ভাব চাপিয়া তিনি স্বর্ণীকে বলিলেন—"তিনি তোমায় কি বলিলেন ?"

স্মরণী বলিল—"তিনি অনেকক্ষণ কিছুই বলিলেন না, শেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন——"যদি কখন সময় হয়, তখন বলিব, তিনি আমার কে হন।"

কাঞ্চনমালার অন্তরে এই সময় কত ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছিল, তাহা কে বলিবে, যোগেশচন্দ্রের এই উত্তরটি তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই বা কে বলিবে? তাঁহার মুখকান্তি গম্ভীর হইল, তিনি বামকরতলে কপোল রক্ষা করিয়া অনেকক্ষণ ধরাবদ্ধ-দৃষ্টিতে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, শেষে আস্তে আস্তে মুখখানি তুলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া স্মরণীকে বলিলেন———"তিনি আমার কে হবেন, দিদি, তিনি দেবতা, আমি অভাগিনী—"

স্মরণী ক্ষণেক কাঞ্চনমালার মুখের প্রতি চাহিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল——"আবার সেই কথা, সেই দেবতা, বুদ্ধিও আমার, দেবতা, বুঝিয়াছি ভালবাসার আধারকেই লোকে দেবতা বলে।"

ক্ষণেক পরে স্মরণী বলিল "দিদি যোগিনীর সন্ধানে বুদ্ধিকে পাঠাইয়াছিলাম; তিনি কোথাও তাঁর সন্ধান পান নাই।"

কাঞ্চনমালা আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোমাদের তো ত্রুটী নাই দিদি, আমারই অদৃষ্ট।" এই বলিয়া তিনি স্মরণীর হস্ত ধরিয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন।

স্মরণীর কথায় অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন—বাস্তবিক যোগিনী কোথায়? কাঞ্চনমালার এত বড় বিপদ গেল, তিনি একবার দেখিলেন না?—কিন্তু সে অনেক কথা, পাঠক পর পরিচ্ছেদে তাহার আভাস পাইবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দুরভিসন্ধি।

কাঞ্চনপাহাড়ীর লৌহ-কারখানার অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে গাট্রে সাহেবের বাঙ্গালা। রাত্রি ১০ টা বাজিয়াছে, চারি দিকে প্রকাণ্ড জগৎ সুপ্ত, নীরব, স্থির; কেবল গাট্রে সাহেব কামরার মধ্যস্থিত বৃহৎ দালানে টেবিল পার্শ্বে একখানি চৌকিতে বসিয়া আছেন, সম্মুখস্থ ঘড়ির প্রতি ঘন ঘন চাহিতেছেন ও বাম পার্শ্বস্থ সুরাপাত্র হইতে সুরা ঢালিয়া মধ্যে মধ্যে পান করিতেছেন। আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা হইল, গাট্রে যাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, সে আসিতেছে না; তাঁহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল, তিনি হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া টেবিলের উপর এক এক বার আঘাত করিতে লাগিলেন ও দন্তে দন্ত চাপিয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালীর চৌদ্দ পুরুষের খবর লইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ঘড়িতে ১১ টা বাজিল, গাট্রে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া পুনরায় গৃহমধ্যে যাইয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই গৃহদ্বারে শব্দ হইল, গাট্রে "ভিতরে আইস" বলিয়া উঠিলেন, এবং সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দুই জন ভদ্রবেশধারী বাঙ্গালী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গাট্রে অন্তরে তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া, মুখে যথেষ্ট ভদ্রতা সহকারে হস্তপীড়নাদি শিষ্টাচার করিয়া বসাইলেন।

যে দুই জন আগন্তুকের সহিত পাঠকের এই প্রথম দেখা হইল, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইহাঁদের মধ্যে প্রথমটি খর্ব্বাকৃতি, বর্ণ তৈলকালীর ন্যায়, চক্ষু ক্ষুদ্র ও কোটরপ্রবিষ্ট এবং তাহার দৃষ্টি হিংসা, দ্বেষ, শঠতা, প্রতারণায় পরিপূর্ণ। তাঁহার ঠোঁট পুরু, নাক বসা, থুঁতি চাপা, শরীর বিষম স্থূল। ইনি রাজগ্রামের নিকটস্থ যশাদহ পরগণার জমিদার। বহুকাল ধরিয়া ইহাঁরা গঙ্গাদহের

রাজাদিগের সহিত বিবাদ করিয়া আসিতেছেন। গঙ্গাদহের রাজসংসারের বলাধিক্য বশতঃই হউক, অথবা সত্যের জয় চিরকাল হইয়া থাকে বলিয়াই হউক, ক্রমাগত ইহাঁরা পরাস্ত হইয়া আসিতেছেন। আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি, তাঁহার নাম দিগম্বর সরকার। যে সময়ের কথা হইতেছে, তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে দিগম্বর জয়হরিচন্দ্রের সহিত বন্ধুতাসংস্থাপনে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি লোকমুখে জয়াবতীর রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া এই বন্ধুতা-সংস্থাপন-চ্ছলে গঙ্গাদহে গমন করেন, এবং তথায় স্বচক্ষে সেই রমণীরত্ন দর্শন করিয়া, তাঁহার জয়াবতী-লাভ-লালসা প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার দুরদৃষ্টবশতঃ, যখন তিনি জয়হরিচন্দ্রের নিকট এই বিষয়ের প্রস্তাবনা করেন, গম্ভীর মহারাজা হাসিয়া, যেন বাতুলের কথার ন্যায়, সে কথা উড়াইয়া দেন। ক্ষোভে, অভিমানে, মনস্তাপে দিগম্বর জয়হরিচন্দ্রের অধিকতর শত্রু হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এত দিন সুযোগ অভাবে কিছুই করিতে পারেন নাই, এক্ষণে গাট্রের সহায়তায়, মন্ত্রের সাধনে শরীর পতন করিতে বসিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটির বর্ণ তামাটে, অত্যন্ত কৃশ—এমনকি, কেবল হাড়ের বোঝা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লম্বা প্রায় সাড়ে চারি হাত,তাঁহার বিপুল নাসিকা থূঁতি ছাড়াইয়া প্রায় চারি অঙ্গুলি সম্মুখে ঝুঁকিয়া আছে। ইনি কে, সে পরিচয় আর আমরা দিব না, গাট্রে ও দিগম্বরের কথোপকথনেই তাহা ব্যক্ত হইবে।

তাঁহারা বসিলে, গাট্রে ঘড়ির প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"বাবুর অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছে।"

দিগম্বর তাঁহার সমভিব্যাহারী বাঙ্গালীর প্রতি অঙ্গুলি হেলাইয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন——"সে ক্ষতি বহুল পরিমাণে পূরণও করিয়াছি।"

গার্টে বলিলেন—"ভাল কথা, বাবুর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন নাই, যদিও এই সময়ে আপনার সঙ্গে আসিয়াছেন দেখিয়াই আমি বুঝিতেছি, আমাদের দলের।"

দিগম্বর তাঁহার ছোট চক্ষু দুটি পাকাইয়া, পুরু ঠোঁট বাঁকাইয়া, বসা নাক বসাইয়া, একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"চমৎকার—যা—চাবেন, কেটে জোড়া দেন।"

প্রশংসা শুনিয়া তৃতীয় ব্যক্তির বিপুল নাসা ফুলিয়া উঠিল, তিনি বার দুই ফোঁত ফোঁত করিয়া সাহেবের মুখের উপরই প্রায় আপনার নাকটি লইয়া গিয়া একবার রহস্যপূর্ণ চক্ষে ঘরের চারি দিক নিরীক্ষণ করিলেন, শেষে যেন ভয়ঙ্কর রহস্য ভেদ করিতেছেন, এই প্রকার স্বরে ও ভাবে বলিলেন—"সাহেব, আমাকে জানেন না?—আমি—মশাদহ থানার দারোগা, আমার নাম গোবিন্দপ্রসাদ। গার্টে অধর প্রান্তে একটু হাসি আনিয়া—"ওঃ দারোগা বাবু," বলিয়াই গোবিন্দপ্রসাদের হস্ত লইয়া আর একবার সবলে পীড়ন করিলেন, শেষে দিগম্বরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি কি রকম বলুন দেখি?"

দিগম্বর বলিলেন;—"উহাঁর সরকারি কার্য্যের তো কথাই নাই, অদ্বিতীয় ব্যক্তি। এই সামান্য বেতনে এক কলমে দুই লক্ষ টাকা উপার্জ্জন ক'রেছেন—ভেবে দেখুন কত ক্ষমতা, তা ছাড়া এমন ভাষা নাই, এমন লেখা নাই, যা দেখবামাত্র উনি অবিকল নকল কর্ত্তে না পারেন।

গার্টে আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বেস্ বেস্——ঠিক উহাই তো আমরা চাই—দারোগা বাবু, আপনাকে পাইয়া আমি বড় সুখী হইলাম, আপনি আমাদের দলের একটি গ্রহ হইয়া থাকিবেন।

দিগম্বর হাসিয়া বলিলেন; "সুগ্রহ না কুগ্রহ?"

গোবিন্দপ্রসাদ বলিলেন—"আপনাদের অদৃষ্ট আর আমার হাত যশ।

ক্ষণেক পরে গার্টে সাহেব বলিলেন, "তবে, আমরা কি এক্ষণে কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি?"

দিগম্বর বলিলেন—"অবশ্য দারোগা বাবু আমাদের বন্ধু।"

গার্টের মুখ গম্ভীর হইল, তাঁহার স্কন্ধদেশ ও মুখ লোহিত বর্ণ ধারণ করিল, তিনি টেবিলে একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেনঃ—"দেখ দিগম্বর বাবু, এই পাজী, কুক্কুর-পুত্র যোগেশ, আমার জাতশত্রু; সে পদে পদে আমার পথের কণ্টক হইতেছে, আমি প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেই অধমের মস্তকে নরকের অগ্নি জ্বালাইব, তাহাকে নরকের কুক্কুর দিয়া ভক্ষণ করাইব, তবে আমার নাম জান মাথু জেকন গার্টে—

দিগম্বর এই সময়ে বলিলেন—"আবার শুনিতেছি, বেটা কাঙ্গুনি বৈষ্টবীটেকে হাত করেছে!

দারোগা মহাশয় বলিলেন,—"তাতে আর বাহাদুরী কি? বৈষ্ণবের মেয়ে; ও তো হাত হয়েই আছে।"

দিগম্বর বলিলেন—"না না, সে রকম নয়, আমি অনেক চেষ্টা ক'রে ছিলাম, কিছুতেই কিছু ক'র্ত্তে পারি নি, শেষে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী জগন্নাথ গেলে ভেবেছিলাম, হাত লাগাব, তা সেই যোগিনীটের জ্বালায় কিছুই ক'র্ত্তে পারলাম না।"

গার্টে সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সেই ডাকিনী? ডাকিনী আর এক্ষণে বাধা দিবে না, সে এক্ষণে পাতাল বাস করিতেছে।

দিগম্বর বলিলেন—"সে কি সাহেব, তুমি যোগিনীর কথা বলিতেছ?"

সাহেব বলিলেন—"হাঁ হাঁ, সেই ভানকারিনী ডাকিনী।"

দিগম্বর বলিলেন—"কোথায় সে?"

সাহেব বলিলেন—"অবশ্য, আমাদের পরস্পরের মধ্যে আর কোন বিষয় গোপন করা উচিত নয়। আমার বাঙ্গালার এক ক্রোশ উত্তরে ঐ যে একটি উপত্যকা আছে জান, তাহার পার্শ্ব-দেশে একটি গহ্বর ছিল, আমি পূর্ব্ব হইতে ঐ গহ্বরের চতুর্দ্দিক বন্ধ করিয়া সম্মুখে একটি ঘন ঝোপের মধ্যে একটি প্রস্তরের দ্বার করিয়া রাখিয়াছিলাম। যখন আমি কাঞ্চনমালাকে হরণ করিবার ইচ্ছা করি, সেই দিন স্থির থাকে, আমরা দুই জনে কাঞ্চনমালাকে এখানে লইয়া আসিব, আর দুই জনে যোগিনীকে সেই গুহার মধ্যে লইয়া যাইবে। যোগিনী সম্বন্ধীয় কার্য্য সিদ্ধ হইল, কিন্তু সেই পাপ, নরকের কীট আসিয়া আমার অভীষ্ট বিফল করিল।,—এই বলিয়া সাহেব টেবিলে আর একটি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।

দিগম্বর বলিলেন—"তবে তো সে এত দিন অনাহারে মরিয়াছে? সাহেব চলিল "মরিত, কিন্তু আমাদের রামহরির ধর্ম্ম-জ্ঞান অধিক, সে বলে যোগিনীকে প্রাণে মারা হইবে না, সে সেই গুহার মধ্যে একটি শিব না কি পুত্তলিকা রাখিয়াছিল, প্রত্যহ তাহা পূজা করিতে যায় ও যোগিনীকে নৈবেদ্য দিয়া আইসে, যোগিনী তাহা খাইয়া বাঁচিতেছে। কিন্তু অন্য দিকে রামহরি অত্যন্ত বিশ্বাসী, তাহাকে কোন মতেই মুক্ত করিবে না।

দিগম্বর বলিলেন—"সাহেব কাঞ্চনমালার প্রতি তোমার লোভ হইয়া থাকে, তুমি তাহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা কর, আমি সে দিকে দেখিতে যাইব না, আমার জয়াবতী লাভ করা চাই।"

সাহেব বলিলেন "শুদ্ধ কাঞ্চনমালা লইয়া কি আমি ধুইয়া-খাইব? আমরা ইংরাজ জাতি, রমণী অপেক্ষা অর্থের অধিক আদর করিয়া থাকি, আমি আপনাকে যাহা বলিয়াছি, তাহার কি?

দিগম্বর গোবিন্দের প্রতি অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিলেন, "ইহাঁর দ্বারাই সমস্ত হইবে।"

তাহার পর আরও দুই ঘণ্টা কাল তাঁহারা তিন জনে একত্র বসিয়া কত কথা বার্ত্তা, কত কাজ কর্ম্ম করিলেন; যখন রাত্রি দুই বাজিল, তখন দিগম্বর ও গোবিন্দ অশ্বারোহণে চলিয়া গেলেন। গাটে গৃহ-দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

শিবের ষষ্ঠীবাটা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চমীর পাণ্ডুবর্ণ চাঁদের কলা নীলাকাশে মুখ টিপে টিপে হাসছে, পাশে ছোট ছোট তারাগুলি, নববিবাহিতা কন্যার চারি পাশে আই-বড় মেয়ের ঝাঁকের মত, হা ক'রে চেয়ে আছে, ক্বচিৎ দুই একখানি উড়ো মেঘ, বউ কাঁটকী ননদের মত, উড়ে এসে চাঁদের চাঁদমুখখানি মলিন করে দিচ্ছে। বউ কাঁটকী ননদ!——কথাটা ঠিক হ'ল কি? ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে হ'লে, ননদের এ অভিধানে কা'রও বড় একটা আপত্তি ক'রবার কথা থা'কত না। তখন ননদকে নাগিনী, বাঘিনী, শাপিনী, ডাকিনী, যা ব'ল্‌তে, তাই শোভা পেত; কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে কালের গতি এখন আর এক পথে দাঁড়িয়েছে। সেকালের ন্যায় আজ কাল বঙ্গবধূরা পাতাচাপা আমের মত, ঘোমটা চাপা মুখখানি আর ঢেকে ঢেকে লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে বেড়ান না; এখন আর তাঁহাদের চোরের মত পা টিপে টিপে হাঁটতে বা গলা চেপে কথা কইতে দেখা যায় না, এখন আর সে কালের ম'রলে-মরি-রা'খলে বাঁচি গোছের বউ কোন ঘরে নাই বল্লেই হয়। এ কালের বউ—যেন বর্ষাকালের পদ্মা

যেন শিবের বুকের কালী, যেন তিন সেরের উপর চৌদ্দ পোয়া। এঁরা শ্বাশুড়ীর যম, ননদের মুগুর, দেবরের সম্মার্জ্জনী। পূর্ব্বে ননদেরা বধূদের জ্বালা দিয়েছিলেন, সর্ব্বময়ীরা এখন তার সুদ শুদ্ধ প্রতিশোধ নিতে বসেছেন। এখনকার ঠাকুরঝি—যেন জুতার সুখতলা, যেন ঢাকের বাঁয়া, যেন লবেদার আস্তিন,—না হলেও চলে না, অথচ বেখবর।

পঞ্চমীর চাঁদের কলা, কৃপণের বাড়ীর প্রদীপের মত, মিটি মিটি জ্বলছে. কৈলাসের খাস বাগানের ফুলের কলিগুলি মুচ্‌কে হেসে মধুর হাওয়ায় ঢু'লে ঢু'লে প'ড়ছে, এমন সময় ননীর পুতুল পার্ব্বতী সোহাগের ভরে মহাদেবের বগলের মধ্যে হাত খানি রেখে ঢিমা চা'লে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে বাগানের শীপাতলে এসে ব'স্‌লেন।

আজ উমার মেজাজটা বড় একটা পরিষ্কার ছিল না;—যেন কিছু ছায়া পড়া ছায়া পড়া, কিছু ঘোলা ঘোলা, কিছু মেঘা মেঘা। উমার রাঙ্গা ঠোঁটে হাসির ছটা খেলাবার জন্য শিব কত সরস কথা বল্‌ছেন, ত্রিভুবন এক করে, মাতা ঘামিয়ে ভেবে ভেবে, কত নূতন রসিকতার সৃষ্টি ক'র্‌ছেন, তবুও সে বেলোরের ঝাড়ে বাতির আলো খুল্‌ছে না। পুরুষের যত প্রকার অধর্ম্ম আছে, তার মধ্যে চাঁদ-চাওয়া গিন্নীর মন রাখার মত আর কিছুই নাই। বিশেষ যদি শত জন্মের পাপের ফলে শুষ্ক বৃদ্ধ তরুতে নবীন কুসুম ফুটে উঠে, তবেই সে স্বামীর ইহলোকেই বৈতরণী উপস্থিত। পাছে সেই পদ্ম মুখীর পদ্মচখের উপর তাঁর তোবড়া মুখের পাকা চুল বা'র হয়ে পড়ে, এই ভয়েতেই তাঁকে দিনে তিনবার কলপ দিয়ে জুতা বুরুষ করার মত মুখ ঘ'স্‌তে হয়; পাছে তাঁর নবীনা রসবতী তাঁকে রসহীন বুড়া ব'লে স্থির করেন, এই ভয়ে তিনি বৃদ্ধকালে নিধুর টপ্পা ও দাসুরায়ের ছড়া মুখস্থ করে বেড়ান, পাছে তাঁর রূপের ডালি তাঁরে কুরূপ ব'লে ঘৃণা করেন, এই

আশঙ্কায় তিনি তিন সন্ধ্যা গোবর খ'লে গা র'গ্‌ড়ে উঁয়ে খেগো ফোঁপড়া কাঠে আলকাতরা লেপার মত আপন দেহের চেক্‌নাই বাগর ক'র্ত্তে থাকেন। এমন পাগল সংসারে হাজার হাজার আছে, যারা শুদ্ধ ঘরের মন রা'খ্‌বার জন্য, গঙ্গার গর্ব্ভে পা দিয়েও চা'র আঙ্গুল চওড়া কালা পেড়ে ধুতি প'র্‌তে ছাড়ে না, যারা সর্ব্বময়ীর খোপার ফুলের জন্য শালগ্রামের পইতা বেচতেও প্রস্তুত, যারা শ্রীমুখের আজ্ঞামাত্র পালন করার জন্য সাগর ডিঙ্গান, লঙ্কা পোড়ান, গন্ধমাদন আনা, সকল বিষয়েই কোমর বেঁধে বসে আছে। তাতে যদি আবার গিন্নী চাঁদ-চাওয়া হলেন, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় হুকুম হ'ল,—আমি তোমার বুকে হাঁড়ী চড়িয়ে ভাত রেঁধে খাব, অম্নি চৌদ্দ পুরুষের কেনা গোলাম—"দেহি পদ-পল্লব মুদারং,,—বলে পায়ের গোড়ায় চিৎপাত হ'য়ে অঙ্গ ঢেলে দিলেন। আমরা স্বচক্ষে একটি গৃহিণীরোগগ্রস্ত বড় গোছের বাবু দেখেছি, যাঁর স্থূলাঙ্গী সোহাগিনী চোখ পাকিয়ে হুকুম করেন, এই রাত্রে আমায় মতির মালা না দিলে তোর কপালে এই—সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর সম্মার্জ্জনী নাচাতে থাকেন। বাবু অমনি চক্ষে সরিষার ফুল দেখে কাঁদো কাঁদো মুখে মুক্তা তু'ল্‌বার জন্য সাগরে ডু'বতে চলেন।

উমার মুখখানি যেন কাদা কাদা, যেন ধূলো ধূলো, যেন আঁধার আঁধার। শিবের উপর কোন রাগ নেই, অথচ তেমন হাসি নেই, তেমন স্ফূর্ত্তি নেই, তেমন চাঁদের কোলে বিজলী খেলা নেই। শিব অনেক কথা কইলেন, উমা তার দুটির একটির জবাব দিয়ে আঁচল পেতে শিলা-তলে শুয়ে প'লেন, একটু পরেই কাতর-স্বরে বলে উঠলেন—"বাবা রে, মাতা যেন ছিঁড়ে প'ড়্‌ছে"। আজ শিবের পাচক ভূতটির ক'বার পেট নামছিল, তাই উমাকে অগত্যা রন্ধনশালার ভার নিতে হয়ে-

ছেন। সেকালের মেয়েরা সহমরণেও হাসি মুখে স্বামীর চিতায় উঠতেন, কিন্তু এ কালের মেয়েদের ভাতের হাঁড়ী যেন ফাঁসি কাঠ। স্বামী কাছারি যাবেন, সকালে তাঁর ভাতের দরকার, তিনি নিজে রাঁধুন। কাছারি হ'তে এলেন, শরীর আলিয়ে পড়েছে, তা বলে কি ক'রবো? নিজে ভাত চড়ান, না হয় ব্রাহ্মণ রাখুন; আমার কোন পুরুষে ও অভ্যাস নাই, আগুনের তাতে গেলে এখনই মাতা ধ'রবে, গায়ে ধোঁয়ার গন্ধ হ'বে—ভাত রাঁধা কি আমার কাজ? কেন, কি দায়? আমরা স্বামীর মরণ কাঠি, জীবন কাঠি, আমরা কোমলাঙ্গী, ননীর পুতুল, পদ্মফুল। আমরা ফুল পেতে শোব, আদরে আদরে থাক্‌ব, হাতে হাতে ফিরবো। আমরা লক্ষ্মীর দোলার বিবি; যে লক্ষ্মী-ছাড়ারা আমাদের আদর না জানে, তাদের মাতায় আমরা কর্ণাট রাজ-মহিষীর মত আমাদের এই বাম পদাঘাত করি।

উমার মাতা ধরেছে,—শিবের মাতায় বজ্রাঘাত! হয়েছে ঘর পোড়া গরু যেমন সিন্দুরে মেঘ দেখে ডরায়, তেম্নি ঘা-খেগো দোজবরে স্বামী স্ত্রীর মাতাটি ধ'রলে ত্রিভুবন অাঁধার দেখে বসেন। স্ত্রীর জন্যে অনেক স্বামী চো'খের জলে নদী নালা ভাসিয়ে দিয়ে থাকেন; কিন্তু আপনারা বলে দিতে পারেন, প্রকৃত ভালবাসার টানে, রামচন্দ্রের মত কর্ম্ম-নাশা নদীর সৃষ্টি করতে, কয়জন কাঁদেন? অনেক স্বামী কাঁদেন—"আমার এ টাকায়-কেনা-পাকা-সোনা হারালে কত ক্ষতি?" অনেকে কাঁদেন প্রেম দেখাবার জন্যে,—"কি জানি, না কাঁদলে বুঝি বউ ভাব্‌বে ভাল বাসেনা, আবার অনেকে কাঁদেন, বউর শ্রীচরণ কমলের পানে চেয়ে, ভাবেন এখন গেলে ও চারুচরণ-কমলের মিষ্ট লাথি আর কোথায় পাব?" যাহউক, মহাদেব উমার মাতা ধরার কথা শুনে প্রকৃত স্নেহের ভরেই কেঁদে আকুল হ'লেন, অম্নি নন্দী, ভৃঙ্গি, বীর-ভদ্র প্রভৃতি ভদ্র ভদ্র ভুত মহাশয়দের ডেকে বলে দিলেন,—যেখানে

ভাল ডাক্তার পাও, তাতে যত টাকা খরচ হয়, শীঘ্র নিয়ে এস; উমা আমার সাত রাজার ধন, উমার কাতর মুখ দেখে আমার পাঁজরায় বরষা বিঁধছে।”

দেশে ইংরাজী চিকিৎসার চলন হওয়া পর্য্যন্ত ডাক্তার ভুতে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। যত হাঘরে, উনপাঁজুরে, বরাখুরে, ষণ্ডামার্কা গোমুর্খ চিরকাল আ-কড়ে এলবার্ট সিতি কেটে কেটে ডাঙপিটমো ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছে, শেষে যখন খরচের নেহাত টানা টানি হয়েছে; তখন পাঁচটাকার ফুলো শিসে কিনে নাওয়ারিবি ডাক্তার খানা খুলে ডাক্তার নাম পাড়িয়ে বসেছে। এরা ভদ্রতায় অকাল কুষ্মাণ্ড, বিদ্যায় হস্তী পঞ্চানন, চিকিৎসায় যমের সহোদর। এরা রোগীর বিছানার পাশে যেতে না যেতে রোগীকে ভবের লীলা সাঙ্গ কর্ত্তে হয়, কিন্তু তাতেও বাবুদের দর্শনীর টাকা কোন খানে যায় না,—— এক দিকে রোগীকে বাহিরে আনবার জন্যে টানা টানি, অন্য দিকে ডাক্তার বাবুর ভিজিট নিয়ে টানা টানি।

এ তো সব গেল বাজারে অচিহ্নিত হাতুড়ে ডাক্তারদের কথা; মেডিকাল কালেজের অনেক পাসকরা গণ্ডমুর্খ আছেন, যাঁরা আবার এদের প্রপিতামহ। তাঁরা ৮।১০ বৎসর করে (এ সব বুদ্ধিমানেরা ৫ বৎসরে প্রায় উত্তীর্ণ হন না) মেডিকাল কালেজের আড়া বরগা গুনে, শেষে চুরি চামারিতে এক এক খানি খুণ করবার সনন্দ বা'র ক'রে দেশে মহামারি আরম্ভ করে বসেন। পরণে পাণ্টালুন চাপকান, চো'খে চসমা, পকেটে একটী শিঙ্গা (ষ্টেথিস্কোপ) চেহারার চটক দেখে কে? স্ত্রীলোক পেশেণ্ট পেলে এঁদের মহেন্দ্র যোগ। যদি রোগীর পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে ব্রণ হয়ে থাকে, তবে ডাক্তার বাবু শিঙ্গে বা'র করে তার চেষ্ট একজামিন কর্ত্তে বসেন। এই সব পামর নরাধমেরা সমাজের প্রকৃত কলঙ্ক। ডাক্তার, কবিরাজ, যাদের হাতে

জা'ত প্রাণ, মান, সর্ব্বস্ব, তারা যদি ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হয়, তা হলে কি না সর্ব্বনাশ হয়। সমাজের উচিত, এই সব বিশ্বাসঘাতক মহাপাতকীদের মাতা মুড়িয়ে——দাগ দিয়ে সমাজ হ'তে বা'র করে দেওয়া।

যে বাবুদের কথা আমরা উপরে ব'ল্‌লাম, তাঁরা পৃথিবীতে হাজার হাজার, লাখে লাখে নর হত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা ভ্রূণহত্যা ক'রে জীবনান্তে ভূত হয়ে, কেহবা পায়খানা, কেহবা শেওড়াগাছ, কেহবা বাঁশগাছ শোভা ক'রে ব'সে থাকেন। সুতরাং ভূত ডাক্তারের অভাব কি?

রা'ত পোহালে ষষ্ঠী, ষষ্ঠিবাটায় উমাকে শিবের সঙ্গে বাপের বাড়ী যেতেই হবে, সুতরাং এক রাত্রের মধ্যে তাঁর পীড়ার শান্তি হওয়া চাই,—তাই ডাক্তার আ'ন্‌বার জন্যে চারি দিকে লোক ছুট্‌ল। কৈলাসের সন্নিকটে একটি তেঁতুল গাছে একজন বড় গোছের ডাক্তার ভূত, খুব বড় বড় অক্ষরে লেখা একখান "সাইনবোর্ড" ঝুলিয়ে রেখেছে দেখে, শিবের চেলা তাঁরই বাড়ী উপস্থিত হ'ল। কত হাঁকা হুঁকি ডাকা ডাকি, ডাক্তার বাবুর সাড়াও নাই, শব্দও নাই। শেষে ঘণ্টা খানিকের পর একটি ছোট গোছের ভূত,—বোধ হয় ডাক্তার বাবুর কম্পাউণ্ডার—বার হয়ে নাকী সুরে ব'ললে,—তুমি তো ভারি আহাম্মক হে, এ অসময়ে কি ডাক্তার বাবুর দেখা মেলে? তিনি এখন পেত্নী পাড়ায় প্রাক্টিষ কর্‌ছেন। শিব-ভূতের বিশেষ গরজ, সে নাছোড় হ'য়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল,—ভাই, তোমার উপর বিশেষ বিবেচনা ক'র্‌বো, ডাক্তার বাবু কোথায় আছেন, একবার দেখিয়ে দেও। বিবেচনার কি মাহাত্ম্য! এই বিবেচনার বলে দিনমান রাত্রি হয়ে যান, শাদা কাল হয়ে যান, ন্যায় চোখের মাতা খেয়ে ব'সে থাকেন। কম্পাউণ্ডার বাবু অমত করবার কোন কারণ দেখলেন না,

শিবদূতকে সঙ্গে করে পেত্নী পাড়ায় যেখানে নব-ঘন-শ্যাম ডাক্তার বাবু জোলস ক'রে ব'সে আছেন, সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

শিব-দুত গিয়ে ডাক্তার বাবুর যে হাল দেখ্‌লেন্‌ তা আর আমরা বর্ণনা কর্‌বো না। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে যাঁরা সন্ধ্যার পর পেত্নী পাড়ায় জোলস দেখেছেন, বা তাতে মিশেছেন, তাঁরা মনে মনেই সে মূর্ত্তি এঁকে নিতে পার্‌বেন; যাঁরা ও রসে বঞ্চিত, আমরা প্রাতঃবাক্যে কায়মনে ব'ল্‌ছি, তাঁরা যেন চিরকালই বঞ্চিত থাকেন। সে বর্ণনা শুন্‌বার যোগ্য পাত্র তাঁরা নন।

ধর্ম্ম, নীতি, সভ্যতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঊনবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের জননী নামে সাধারণ্যে পরিচিতা। সভ্যতার বিমল জ্যোৎস্নায়,—জ্ঞানোন্নতির আশাতীত উৎকর্ষে, বৈজ্ঞানিক সূত্রের বহুল ব্যাখ্যায়, দর্শনশাস্ত্রের প্রতিভাকে হীনপ্রভ করিয়া তুলিয়াছে। সময়ের দুর্নিবার স্রোত সংরুদ্ধ করা ক্ষমতার অতীত। সভ্যতার উন্নতিতে বিজ্ঞান যে অসাধারণ প্রাধান্য সংস্থাপন করিতেছে তাহা বস্তুতঃ অসাধারণ হইলে, সুতরাং কল্পনা-সাগরে ভাসমান দার্শনিক সূত্রের প্রতিও মানুষের আস্থা অবশ্য বিচলিত হইবে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার অতি অল্প দিন হইলে, কাযেই চির-সংস্কার দার্শনিক-সূত্রে গোঁড়ামী অতি সত্বর অপনীত হইবার নহে। সংস্কারের বদ্ধমূল বিচলিত করা অধিক আয়াস ও সময়ের প্রয়োজন।

মানব সমাজে যখনই যে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তখনই দার্শনিকেরা তৎমূল সূত্রের মধ্যে কোন একটি অবলম্বনপূর্ব্বক অপর একটি নূতন

মূলসূত্রে উপনীত হইয়াছেন। এই কারণে ধর্ম্ম জ্ঞানের মৌলিকত্ব পরিণামে দার্শনিক মৌলিকত্বে পরিণত। দার্শনিকেরা ধর্ম্মজ্ঞানের মৌলিকত্বের সংশ্লেষণকে বিশ্লিষ্ট করতঃ সংশ্লেষণের যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তদ্দ্বারাই ধর্ম্ম জ্ঞানের লক্ষ্যের প্রতি কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনায়—বৈজ্ঞানিক তুলমান দণ্ডের এবম্ভুত মত পরিস্থাপিত করিলে, কোনরূপ গুরুত্বের উপলব্ধি হয় না। বস্তুতঃ দার্শনিক প্ররোচনা যে ঠিক নহে; তাহা আপনাদিগের মত দ্বৈধতাই প্রমাণ করিতেছে। শাস্ত্রকর্ত্তার লিপির ভ্রান্ততা প্রতিপাদন করিলে কাযেই ধর্ম্মেরও ব্যাঘাত সাধন হয়। অট্টালিকা যে ইষ্টক দ্বারা সংরচিত, সেই ইষ্টককে কিছুই নয় করিতে পারিলে অট্টালিকা গঠিত হয় কিসে? ধর্ম্মজ্ঞান অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রের আরম্ভ প্রথমতঃই প্রমাণের নিমিত্ত ক্ষুৎ-পিপাসাতুর ও শাস্ত্রিক হওয়ায় (philosophic) পরিণামে অসংলগ্নত্ব অসম্ভব নহে।

হিউম প্রাকৃতিক ধর্ম্মের আলোচনা করিতে যাইয়া একেশ্বর সম্বন্ধে যে সকল অভিমত পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তত্তাবতই গম্ভীর যুক্তির অনুগামী। তিনি বলেন, একেশ্বর বাদ যেস্থলে কোনরূপ সর্ব্ববাদী-সম্মত ধর্ম্মের মৌলিকত্বরূপে সংগঠিত, সেই ধর্ম্ম গভীর যুক্তির এত অনুগামী হয় যে, ধর্ম্মের প্রত্যেক প্রণালীর সহিত দর্শনশাস্ত্র আপনি বিমিশ্রিত হইবার যোগ্য হইয়া পড়ে। এবং যদি কোন পবিত্র ধর্ম্ম পুস্তক, যেমন কোরাণ অথবা তৎসদৃশ অমানুষিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিব্যক্ত ধর্ম্মগ্রন্থে অথবা বাক্যে এতদ্রূপ কথা লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে (speculative philosopher) সেই সকল অভিমত বিলোড়ন করনান্তর অপর একটি মতে উপনীত হয়েন। দর্শনশাস্ত্র তাহার কোন কোনটিকে ভ্রমসংকুল বলিতে যাওয়ায় সুতরাং নূতন সঙ্গীর সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এবং কাযেই ধর্ম্মগ্রন্থের প্রত্যেক

প্রণালীর সংশোধনের স্থলে, দর্শনশাস্ত্র আরো কুসংস্কারের অবতারণা করে। এই ঘটনা দৃষ্টে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে সমুদয় সর্ব্ববাদী-সম্মত ধর্ম্মশাস্ত্র, বিশেষতঃ দার্শনিক ধর্ম্মজ্ঞান (scholastic religion) অসংলগ্নত্ব এবং বিতণ্ডার জন্য ক্ষুৎপিপাসাতুর। যে কোনরূপ ধর্ম্মই হউক, প্রমাণ ও সহজ বুদ্ধিকে অতিক্রম না করিলে অনায়াসে সর্ব্ববাদী সম্মত হইতে পারে। মনোবিকার ও রহস্যাক্রান্তের উত্তেজনশীলতার বিরাম নাই, অন্ধকার ও দুর্জ্ঞেয়তা এতৎপরিণাম অনুসন্ধানের বিষয়! অথবা প্রতিভা সংস্থাপনে বিশ্বাসপরতন্ত্র গোঁড়া উপাসকেরা, কৃত্রিম বিচারকে মৌলিকত্বে আরোপ করিয়া বিরুদ্ধ বাদীকে পরাজয় করণে সংকল্প করে। ধর্ম্মপোদেশক ইতিহাস এতদ্রূপ প্রতিবিম্বের যথেষ্ট নির্দেশবর্ত্তী। বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বাকবিতণ্ডা অবলোকনে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় বাদানুবাদের বিষয় আদৌ তত স্থিরতর নয়। পরিণামে অসংলগ্নত্ব অসম্ভব নহে। দার্শনিক ধর্ম্মস্রোত সংরুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যদি এইরূপ সামান্য মুলসূত্র অবলম্বিত হয় যে কোন এক বস্তু একই সময়ে হইতে পারে ও পারে না« এ কথা অসম্ভব; অথবা অংশ হইতে সমুদয় বৃহৎ কিম্বা «তিন ও দুইয়ে পাঁচ হয়,» তবে এই সামান্য তৃণকনা সদৃশ যুক্তি দার্শনিক সমুদ্র স্রোত নিরুদ্ধ করণে গৌরব করিতে পারে। "পবিত্র রহস্যের বিরুদ্ধে তুমি পাষণ্ড যুক্তি আরোপ কর?—তোমার অপবিত্রতার জন্য কোন শাস্তি সমুচিত? প্রাগুক্ত সামান্য কথা গুলিরও দার্শনিক প্রত্যুত্তর এই। ইহারা বিরুদ্ধবাদী অথবা পাষণ্ডদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য শেষোক্ত শিখাবিশিষ্ট যে অগ্নি প্রজ্জ্বালন করেন, সেই অগ্নিতে তাঁহারা আপনারাও ভস্মসার হয়েন। ১।

---

(১) See Hume's natural history of religion. Iv. page 481

মূল বিশ্বাস দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র অসাধারণ মৌলিকত্ব। দার্শনিকেরা বলেন, মূল বিশ্বাস ব্যতীত জ্ঞানোন্নতি একেবারে অসম্ভব। বিশ্বাস না থাকিলে দ্রব্য সকল নির্ণয় করিতে পারা যায় না। জগতের যাহাই দেখা যায় অথবা চিন্তা করিতে পারা যায়, তাহাই বিশ্বাস সাপেক্ষ। বিশ্বাস আমাদিগের হৃদয়ে আছে বলিয়া আমরা অনায়াসেই কোন দ্রব্য নির্ণয় করণে সমর্থ। বিশ্বাসকে অবিশ্বাস মানব কখনই করিতে পারে না। সুতরাং বিশ্বাস প্রাকৃতিক এবং অভ্রান্ত। বিজ্ঞানবিদেরা এই বিশ্বাস কি বুঝিতে না পারিয়া মহান অনর্থের সূত্রপাত করেন। তাঁহারা বলেন, "আমি আছি" এই চিন্তা করিতে পারি; অতএব আমার অস্তিত্ব অলঙ্ঘনীয়। কাযেই, যাহাই ভাবিতে পারি, তাহাই সৎ হইয়া পড়ে।

দার্শনিকের মতে বিশ্বাসই জ্ঞানের অবান্তর; অথবা জ্ঞানই বিশ্বাসের অবান্তর মাত্র। অনেকের মতে সহজ জ্ঞান (common sense) বিশ্বাস হইতে সমদ্ভূত। আমরা এবম্ভূত দার্শনিক প্ররোচনায় কখন আস্থা করিতে পারি না। আমরা সহজ জ্ঞান অথবা পাশব জ্ঞান (instinct) কে ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মশীল অবাদান পরম্পরায় বিনির্ম্মিত মনে করিয়া থাকি। বিশ্বাস আমাদিগের মতে অভ্যাসজাত। সহজ জ্ঞান অথবা পাশবজ্ঞান স্বভাবজাত। ভয়ের সঞ্চার হওয়া, কৌতূহলের উদ্দীপ্ত হওয়া, শিশুর মাতৃস্তন্য পান করা ইত্যাদি পাশব জ্ঞানের ফল। পুত্তলে ঈশ্বর বলিয়া ভক্তি, ব্রাহ্মণকে দেবতা বোধ, ইত্যাদি সংস্কারের ফল। এই সংস্কার হইতেই বিশ্বাস অথবা এই সংস্কারই বিশ্বাস। সংস্কার অথবা বিশ্বাস যে ক্রমিক অনুশীলনে সমুৎপন্ন, তাহা বোধ হয়, পাঠকগণ আমাদিগের পূর্ব্ব প্রস্তাবে বুঝিয়া থাকিবেন। বহু ঈশ্বরে অথবা একেশ্বরে বিশ্বাস, অনুশীলনের সংস্কারের ফল। ঈশ্বর আছেন; তিনি অনাদি মঙ্গলময় ইত্যাদি বিশ্বাস

সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানোন্নতির দ্বারা আহৃত। জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন, মানবের সংকীর্ণ মানসিক বৃত্তে, এরূপ বিশ্বাসের একেবারেই অসম্ভব।

বিশ্বাসের সঞ্চার হওয়া যে, শিক্ষা ও অভ্যাস সাপেক্ষ তাহার আর একটি প্রমাণ এই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অথবা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কিছু জ্ঞান অথবা বিশ্বাস আমাদিগের হৃদয়ে বর্ত্তমাণ আছে; তাহা সম্পূর্ণরূপে, পিতা মাতা অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি—যাহার দ্বারা আমরা লালিত হই, অথবা অহর্নিশি যাহাদিগের সংশ্রবে কালাতিপাত করি, তাহাদিগের উপদেশ অথবা দৃষ্টান্তের ফল। কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি বাক্‌পদ্ধতি সকলই তাহাদিগের উপদেশ কিম্বা দৃষ্টান্ত হইতে জাত! ধর্ম্মজ্ঞান, ঈশ্বরে বিশ্বাস, পারলৌকিক ভয় ইত্যাদি না থাকিলে, সমাজনীতি পরীরক্ষনীয়া হয় না, এরূপ বিশ্বাসও শিক্ষা এবং অভ্যাস সাপেক্ষ। বাল্য জীবনে, আমরা যদি পিতা মাতা কর্ত্তৃক উপদেশ প্রাপ্ত হইতাম যে, ধর্ম্মনীতি (relegion) অভাবে সমাজনীতি চলিতে পারে—মানব-সমাজ সুখবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে কি সমাজ সুশৃঙ্খল পরিরক্ষিত হইত না?—সামাজিক ক্রিয়া কলাপ কি মানব-সমাজে সুখবৃদ্ধি সাধনের হীনতা থাকিত? কখনই নহে। ধর্ম্মের ভয় পরলোকের ভয়, ইত্যাদি যদি না থাকিত, তবে সমাজ চলিতে পারিত না—সমাজ-নীতির অসাধারণ প্রাধান্য সংশ্লিষ্ট থাকিত না, একথা অসম্ভব ও প্রত্যক্ষেয় অপলাপী। ধর্ম্মের ভয়, ইত্যাদি পূর্ব্বের সংস্কারের দ্বারা আমরা পরিচালিত হই। এগুলি না থাকিলে পাপ কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য—সামাজিক নিয়মাবলীকে সুশৃঙ্খলে রাখিবার জন্য, মানুষের আত্মাভিমান ও কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রবলতর হওয়া প্রয়োজন। এখন পৃথিবীতে ২।৪ জন মনীষী, স্বীয় প্রতিভার দ্বারা, ধর্ম্মভয় পরিশূন্য হইয়া, জগতের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। পূর্ব্ব হইতে, জড়জগতের শক্তিনিচয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ;

মানব-হৃদয় ধর্ম্মভাব পরিশূন্যভাবে সংসার ক্ষেত্রে অবতরণ করিলে, সকলেই আত্মাভিমান প্রবল ও কর্ত্তব্য জ্ঞানে উত্তেজিত হইয়া, সমাজ-নীতির সংশ্লেষণত্ব ও সামাজিক উৎকর্ষতা বিধান করিতে পারিত।

শিক্ষা পর্য্যবেক্ষণ অথবা প্রমাণ (analogy) দ্বারা বিবিধ অন্তর্ব্বোধ (impression) মানবহৃদয়কে বিজড়িত করে। অন্তর্ব্বোধ সকল যে শূন্যে শূন্যে হইয়া থাকে, তাহা নহে। মানব প্রকৃতি ও জাগতিক ঘটনা পরম্পরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা করিলে, এই কথা স্পষ্টতই উপলব্ধি হয়। উত্তরকালে এই অন্তর্ব্বোধ মনোবেগের (Feeling) সহিত এতদূর দৃঢ়তম সূত্রে গ্রথিত হয় যে, কোন্‌টী অন্তর্ব্বোধ ও কোন্‌টী মনোবেগ তদাবধারণ করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। যাঁহাদিগের মানসিক চিন্তা-প্রবণতা অতি খরতর, তাঁহারা ব্যতীত, অন্যের পক্ষে মনোবেগ সংলোচন করিয়া সৎমার্গে বিচরণ করা অসম্ভব। অনেক পদার্থে বিশ্বাসের মূল একমাত্র মনোবেগ। ইচ্ছা হয় না, বিশ্বাস করি, কেহ বলিয়া দেয় না বিশ্বাস কর, তবুও বিশ্বাস আসিয়া পড়ে কোথা হইতে? অন্যে যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পারেন আমরা বলি, মনোবেগ হইতে। অনেকগুলি অন্তর্ব্বোধ মনোবেগের সহিত বিজড়িত; এমন কি সেগুলিকে অন্তর্ব্বোধ হইতে সংজাত বলিলেও কোন হানি নাই। প্রায় অন্তর্ব্বোধই পর্য্যবেক্ষণ ও প্রমাণ [analogy] সাপেক্ষ। তবে বিশ্বাস আজলবী হয় না। বিশ্বাস, পর্য্যবেক্ষণ ও প্রমাণ হইতে হইয়া থাকে। আমরা বলিয়া রাখি, মানবের পর্য্যবেক্ষণ মাত্রেই এখনও প্রমাণ মূলক হয় নাই। অনেকগুলিতে ভ্রমসংকুলতা এখনও বিদ্যমান আছে। পুনঃ পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন মনোবেগ হইতে অনেকগুলি বিশ্বাস হইয়া থাকে। আবার এমন অন্তর্ব্বোধও অনেক আছে, যাহার কারণের মূলে কোনরূপ গুরুত্ব নাই। সুতরাং যে অন্তর্ব্বোধের এইরূপ ভার, সেই স্থলে সেই মনোবেগজাত বিশ্বাস

যে অপর একটি নিরর্থক মনোবেগে পরিণত হইবে তাহা অসম্ভব নহে। কাযেই আমরা বলিতেছি, বিশ্বাস মাত্রের মূলেই যে গুরুত্ব থাকিবে, এ কথা সমীচিন হয় না।

(ক্রমশঃ)

"গাও ভারতের স্মৃতি গান।"

১

বিরহ বিধুর, অধম বাঙ্গালী,
জ্ঞান, মান, ধন, যশের কাঙ্গালী,
সাহস প্রভুত্ব বীরত্বে সুদীন,
"ভারত-কলঙ্ক" শৌর্য্য বীর্য্য হীন,
কতকাল গাবে প্রেমের গান।

প্রেমের আবেশে হ'য়ে অচেতন,
বিলাস-সরিতে হ'য়ে নিমগন,
কতকাল আর থাকিবে এমন ;
প্রেমের বীণায় কর সংযোজ,
শৌর্য্যবীর্য্য ময় তার অগনণে,
চড়াও বীণার পঞ্চমের তানে,
গাও মন সুখে বীরত্ব-গান।

২

পাখোয়াজ সনে মিলাও সুতান,
করে ফেল সুধু বীরত্বের প্রাণ ;—
তবলা বেহালা ফেলে দ্যাও দূরে,
উদ্দীপনা স্বরে—উচ্চতান পূরে,
ভারতের যশঃ কেবল গাও ;

অন্য চিন্তা যেন রাখিও না মনে,
গাও মন সুখে বীরত্ব বদনে ;—
"ভারত সন্তান আমরা সকলে,
আজি এ কলঙ্ক আমাদের ভালে ;
অর্জ্জুন, সাত্যকি,—ভীষ্ম, বৃকোদর,
কর্ণ, যুধিষ্ঠির—ভার্গব প্রবর,
যাহার উদরে লভেছে জনম,
তাহারি সন্তান আমরা এখন,
আরো কি তোমরা শুনিতে চাও ?"

৩

তবে বলি শুন হয়ে এক মন,
জগতে অতুল ভারত-রতন ;
যাহার সন্তান বীরদর্প ভরে,
কাঁপাইয়া ধরা প্রফুল্ল অন্তরে—
নীলবারী-নিধি অগাধ সাগরে
বেঁধেছিল যারা—কঠিন প্রস্তরে
তাহারি সন্তান আমরা সবে।

কুরুক্ষেত্র রণে—মহা যোধগণ,
যেন ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড বারণ,
হেন যোধগণ অতুল ভবে।

৪

ব্যাসদেব যথা বীরত্ব বীণায়,
শৌর্য্য বীর্য্যময় তার যোজনায়-

সুগম্ভীর স্বরে—বিদারি গগণে
বীরত্বের উৎস—উদ্দীপনা গানে
মোহিত করেছে জগজ্জনে;

বাল্মীকি যেথায় বীণা বাজাইয়া
বীরত্বের গান গাইয়া গাইয়া,
ভারতের যশঃ গেয়েছে কেবল,
সে ভারত সুত আমরা সকল,
কারোই কি ইহা নাহিরে মনে ?৮

৫

"তবে বলি শুন শুন আর বার,
অদ্ভূত কাহিনী কিবা চমৎকার,
যাহার তনয়া—বীরত্ব শালিনী—
স্বদেশের তরে যেন রে সাপিনী.
চাহে দংশিবারে অরাতি নিকরে,
ক্রোধে ধরা যেন টল টল করে,
সাধের চিকুর করেছে চ্ছেদন,
ধনুকের ছিলা করিতে যোজন,
সে ভারত-সুত আমরা সবে।

তনয়া যাহার বিক্রম শালিনী,
সমরে যেনরে চামুণ্ডা রূপিনী,
তনয় যাহার—বীরত্ব আধার,
বীরত্বে স্তম্ভিত করেছে সংসার,
তাহার সন্তান আমরা সবে।

(উত্তেজন।)

প্রতি গৃহে গৃহে গাও এইগান,
পঞ্চমে মাতিয়া—উদ্দীপনা তান,
প্রাচীন গৌরব করিয়া মনে।

পাখোয়াজ সনে মিলায়ে সুতান,
করে ফেল সুধু—বীরত্বের প্রাণ,
বিলাস বাজনা ফেলে দ্যাও দূরে,
উদ্দীপনা স্বরে—উচ্চ তান পূরে
গাও ভারতের স্মৃতির গান।

৬

"বশিষ্ট বাল্মিকী ব্যাসের জননী,
সে ভারত-ভুমি মোদের জননী,
আচার্য্য শঙ্কর সাম্য বিঘোষণে,
সতেজ করেছে যাহার সন্তানে,
তাহারি সন্তান আমরা ভবে।

হিমাদ্রি-শেখরে যোগাসন প'রে,
ধ্যানে নিয়ন্ত্রিত—প্রফুল্ল অন্তরে
আছিল যাহারা,—যাদের বচন,
তীক্ষ্ণজ্ঞানময়—বেদ, দরশন,
সে ভারত-সুত আমরা সবে।"

৭

"অভ্রভেদী-উচ্চ ওই হিমগিরি,
প্রস্তর মণ্ডিত—উত্তর প্রহরী,

পূরব পশ্চিম দক্ষিণ দুয়ারে,
অগাধ অনন্ত ফেনিল সাগরে
বেষ্টিত সোণার ভারত-ভূমি।

"সেই মহাস্থানে—আর্য্যের নিবাস—
প্রচণ্ড তপন যেথা পরকাশ;
উঠিতে বসিতে শিরায় শিরায়,
শোণিত উত্তপ্ত নিরন্তর হয়,
ক্রোধের অনলে করে যোগদান,
তীক্ষ্ণকরময়—প্রচণ্ড তপন,
জগতে অতুল ভারত-ভূমি।"

(উত্তেজন।)

বিরহ-বিধুর অধম বাঙ্গালী,
জ্ঞান, মান, ধন, যশের কাঙ্গালী,
কতকাল গাবে প্রেমের গান?

পঞ্চমে মাতিয়া উদ্দীপনা তানে,
গাও মন সুখে গাও এই গানে,
ভারত ভূমির প্রতি ঘরে ঘরে,
গাও এই গান—উদ্দীপনা স্বরে,
গম্ভীর শবদে মিলাও তান;
প্রাচীন ভারত যশের রতন,
জাতীয়-গৌরব কর উদ্দীপন,
গাও ভারতের স্মৃতির গান।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

মাসিক সমালোচক ও খেয়াল সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় রচনা, প্রবন্ধাদি, সমালোচ্য গ্রন্থাদি ও কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

ব্যারিং বা ইন্সফিসিয়েণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না। যাঁহারা পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উত্তর লেখা যাইবে না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা ডাকের টিকিটে মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় /০ আনা কমিসন দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট যেন কেহ না পাঠান। মনি আর্ডরে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর ডাকঘরে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন, তাঁহাদিগের নিকট পশ্চাদ্দের হিসাবে ৪৲ টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে, সুতরাং বিনা মূল্যে দেওয়া এক কালে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্র ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

উকীলাবাদ,
বহরমপুর।
১২৮৯ সাল,
১৫ই বৈশাখ।

শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী।

(৪র্থ খণ্ড।) ৪র্থ। ৫ম সংখ্যা।)

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল

সংযোজিত।

(সর্ব্ব-শাস্ত্র বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচক।)

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১২৮৯ সাল, শ্রাবণ ও ভাদ্র।

বহরমপুর,—অরুণোদয় যন্ত্রে
শ্রীভগবানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা। দুই সংখ্যার মূল্য ৫০ আনা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

পূজা আগতপ্রায়। এই সময়েই আমাদিগকে সমস্ত দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ করিতে হইবে। এই ঝঞ্ঝাটের সময়ে বিদ্যোৎসাহী দেশহিতৈষী গ্রাহকগণই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। তাঁহাদের বদান্য ও উদারতা ব্যতিরেকে মাসিক পত্র প্রকাশের ন্যায় ব্যয়সাধ্য গুরুতর কার্য্য শুদ্ধ একা আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব। অতএব তাঁহাদের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা "সমালোচক ও খেয়ালের" স্ব স্ব দেয় মূল্য পরিশোধ করিয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল

ছোট বৌর ঝাঁপি

গরলে অমৃত।

নবম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণার ফল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার ১৫ দিবস পর কাঞ্চনপাহাড়ীর তলদেশে এক জন বাঙ্গালী বণিক একখানি আড়ত খুলিল; সাঁওতালেরা ঘৃত, ধান্য, ভুট্টা, শালপাত প্রভৃতি সেই আড়তে আমদানি করিতে লাগিল। সরলমতি সাঁওতালেরা প্রতারণা কাহাকে বলে তখন তাহা জানিত না, ধূর্ত্ত বাঙ্গালী আড়তদার তাহাদিগকে ভুলাইয়া এক মণের স্থানে দশ মণ মাপিয়া লইত, এইরূপ করিয়া মাপিয়া লইয়াও এক এক জন সাঁওতালের ২০০।২৫০ করিয়া টাকা পাওনা হইল; আড়তদার আজ কাল করিয়া প্রায় ৫০ হাজার টাকার দ্রব্য

চালান দিয়া এক রাত্রে আড়ত ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল। সে কোথায় গেল, তাহা সাঁওতালেরা জানিল না, কিন্তু যে রাত্রে সে পলায়ন করে, সেই রাত্রে কেহ কেহ তাহাকে গাট্রে সাহেবের বাঙ্গালাতে দেখিয়াছিল। এই সময় হইতে যে বাঙ্গালী সাঁওতালদিগের সহিত কারবার আরম্ভ করিল, সেই তাহাদিগকে ভুলাইতে লাগল, সাঁওতালেরা অনুনয়, মিনতি, রোদন পর্য্যন্ত করিয়া দেখিল——বাঙ্গালীর অন্ত পাইল না।

কাঞ্চনমালার পীড়া অবধি যোগেশচন্দ্র কারখানার প্রায় সমস্ত কার্য্যই গাট্রে সাহেবের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, কেবল প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় স্বয়ং তহবিল বুঝিয়া লইতেন। গাট্রে প্রতিদিন সাঁওতালগণের বেতন বাহির করিয়া লইয়া খরচ লিখিত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই হিসাব পরিষ্কার করিয়া বেতন পাইত না, সকলেরই প্রায় অর্দ্ধেক বাকি পড়িত। সাহেবের নিকট চাহিতে গেলে, সাহেব তাহাদিগকে চাবুক দেখাইতেন।

এক দিবস কারখানায় মহা ধুমধামে কার্য্য হইতেছে, সকলেই ব্যস্ত, কেবল সাঁওতাল-যুবক ভগলু তাহার নব-পরিণীতা ভার্য্যা কলুসীর সঙ্গে নির্জ্জন প্রদেশে বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছিল, গাট্রে দূর হইতে তাহা দেখিয়া বায়ুগতিতে নিকটে আসিয়া ভগলুর পৃষ্ঠে সবলে কষাঘাত করিতে লাগিল ; শেষে নিরীহ ভগলু যাতনায় ছট ফট করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলে, দুরাত্মা গাট্রে কলুসীর হস্ত ধরিয়া গুদাম ঘরের দিকে যাইতে লাগিল, কলুসী চীৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। যেখানে এই ব্যাপার হইতেছিল, সে স্থান হইতে অন্যান্য শ্রমজীবীরা দূরে ছিল, কেহই এ সমস্ত ঘটনা দেখিতে বা শুনিতে পায় নাই। প্রাণাধিকা সতীর উপর এতাদৃশ পাশব আক্রমণ দেখিয়া নরীহ সাঁওতালের ক্রোধ প্রদীপ্ত হইল, যে ক্ষণপূর্ব্বে শিশুর ন্যায়

পড়িয়া সাহেবের কষাঘাত সহ্য করিয়াছিল, সেই ভগলু একণে উত্তে-জিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ক্রোধে শরীর ফুলাইয়া এক লম্ফে যাইয়া সাহেবের টুঁটি চাপিয়া ধরিল। ভগলু তৎক্ষণাৎ সাহেবকে শমনভবনে প্রেরণ করিত, কিন্তু সেই সময়ে যোগেশচন্দ্র সহসা কারখানায় উপস্থিত হইয়া দূর হইতে এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া তীরবেগে আসিয়া ভগলুর বজ্রমুষ্টি হইতে গাট্রেকে রক্ষা করিলেন।

এই সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে দিগম্বর বাবু সাঁওতালদিগের মধ্যে মহা উৎপাত আরম্ভ করিলেন, যাহারা এক টাকা খাজানা দিত, নানা ছলনায় তাহাদিগের নিকট বলপূর্ব্বক পাঁচ টাকা আদায় করিতে লাগিলেন! তাঁহার কতকগুলি লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ ক্রমাগত সাঁওতালপল্লী মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহারা যাহার যাহা পাইত, তাহাই লুঠ করিয়া লইত, সাঁওতাল যুবতীগণকে স্বামীর ক্রোড় হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যাইত, বৃথা কথায় বিবাদ বাধাইয়া দিবা দ্বিপ্রহরের সময় গ্রাম জ্বালাইয়া দিত। সাঁওতালেরা সকলেই উৎপীড়িত হইয়া যোগেশচন্দ্রের নিকট আবেদন করিল, যোগেশ স্বয়ং দিগম্বর বাবুর সহিত দেখা করিয়া এ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিবেন স্থির করিলেন।

এক দিবস বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যোগেশচন্দ্র কাঞ্চনভবনে আহা-রান্তে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে, বিংশতি জন বরকন্দাজ ও একজন জমাদার গঙ্গাদহ হইতে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একখানি লিপি প্রদান করিল। লিপি খানি যোগেশের পিতার হস্তের লেখা মহারাজ জয়হরিচন্দ্রের স্বাক্ষরিত; তাহাতে এইরূপ লেখা আছে;—

"প্রাণাধিকেষু—

তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী৺ স্থানে নিয়ত প্রার্থিত, পরং এখানে টাকার আমদানি নাই, অথচ বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে তোমার কারখানায়

যত টাকা থাকে, শালগ্রাম সিং জমাদারের মারফত অদ্যই পাঠাইবে; এ লোক বিশ্বাসী, পাটনার গদীতে ছিল, সেইজন্য তুমি ইহাকে পূর্ব্বে দেখ নাই। ইতি—"

যোগেশচন্দ্র পত্রখানি দুই তিন বার পাঠ করিলেন, মহারাজা তাঁহাকে সর্ব্বদা যে প্রকার স্নেহপূর্ণ ভাষায় পত্র লেখেন, এ খানিতে তাহার অভাব দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন, আবার পরক্ষণেই ভাবিলেন, বিশেষ ব্যস্ততা-প্রযুক্ত ও প্রকার লিখিয়াছেন। শেষে বলিলেন— "শালগ্রাম সিংহ কাহার নাম ?"

শালগ্রাম সিংহ অভিবাদন করিয়া সম্মুখে যোড়হস্তে দাঁড়াইল।

যোগেশ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন টাকা লইবে ?

সিংহজী বলিল——"মহারাজ, হুকুম জরুরি, বিলম্ব করিবার আদেশ নাই।" যোগেশের তহবিলে তখন লক্ষ টাকা মজুদ, তিনি চারিখানি শকট আনাইয়া টাকা উঠাইয়া দিলেন ও পত্র লিখিয়া শালগ্রাম সিংহকে বিদায় করিলেন। শালগ্রাম সিংহ টাকা লইয়া বিদায় হইবার দুই ঘণ্টা পরে, প্রায় দিবাবসান সময়ে, বুদ্ধিচাঙ্গ, মাঙ্গক ও অপরাপর জনকয়েক সাঁওতাল যোগেশচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিল। সাঁওতালেরা যোগেশকে আদর করিয়া "রাজা" বলিয়া ডাকিত, তিনিও তাহাদিগকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। তাঁহার গৃহে সাঁওতালগণের অবারিত দ্বার ছিল, তাহারা যে কেহ যে সময় আসিত, তখনই বিনা এত্তালায় তাঁহার শয়নগৃহে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিত, কোন ভৃত্য কখন তাহাদিগকে বাধা দিত না। সাঁওতালেরা গৃহ প্রবেশ করিলে যোগেশচন্দ্র তাহাদিগকে আদর করিয়া বসাইলেন, শেষে সহাস্যবদনে বলিলেন —"তবে, মাঝি কি মনে করে ?"

মাঙ্গক ছল ছল চক্ষে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—"আর রাজা, বলিব কি, দেশে বাস করা ভার হইল, আজ এখনই দিগম্বর

বাবুর লোকে আলুপাহাড়ী পোড়াইয়া দিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দারোগা আসিয়া আমার গ্রামের ভগলু ও কলুসীকে চোর বলিয়া বান্ধিয়া লইয়া গেল; আমরা কত কাঁদিলাম, তার পায়ে ধরিলাম, সে ফিরিয়াও চাহিল না।”

যোগেশচন্দ্রের মুখ গম্ভীর হইল, তিনি একবার বুদ্ধিচান্দের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, তাহার চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, বুদ্ধি আস্ফালন সহকারে বলিতে লাগিল:—“কি বলিব রাজা, তুমি বারণ কর, নচেৎ দেখিতাম দিগম্বর বাবুর কত বল, দারোগারই বা কত সাহস। আমরা সাঁওতাল, স্বভাবতঃ সরল, নিরীহ, কিন্তু আমাদিগকে কেহ উৎপীড়ন করিলে আমরা হস্তীর বল ও সিংহের সাহস দেখাইতে জানি।”

মাঙ্কু আক্ষেপ সহকারে বলিতে লাগিল:—“রাজা আমরা জানিতাম, ইংরাজ ধর্ম্ম-অবতার, তাহাদের রাজ্যের কি এই বিচার, এই ধর্ম্ম? যে রাজার রাজ্যে দরিদ্রের অভয় নাই, সে রাজার গৌরব কোথায়?”

যোগেশচন্দ্র বলিলেন—“মাঝি, তোমার ভ্রম হইয়াছে, পৃথিবীতে ইংরাজের মত ন্যায়বান রাজা অতি বিরল, আমাদের রাজার চক্ষে ধনী নির্ধন সমান, তবে এখানে এই যে সমস্ত উৎপীড়ন হইতেছে, ইহাতে রাজার অপরাধ নাই—রাজা ইহার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহেন।”

বুদ্ধিচান্দ পূর্ব্ববৎ বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিল—“ইংরাজ যদি এত কাণ্ড কিছুই না জানেন, তবে আমরা স্বয়ং এ সমস্ত উৎপাত নিবারণ করিতে পারি, আমাদের কার্য্যও তাঁহাদের খবরে আসিবে না।”

যোগেশ বলিলেন——“বুদ্ধি, তুমি বুঝিতেছ না, তোমাদের চারিদিকে শত্রু হইয়াছে, তোমরা সামান্য একটি কার্য্য করিলেই সকলে

সেটিকে রাজদ্রোহ বলিয়া রঞ্জিত করিবে. ও সেই সামান্য বিষয় অতিরঞ্জনাবস্থায় রাজার কর্ণগোচর হইবে।” নিশ্বাস ফেলিয়া বুদ্ধিচাঙ্গ বলিল:—“তবে উপায়! বাঁধা মার খাইব? ধৈর্য্য যে ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতেছে।”

যোগেশ বলিলেন:—“রাজার নিকট প্রার্থনা কর, তিনিই দুষ্টের দমন করিবেন——যাহা হউক, ভগলু ও কলুসীকে দারোগা কোথায় লইয়া গেল?

' মাঙ্গক বলিল—“সাহেবের বাঙ্গলার দিকে”।

কথাটি যোগেশচন্দ্রের বড়ভাল লাগিল না, তিনি আপন মনে এক মিনিট কাল কি ভাবিলেন,এবং পরক্ষণে বলিলেন “বুদ্ধি, আমার ভাল বোধ হইতেছে না, আমার সঙ্গে তোমরা আইস—”

এই বলিয়া কাঞ্চন ভবন হইতে সকলে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা যখন কাঞ্চন ভবন হইতে বহির্গত হন, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। কাঞ্চন পাহাড়ীর তলদেশ দিয়া ইহাঁরা ক্রমাগত উত্তর মুখে চলিলেন। এই পথ পর্ব্বততল বেষ্টন করিয়া যেখানে পশ্চিম মুখে গমন করিয়াছে, সেই কোণের মাতায় সাহেবের বাঙ্গালা, সুতরাং তাঁহারা যখন উত্তর মুখে যাইতে লাগিলেন, তখন সাহেবের বাঙ্গালায় কি হইতেছে, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না, সাহেবের বাঙ্গালা হইতেও কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। কলুসীর অদৃষ্টে এতক্ষণ কি হইয়াছে, সে গাড্রে সাহেবের চক্রেই তথায় নীতা হইয়াছে, সাহেব সে দিবসের অপমানের সহস্র গুণ প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবে না ইত্যাদি প্রকার চিন্তা যোগেশের অন্তঃকরণে গাঢ় হইয়া বসিতে লাগিল; তিনি বুদ্ধিচাঙ্গকে “শীঘ্র আইস” বলিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। যোগেশচন্দ্র অগ্রে যাইতেছেন, তিনি পথের মোড়ের মাথায় উপস্থিত হইয়াছেন

সাহেবের বাঙ্গালা সম্মুখে রসিমাত্র স্থান ব্যবধান স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কিন্তু যোগেশচন্দ্র একেবারে স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইলেন,। তিনি দেখিলেন, সেই বৈকালে তিনি যে চারিখানি শকটে গঙ্গাদহে টাকা পাঠাইয়াছেন; সেই শকট ও সেই সমস্ত শস্ত্রধারী পুরুষ সাহেবের বাঙ্গালার প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছে, সাহেব টাকা উঠাইয়া লইতেছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে যোগেশচন্দ্রের সমস্ত কথা মনে উদয় হইল, সাহেব তাঁহাকে জাল পত্র লিখিয়া প্রতারণা করিয়াছে বুঝিতে পারিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি ও অন্যান্য সাঁওতাল যুবককে সত্বরে ও সংক্ষেপে সমুদয় কথা বুঝাইয়া বলিলেন ও সকলে এক যোগে এক সঙ্গে ক্ষিপ্ত মাতঙ্গ-যুথের ন্যায় হল্লা করিয়া সাহেবের বাঙ্গালার প্রাঙ্গণাভিমুখে দৌড়িলেন।

যোগেশচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া বজ্রমুষ্টিতে শালগ্রাম সিংহের গলদেশ ধারণ করিলেন, সে সহসা এইরূপ আঘাত পাইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল, যোগেশ অমনি চকিতের ন্যায় বাম হস্তে তাহার গলদেশ চাপিয়া ধরিয়া বাম জানু তাহার বক্ষে স্থাপন করিলেন ও ক্ষিপ্রহস্তে তাহার তরবারি কাড়িয়া লইলেন। নিমেষ মধ্যে অন্যান্য শস্ত্রধারী বরকন্দাজেরা যোগেশের প্রতি একযোগে আক্রমণ করিল, যোগেশ তখন শালগ্রামকে পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুৎগতিতে অসিসঞ্চালন দ্বারা কেবল আত্মরক্ষার উপায় করিতে লাগিলেন। যোগেশ সেই ভীষণ সময়ে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেবল শত্রু পক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার বন্ধু সাঁওতালগণ সে ঘটনাস্থলে নাই। যোগেশ প্রাণপণে অসি ঘুরাইতেছেন, কিন্তু অন্ধকারে কে কোথায় তাহা লক্ষ্য হইতেছে না, এমন সময়ে বিপক্ষীয় একজন পা টিপিয়া যোগেশের পশ্চাতে উপস্থিত হইল, যোগেশের শির লক্ষ করিয়া তরবারি উঠাইল, নক্ষত্রালোকে তরবারি ঝকমক করিয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ! একাঘাতেই যোগেশের মুণ্ড দ্বিখণ্ড হইবে!—সাবধান!—

যোগেশচন্দ্র, 'পশ্চাতে চাহিয়া দেখ—বা! আর দেখিতে হইবে না', আততায়ীর উত্তোলিত হস্ত সেই ভাবেই থাকিল, শরবিদ্ধ হইয়া সে পার্শ্বে ঝুকিয়া ধরাশায়ী হইল—একটি কথামাত্র উচ্চারণ করিতে হইল না! কিছুক্ষণ অনবরত শন্ শন্ বেগে তীর ছুটিতে লাগিল। ধন্য সাঁওতাল শিক্ষা, একটি তীর ব্যর্থ হইবার নহে, তিন চারি মিনিটের মধ্যে যোগেশচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার বিপক্ষ সকলেই ধরাশায়ী হইয়াছে তিনি তখন বুঝিলেন যে, তাঁহার সাঁওতাল বন্ধুগণ তাঁহাকে বিপদে পরিত্যাগ করে নাই, বরং তাহাদেরই বাহুবলে তিনি উদ্ধার পাইয়াছেন।

যোগেশ তখন বুদ্ধিচাঙ্গকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করিয়াছি; এখন ভগলু ও কলুসীর উদ্ধারের চেষ্টা দেখ"। বুদ্ধি, বলিল—"ভয় নাই, আমি বাঙ্গালার চারি দিকে লোক রাখিয়াছি, এক প্রাণীও পালাইতে পারিবে না।"

তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, সাহেব কি দারোগা কেহই তথায় নাই, ঝড় আরম্ভের পূর্ব্বেই তাহারা তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে। যোগেশ ও বুদ্ধি তখন আলো লইয়া ভগলু ও কলুসীর সন্ধান করিতে লাগিলেন, তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন—কোনই সাড়া শব্দ পাইলেন না। এ ঘর ও ঘর অনুসন্ধান করিয়া যোগেশচন্দ্র আলোহস্তে সাহেবের গোছলখানায় প্রবেশ করিলেন:—উঃ! সর্ব্বনাশ!—কি ভীষণ দৃশ্য!! যোগেশের সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন কে তড়িৎ প্রবেশ করাইয়া দিল, মস্তক ঘুরিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, সেই দৃঢ় হস্ত কাঁপিয়া দীপ পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি ভগ্নকণ্ঠে বুদ্ধিকে ডাকিলেন, বুদ্ধি অনেকক্ষণ উন্মত্তের ন্যায় বিস্ফারিত নেত্রে নিশ্বাস অবরোধ করিয়া সেই দৃশ্য দেখিল, শেষে হুহুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল—"যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে ইহার প্রতিশোধ হইবে।"

তাঁহারা দেখিলেন,——উপঙ্গিনী, এলোকেশী কলুসী দেয়ালের সহিত গজাল বিদ্ধা হইয়া আছেন, তাঁহার বিস্তৃত বাহুমূলে, হস্তের তালুকায়, গলদেশে, নাভিতলে ও চরণে গজাল বিদ্ধ রহিয়াছে, ভগলুর মস্তকহীন রুধিরাপ্লুত দেহ তাঁহার চরণমূলে পতিত রহিয়াছে এবং স্বামীর ছিন্ন মুণ্ডটি অভাগিনীর কণ্ঠদেশে এক গাছি দড়িতে ঝুলিতেছে !!

যোগেশ ও বুদ্ধি অনেকক্ষণ নীরবে লোহিত-বিস্ফারিতনেত্রে সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন, শেষে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যোগেশচন্দ্র বুদ্ধির হস্ত ধরিয়া সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ইহার তিন চারি দিবস পরেই যোগেশচন্দ্র জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাত করিলেন, নিরীহ সাঁওতালগণের প্রতি যে সমস্ত অত্যাচার হইতেছে, তাহা একখানি আবেদন-পত্রে ও মুখে সমস্ত বর্ণনা করিয়া আনুপূর্ব্বিক সাহেবকে জানাইলেন, শীঘ্র প্রতিবিধান না করিলে সাঁওতাল রাজ্যে বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা, তাহাও বিশিষ্ট প্রকারে বুঝাইলেন। সাহেব তখন ঘোড় দৌড় লইয়া মহাব্যস্ত, তিনি আদ্যোপান্ত শুনিয়া যোগেশকে বলিলেন—"এ সমস্ত সামান্য বিষয়ে আমার মস্তক ঘামাইবার সময় নাই, দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, পুলিস আছে। পেস্কারকে বলিলেন, দরখাস্তে হুকুম লিখ—"নথির সামিল থাকে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রেম-পরিচয়।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল, নিমজ্জমান সূর্য্যের সুবর্ণ রশ্মিতে অস্তবেদী ঝলমল করিতেছে, গিরি-শিখরে উচ্চ বৃক্ষশিরে লোহিত কিরণমালা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কাঞ্চনমালা ও স্মরণী গিরি-শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের অস্তগমন-শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহারা যেখানে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহার

অদূরে একটি উপত্যকা ভূমি, তন্মধ্যে নানা জাতীয় কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া অতুল শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। সাঁওতাল কন্যাগণ স্বভাবতঃই কুসুম-প্রিয়া ; স্বরণী ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে বলিল— "দিদি, এস, আমরা ঐ উপত্যকায় ফুল তুলিয়া খেলা করিগে।"

কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে কাঞ্চনমালা স্বরণীর কথায় কখনই অমত প্রকাশ করিতেন না, তিনি স্বরণীর মুখ প্রতি চাহিয়া একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে চল।"

স্বরণী কাঞ্চনমালার হস্ত ধরিয়া পুষ্পবনে উপস্থিত হইলেন এবং দুই জনে আঁচল ভরিয়া কুসুম তুলিলেন। পুষ্পচয়ন সমাপ্ত হইলে উভয়ে একখানি শিলাতলে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও উভয়ে উভয়কে সেই পুষ্পাভরণে সাজাইতে লাগিলেন। কাঞ্চনমালা বাঙ্গালী কন্যা, বঙ্গমহিলারা ধাতু-আভরণেই প্রায় অঙ্গ শোভা করেন, এক দেবপূজা ব্যতীত অন্য বিষয়ে পুষ্পের ব্যবহার অতি অল্পই করিয়া থাকেন। বিশেষ কাঞ্চনমালা কোন কালে শিল্প চাতুর্য্যের দ্বারা আপন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পান নাই, কোন কালে তাঁহার সেই শিরীষ-কুসুমস্তবকবিনিন্দিত দেহ কুসুমাভরণে সজ্জিত করেন নাই, সুতরাং শরীরের কোন্ স্থানে কোন পুষ্পটি শোভা পায়, কোন ফুলটি কেমন করিয়া কোন স্থানে পরিতে হয়, তাহা তিনি কিছুই জানিতেন না, তিনি এক গাছি চিকণ লতা কুড়াইয়া লইয়া সোজাসুজি হার গাঁথিতে বসিলেন। কিন্তু সাঁওতাল কন্যারা অন্যরূপ আভরণ কখন চক্ষে দেখে নাই, তাহারা স্বভাব-গৃহে জন্ম গ্রহণ করে, স্বভাব-হস্তে পরিবর্দ্ধিত হয়, স্বভাব-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়, স্বভাবের সহিতই চির জীবন অতিবাহিত করে। স্বরণী কাঞ্চনমালার মালা গাঁথা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার হস্ত হইতে ফুলগুলি কাড়িয়া লইল, ও "ও দিদি, ও কি হইতেছে, তুমি রাখ, আমি তোমায় সাজাইয়া দেই" বলিয়া

আপন ঘন কৃষ্ণ চিকুর দামের এক পার্শ্ব হইতে এক খানি চিকণী বাহির করিয়া কাঞ্চনমালার সেই অযত্নন্যস্ত সুদীর্ঘ কেশভার হস্তে করিয়া ফিরিয়া বসিল। স্বরণীর ভাব দেখিয়া কাঞ্চনমালা বলিলেন—"ছি দিদি, ও কেন, আমি তো চুল বাঁধি না, আমি দুঃখিনী, অভাগিনী, আমার আবার সজ্জা কেন? স্বরণী বলিল—"দিদি, তোমার ঐ কথাটি আর গেল না, সত্য বলছি দিদি, তোমার এই ভাব দেখ্‌লে আমি বড় প্রাণে ব্যথা পাই; তোমায় সাজাইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, তোমার পায় পড়ি দিদি, আমায় বাধা দিও না।"

কাঞ্চনমালা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার নয়ন-কোণে দুই ফোটা জল পড়িল, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মেঘ-ভেদী সূর্য্য রশ্মির ন্যায় চারু অধরে একটু মধুর হাস্য বিকাশ করিয়া বলিলেনঃ— "দিদি, তোমাদের গুণ আমি ম'লেও ভুলিব না, তুমি যাহা করিয়া সুখী হও, তাহাই কর, আমি আর বারণ করিব না।"

স্বরণী কাঞ্চনমালার সুচিক্কণ, সুদীর্ঘ, কুঞ্চিত, ঘন কৃষ্ণ কেশরাশিতে চিরুণী দিল, বৈষ্ণবীর জগন্নাথ গমনাবধি যে চিকুর বিন্যস্ত হয় নাই, দুঃখিনী কাঞ্চনমালা নিজ অদৃষ্টের উপর ধিক্কার দিয়া যে কেশ-দাম এত দিন তাচ্ছিল্য করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ স্বরণীর যত্নে তাহাতে চিরুণী পড়িল। স্বরণী অতি যত্নে মস্তকের মধ্যস্থলে সরল সীমন্ত পরিষ্কার করিল, নিবিড় কেশদাম দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সীমন্তের দুই পার্শ্বে ফেলাইয়া দিল, চূর্ণ কুন্তলগুচ্ছ এক এক গাছি করিয়া সরাইয়া কর্ণপৃষ্ঠ দিয়া মস্তকের কেশের সহিত মিলাইয়া দিল, শেষে বাছিয়া বাছিয়া কুসুম লইয়া সেই কেশরাশির মধ্যে ফুলের ক্রীড়া আরম্ভ করিল। বেণীর এক একটি পাক ফিরিতে লাগিল ও তাহারা মধ্যে মধ্যে স্বরণীর শিল্প চাতুর্য্যে এক এক গুচ্ছ কুসুম সন্নিবেশিত হইতে লাগিল, শেষে সেই সুগোল সুদীর্ঘ বেণী সমাপ্ত হইয়া পৃষ্ঠ দেশে ঠিক এক গাছি ফুলের ছড়ি দুলিতে লাগিল।

কাঞ্চনমালার ফুল-সজ্জা সমাপ্ত হইল, স্বরণী সেই গোলাপদাম-বিনিন্দিত চিবুকখানি ধরিল, সেই নমিত বদনখানি আস্তে আস্তে তুলিল, সস্নেহে ধীরে ধীরে সেই নিটোল উজ্জ্বল ললাট চুম্বন করিয়া বলিলঃ—“কি বলিব, কাছে আরসি নাই, তা হ'লে তোমায় দেখা'তাম, কেমন সোণার গাছে হীরের লতা জড়িয়ে দিয়েছি।” একটু হাসিয়া কাঞ্চনমালা বলিলঃ—“আমার দেখে কাজ কি দিদি, আমি তো আর ও দেকে ভাল বাসিনে, যাহারা আমায় ভাল বাসে, তাহারা দেখ্‌লেই হ'ল।”

স্বরণী কাঞ্চনমালার দুইখানি চিবুকে দুইটি অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলঃ—“তবে দিদি, তোমার এই ফুলবালিকার বেশ একবার দাদাকে দেখাও না কেন, তিনি দেখিলে তোমায় মাতায় করিয়া রাখিবেন।”

লজ্জাবতী লতায় হস্ত প্রদান করিলে, উজ্জ্বল, সজীব, হরিদ্বর্ণের পত্রগুলি যেমন দেখিতে দেখিতে ম্লান হইয়া যায়, স্বরণীর কথায় কাঞ্চনমালার প্রফুল্ল বদন সেইরূপ দেখিতে দেখিতে ম্লান হইয়া গেল। তিনি বামস্কন্ধে বাম চিবুক রক্ষা করিয়া, ধরাবদ্ধ-দৃষ্টিতে ক্ষণেক কি চিন্তা করিলেন, শেষে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বদনখানি তুলিয়া স্বরণীর মুখ প্রতি চাহিয়া বলিলেনঃ—“কেন, দিদি ও কথা বল্লে ?”

“স্বরণী বলিলঃ——কেন, দাদা যে তোমায় ভালবাসেন।”

আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাঞ্চনমালা বলিলঃ—

“আহা বোন্, তোমার দাদা কারে না ভালবাসেন, তাঁর হৃদয় ভাল বাসায় মোড়া, তিনি কখন কাহাকে মন্দ বাসিতে জানেন না।

স্বরণী বলিলঃ—“দিদি দাদার কাছে তোমার কথা হ'লেও তিনি সেইরূপ করেন, তোমাদের বাঙ্গালীর এ কেমন ভালবাসা ?

কাঞ্চনমালার হৃদয়-বেগ আর থামিল না, তিনি স্বরণীর মুখে হস্ত দিয়া অতি কাতরভাবে গদগদ স্বরে বলিলঃ—"দিদি, আমায় ক্ষমা কর, দুঃখিনীর প্রতি দয়া কর. আর বলো না, আর শুন্‌তে পারিনে—অদৃষ্টে না জানি কত লাঞ্ছনাই আছে—" কাঞ্চনমালা ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সরলা স্বরণী অপ্রতিভদৃষ্টিতে ক্ষণেক অবাক হইয়া কাঞ্চনমালার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, পরে আপনিও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দিদি, আমি অপরাধ করিয়াছি, না বুঝিয়া তোমার ঐ কোমল প্রাণে ব্যথা দিয়াছি, আমার মরিলে গতি হইবে না।"

স্বরণীর কাতর ভাব দেখিয়া কাঞ্চনমালা আপন দুঃখ ভুলিয়া গেলেন, তিনি স্বরণীর মস্তকখানি বক্ষমধ্যে ধরিয়া স্নেহপূর্ণ অমিয়-বচনে বলিতে লাগিলেনঃ—"আমার দিদিমণি, পাগলমণি, আমি কি তোমার কথায় কেঁদেছি, আমার যে কাঁদিবার জন্যই জন্ম, আমি যে যখন তখন কাঁদি, ছি বোন্, চুপ কর, আমি তোমার কাছে কাঁদিব না, এই দেখ আমি হাসিতেছি।"—এই বলিয়া কাঞ্চনমালা হাসিলেন।

তাঁহারা দুইজনে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সুবিমল সুশীতল রজত কিরণে ধরণীবক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ণ চন্দ্র পূর্ব্বাকাশে উদয় হইলেন, শীতল সান্ধ্য পবন সেই লতাদির আমুল কম্পিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে সুবাস লেপনপূর্ব্বক ঝির ঝির করিয়া বহিতে লাগিল; হৃদয়-উচ্ছ্বাস-বশতঃ কাঞ্চনমালা সেই শিলাতলে অঞ্চল পাড়িয়া শয়ন করিলেন! স্বরণী পার্শ্বে বসিয়া চন্দ্র কিরণে কাঞ্চন-লতার অকলঙ্ক মুখচন্দ্রের শোভা দর্শন করিতেছে ও এ কথা সে কথা পাঁচ কথায় গল্প করিতেছে, কাঞ্চনমালা শুইয়া হুঁ হুঁ করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন, এমন সময় অতর্কিতে নিদ্রা আসিয়া তাঁহার নয়নপত্র দুটি ঢাকিয়া দিল।

কাঞ্চনমালাকে নিদ্রিতা দেখিয়া স্বরণী আপন মনে এ দিকে ও দিকে স্বভাব-শোভা দর্শন করিতে লাগিল। সে একবার উপরে দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখে, দুইটি পুরুষ পর্ব্বতশিখরে পাদচারণ করিয়া বেড়াই-তেছেন, চন্দ্রালোকে স্বরণী চিনিল, তাঁহাদের মধ্যে একজন যোগেশচন্দ্র, অপর তাঁহারই জীবন-সর্ব্বস্ব, হৃদয়-নিধি, প্রেম পারাবার বুদ্ধি চাঙ্গ। স্বরণী নিঃশব্দে কাঞ্চনমালার নিকট হইতে উঠিল; ধীরে পাদবিক্ষেপে পুষ্পবাটিকা উত্তীর্ণ হইল, শেষে চঞ্চলচরণে, হরিণ-গতিতে শৈলতলু অতিক্রম করিয়া নিমেষ মধ্যে বুদ্ধিচাঙ্গের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে দাঁড়াইল।

বুদ্ধিচাঙ্গ সাদরে স্বরণীর হস্তখানি ধরিয়া বলিলঃ—"আমরা যে তোমাদের সন্ধান করিতেছিলাম, তোমরা কোথায় ছিলে?

নিম্নে পুষ্পবনের প্রতি অঙ্গুলি হেলাইয়া স্বরণী বলিলঃ—"ঐ খানে।"

যোগেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার দিদিও কি ঐ খানে?"

স্বরণী একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"দাদা, দিদি নীচে ঐ শীলাতলে ঘুমাইয়াছেন, তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া বস, আমি বুদ্ধিকে একটু চাঁদের আলো দেখাইয়া আনি।"

যোগেশ সহাস্য-বদনে বলিলেন—"আর আমিও যদি তোমাদের সঙ্গে চাঁদের আলো দেখিতে যাই?"

স্বরণী বলিল—"ঠকিবে।"

যোগেশ। কেন?

স্বরণী। এ চাঁদ একখানা বইতো নয়, যে খানে যাইতে বলিলাম, সেখানে চাঁদের মেলা; দিদি আজ চাঁদের মালা গলায় পরিয়া শুইয়া আছেন।"

"আচ্ছা, তবে তোমার কথাই স্থির।" বলিয়া যোগেশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে শিলাতলে যে স্থানে কাঞ্চনমালা শুইয়া আছেন, তদভিমুখে নামিতে লাগিলেন, বুদ্ধিচাঙ্গ স্বরণীর বিমল প্রেমস্রোতে গা ভাসাইয়া বংশী বাদন করিতে করিতে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

যোগেশচন্দ্র শিলাতলের নিকট উপনীত হইয়াই একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। তিনি এত দিন যে কাঞ্চনমালাকে দেখিয়া আসিতেছেন এ কাঞ্চনমালার সহিত তাহার স্বর্গ মর্ত্ত ভেদ বোধ হইতে লাগিল। তিনি এত দিন জলদাবৃত চন্দ্রের কিরণে হৃদয় শীতল করিতেছিলেন, আজ সহসা তাঁহার নয়নসম্মুখে পরিষ্কার নীল গগণে শারদ পূর্ণ চন্দ্রিমা পূর্ণ জ্যোঃতিতে প্রকাশ পাইল; তিনি এত দিবস মৃত্তিকা-মিশ্রিত স্বর্ণের শোভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আজ সেই স্বর্ণ বিমলকান্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিল; তিনি মহার্ঘ হীরক খণ্ড বোধে যে প্রস্তর খণ্ড কুড়াইয়াছিলেন, আজ তিনি সহসা তাহাতে কৌস্তুভমণির জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলেন। নব ভাবে যোগেশের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার ভাগ্যে আজ শিরীষ কুসুম, পারিজাত; বিমল-সলিলা স্রোতস্বতী, অমৃত নদী; সুপক্ক সুবর্ণ-বর্ণ রসাল, অমৃত ফল। ভাবের তরঙ্গ হৃদয় ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল, যোগেশ একবার ভাবিলেন, এই দণ্ডে যুবতীর পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িয়া প্রেমভিক্ষা করেন, আবার সে বেগ শান্ত করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেনঃ—মরি, মরি একি আমার সেই কাঞ্চন-মালা? বোধ হইতেছে, কোন স্বর্গ-বিদ্যাধরী শাপভ্রষ্টা হইয়া স্বর্গ হইতে এই স্থানে খসিয়া পরিয়াছেন, কিম্বা কোন পরী এই নির্জ্জন শানুতলে সুসুপ্তি-সুখ উপভোগ করিতেছেন। যোগেশচন্দ্র সে বিশ্রাম ভঙ্গ করিতে সাহসী হইলেন না, যুবতীর বদনপার্শ্বে শিলা-নিম্নে জানু পাতিয়া বসিয়া অনিমেষ নেত্রে সেই ললাম-ভূতারমণীর ফুল সজ্জা

অতুল শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন,ও মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“স্বরণী যথার্থই বলিয়াছে, আমার চন্দ্রমুখী আজ সত্য সত্যই চাঁদের মালা পরিয়াছেন।”

কাঞ্চনমালা পার্শ্বে ভর করিয়া, সুকোমল ভুজলতায় মস্তক রক্ষা করিয়া শুইয়া আছেন, মুখখানি ভরিয়া জ্যোৎস্না পরিয়াছে, মরি মরি, যেন সুধার সাগরে সুধা বর্ষণ হইতেছে। কাঞ্চনমালা নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহার বোধ হইতেছে,—

যেন একটি লবঙ্গলতা আশ্রয়-প্রাপ্তির আশয়ে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু আশ্রয় মিলিতেছে না, এমন সময় একটি দুরন্ত মত্ত হস্তী বিকট শব্দ করিতে করিতে তাহার দিকে ধাবমান হইতে লাগিল, দেখিয়াই তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল, এখনি হস্তিপদদলিত হইতে হইবে ভাবিয়া থর, থর, করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হস্তী তাহার নিকট উপস্থিত হইল, নিকটস্থ অন্যান্য বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, একটি পুরাতন জীর্ণ বৃক্ষ হেলাইয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল ও তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গেল। নিরাশ্রয়া লবঙ্গলতা এই জীর্ণ বৃক্ষ অবলম্বন করিল, সেইখানেই বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল, কিন্তু কপালে দুঃখ থাকিলে কে তাহা খণ্ডন করিতে পারে? এক দিন প্রবল ঝটিকায় জীর্ণ বৃক্ষ ধরাশায়ী হইল, ললিতা লবঙ্গলতা পুনরায় অনন্ত বিশ্বে যে আশ্রয়হীনা সেই আশ্রয়হীনাই হইল। সে কোথায় যাইবে, এই বিপুল জগতে দুখিনীর স্থান কোথায় হইবে, কোন্ দয়াবান ব্যক্তি এই অভাগিনী লতাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিবেন, সে এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় প্রতিকূল পবনে তাহার গতি ঘুরাইয়া দিল, সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল—তাহার নিকটেই একটি সুন্দর সুদৃঢ় সতেজ নধর রসাল শোভা পাইতেছে। লবঙ্গ আশ্রয়-আশয়ে বদন তুলিয়া সেই দিকে চাহিল, কিন্তু দেখিল, একটি বিপুল

অপরাজিতা লতা রসালের মূল হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত বিবিধ বন্ধনে জড়াইয়া আছে,অন্য লতার জন্য তিলার্দ্ধও স্থান রাখে নাই। ললিতা লবঙ্গ কম্পিত-কলেবরে একবার অগ্রসর হইল, সাত বার ফিরিল,শেষে দেখিল অ শ্রয়হীনা অভাগিনীর প্রতি রসালের দৃষ্টি পড়িয়াছে, দুঃখিনীর দুঃখে সেই উচ্চ হৃদয় গলিয়াছে, অভাগিনীর আশ্রয়-দাতা হইবার জন্য সে হৃদয় ব্যগ্র হইয়াছে। রসাল লবঙ্গলতাকে ডাকিল, লবঙ্গ তাহার চরণমূলে আছাড়িয়া পড়িল, কিন্তু অপরাজিতা লতার প্রভাবে উপরে উঠিতে পারিল না। রসাল সমস্ত দেখিল, দুঃখিনীর দুঃখে তাহার হৃদয় কাঁদিল, সে তৎক্ষণাৎ মূল হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ভিতরে ভিতরে মজ্জায় মজ্জায় পথ করিয়া দিল,সুরঙ্গ পাইয়া লবঙ্গলতা ভিতরে ভিতরে উঠিতে লাগিল,উপরকার অপরাজিতা উপরেই রহিল। সে রসালের স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে,এমন সময়ে তাহার বোধ হইল,কে যেন বাহির হইতে তাহার মূল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে ও বলিতেছে "লবঙ্গ, বাহিরে আয়, তোর শোভা সকলে দেখিবে, ভ্রমরে তোর ফুলের মধু খাইবে, ও কোটরে কেন মরিবার জন্য প্রবেশ করিতেছিস্—।" লবঙ্গ ভয়ে রসালকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল ও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমায় অমন কথা বলিও না, আমি মরিব, তথাপি এ আশ্রয় ছাড়িব না, আমি চিনিয়াছি—এ আমার যোগেশচন্দ্র—"

যোগেশচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিয়াই রোদনের সহিত কাঞ্চনমালার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি নয়ন উন্মীলন করিবামাত্র দেখেন, পার্শ্বে স্বরণী নাই, কেবল যোগেশচন্দ্র তাঁহার মস্তক পার্শ্বে বসিয়া একদৃষ্টে তাঁহার মুখ প্রতি চাহিয়া আছেন। যোগেশকে দেখিবামাত্র কাঞ্চনমালা ত্রস্তে উঠিয়া বসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিজাতীয় লজ্জায় তাঁহার চক্ষের পাতা দুখানি নামাইয়া দিল।

অতি মধুর অথচ কম্পিত-কণ্ঠে যোগেশচন্দ্র বলিলেন:—

"কাঞ্চনমালা, এই শিলাতলেই নিদ্রা গিয়াছিলে? আমি স্মরণীর মুখে শুনিয়া তোমার প্রহরায় নিযুক্ত ছিলাম।"

ধরাবদ্ধ-দৃষ্টিতে, অকম্পিত-চিবুকে, ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে কাঞ্চনমালা বলিলেনঃ—"আপনি দয়ার সাগর।"

যোগেশচন্দ্র বলিলেন,—কাঞ্চনমালা, আমি তোমায় "তুমি" বলি, তুমি আমায় "আপনি" বলা পরিত্যাগ করিলে না?"

পূর্ব্ব-ভাবে কেবল নমিত নয়ন দুখানি যোগেশের মুখের প্রতি ঈষৎ উত্তোলন করিয়া কাঞ্চনমালা বলিলেনঃ—"আপনি আমার আশ্রয়-দাতা, প্রতিপালক; আমি আশ্রয়হীনা, দুঃখিনী।"

যোগেশচন্দ্র কিঞ্চিৎ বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"আমি কতবার বলিয়াছি ও কথায় আমি আন্তরিক কষ্ট পাই। কাঞ্চনমালা, পৃথিবীতে কি আর কথা নাই?

সেই নিস্তব্ধ নির্জ্জন কৌমুদী-মুণ্ডিত পুষ্পবনে শিলাতলে বসিয়া যোগেশচন্দ্র কাঞ্চনমালার ঘন নিশ্বাস স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, বক্ষের আন্দোলনে স্পষ্ট বুঝিলেন, বালার হৃদয় ভাববশে উচ্ছ্বলিত হইতেছে, দেখিলেন নৈশ শীতল পবনেও কাঞ্চনমালার কপোল দেশ ঘামিতেছে। কাঞ্চনমালা, যোগেশকে একটি কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু কণ্ঠের স্বর বাহির হইল না, মনের কথা মনেই মিশিয়া গেল।

ক্ষণেক পরে কাঞ্চনমালার বিষণ্ণভাব দূর করিবার জন্য যোগেশচন্দ্র মধুরহাস্যে বলিলেন,—"যাহা হউক, আমি সাঁওতাল কন্যার রুচিতে মোহিত হইয়াছি।"

কাঞ্চনমালা এবার যোগেশের কথার অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত-নেত্রে পূর্ণ-দৃষ্টিতে যোগেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

যোগেশচন্দ্র পুনরায় সস্মিত-বদনে বলিলেন—"স্মরণী যথার্থই বলিয়াছে, এই বন্য সৌন্দর্য্যে আজ তুমি যথার্থই চাঁদের মালা গলায় পরিয়াছ; কাঞ্চনমালা, তোমার এই ফুল সাজ হরধ্যান ভঙ্গের জন্য গৌরীর মোহিনী সাজের—"

যোগেশের মুখের কথা মুখেই রহিল, কাঞ্চনমালা এতক্ষণ ফুল সজ্জার বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে যোগেশের মুখে সেই কথার প্রসঙ্গ শুনিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, তাঁহার স্কন্ধ চিবুক, কপোলদেশ সিন্দুরবর্ণে রঞ্জিত হইল, তিনি কুন্দদন্তে জিহ্বাগ্র দংশন করিয়া, মস্তক হইতে কুসুমাভরণ দূরে নিক্ষেপ করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলেন। যোগেশচন্দ্র তাঁহার অভীষ্ট বুঝিতে পারিলেন, কাঞ্চনমালার হস্ত মস্তক পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতে তিনি সেই নবনী-বিনিন্দিত সুকোমল করপল্লব দুখানি তাঁহার জীবনের মধ্যে এই প্রথম ধরিলেন ও আপন অঞ্জলি মধ্যে সেই অমূল্য কর দুখানি রক্ষা করিয়া বলিলেনঃ—"কাঞ্চনমালা, আমি মর-নয়নে বিদ্যাধরীর শোভা দেখিতেছি, সে স্বপ্ন ভঙ্গ করিও না।" যোগেশের অঞ্জলি মধ্যে অঞ্জলি রক্ষা করিয়া লজ্জা-নম্র-বদনে কাঞ্চনমালা গুটি দুই কি অশ্রুতিগোচর কথা বলিলেন, যোগেশ কেবল দেখিলেন, কাঞ্চনমালার ওষ্ঠ দুখানি ঈষৎ নড়িল, কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। যোগেশের তখন হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, মনের ভাব আর মনে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি কাঞ্চনমালার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া, দক্ষিণ হস্তে হৃদয় চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, কাঞ্চনমালা আর হৃদয়বেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না, আজ এ হৃদয় খুলিলাম, এই চন্দ্র সাক্ষী করিয়া তোমার চরণে ইহাকে জন্মের মত সমর্পণ করিলাম,— প্রিয়তমে, প্রাণেশ্বরী, জীবন-সর্ব্বস্ব, ইহাকে হয় অমরাবতীর সুখ প্রদান কর, না হয় চরণে দলন কর। আমি জানিয়াছি, তুমিই আমার

এ জন্মের সুখ, ভরসা, আশ্রয়; তুমিই আমার গতি, মুক্তি, স্বর্গ, যদি তুমি আমার জীবন সঙ্গিনী হও তাহা হইলে, আমার শ্মশান, অমরাপুরী; পর্ণ কুটীর, রাজ অট্টালিকা; বৃক্ষতল, রাজসিংহাসন।—” কাঞ্চনমালা এতক্ষণ আকাট হইয়া কলের পুত্তলিকাপ্রায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, যোগেশের চরণ প্রান্তে আছাড়িয়া পড়িয়া কাতর-স্বরে বলিলেন—“আপনি দয়ার নিধি, আমি অবলা, অবলার ক্ষীণ মনকে ক্ষমা করুন।”

কাঞ্চনমালার আর কথা বাহির হইল না, বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, দৃষ্টি ছাপিয়া গেল।

হাস, হাস, চাঁদ! নীলাকাশে খুব হাস, তোমার নক্ষত্রগণকেও হাসিতে বল, এ সুখময় প্রেম-আলাপন সময়ে তোমরা না হাসিলে আর কে হাসিবে? গণিকা লম্পটের পাশব আচরণকালে তোমারা নয়ন মুদ্রিত করিও, তখন তিমিরাবগুণ্ঠিতা কাল রজনীকে ধরা গ্রাস করিতে বলিও, তখন প্রলয় কালের দুর্জ্জয় জলদ-পটলে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিও, তখন ভীম বজ্রের গম্ভীর নির্ঘোষে পৃথিবী কাঁপাইয়া দিও, কিন্তু এখন হাস, সরল দম্পতীর বিমল প্রেমোচ্ছ্বাসে হাসিবে না তো কিসে হাসিবে। হাস, হাস, জগৎ মাতাইয়া হাস, সুধায় পৃথিবী ভাসাইয়া দেও, দম্পতীর নবীন প্রণয়ে সুধা সিঞ্চন কর। আর তুমি পবন, জগতে লোকে তোমায় পাগল বলে, কেননা তুমি সরল, তুমি সকল কাজেই আগে নাচিয়া থাক, সংসারের কুটিল লোকে সরলকে পাগল বলিবে না তো কাহাকে বলিবে——তুমি পবন, তুমিও নাচ, নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া যাও, এ সুধাময় প্রেমের কথা স্বর্গে লইয়া যাও,—দেখিও এ পৃথিবীর কাহাকেও যেন বলিও না, এখানকার লোকে পরের ভাল দেখিতে পারে না, এ সুখ দেখিলে তাহাদের চক্ষু টাটাইবে। কুসুম কুল, বাতাসে নাচিয়া তোমরাও হাস, তোমরাই প্রেমের অটল স্বাক্ষী, কুসুম-মাল্য পরিবর্ত্তন না করিলে বিবাহই হয় না।

রাত্রি যখন প্রায় ৯ টা, তখন কাঞ্চনমালা যোগেশচন্দ্রের স্কন্ধে ভর করিয়া মাঙ্গুক মাঝির গৃহাভিমুখে ধীরগতিতে চলিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শীকার।

যোগেশচন্দ্র অতি প্রত্যূষে উঠিয়া দেখেন, পর্ব্বতের তলদেশে প্রায় ৫০টি হস্তী, দেড়শত অশ্ব, ১০।১২ টা উষ্ট্র ও বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছে। এক জন অন্যকে ডাকিতেছে, কেহ ছুটিতেছে, কেহ বসিয়া ধূমপান করিতেছে ও হাত মাতা নাড়িয়া যেন কি বীরত্বের পরিচয় দিতেছে, আর কতকগুলি লোক এক স্থানে মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া তাম্বু উঠাইতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য যোগেশচন্দ্র কাঞ্চনভবন হইতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার পুষ্পোদ্যান অতিক্রম করিতে না করিতেই এক জন অশ্বারোহী সৈনিক কাঞ্চনভবনের বহির্দ্বার-পার্শ্বে ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইয়া একটি বৃক্ষ-মূলে ঘোটক বন্ধন করিল, ও দ্বারবানের সহিত উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সৈনিকভাবে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার হস্তে একখানি লিপি প্রদান করিয়া বলিল—"জনাবালির পত্র।" যোগেশচন্দ্র মহারাজা জয়হরিচন্দ্রের সহিত অনেকবার জনাবালির দরবারে গিয়াছিলেন, জনাবালি যোগেশকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তিনিও তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করিতেন। পত্রখানি যোগেশচন্দ্র অতি ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিলেন এবং শীঘ্রহস্তে আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন; তাহার মর্ম্ম এই,—

"স্নেহাস্পদ!

শুনিলাম, তুমি আজ কাল কাঞ্চনভবনেই বাস কর। সাঁওতাল রাজ্যের এত কি মধুরতা পাইয়া আমাদিগকে সেলাম পর্য্যন্ত করা

ভুলিয়া গিয়াছ, তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। তুমি আপন কর্ত্তব্য ভুলিতে পার, কিন্তু পথভ্রষ্ট প্রজাকে পথে পুনরানয়ন করা যে, আমার কর্ত্তব্য, তাহা আমি ভুলি নাই। যাহা হউক, তোমার রাজার প্রতি কর্ত্তব্যসাধনের এই প্রথম অবহেলা, অতএব এবারে তোমার প্রতি আমি কোন গুরুদণ্ড নিয়োগ করিব না, কিন্তু একেবারে বিনা দণ্ডেও নিষ্কৃতি দিব না। কল্য আমি তোমার কাঞ্চনভবনে অতিথি হইব; তুমি শীকারের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। ইতি"

পত্র পাঠান্তে যোগেশচন্দ্র সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

"জনাবালির কখন আসিবার কথা?"

সৈনিক বলিল "দশটার সময়।"

"আচ্ছা, তুমি যাও" বলিয়া যোগেশ সৈনিককে বিদায় দিলেন, এবং আপনার প্রধান ভৃত্যকে ডাকিয়া নবাব নাজিমের সমস্ত লোকের নিহিত তত্ত্বাবধান করিবার আজ্ঞা করিলেন। নির্জ্জন হইলে যোগেশ-চন্দ্র জনাবালির পত্রখানি আর একবার খুলিলেন, তাহা উপর্য্যুপরি সাত আটবার পাঠ করিলেন, প্রতি কথার উপর থামিয়া থামিয়া তাহার ভাব গ্রহণ করিলেন, ভাবাবেশে তাঁহার হৃদয় দ্রব হইল। শেষে আবার কি একটি চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল, তাঁহার মুখকান্তি গম্ভীর হইল, পত্রখানি বাম হস্তে ধরিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আপন মনে বলিতে লাগিলেনঃ—"এইরূপ প্রজা-বৎসলতাই তো রাজধর্ম্ম। যে প্রচণ্ড তপন অপ্রতিহত-প্রভাবে অনন্ত আকাশে রাজত্ব করেন, তিনিও আপন স্বভাব-সিদ্ধ নম্রতাগুণে পৃথিবীর সামান্য লতাগুল্মটিরও তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। আচ্ছা, যদি সুসভ্য ইংরাজ রাজ, আমাদিগকে ঘৃণাপূর্ণ চক্ষে নিরীক্ষণ না করিতেন, যদি আমাদিগকে অস্পৃশ্য পশু অপেক্ষাও অধম না ভাবিতেন, যদি আমাদের স্বত্ব আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন—কিন্তু যাক কালে হইবে, আমরা সভ্য

করিয়া গেলাম, আমাদের পর পুরুষেরা আর সহ্য করিবে, না। এই যবনেরাই প্রথমে কি ছিলেন? ইহাঁরা কর্ণে হিন্দুর নাম শুনিতেন না, চক্ষে হিন্দুর মুখ দেখিতেন না, মুখে হিন্দুর নাম উচ্চারণ করিতেন না; সেই যবনেরাও তো ক্রমে ক্রমে আমাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন, তবে ইংরাজই বা না মিশিবেন কেন? অবশ্য মিশিবেন, ইংরাজ আমাদের পিতা, পিতা সন্তানের দুঃখ কত কাল ভুলিয়া থাকিবেন? আমাদের মধ্যেও যেরূপ দিগম্বর, গোবিন্দ আছে, ইংরাজের মধ্যেও সেইরূপ গাট্রে আছে, তাহা বলিয়া জাতির অপরাধ হইতে পারে না। ইহাঁদের মধ্যেও প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা অনেক আছেন, তাঁহাদের কর্ণে কি দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীর আর্ত্তনাদ প্রবেশ করিবে না? তাঁহাদের উচ্চ হৃদয় কি শোক-রবে গলিবে না? তাঁহারা কি চিরকালই এই হতভাগ্য-গণকে নিজ গৃহে নিজ স্বত্বে বঞ্চিত করিয়া রাখিবেন? আমরা ইংরা-জের নিকট সহস্র ঋণে আবদ্ধ, আমরা চিরকাল ইংরাজকে ভালবাসিব, চিরকাল ইংরাজের জয় কামনা করিব, চিরকাল প্রাণ দিয়া ইংরাজের কার্য্য সাধন করিব, কিন্তু জগদীশ্বর!—ইংরাজ বাঙ্গালীতে মিলন করিয়া দেও, প্রজার প্রতি রাজার বিসদৃশ ভাব থাকিলে রাজ্যে কখনই মঙ্গল হয় না!—”

ইত্যাদি প্রকার চিন্তায় প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল। জনাবালি শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন, মহাধুম ধাম পড়িয়াছে, যোগেশচন্দ্র যথা-সময়ে উপঢৌকন লইয়া নবাব-শিবিরে উপস্থিত হইলেন। জনাবালি বাৎ-সল্যভাবে যোগেশের হস্ত ধরিয়া নিকটে উপবেশন করাইলেন ও কাঞ্চ-নপাহাড়ীর ও গঙ্গাদহের সমস্ত কুশল সমাচার একে একে জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে হাসিতে হাসিতে বলিলেনঃ—“ যোগেশ, তুমি নাকি সাঁওতালদিগের রাজা হইয়াছ?” কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া নত-নয়নে যোগেশচন্দ্র বলিলেন—“ জনাব, তাহাদিগকে আমি অনেক নিষেধ করি-

য়াছি, কিন্তু সরল সাঁওতালেরা নিজে যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই করিবে, বারণ শুনে না; তাহারা আদর করিয়া আমাকে "রাজা" বলিয়া ডাকে।

জনাবালির মুখ পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর হইল, তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যোগেশের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন:—"যোগেশচন্দ্র, যদি মুর্শিদাবাদের নবাব বিষহীন ফণী না হইত, তাহা হইলে এই আদরের নাম এত দিন প্রকৃত উপাধি হইত।"

যোগেশচন্দ্র ভূতলে, নবাবের চরণ-মূলে জানুভরে উপবেশন করিয়া যোড়হস্তে ঊর্দ্ধমুখে, সজল-নয়নে বাস্পগদ-গদ-স্বরে বলিতে লাগিলেন:—জনাব, দেব, পিতঃ, সেবক কেবল ঐ উচ্চ হৃদয়ের পিতৃতুল্য স্নেহের অভিলাষী, যেন চির জীবন ঐ বিমল স্নেহের সুশীতল ছায়ায় কালাতিপাত করিতে পারি, এই মাত্র দাসের ভিক্ষা।

নবাব নাজিম যোগেশচন্দ্রকে হস্তে ধরিয়া উঠাইলেন, তাঁহার মস্তকের কুঞ্চিত কেশ মধ্যে ও পৃষ্ঠদেশে হস্ত মার্জ্জন করিলেন, শেষে ধীরে ধীরে সস্নেহে বলিলেন:—"যোগেশচন্দ্র তুমি প্রকৃতই বঙ্গরত্ন।"

সাঁওতালদিগের উপর যে প্রকার উৎপীড়ন হইতেছে, ভগলু ও কলুসীর ভাগ্যে যে প্রকার লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ সমস্ত বিষয়ে যে প্রকার উদাসীনতা দেখাইয়াছেন, যোগেশচন্দ্র তখন একে একে সমস্ত বিষয় নবাব নাজিমকে অবগত করাইতে লাগিলেন। নবাব নাজিম দেখিলেন ভগলু ও কলুসীর মৃত্যু-বর্ণনকালে যোগেশের মুখ আরক্তিম হইয়াছে ও নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। সমস্ত শুনিয়া জনাবালি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন;—"সরল, নিরীহ সাঁওতালগণের প্রতি এ প্রকার আচরণ নিতান্ত গর্হিত, কিন্তু যোগেশ, তোমরা এখনও বালক, পৃথিবীর কিছুতেই অভিজ্ঞান নাই, এখন লোকের সামান্য দুঃখে তোমাদের হৃদয় গলিয়া যায়, সামান্য

উৎপীড়ন দেখিলে তোমাদের অন্তর জ্বলিয়া উঠে। এই যৌবনকালই কঠিন পরীক্ষার সময়, এই সময়ে যে মনকে দমন করিতে পারিল, আপন বশে আনিতে পারিল, সেই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। যোগেশ, আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য আছে, আমি বুঝিয়াছি তুমি সাঁওতালগণকে প্রাণের সহিত ভালবাস, তাহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার দেখিলে তোমার হৃদয় ব্যথিত হয়। তুমি যে সমস্ত অত্যাচারের কথা বলিলে, তাহা অপেক্ষাও ভীষণতর অত্যাচার সংঘটিত হইতে পারে—কিন্তু সাবধান, যেন সেই কারণে তোমার অটল রাজভক্তি বিলোড়িত না হয়। নিশ্চয় জানিও, এ সমস্ত অত্যাচারের বিষয় আমাদের রাজা কিছুই অবগত নহেন। যোগেশ, আমাদের রাজা প্রজা-বৎসল, মঙ্গলনিয়ন্তা, দয়ার পয়োধি; কিন্তু তাঁহাকে সমস্ত-বিষয় পরের চক্ষে দেখিতে হয়। যদি ভবিষ্যতে অন্য কোন বিশেষ উপদ্রব আরম্ভ হয়, তবে রাজার নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিও তিনি প্রজার দুঃখে অবশ্যই কর্ণপাত করিবেন।”

এবম্প্রকার কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে আকরবা ও অন্যান্য শীকারীরা সুসজ্জিত হইয়া শিবিরদ্বারে উপনীত হইতে লাগিলেন দেখিয়া জনাবালি যোগেশকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া স্বয়ং প্রস্তুত হইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

শীকার সম্বন্ধীয় আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লিখিয়া আমরা পাঠকগণের বিরক্তি জন্মাইতে ইচ্ছা করি না, কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ঐ দিবস যোগেশচন্দ্রের শীকারে ও অশ্বসঞ্চালনে নিপুণতা দর্শন করিয়া নবাব নাজিম প্রফুল্লান্তঃকরণে আপন হস্তের হীরক অঙ্গুরীয় যোগেশচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন।

শীকারান্তে নবাব নাজিম সমস্ত সমভিব্যাহারীকে শিবিরে যাইতে আদেশ করিয়া যোগেশচন্দ্রের সহিত অরণ্য শোভা দর্শন করিবার জন্য

শালারণ্য ভেদ করিয়া চলিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন এমত সময় তাঁহারা দক্ষিণ পার্শ্বে মনুষ্যের কোলাহল শ্রবণ করিলেনও তৎক্ষণাৎ উভয়েই অশ্ববেগ সম্বরণ করিয়া তদভিমুখে উৎকর্ণ হই-লেন। ক্ষণেক পরে যোগেশচন্দ্র বলিলেন,—“বুদ্ধি চাঙ্গের গলা শুনিতেছি, বোধ হয় কোন নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকিবে, অনু-মতি করেন তো এক বার দেখিয়া আসি।” নবাব নাজিম বলিলেন, “এখান হইতে অধিক দূর বোধ হইতেছে না, চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।”—তাঁহারা উভয়েই শব্দাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা অরণ্য অতিক্রম করিয়া দেখেন, বুদ্ধি ও অপর কয়েক জন সাঁওতালে একটি গুহার মুখে একখানি প্রস্তর ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। যোগেশচন্দ্রকে দেখিয়া বুদ্ধি বলিল,—“রাজা, যোগি-নীকে পাইয়াছি, এই গুহার মধ্যে আছেন, কিন্তু ভিতরে যাইবার পথ পাইতেছি না।” জনাবালি কৌতূহলপূর্ণ নয়নে যোগেশের মুখ প্রতি চাহিলে, যোগেশ তাঁহাকে কাঞ্চনমালা হরণের উদ্যম হইতে সমস্ত কথা বলিলেন এবং আপনিও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া প্রবেশ-দ্বারের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক এ দিক ও দিক দেখিয়া যোগেশচন্দ্র বলিলেন, “আমার বোধ হইতেছে এই জঙ্গলের ভিতর পথ আছে, তোমরা এই জঙ্গল অনুসন্ধান কর।” সাঁওতালগণ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া ক্ষণেক পরেই বলিল,—“আছে, আছে, রাজা, পথ আছে, এক প্রকাণ্ড পাতর চাপান আছে।” সাঁওতাল-হস্তে প্রস্তর শীঘ্রই স্থানচ্যুত হইল, এবং পরক্ষণেই যোগিনী গুহা মধ্য হইতে বহি-র্গত হইয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে বলিলেন,—“বাবা, আমার মাথার যত চুল, তত তোমাদের পরমায়ু হউক; তোমরা ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর হও।”

যোগেশ বলিলেন,—“মা, আপনি আমাদের পূজনীয়া, আমরা অনেক স্থলে আপনার অনুসন্ধান করিয়াছি, আজ অদৃষ্টবশতঃ আমরা

মাতৃ-উদ্ধার করিলাম। কাঞ্চনমালা আপনার জন্য নিতান্ত ব্যাকুলা আছেন।”

যোগিনী রোদন করিয়া বলিলেন—“বাবা, আমি সে ধন কি আর পাব. আমি যে এ গুহায় বসিয়াই শুনিয়াছি, কোন্ সাহেব নাকি—” যোগিনী আর বলিতে পারিলেন না, উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন।

নবাব নাজিম অবাক্ হইয়া এতক্ষণ এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিতে-ছিলেন. এক্ষণে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—যোগেশচন্দ্র, সত্যই সাঁওতাল রাজ্যে অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছে।”

যোগেশচন্দ্র নাম শুনিয়াই যোগিনী একবার চমকিয়া উঠিলেন, চারিদিকে চাহিলেন, যোগেশের মুখের উপর ক্ষণেক দৃষ্টি স্থাপন করিলেন, শেষে বাম করে কপোলদেশ টিপিয়া ধরিয়া মনে মনে বলি-লেন,—“যোগেশ, যোগেশ, উঃ স্মৃতি, আর কত কাল জ্বালাইবে?”

যোগেশচন্দ্র, যোগিনীকে সান্ত্বনা ও বুদ্ধির হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন, যোগিনী যোগেশের সেই স্বর্ণকান্তির প্রতি চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন—“যোগেশ, তাঁর আদরের নাম,—সেই সুখস্বপ্ন—আবার কেন—এত দিন কাটাইয়া শেষে বৃদ্ধকালে কি উন্মাদিনী হ'ব—” এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে বুদ্ধি চাঙ্গের সহিত তিনি মাঙ্গক মাঝির গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

সেই রাত্রিতে যোগেশচন্দ্র কাঞ্চনভবনে পর্য্যঙ্কে শুইয়া আছেন। রাত্রি ১টা বাজিয়াছে, সমস্ত জগৎ ঘুমাইয়াছে, কেবল আমাদের যোগেশচন্দ্র একাকী সেই নিশীথ রাত্রে ভাবিতেছেন। যোগেশ কি ভাবিতেছেন? কাঞ্চনমালার প্রেম? সে কথা তো তিনি সর্ব্বদাই ভাবিয়া থাকেন, তদপেক্ষা আরও কিঞ্চিৎ গুরুতর চিন্তায় অদ্য তাঁহার মন আচ্ছন্ন। যোগেশ শয়ন করিয়াই প্রথমে নবাব নাজিমের অমায়িক-কতা, কারুণ্য প্রভৃতি গুণনিচয়ের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, ভাবনার

স্রোতঃ ক্রমে ক্রমে সাঁওতাল রাজ্যে চলিয়া পড়িল। দিগম্বরের নিষ্ঠুরতা, গোবিন্দ দারোগার দুষ্ট বুদ্ধি, গাট্রের পাশব আচরণ, সাঁওতালদিগের প্রতি অত্যাচার, তাহার পরিণাম ফল, একে একে তাঁহার অন্তরে উদয় হইতে লাগিল! ভাবিতে ভাবিতে কাঞ্চনমালার মুখ মনে পড়িল—সেই বিপুল প্রেম, সেই অপার ভালবাসা, সেই সুধাময় কটাক্ষ, সেই জ্যোৎস্নাপূর্ণ হাসি একে একে তাঁহার নয়ন সম্মুখে নাচিতে লাগিল, তাঁহার হৃদয় আনন্দে কাঁপিয়া উঠিল, তিনি অনেক ক্ষণ ধরিয়া সেই চিন্তাসাগরে ডুবিয়া থাকিলেন। পরে ভাবনা হইল, এ প্রেমের পরিণাম কি হইবে? তিনি কায়স্থ, কাঞ্চনমালা বৈষ্ণবী, কি প্রকারে বিবাহ হইবে, কি উপায়ে তাঁহারা ধর্ম্মতঃ স্ত্রী পুরুষ হইবেন, কোন্ শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে কাঞ্চনমালার বিমল প্রেমে কলঙ্কারোপণ হইবে না। কাঞ্চনমালার প্রেমের অনুরোধে যোগেশ ভেক গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে স্মরণ হইল, তিনি ইহাতে আপত্তি করিবেন বলিয়া তাঁহার ভয় হইল। আবার ভাবিলেন—"পিতা আমার দয়াময়, তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিব পুত্রের চক্ষে জল দেখিলে সে স্নেহসাগর অবশ্যই উথলিয়া উঠিবে, কখনই তিনি আমার চির সুখের পথে কণ্টক হইবেন না। এতক্ষণ এক এক খানি শুভ্র মেঘ যোগেশের হৃদয় আকাশে উদয় হইতেছিল, আবার মৃদু পবনে তখনই সেখানি উড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে একখানি জলভারাবনত কৃষ্ণ মেঘ, যোগেশের হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিল, যোগেশ চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। অভাগিনী জয়াবতী!—এতক্ষণ পরে তুমি যোগেশের হৃদয়ে উঠিয়াছ, তুমি যাহাকে যপের মালা, সাধনের মন্ত্র, হৃদয়ের হার করিয়া রাখিয়াছ সেই যোগেশ তোমায় ভাবিতেছেন। জয়াবতীর অকৃত্রিম প্রণয়,

সরল ভালবাসা, তন্ময় জীবন, যোগেশের মনে হইল. বাল্যকাল হইতে সমস্ত কথা একে একে যোগেশের স্মরণপথে আসিতে লাগিল। তিনি মনে বলিতে লাগিলেন.—জয়াবতী, আমার স্নেহে জননী, ভালবাসায় ভগিনী, সখ্যে স্বজন, উপদেশে গুরু; আমার শৈশবের সুখ, কৈশোরের আশ্রয়, যৌবনের বন্ধু; আমার মনের মমতা; প্রাণের স্নেহ হৃদয়ের শান্তি জীবনের ধর্ম্ম;—দিদি, প্রাণের ভগিনী, কেন এ অভাগাকে প্রেমচক্ষে দেখিয়াছিলে, কেন তোমার সরল হৃদয়ে এ কালকূট প্রবেশ করিয়াছিল? দিদি, তোমার উপায় কি হইবে, সে সরল হৃদয় যে একেবারে পেষিত হইয়া যাইবে। তোমার সুখের জন্য আমি সব করিতে পারি, হৃদয় টানিয়া বাহির করিতে পারি, জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিতে পারি, মৃত্যুকে সুখে আলিঙ্গন করিতে পারি—কিন্তু—ওহঃ।” যোগেশচন্দ্র আর ভাবিতে পারিলেন না, উপাধানে মস্তক গুঁজিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

——oo——

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আশায় নিরাশ।

গঙ্গাদেবের বাটীর অন্তঃপুর-উদ্যানে একটি বকুল-বৃক্ষ-মূলে জয়াবতী একাকিনী বসিয়া আছেন। যে অবধি যোগেশচন্দ্র কাঞ্চন পাহাড়ীতে গিয়াছেন, সেই অবধি জয়াবতী অবসর পাইলে প্রায়ই নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করেন। জয়াবতীর স্বভাবে এক্ষণে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; তাঁহার আর সে পূর্ব্বেকার উচ্চ হাস্য নাই, চঞ্চল চরণ নাই, চক্ষে বিদ্যুৎক্রীড়া নাই, জয়া এখন ধীরপদে মৃত্তিকার প্রতি চাহিয়া যান, সঙ্গিনীগণের সহিত ধীর মধুর কোমলকণ্ঠে কথা কন, হাসিবার সময় অধর ঈষৎ প্রস্ফুরিত করিয়া কুন্দ-দন্তের অগ্রভাগমাত্র প্রকাশ করিয়া নীরব হাস্য অধরে অধরেই মিশাইয়া দেন। দোল পূর্ণিমা চলিয়া

গিয়াছে. কিন্তু জয়াবতী পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবার আর আবীর-ক্রীড়া করেন নাই, এবার আর তেমন করিয়া আপন হাতে ফুলের মালা গাঁথিয়া খোপায় পরেন নাই। জয়ার আর সে বালিকার ভাব নাই, এখন সে মূর্ত্তি স্থির, ধীরা, গম্ভীরা। তিনি যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসেন, সে এত দিন নয়নে নয়নে ফিরিত, ইচ্ছা হইলেই তাহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিতেন, তাহার কাছে যাইয়া বসিতেন, তাহার মধুর কণ্ঠে কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেন। তিনি এত দিন কেবল প্রেমের শুক্লপক্ষ দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হইয়াছে, জয়া ইতি-পূর্ব্বে কখন ভাবেন নাই, এক্ষণে ভাবিতে শিখিয়াছেন; তাঁহার যে নয়নে পূর্ব্বে কেবল শারদ কৌমুদী উদ্ভাসিত হইত, সে এক্ষণে থাকিয়া থাকিয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় জলভারাবনত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহার যে হৃদয় তৃণের ন্যায় লঘু ছিল, তাহা প্রস্তরের ন্যায় গুরু হইয়াছে। জয়ার মনে এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নুতন ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছে—সেটি ভয়। হৃদয়-নিধি, বুকের ধন, জীবন-সর্ব্বস্ব কোথায় ছাড়িয়া দিলাম, সে কেমন স্থান, যদি সেখানে ডাকিনীর চাতর থাকে, যদি আমার সেই সর্ব্বস্বধন কেহ ভুলাইয়া লয়,—যদি কাহার মোহিনীতে ভুলিয়া তিনিই আমায় ভুলিয়া যান—না, না, আমার যোগেশ দেবতা, সে সরল হৃদয় সুধা-মণ্ডিত, তাহাতে কালকুট প্রবেশ করিতে পারিবে কেন?—জয়াবতী প্রায়ই এইরূপ চিন্তা করিতেন।

আজ বকুল-মূলে বসিয়া জয়া ভাবিতেছেন। সুদূরবিস্তৃত, সুনীল, অনঙ্কিত গগণের প্রতি অনেক ক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া জয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঐ পাখিটি কত দূর উঠিয়াছে, ও আরও উঠিতে পারে, ও হয় তো তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে; আহা, পাখী-জন্ম বেশ্! লোকে কি করিলে পাখী হইতে পারে? আমি একটি বর পাই যে,

যা মনে করি, তাই করিতে পারি, তাহা হইলে এখনই একবার পাখী হই, একবার ঐ পাখীটির মত উড়িয়া যাই, তিনি যেখানে আছেন, সেইখানে যাই, তাঁর সম্মুখে গিয়া বসি, তিনি আমায় দেখিতে পান না, কিন্তু আমি তাঁকে দেখি—প্রাণের আশা মিটাইয়া দেখি, চক্ষু ভরিয়া দেখি, চক্ষে করিয়া তুলিয়া আনি। সে কি সুখেরই হয়—তাহা হইলে দেখিতে পাই, তিনি আমার জন্য কেমন করিয়া ভাবেন। তিনি আমায় ভাবেন কি? ছাই ভাবেন, ভাবিলে এত দিন আসিতেন। আমি কে, তাই তিনি আমার জন্য ভাবিবেন? কত দেশের কত নদী দিবারাত্র অবিশ্রান্ত ছুটিতে ছুটিতে সাগরে মিশিতে যায়, প্রশান্ত, গভীর, অনন্ত জলনিধি কার প্রতি ফিরিয়া চান? আমি পাখী হইয়া তাঁহার কাছে যাইব, কিন্তু যদি দেখি, আমার সে ধন অপরে গ্রাস করিয়াছে, তিনি জীবনের মত অপরের হইয়াছেন, তখন কি করিব, কোন করিয়া আর ফিরিয়া আসিব?—আসিবারই বা প্রয়োজন কি?—সে দেশে কি ব্যাধ নাই, তাহার ফাঁদে যাইয়া বসিব, সে আমায় মারিয়া ফেলিবে, সকল জ্বালা নিবিয়া যাইবে।

"কাঞ্চন পাহাড়ী—সে কোথায়? আমাদের ছাদে উঠিলে দেখা যায় না? কত গ্রাম, কত গাছ, কত নদী দেখা যায়, সেটি দেখা যায় না? সে দিন তো ছাদে উঠিয়া চারি দিকে কত পাহাড় দেখিলাম, তাহার মধ্যে একটিও কি কাঞ্চনপাহাড়ী নয়?—এ পোড়া পাহাড়ী কোন বিধাতার সৃষ্টি!!

"ঐ পাতলা মেঘখানি কেমন হন হন করে ছুটে আসছে, ও আমায় বেশ দেক্তে পাচ্ছে। আচ্ছা, ও খানি যদি মেঘ না হ'য়ে তিনি হন; আর ঐখান হ'তে আমায় ডাকেন, তা হ'লে আমি কেমন ক'রে তাঁর কাছে যাই?—নাই বা যেতে পারলাম, তবু তো এখান হ'তেই তাঁকে দেক্তে পাই!

"তিনি বড় ফুল ভাল বাসেন ; সে দেশে কি ফুল আছে ? যদি কেহ ফুলের খেলা দেখাইয়া তাঁহার মন ভুলাইয়া দেয় ! না, শুনিয়াছি সে সাঁওতালের দেশ, সাঁওতালের মেয়েতে কি আমার যোগেশকে ভুলাইতে পারে ?"

মুগ্ধা জয়াবতী আপন মনে এইরূপ ভাবিতেছেন। ক্রমে ক্রমে বেলা ঢলিয়া পড়িল, সূর্য্য ডুবিল, চাঁদ উঠিল, চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি করিয়া নক্ষত্রও ফুটিতে লাগিল। সন্ধ্যা দেখিয়া জয়াবতী বলিতে লাগিলেন;—"আবার এক দিন গেল, কত দিন এল, কত দিন গেল, আবার কাল এক দিন আসিবে। এক দিন যায়, আবার তার পর আসে, কিন্তু আমি যাঁহার জন্য ভাবিয়া মরিতেছি, তিনি আসিতেছেন না কেন ? আচ্ছা, তিনি কত দিন গিয়াছেন ?—এক, দুই, তিন— জয়াবতী গণিতে আরম্ভ করিলেন, একবার দুই বার তিন বার, চেষ্টা করিলেন, গণনা ঠিক্ হইল না, শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"দূর ছাই——সে কি আজকার কথা, তাই মনে পড়িবে।"

জয়াবতী বকুল-মূল হইতে উঠিলেন, লঘুপাদ-বিক্ষেপে পুষ্করিণীর দিকে আসিতে লাগিলেন, যে ঘাটের আলিসার উপর তিনি যোগে-শের গাত্রে আবীর ফেলিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই স্থানটি দেখিলেন,শেষে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে তাহার উপর আসিয়া বসিলেন। এক বার চারি দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জয়াবতী মনে মনে বলিতে লাগিলেন;—"তিনি এই স্থানটি বড় ভাল বাসেন, এখানে থাকিতে, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় এখানে আসিয়া বসিতেন, এইখানে বসিয়া ঐ জলের ভিতর চাঁদের খেলা দেখিতেন। তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন—"বিমল সলিলে চাঁদের ছায়া, চাঁদ চেয়ে মিষ্ট"—কিন্তু সে মিথ্যা কথা, আমার মনে তো চাঁদের ছায়া রহিয়াছে, তবু কেন আমার প্রাণ আমার চাঁদের জন্যে এত ব্যাকুল !"

জয়াবতী যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে উঠিলেন, পুষ্করিণীর জলের দিকে যে আলিসাটি উচু হইয়া আছে, তাহার নিকট গমন করিলেন, ও তাহার উপর বক্ষ ন্যস্ত করিয়া নতমস্তকে পুষ্করিণীর প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আবার চিন্তাসাগরে ভাসিলেন।

"আমি একটি দিনও তাঁহার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলি নাই, আমার চপলতা ও ক্ষীণতা নিবন্ধন তিনি আভাসেই যাহা জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু—তা কি হইবে? সে যে আমার আকাশ-কুসুম। যদিই হয়, যদিই অভাগিনীর অদৃষ্ট ফিরিয়া যায়—যদি আমি আজ এই স্থানে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্রের দেখা পাই, তাহা হইলে আমি তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িব, প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা তাঁহাকে বলিব, প্রাণের ভিতর প্রাণ দিয়া তাঁহাকে গাঁথিয়া লইব। আমি তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিব—"আমার সর্ব্বস্ব। আমি সব সহিতে পারি, তোমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা আমার অসহ্য, তুমি এবার হইতে আমায় পায়ের কাদা করিয়া রাখ, যেখানে যাইবে, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইব।—"

জয়াবতীর চক্ষে জল আসিল, তিনি চক্ষু মুছিবার জন্য মস্তক তুলিলেন, নয়ন ফিরাইলেন, চন্দ্রালোকে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে সেই ধীর, গম্ভীর, সরল, সমুন্নত, সুন্দরকান্তি—যোগেশচন্দ্র!

হর্ষে, বিস্ময়ে, অভিমানে জয়াবতীর হৃদয় ঘূর্ণ জলের ন্যায় চক্রবৎ ঘুরিতে লাগিল, তাঁহার মস্তক ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের জন্য তিনি তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। যোগেশচন্দ্র সেইরূপ ধীর গম্ভীর ভাবে অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার মুখখানি বিষাদ-পরিপূর্ণ, দেখিলেই বোধ হয় যেন ঘোর দুঃখ বা সমবেদনা তাঁহার হৃদয়ে সবলে আঘাত করিতেছে। প্রথম হৃদয়-বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে জয়াবতীর মুখ-কমল মুদিত কমল-কোরকের প্রথম প্রস্ফুটনের ন্যায়

সুমধুর ঈষদ্ধাস্যে প্রফুল্ল হইল, তিনি বেদিকার উপর হইতে নিম্নে নামিয়া মধুর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন এলে ?"

আর্য্য-জ্ঞান-গরিমা।

এ দেশে বহুকালাবধি শবদাহ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন স্থলেই এপর্য্যন্ত উহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সংপ্রতি ইউরোপীয় এবং আমেরিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানবলে জানিতে পারিয়াছেন যে, ভূমিতে শব প্রোথিত করা অপেক্ষা দাহ করা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট। যাহা এত দিন পরিশ্রম করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ প্রকাশ করিলেন, তাহা কত কাল হইতে আমাদিগের দেশে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, কে বলিতে পারে ?

বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেই অবগত আছেন যে, চন্দ্র. সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের সঙ্গে জীব শরীরের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। তিথি বিশেষে ঐ সকল গ্রহের সংক্রমণ কালে মানব শরীরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এইজন্য অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী প্রভৃতি তিথিতে লঘু আহার বা উপবাস ইত্যাদির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাতঃস্নানের পর প্রাচীন ঋষিগণ চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ও মৃত্তিকাদি দ্বারা তিলক ও দেহ লেপনাদির বিধান দিয়া গিয়াছেন। সুগন্ধি দ্রব্য লেপনে প্রীতি ও তেজোবৃদ্ধি হয় এবং ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, তন্দ্রা, পাপ অর্থাৎ পীড়া, শ্রম ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফল কথা, দুর্গন্ধ নিবারণের পক্ষে সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ বলেন, মৃত্তিকা দ্বারা তাড়িৎ নষ্ট হইয়া থাকে। বোধ হয়, এইজন্যই বহিঃস্থ শরীরজ প্রয়োজনাতিরিক্ত তাড়িৎ নিবারণার্থ মৃত্তিকার তিলকাদি ধারণের বিধান প্রচারিত হইয়া থাকিবে। দেবার্চ্চনাদি কোন

কাজ করিতে হইলেই স্নান করিয়া শুচী হইয়া যাইবার বিধি আছে,কারণ ময়লায় থাকিলে পীড়ার সম্ভাবনা।

তুলসী বিষঘ্ন, কবিরাজেরা তুলসী দ্বারা সর্পবিষ শোধন করেন। দুই আনা পরিমিত কৃষ্ণ তুলসীর সিকড় শীতল জলের সহিত বাটিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। যাঁহারা সর্পবিষে তুলসীর পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শুনা যায় যে, তুলসী পত্রের রস চক্ষে, নাসারন্ধ্রে এবং ওষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করাইলে মৃতবৎ ব্যক্তিরও চেতনা হয়,কিন্তু এ কথা কত দূর সত্য বলিতে পারি না। ফলতঃ তুলসী যে আমাদিগের বিশেষ উপকারী,তাহা বহুকালাবধি লোকের বিশ্বাস আছে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্বয়ং বিষ্ণুর তুলসীপত্রে বিশেষ অনুরাগ। বিষ্ণু এই সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা, সকল ঔষধ বাছিয়া তুলসীকে প্রধান স্থান দিয়াছেন। তুলসী বিষঘ্ন ও জ্বরঘ্ন, ইহা অনেকেই জানেন। ইহার রসে দদ্রু প্রভৃতি অনেক চর্ম্ম রোগ ভাল হয়। আবার শুনা যায়, তুলসী বাটীতে রোপণ করিলে বায়ুর দোষ নষ্ট হয়। তুলসীর মালা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ফলতঃ বোধ হয় অন্য অপেক্ষা তুলসীর ভক্ত বৈষ্ণবের স্বাস্থ্যরক্ষা ভাল হয়।

এ দেশে যে বৃক্ষকে মনসা বলিয়া লোকে পূজা করে, তাহা সর্পবিষ সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী বলিয়া বোধ হয়। পুরাণে মনসা নাম্নী নাগিনীকে আস্তিক মুনির মাতা বাসুকী সর্পিনীর ভগিনী ও জরৎকারু মুনির পত্নী বলিয়া উল্লেখ আছে এবং সেই দেবী সর্পগণের সম্মাননীয়া, এইজন্যই এতদ্দেশে মনসাবৃক্ষের এত দূর মান। কিন্তু অনেকেই ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করেন নাই। এক্ষণে পরীক্ষিত হইয়াছে যে, মনসা বৃক্ষের বিলক্ষণ বিষনাশিকা শক্তি আছে। সর্প দষ্ট স্থানে উত্তমরূপ মনসা বৃক্ষের আটা লাগাইয়া দিয়া উক্ত বৃক্ষপত্রের রস এক ছটাক রোগীকে পান করাইলে তাহাতেই সর্প দষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে।

বেলের মূলের গন্ধে সর্প একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই মূল নিকটে লইয়া গেলে সর্প মস্তক তুলে না। গৃহে রাখিলে সর্প গৃহে প্রবেশ করে না। কিন্তু দেখা গিয়াছে, বেলের মূল শুষ্ক হইয়া গেলে আর কোন ফল দর্শে না। বেল ফুলের গন্ধও অতি মনোহর। শিবের স্কন্ধে সর্প আর মস্তকে বিল্বপত্র দিয়া শৈবেরা উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এই সম্বন্ধটি নানা প্রকারে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

এই সকল ব্যতীত স্বগোত্রে বিবাহের নিষিদ্ধতা তাঁহাদিগের একটি বিশেষ গবেষণা ও বিজ্ঞতার ফল। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এইরূপ কত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

চন্দ্র স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় নয়, সূর্য্যতেজে জ্যোতিষ্মান হইয়াছে, পৃথিবী গোল, ইহা অবিরত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ ও শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে, জোয়ার ভাঁটা এবং গ্রহণ প্রভৃতির বিবরণ তাঁহারা অতি পূর্ব্বকালেই জানিতেন। যদি কখনও কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি তাঁহাদিগের নিকট সূর্য্য কি চন্দ্রগ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে না বিবেচনা করিয়া রাহুকেতুর উপন্যাস বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেন। তাহারাও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত এবং সেই হইতেই ঐরূপ কল্পিত বিষয় লোকের মন অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ এইরূপ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক নিয়ম ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত সংসৃষ্ট করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এদেশীয় জনগণ পুরুষ পরম্পরায় তাহাই আবার ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, কিন্তু উহার যথার্থ কারণ কি কেহই তাহা অবগত নহে; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর প্রদান করিতে পারে না।

এইরূপ যখন পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী মহোদয়গণ কোন বিষয়ের সত্যোদ্ভাবনের চেষ্টা করিবেন, তখন তাঁহাদিগের মুখমণ্ডলী ভারতের

মহিমাকীর্ত্তনেই অগ্রসর হইবেক। যেমন পতিতপাবনী ভাগিরথী পর্ব্বতাগ্রগণ্য অসীমবিস্তার হিমালয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে অমৃতধারে নিঃসৃত হইয়া অসংখ্য পতিত স্থান এবং পাতকী কুল উদ্ধার করিতে করিতে অদম্যগতিতে উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগরের ভীমপ্রবাহে সংমিলিত হইয়াছেন, তদ্রূপ অসীম প্রতিভা-সম্পন্ন আর্য্যজাতিও পারস্য দেশের অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভীম সংরাবে অদম্যগতিতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে জাতির প্রথমোদ্ভূত ধর্ম্মভাব অদ্যাপি ভূমণ্ডলের সমস্ত ধর্ম্ম পুস্তকের উপর প্রাধান্য রক্ষা করিতেছে, যাঁহাদিগের মুখ-বিনিঃসৃত সংস্কৃতভাষা, সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভাষামধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়েছে, যাঁহাদিগ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত,ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট ভাবগর্ভ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, বাল্মিকী, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি শ্রীহর্ষ, মাঘ, ভারবি, প্রভৃতি কবিগণ যে জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি যে জাতির স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, যাঁহাদিগের দর্শনশাস্ত্রে পৃথিবীস্থ অধুনাতন সকল জাতির মতের সার-সংগ্রহ রহিয়াছে, সেই আদিম সুসভ্য জাতির বিষয় চিন্তা করিলে কাহার মনে গৌরব ও উল্লাসের আবির্ভাব না হইবে? যে জাতিতে পরশুরাম, রামচন্দ্র, নল, যুধিষ্ঠির, সগর, ভরত প্রভৃতি তেজ-পুঞ্জ নরপতিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে জাতির ঋষিগণ, জনসমাজে অসামান্য সম্মান এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়াও সাংসারিক ভোগবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে কুটীরবাসে ঈশ্বরোপাসনায় কাল যাপন করিতেন, যাঁহাদিগের বিজ্ঞানের অঙ্কুর দেশ বিদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া অভিনব কায়া ধারণ করিয়াছে, যে জাতি হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইয়া তিব্বৎ, ব্রহ্ম, চীন, তাতার প্রভৃতি দেশে সমাদৃত হইয়াছে, যাঁহাদিগের মুখ বিনিঃসৃত বাক্য হইতে

যীশুখৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কলন করিয়াছেন, সেই জাতির কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির মন বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন না হয়?

অস্মদ্দেশে বিদ্যার কতদূর সমাদর ছিল, তাহা উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা এবং নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাই সকলকে বলিয়া দিয়াছে। সুতরাং আমরা তদ্বিষয়ে অনর্থক বাক্যব্যয় হইতে বিরত হইলাম। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রায় সমগ্র বিষয়ে জগতের উপদেষ্টা হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে ইতিহাসের আদর ছিল না। আর্য্যগণ শ্লাঘা পঞ্চ মহাপাতকের অন্যতম বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং এ দেশে ইতিহাসের সৃষ্টিও হয় নাই। অথবা ইহা কেমন করিয়াই বা বিশ্বাস করি, যে দেশে অন্যান্য সমুদয় শাস্ত্রের এত সমুৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, সে দেশ যে একেবারেই এই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়টিকে ভুলিয়াছিল, ইহা কোন মতেই সম্ভবপর বোধ হয় না। বোধ হয় যবনের ভীষণ উপপ্লবে সমস্ত বিধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, আর দেখিবার উপায় নাই; সুতরাং আমরা মনে করিতেছি, তাঁহারা মুলে ইতিহাসই রচনা করিয়া যান নাই। এক্ষণে রাজতরঙ্গিণী, ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্ প্রভৃতির দুই এক খানা সংস্কৃত ইতিহাস প্রকাশিত হইতেছে। এতদ্দ্বারাই বোধ হয় পূর্ব্বকালের ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি সম্যক্ প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, এই ইতিহাসাভাবেই কোন্ সময় তাঁহারা অত্যুচ্চ উন্নতির শিখরাগ্রভাগে সংস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার সঠীক সংবাদ পাওয়া যায় না। ফলতঃ ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে, একদা বহুরত্ন সমাকীর্ণ, লোকারণ্য পরিপূর্ণ, বহুবিধ বিস্তীর্ণ বাণিজ্য দ্রব্য সমন্বিত, অতীব সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ বলিয়া ইহা সতত বিদেশীয় জাতির মোহমুগ্ধ চিত্তকে লোভাকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। মহাত্মা কোলব্রুক যথার্থই বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতে যাহা ছিল না

তাহা জগতে নাই এবং তদপেক্ষা নুতন কোন বিষয় আবিষ্কার হওয়া সুকঠিন।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ কতকাল আপনাদিগের এই উন্নতি অবিচলিত রাখিয়াছিলেন, তাহার স্থির নিশ্চয় সংবাদও নাই। অতি সংক্ষেপে আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতির উন্নতির উল্লেখ করিয়া এক্ষণে তাঁহাদিগের অবনতির বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া প্রস্তাবে ক্ষান্ত হইতেছি।

(ক্রমশঃ)

দাস।

——oo——

দস্যু-কন্যা।

১

নির্জ্জন প্রান্তরে নিবিড় জঙ্গল
লোকের আবাস নিকটে নাই,
চারি দিকে শুধু ধুধু করে মাঠ
ভাবিয়া আকাট যে দিকে চাই।

২

গভীর নীরব, ভয়ঙ্কর স্থান
প্রকৃতির মুখ কালীমা মাখা,
হেরিলে হৃদয়ে হয় প্রতিঘাত
যেন কাল মেঘে সতত ঢাকা।

৩

শন্ শন্ শন্ বহিছে বাতাস,
হৃদয় উদাস করিছে তায়,

উচ্চ শাখী শিরে বসি ঘুঘু পাখী
গম্ভীরে বিষাদে কি যেন গায়।

৪

সে গান শুনিয়া, তেমনি বিষাদে
তরুমূলে এক ষোড়শী বালা
কাঁদিছে কাতরে বিনায়ে বিনায়ে,
জ্বলিছে বিষম হৃদয় জ্বালা।

৫

সুচারু, সুঠাম, সুন্দর আননে
গভীর ভাবনা রয়েছে লেখা,
পূর্ণিমা-প্রদোষে যেন শশধর
ধরেছে হৃদয়ে কলঙ্ক রেখা।

৬

হীরকের লতা তনু তনুখানি
মাধুরী উছলি পড়িছে তায়,
আধা মুকুলিত যৌবনের কলি
অলি আজো উড়ে পড়েনি পায়।

৭

চাঁচর চিকুর এলায়ে পড়েছে,
সে ভাব হেরিয়ে ভাবনা হেন,
কপোল জঘন উরস ঘেরিয়ে
লবঙ্গ ললিতা জড়িতা যেন।

৮

ইন্দীবর নিন্দি নয়ন বিশাল,
বঙ্কিম ভ্রূতলে মধুর রাজে,

বিশ্বের মাধুরী যেন এক হয়ে,
পশিয়াছে ঐ আঁখির মাঝে।

৯

মরাল-গ্রীবাটি বাঁকাইয়া ধনী
বাম করতলে রাখিয়া মুখ,
পীবর হৃদয় দুলায়ে দুলায়ে,
মনে মনে গায় মনের দুখ।

১০

"আর কত কাল এ ঘোর বিপিনে,
এ ভাবে আমায় থাকিতে হ'বে?
হে বিধাত, আর কত জ্বালা দিবে?
অবলার প্রাণে কতই সবে?

১১

পঞ্চম বরষ বয়স যখন,
পড়েছি তখন পরের করে,
এই পথ দিয়ে স্বামীর সহিত
যাইতেছিলাম শ্বশুর ঘরে।

১২

ভুলেছি সে সব—কত দিন হ'ল,
কে বলে সে কথা, সুধাই কায়?
স্বপনের প্রায় আসে আসে মনে,
তখনি মনেতে মিশায়ে যায়।

১৩

আকাশের কোলে ঝিকি মিকি বেলা,
এ মাঠে যখন সোয়ারি এল,

তখনি অমনি কাঁপাইয়া দিক্
হুলস্থুল গোল পড়িয়া গেল।

১৪

মনে তো পড়ে না—কে কোথায় গেল,
ফলে সেই দিনে ভাঙ্গে কপাল,
সে দিন হইতে দস্যুর আগারে
কানন-মাঝারে কাটাই কাল।

১৫

বালিকা দেখিয়া বুঝি দয়া হ'ল
নিদয় দস্যুর পাষাণ মনে,
তাই স্নেহ-ভরে আনিয়া আমায়
পালিতে লাগিলা বিজন বনে।

১৬

দুহিতা ভাবিয়া যতন আদর
যদিও তস্কর আমায় করে,
পিঞ্জরের পাখী তথাপি যেমন,
উড়ু উড়ু প্রাণ বিষাদ-ভরে।

১৭

তাও জানি আমি, সে স্বাধীন চিত্ত
হয়েছে ইদানি স্নেহের দাস,
আমারি কারণে এ ঘোর বিপিনে
পরেছে চরণে মায়ার ফাঁস।

১৮

আত্ম-পরিবার কেহ নাহি আর,
শুধু আমি তাঁর আশার স্থল

ভাল বেসে বেসে ভেবেছেন মোরে;
ঠিক যেন তাঁর তৃষার জল।

১৯

তথাপি এ মন চাহে কি কখন,
বিজন বিপিনে করিতে বাস?
দস্যুর আদর, দস্যুর যতনে
পুরে কি কখন হৃদয়-আশ?

২০

জনকের দয়া, জননীর মায়া
ঘুঁচিল সুজন-স্বজন-সঙ্গ,
হায় রে বিধাতা, কি পাপে আমার
দগ্ধ কপাল করিলি ভঙ্গ।

২১

কি সুখের স্থান' সেই জন্মস্থান,
আর কি ফিরিয়া যাব সে দেশে,
প্রতিকূল বিধি ফেলেছে অকূলে
স্রোতের শৈবাল চলেছি ভেসে।

২২

বালিকা জীবন—চাঁদের কিরণ—
সুখের স্বপনে আছিনু ভোর,
সে আশা জ্বলিল, সব ফুরাইল,
ঘটিল কপালে বিষাদ ঘোর।

২৩

বিহঙ্গ শাবক জননীর নীড়ে
আদরে যেমন কাটায় কাল,

আমিও তেমনি ছিলাম সোহাগে,
উড়িতে এখনও শিখি নি ভাল।

২৪

কাল ব্যাধ হাতে তখনি পড়েছি,
আর কি যাতনা ইহার চেয়ে,
ভাঙ্গি ডানা দুটি রেখেছে পিঞ্জরে,
উড়িবার পথ দিয়াছে খেয়ে।

২৫

এইরূপে বালা তরুমূলে বসি
ভাবিছে খুলিয়া হৃদয়-দ্বার,
সহসা কে যেন পশ্চাৎ হইতে
মস্তক পরশ করিল তার।

২৬

চমকিয়া ধনী, যেন সৌদামিনী
চমকিয়া ধায় জলদ কোলে,
ফিরায়ে বদন, তুলিয়া নয়ন,
অনিলে গোলাপ যেমন দোলে।

২৭

চকিত লোচনে চটুল চাহনি
চাহিয়া দেখিল—তাহার পাছে,
ধীরপদক্ষেপে দস্যুপতি আসি
হাসি হাসি মুখে দাঁড়ায়ে আছে।

২৮

সমুন্নত দেহ, বিশাল উরস,
ক্ষীণ কটিদেশ শোভিছে তায়,

বার্দ্ধক্য প্রবেশ করিয়াছে দেহে,
তথাপি নধর অজর কায়।

২৯

শিহরে অন্তর, কম্পে কলেবর,
সহসা হেরিলে মুরতি হেন,
উজ্জ্বল মধুর নয়নের ভাতি,
পলাসের জ্যোতিঃ মধুতে যেন।

৩০

ধনীর সুঠাম সুন্দর মস্তক
উরস মাঝারে আদরে ধ'রে,
নিবিড় চিকুরে রাখিয়া অঙ্গুলি
কহিতে লাগিলা স্নেহের ভরেঃ—

৩১

"হাঁ মা রাজবালা, আবার কি জ্বালা
জ্বালিয়াছ আজি হৃদয় কোণে?
নয়ন-কমল জলে ছল ছল,
কি ভাবিছ বসি আপন মনে?

৩২

ঐ টুকু প্রাণে এত কি ভাবনা,
ব'ল মা আমায় সুধাই তাই,
দিন রাত হেরি ভাবের অভাব,
এতই কি ভাব ভেবে না পাই।

৩৩

সরবস ধন তুমি মা আমার,
দস্যুর সংসার তোমায় নিয়ে,

ভাবনায় ঘেরা হেরিলে তোমায়
বিষাদে বিদরে আমার হিয়ে।

৩৪

তুমি বিনা বল, এ জগত মাঝে
আমার বলিতে কে আর আছে,
হৃদয়ের জ্বালা সব ভুলে যাই,
মা বলে আসিলে তোমার কাছে।

৩৫

দরিদ্রের ধন, তুমি মা আমার,
বহি দেহ-ভার ও মুখ চেয়ে,
ছিনু উদাসীন, হয়েছি সংসারী,
প্রাণের কুমারী তোমায় পেয়ে।

৩৬

হাসি ভরা মুখ দেখিতে তোমার
পরাণ আমার সদাই চায়,
জলদে ঘেরিলে রাকা শশধর
কার না পরাণ কাঁদে মা তায়?

৩৭

গোলাপের দল অধর-যুগল
দুলায়ে দুলায়ে ভাবের ভরে,
কহিতে লাগিলা ধনী রাজবালা
সেতার-ঝঙ্কার তুলিয়া স্বরে।—

৩৮

"অভাগীর প্রতি অসীম করুণা
পিতা গো তোমার সকল কালে,

কিন্তু ভাগ্য-ফলে, বিধি যে এ দিকে
নিরন্তর জ্বালা লিখেছে ভালে।

৩৯

মনে মনে ভাবি কাননে তোমার
সেবিয়া চরণ লভিব সুখ,
করি পরিশোধ তব স্নেহ-ঋণ
ভুলিব না আর হৃদয়-দুখ।

৪০

অবোধ অন্তর তবু নিরন্তর
হুহু করে সদা, কি জানি কেন,
উছলি উছলি উঠে ভাব-বেগ
দ্রব ধাতু গিরি উদরে যেন।

৪১

না ভাবিতে মনে আপনি ভাবনা
উদিয়া অন্তর ডুবায় শোকে,
যে অবধি আসিয়াছি এই বনে,
মা বাপের মুখ দেখিনি চখে।

৪২

তাই মনু মরা হয়ে সদা রই,
মনে মনে সহি মনের দুখ,
ইচ্ছা করে যাই পাখী হয়ে উড়ে,
দেখে আসি পিতা মাতার মুখ।

৪৩

পঞ্চম বৎসর বয়স যখন
এসেছি তখন কানন ভুমি,

বৈধব্য-অনল জ্বালায়ে কপাল
নিজ হাতে দগ্ধ করেছ তুমি।”

৪৪

রাজবালা মুখে শেষ কথা শুনি
দস্যুপতিচিত চকিত প্রায়,
উঠিল চমকি, তখনি আবার
নিবারি সে ভাব কহিলা তায়।

৪৫

“অবোধ বালিকা, কে শিখালে তোরে
এ সব প্রলাপ ভেবে না পাই,
কবে বা হইল বিবাহ তোমার,
বিধবা বলিয়ে বিলাপ তাই।

৪৬

বুঝেছি এ সব ধাত্রীর সকাশে
শুনেছ, বিশ্বাস করেছ তাই,
আমি পিতা ছাড়া আর কোন পিতা
পাগলিনী তোর জগতে নাই।”

৪৭

বলিতে বলিতে নামায়ে বদন
ক্ষণেক চাহিয়া হেরিলা ধরা।
ভাবের তুফান বহিলা হৃদয়ে
চঞ্চল-চরণে চলিলা ত্বরা।

(ক্রমশঃ)

ভারতে বিদ্যালোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পর হইতেই ভারতের অবনতির সূত্রপাত হয়। রামায়ণের রাম ও রঘুবংশের রাম, মহাভারতের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলায় তুলনা করিলেই ইহা স্পষ্ট অনুভূত হইবে। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে আর্য্য-সন্তানগণ আলস্য, বিলাসিতা ও কুসংস্কারের দাস এবং হীনবীর্য্য হইয়া আপনাদিগের জ্ঞানরত্ন-সমুজ্জ্বলিত গৌরবের মলিনত্ব সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা গৃহবিবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল এবং সেই হইতেই ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য ক্রমে ক্রমে মলিন বেশ ধারণপূর্ব্বক অস্তগত হইলেন। তাঁহাদিগের সুখশয্যা ও স্বাধীনতা-রত্ন বিদেশীয় ম্লেচ্ছ জাতি কর্ত্তৃক অপহৃত হইল; স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষ ও অচিরেই যবন হস্তে পতিতা হইয়া নানাবিধ লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হইলেন; এবং তাঁহাদিগের অমূল্য রত্নগর্ভা সংস্কৃত ভাষাও অনন্ত সাগর গর্ভে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

মুসলমানগণ ভারতের কতদূর অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই! তাহারা যে কেবল সুসমৃদ্ধ হিন্দু গ্রাম, নগর, জনপদ লুণ্ঠিত, দাহিত ও উৎসাদিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল এমন নহে, বহুকাল ধরিয়া বহুকষ্টে যে সমস্ত বহুমূল্য রত্ন ও সম্পত্তি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাই যে কেবল বিলুণ্ঠিত ও বিনাশিত করিয়াছিল এরূপও নহে, অত্যদ্ভুত শিল্প বিজ্ঞানাদির প্রমাণ স্বরূপ অতুল কীর্ত্তি সকলও বিলোপিত করিয়াছিল। তাহারা হিন্দুগণের তীর্থস্থানে যাইতে নিষেধ, তীর্থস্থানীয় দেবতাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভঙ্গ করণ, হিন্দু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

মঠাদি ভঙ্গ করিয়া তত্তৎস্থলে মসৃজিদ্ স্থাপন, স্ত্রীলোকদিগের প্রতি জঘন্য অত্যাচার, বলপূর্ব্বক বিবাহ করণ, হিন্দু-গ্রন্থসমূহ পর্ব্বতাকারে প্রজ্বালিত করা, সমগ্র বেদবক্তার শিরশ্ছেদ, মুসলমানদিগের প্রতি অনুচিত পক্ষপাত, জমীদারদিগের প্রতি অনর্থক অত্যাচার, সুতরাং প্রজাদিগের সর্ব্বনাশসাধন, হিন্দুদিগের কোন রীতি ভাল বলিলে বক্তাকে কারাগারে প্রেরণ, প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাচার-বর্ষণপূর্ব্বক ভারতের, বিশেষতঃ হিন্দুসন্তানগণের, বিশেষ অনিষ্ট সাধিত করিয়াছে। অথচ হিন্দুগণ ব্যতীত তাহাদিগের রাজ্যরক্ষা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইত না। ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের অপ্রতিহত প্রাধান্য রক্ষার কারণও কোন কোন হিন্দু নরপতি ঐকান্তিক যত্ন এবং পরিশ্রম করিতেন! আকস্মিক বিপৎপাতকালে হিন্দুসেনাপতিগণ ব্যতীত উদ্ধারের উপায়ান্তর ছিল না। রাজা মানসিংহ, টোডার মল্ল এবং যশোবন্ত রাও প্রভৃতি ইহার প্রসিদ্ধ প্রমাণ, কিন্তু মুসলমানগণ এতাদৃশ নীচ প্রাকৃতিক ছিল যে, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দূরে থাকুক, তাহাকে প্রবল শত্রু মনে করিয়া শিরশ্ছেদ করিতেও সতত চেষ্টিত হইত। দুরাত্মা আরঞ্জিব এবং সেলিম প্রভৃতি ইহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। শেষোক্ত মহাত্মা হিন্দুধর্ম্মের দারুণ বিদ্বেষী ছিলেন। কথিত আছে, একদা সেলিমের সভায় কোন মুসলমান বলিয়াছিল, ভক্তি থাকিলে সকল ধর্ম্মেই মুক্তিলাভ হয়। সেলিম ইহা শুনিতে পাইয়া রোষ-পরিপূর্ণ-নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, অরে দুরাত্মন! কি বলিতেছিস্? সে তাঁহার ক্রোধ বুঝিতে পারিয়া বলিল, না আমি বলিতেছিলাম, রাজাদিগের প্রজাপীড়ন অনুচিত। এই কথায় সেলিম অগত্যা নিরস্ত হইলেন।

এইরূপে একাদিক্রমে ৫৬৬ বৎসর কাল মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া আর্য্যগণের আর কিছুই ছিল না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ইংরেজগণ এতদ্দেশ অধিকার করাতে এতদ্দেশীয়দিগের সজীবতা সম্পাদিত হইল এবং ভাষারও পুনরুন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহারা এদেশে আসিয়া ভাষার যাহা কিছু পাইয়াছিলেন, তাহা কেবল কঙ্কাল মাত্র। যাহা হউক, অবশেষে রাইন্ নদী তীরবর্ত্তী জর্ম্মণ-গণ কর্ত্তৃক আমাদিগের মাতৃভাষা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে আমরা সংস্কৃতের যাহা কিছু পাইতেছি, তাহা জার্ম্মেণীর প্রসাদাৎ। যাহা আমাদিগের মাতৃভাষা বলিয়া পরিচিত এবং যাহার এতদূর সম্মান ছিল যে, সর উইলিয়ম্ জোন্স যখন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছিলেন, "আমরা ম্লেচ্ছকে শিক্ষা দিয়া ভাষা কলঙ্কিত করিতে চাহি না।" সেই পরম পবিত্র সংস্কৃত ভাষাই এক্ষণ আমরা জর্ম্মণদিগের নিকট শিক্ষা করিতেছি!!! আজি ম্লেচ্ছ জর্ম্মণজাতি অকুণ্ঠিত-চিত্তে চিরপবিত্র জগন্মান্য ভারতীয় আর্য্য শর্ম্মণ জাতির সহিত এক বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেছে! অহো কি দুরাকাঙ্ক্ষা! কি বিড়ম্বনা! কালের কি অচিন্তনীয় প্রভাব, নিয়তি-নেমীর কি নিদারুণ পরিবর্ত্তন? ভারতবাসিগণ, এককালে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া, মানব-জাতির চির-প্রয়াস-লব্ধ অত্যুন্নত অবস্থার শিখর প্রদেশে উপস্থাপিত হইয়া, সমস্ত জগতের উপদেষ্টা হইয়াও কালক্রমে তদপেক্ষা সহস্র গুণে নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ এবং আধুনিক জাতির নিকট ভিক্ষা-প্রার্থী হইবেন, এতদপেক্ষা শোচনীয় ঘটনা আর কি হইতে পারে? আক্ষেপের বিষয়, আজ কাল এতদ্দেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের তাদৃশ আদর নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যের যেরূপ আদর করেন ও উহা শিক্ষার নিমিত্ত যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা দেখিয়াও আমাদিগের মনে লজ্জার উদয় হয় না। বিদেশীয় সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা অমূল্য রত্ন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনাদর প্রদ

র্শন করিতেছি, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। আর্য্যগণের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রশস্ত পরিচায়ক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের পুনরুদ্ধার হইলে যে,আমাদিগেরই গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে প্রায় কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে কত দূর বিদ্যালোচনা হইতেছে, তাহা আমরা সম্যক অবগত নহি এবং জানিবারও কোন উপায় নাই। ইহা দেশের বিশেষ দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আমরা প্রত্যহ তাড়িত বার্ত্তাবহ যোগে সাত সমুদ্রের পার ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিবরণ জানিতেছি, কিন্তু স্বদেশের কোথায় কি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহা কিছুই জানিতেছি না। আর জানিবার চেষ্টাও করিতেছি না। যাহা হউক বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, বঙ্গদেশ বহুকালাবধি বিদেশীয় জাতির অধীনে রহিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গভাষা, এতদ্রূপ অবস্থাতেওযেরূপ উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে দৃঢ়তা সহকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যদি দেশ স্বাধীন অবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে ইহার উন্নতি জ্যোতিঃবিকীর্ণ হইয়া সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিতে পারিত। স্বাধীন অবস্থায় থাকিলে অধিবাসী নির্ভয়ে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারেন, কিন্তু পরাধীনগণের পক্ষে তদ্রূপ হওয়া দুরপরাহত। কারণ সাধারণতঃ প্রায় দৃষ্ট হয়, রাজ-পুরুষগণের ভয়ে এবং নানাবিধ দণ্ডাজ্ঞা প্রচলিত থাকাতে সময়ে সময়ে অধিবাসগণের স্বস্ব মনোগত ভাব অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা সমূহ কষ্টকর হইয়া পড়ে। যদিও নিতান্ত কঠিন শাস্তির আদেশ প্রচলিত না থাকুক, তথাপি কি জানি কি বলিলে কি হয় ইত্যাদি ভাবিয়াই অনেকে অনেক কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে বিরত থাকেন। যদি দেশ স্বাধীন অবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে সকলেই নানাপ্রকার শব্দে

আপনাপন মনোভাব প্রকাশ করিয়া ভাষার সোষ্ঠব সম্যক বৃদ্ধি করিতে পারিতেন।

ভাষা শব্দ-সম্পদ-বহুলা না হইবার দ্বিতীয় কারণ, এ দেশে শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুন্নতি। শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি বৃদ্ধি না হওয়াতেই বঙ্গবাসিগণের মনের মালিন্য অদ্যাপি বিদূরিত হয় নাই এবং মনোগত ভাষায় পরিস্ফুট করিতেও তাঁহারা অপারগ হইতেছেন। যাহা হউক যাঁহার প্রসাদে অদ্য বঙ্গবাসিগণের মনের সরস বসন্ত উপনীত হইয়াছে, বঙ্গবাসিগণ ক্রমেই উন্নতি-বিকীর্ণ হইতেছেন, অদ্য আমরা কেবল মাত্র তাঁহারই অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ভাষা সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব।

চিরস্মরণীয় সার চার্লস মেটকাফ মহোদয় ১৮৩৫ খৃঃষ্টাব্দে এতদ্দেশীয়দিগকে মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন এবং তৎকালাবধি বঙ্গভাষার যথাসম্ভব উন্নতিও হইয়াছিল। কিন্তু বিগত ১৮৭৯ সনের দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৯ আইন দ্বারা মহাত্মা (!) লর্ড লিটন বঙ্গভাষার বক্ষে নিদারুণ শেলাঘাত করিয়াছেন। তদবধি দেশীয় ভাষার পত্রাদিতে আর সে পূর্ব্বের মত রাজনীতি বা রাজব্যবস্থা সম্বন্ধে বাক্যের পরিস্ফুটতা নাই! কিন্তু নিপীড়িত ক্রোধের কম্পে, ক্ষোভের দীর্ঘ নিশ্বাসে, শঙ্কার সঙ্কোচে, দ্বিগুণিত অন্তর্দাহের প্রমাণ সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বঙ্গভাষা অকস্মাৎ এই বিষাক্ত অস্ত্রাঘাতে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। *

১৮১৮ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড হেষ্টিংস বাহাদুর সর্ব্বত্র শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিস্তার করিয়া এতদ্দেশীয় লোকের

* এই প্রবন্ধটি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-পুনঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছি

বিদ্যানুশীলনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্নবান হয়েন। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গ-ভাষার বিশেষ চর্চ্চা ছিল না; তৎকাল হইতেই ইহা ক্রমশঃ ভাষারূপ ধারণ করে। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে মহানুভব হালহেড সাহেব সর্ব্বপ্রথম এই ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন এবং তদীয় পরমবন্ধু মহাত্মা উইল্-কিন্‌স সাহেব বঙ্গীয় অক্ষর মুদ্রাঙ্কিত করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। বঙ্গভাষার উন্নতি সম্বন্ধে তাহার পর আমরা শ্রীরামপুরের মিষণারী গণকে সবিশেষ ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাঁহা-রাই উক্ত সনে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপন এবং "সমাচার দর্পণ" নামে বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রচার করেন। তৎপর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্যাকরণ ও অন্যান্য গ্রন্থাদি প্রকাশপূর্ব্বক এই ভাষাকে এক প্রকার শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। অতঃপর সংস্কৃত কালেজের কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গ বঙ্গভাষার বিশেষ উন্নতি সংসাধিত করিয়াছেন। সংস্কৃত কালেজের মধ্যে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞতা-ভাজন, তিনিই বাঙ্গলাকে বাঙ্গলা করিয়াছেন এবং নানাবিধ অলঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক ইহাকে সুশৃঙ্খলা-সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও আমাদিগের সমধিক কৃতজ্ঞতা-ভাজন। যেহেতু তিনিই বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞান লিখিবার প্রথা প্রচলিত করেন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে অনেক সুলেখক বিদ্যমান আছেন। বাহুল্যভয়ে এ স্থলে আর অধিক নাম করা হইল না।

যৎকালে বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সাময়িকপত্রের অভ্যুদয় হয়, তখনকার সমাজের অবস্থা ভাবিলে এখন যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। সংপ্রতি নানাবিধ সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রাদি প্রচারিত হইয়া ভাষার যথেষ্ট সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু তথাপি একণও

ইহার বিস্তর অভাব রহিয়াছে। বঙ্গভাষার দুরবস্থার দুইটি কারণ অনুমিত হয়। এক সুশিক্ষিতের তৎপ্রতি অনুরাগ, অপর সকলেরই লিখিতে সচেষ্ট না হওয়া। শিক্ষিতগণের দৃঢ় বিশ্বাস বাঙ্গালায় পড়িবার কিছুই নাই; সকলি হয়ত ইংরেজী হইতে অনুবাদিত নতুবা অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং পাঠকের অনুরাগাভাববশতঃ কেহই তাদৃশ মনোযোগী হইয়া বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে সযত্ন হয়েন না। ইহার মধ্যে যে ২।৪ জন দেখা যায়, তাঁহারাই ভাষার যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত করিয়াছেন। অপরাপর সুশিক্ষিতগণ ইহা একবারও বিবেচনা করেন না যে, তাঁহারা অগ্রসর হইয়া না লিখিলে কিরূপে ভাষার উন্নতি হইবে?

এক সম্প্রদায় পাঠক আছেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই পর নিন্দা প্রিয়! তাঁহাদের হস্তে যেরূপ গ্রন্থ কেন পতিত না হউক, তাঁহারা একবার তাহার নিন্দা না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন না। কেহবা কোন গ্রন্থের আকৃতি দর্শনে অথবা নাম মাত্র শ্রবণেই পুস্তকের দোষ-গুণ সমালোচনা করিয়া বসেন। এই সকল লোক ইংরেজীতে সাতিশয় অনুরক্ত; ইংরেজী কথোপকথন, পত্রলিখা, প্রভৃতি তাঁহাদিগের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ। ঘটনাক্রমে বাঙ্গলাতে কোন সভা হইলেও তাঁহারা সাতিশয় বিরক্তচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি, আমরা এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াছি। যদি তাঁহাদিগকে ওরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বলিবেন, ও বাঙ্গলা; উহাতে শুনিবার বিষয় কি আছে? অথচ ইংরেজীতে সেইরূপ অথবা তাহা হইতে নিকৃষ্ট বক্তৃতা শুনিবার জন্যও আগ্রহচিত্তে আদ্যোপান্ত উপবেশন করিয়া থাকেন, ইংরেজীতে একখা না যৎসামান্য গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে জপমালা সদৃশ করিয়া রাখেন। এখনও একজন বাঙ্গালি ৮০।৯০

টাকা মূল্য দিয়া একখানা ইংরেজী সংবাদপত্র দেখিতে সচেষ্ট হইবেন। তথাপি ১০।৫ টাকা খরচ করিয়া একখানা বাঙ্গলা সংবাদপত্র রাখিতে সম্মত নহেন। আমরা দুঃখিতচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, বঙ্গীয় একখানা প্রধান পত্রিকা কেবল মূল্যাভাবেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈদৃশ-বিদ্বেষী পর-পদ লেহন-কারীদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই।

আজ বাঙ্গালী বিদেশীয় বিদ্যা হইতেই জ্ঞানলাভের প্রয়াসী, কেবল বিদ্যালোচনা কেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহাদিগের অশন, বসন, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই পর-হস্ত-ধৃত। ইহাঁরা পরিধান করিবেন, তজ্জন্য মাঞ্চেষ্টারের নিদ্রা হয় না; লিখিবেন, লেখনীর জন্য বার্ম্মিংহাম ব্যস্ত; গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত ফরাসী ও ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণের মস্তিষ্ক সতত বিলোড়িত হইতেছে; প্রাচীন ভারতের গণিতবিজ্ঞান সংগ্রহের নিমিত্ত তাঁহারাই অহোরাত্র শরীরের রক্ত জল করিতেছেন, লিবরপুল, লবণ যোগাইতে প্রস্তুত রহিয়াছে; অধিক কি আজ কাল মৎস্য ধরিবার সরঞ্জাম পর্য্যন্তও বিলাত হইতে আমদানি হইতেছে! সংক্ষেপে বলিতেছি, পরমুখ-প্রেক্ষিতাই ইহাঁদের জীবনের সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। পর-পদাঘাত-পেষিত, পরপদলেহনকারী স্বদেশ কলঙ্ক, কুলাঙ্গার বাঙ্গালী একদিনও আপনার স্বত্ব বুঝিল না, বুঝিতে চেষ্টাও করিল না। পাঠক শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইবেন, একজন জ্ঞানগর্ব্বী, সুশিক্ষিতাভিমানী, স্বজাতি স্বসমাজের অবমাননাকারী, স্বদেশবিদ্বেষী বাঙ্গালী অবাধে স্বদেশ স্বজাতি বিরুদ্ধে যদৃচ্ছাক্রমে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিল। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভারতের দুগ্ধে প্রতিপোষিত হইয়া যে এরূপে ভারতের নিন্দা করে, তাহার তুল্য নরাধম জগতে দ্বিতীয় নাই। এত দিন জানিতাম, দুরাচার বিবেক রহিত, বাঙ্গালিদ্বেষী, মেকলেই কেবল

ভারতের বিরুদ্ধে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু আজ স্বজাতীয় এক ব্যক্তির মুখ হইতে যে ঈদৃশ জঘন্য অপভাষা বিনির্গত হইবে, ইহা আমাদিগের স্বপ্নেরও অগোচর। এত দিন জানিতাম, বিদেশীয় জাতিই আমাদিগকে ঘৃণাস্পদ মনে করিয়া থাকে। কিন্তু আজ আমাদের সে সমুদয় বিশ্বাসের মূলোৎপাটিত হইল। আজ আমরা বুঝিলাম, যে বাঙ্গালি সেই বাঙ্গালিই রহিয়াছে। যে বাঙ্গালি নিয়ত পরপাদুকা সম্মানের সহিত মস্তকে বহন করিত, আজও সে তাহাই করিতেছে। যে বাঙ্গালি চিরকাল ভারতভূমির নামে কলঙ্ক রেখা অর্পণ করিয়াছে, আবার সেই জাগ্রত হইতেছে। অধিক কি সেই বাঙ্গালি, সেই স্বদেশ স্বজাতির কলঙ্ক বাঙ্গালী, সেই অন্তঃসার-বিহীন পশুপ্রকৃতি বাঙ্গালি, আজ ভারতভূমির পূর্ব্বতন মহিমায় অনাস্থাবান হইয়াছে। অথবা বাঙ্গালির পক্ষে ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যে কোন দিন উন্নতির অতি সঙ্কীর্ণ ফলও উপভোগে সমর্থ হয় নাই, যে চির দিন পরহস্তে ভোজন করিল, পরের উন্নতিতে আপনাকে উচ্চ মনে করিল, আজ সে ব্রিটিশ প্রসাদে এ, বি, সি, ডির দুই কলম জানিয়াই যে এরূপ অবস্থাপন্ন হইবে, ইহা অসম্ভাবিত নহে। হা মাত ভারতভূমি, অবশেষে তোমার অদৃষ্টে এই ছিল! যাহা লইয়া ইউরোপীয় মনীষিবর্গ তোমার গৌরব করিয়া থাকেন, আজ তোমার পাপিষ্ঠ নরাধম সন্তান সেই উন্নতিতেও সন্দিগ্ধচিত্ত হইতেছে। অহো বিধাতঃ, তোমার কি অপার মহিমা।

এক্ষণে প্রায় দৃষ্ট হয়, যদি কেহ ইংরেজী কিম্বা অপর কোন ভাষা হইতে কোন বিষয় অনুবাদ করিয়া বাঙ্গলায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে চতুর্দ্দিক হইতে নানা লোকে এবং সমালোচকগণ, অনুবাদ অনুবাদ বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে আমরা অনিষ্ট ভিন্ন কিছুমাত্র লাভ দেখিতেছি না।

বঙ্গভাষার এই বাল্যাবস্থা, এই সময় সকল প্রকার লেখাই প্রকাশিত হইয়া যাহাতে ভাষার পুষ্টি সাধন করে, তদ্বিষয়ে সাধারণের সমবেত চেষ্টা অতীব প্রয়োজনীয়। যিনি চিন্তাশীল, আপনার ভাব-সমুদ্র-মন্থন করিয়া অপূর্ব্ব সুধা উৎপাদন করিবেন; যিনি দশ জন হইতে সংগ্রহ করিয়া একটি মত প্রকাশ করিতে পারেন, করিবেন; যাঁহার নিজের ভাণ্ডারে কিছু সঞ্চিত নাই, তিনি অন্য হইতে গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন করুন; তাহাতে ভাষার অনিষ্ট না হইয়া বরং শ্রীবৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। প্রায় প্রত্যেক ভাষাই বাল্যাবস্থায় এইরূপ হইয়া থাকে। ইংরেজী ভাষাজ্ঞ জানেন, তাহাতে গ্রীক, লাটিন, করাসী প্রভৃতি হইতে কত অনুবাদিত হইয়া ভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছে। কেবল গ্রীক্ লাটিন কেন, যে কোন ভাষায় ইংরেজেরা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এইরূপে ভারতীয় অনেক গ্রন্থও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের ভাষায় যে সকল শব্দ নাই, যত্নপূর্ব্বক তাহা অন্য ভাষা হইতে গ্রহণ করিতেও তাঁহারা সবিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। আমরা বাস্তবিক অপদার্থ, নতুবা কেন এমন সাধারণ হিতকর কার্য্যেও অপরের বাধা জন্মাইতে যাইব? কেন স্বদেশ-বিদ্বেষী হইয়া পর-পদ-লেহন করিব? কেন আমাদিগের কার্য্যকলাপ কেবল বক্তৃতা ও টেবলোপরি চপেটাঘাত মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে? কেন বড় ধাতুর লোক বলিয়া উপহাসিত হইব? যদি ভিন্ন দেশীয় ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয়, তাহা হইলে দেশের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। বস্তুতঃ অনুবাদের কত দূর উপকারিতা, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। অনুবাদের কি গুণ, তাহা আমরা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যদি সর উইলিয়ম্ জোন্স ইংরেজী ভাষায় শকুন্তলার অনুবাদ না করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের

মাতৃভাষা সংস্কৃত এত দিনে অনন্ত-কাল-সাগরে বিলীন হইতেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা তাহা দ্বারা কত দূর উপকৃত হইয়াছি, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারিতেছেন। অতএব বাঙ্গালা ভাষায় যে কেহ অনুবাদ করেন, তাহাতে বাধা না দিয়া বরং উৎসাহ প্রদান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যিনি প্রতিবন্ধকতা জন্মান, তিনি ভাষার কিছু না কিছু অনিষ্ট অবশ্যই করিয়া থাকেন। এমন একটি বিষয় হইতে পারে, যাহা বিদেশীয় ভাষাজ্ঞ জানেন, দেশীয়গণ অবগত নহেন, সে স্থলে অনুবাদ কত দূর উপকারী, বলিয়া ব্যাখ্যা করা সুকঠিন। আমাদের স্মরণ আছে, বঙ্গীয় কোন লেখক অপর এক জনকে বলিয়াছিলেন যে, "কেহ করাসী রাষ্ট্রবিপ্লব লিখিতেছেন কেন? মহারাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রবিপ্লব কি এতই অকিঞ্চিৎকর যে কেহই তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না? মিলের জীবন চরিত অপেক্ষা কপিল ও কণাদের চরিত্র স্বদেশীয়দিগের পক্ষে অধিকতর উপকারী। আমরা ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যিনি মহারাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রবিপ্লব কি কপিল ও কনাদের জীবনবৃত্ত অবগত নহেনা অথচ করাসী রাষ্ট্রবিপ্লব কি মিলের জীবনচরিত্র অবগত আছেন, তিনি বিদেশীয় ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরিজ্ঞানার্থ উহা লিখিলে ক্ষতি কি? যাঁহারা বিদেশীয় ভাষা অবগত নহেন, তাঁহাদিগের নিকট উহা নিরতিশয় উপাদেয় বলিয়া বোধ হইবে এবং আমাদিগের ক্ষুদ্র অন্তঃকরণে ইহাই প্রতিভাত হয়, যে যদি সমগ্র করাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইত, তাহা হইলে উহা একখানা অত্যুৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ হইত। যিনি মহারাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র-বিপ্লব কি কপিল কণাদের জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারেন, করিবেন। তাহার জন্য অন্যের উৎসাহ ভঙ্গ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু হায়! আমরা এমনই দুর্ভাগ্য যে, স্বদে-

বীরগণের জীবনবৃত্ত, অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী, অলৌকিক কীর্ত্তি-কলাপ, এমন কি তাঁহাদিগের নাম মাত্রও অবগত হইতেছি না, অথচ যাঁহারা আমাদিগের বহুসহস্র যোজন ব্যবধানে বসিয়া কোন স্মরণীয় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিবরণ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ বলিতেও কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এক জন বিদ্যালয়ের ছাত্রকে ফ্রান্সের রাজধানী কি জিজ্ঞাসা করিলে অনায়াসে উত্তর করিবে, কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন রাজধানীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে অনেককেই গলদঘর্ম্মকলেবর হইতে হয়, কেহ ইংলণ্ডীয় হেনরী, জর্জ্জ, জেমস্ প্রভৃতি নৃপতিগণের বংশাবলী পর্য্যায়ক্রমে অনর্গল বর্ণনা করিতে পারিবে, কিন্তু তাহার নিজের পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলেই হতবুদ্ধি হইয়া থাকে। হা মাতঃ ভারতভূমি! অবশেষে তোমার এমন শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর।

বর্ত্তমান সময়ে সংবাদপত্র ও নাটকাদিতে ইংরেজী প্রভৃতি অনেক বিদেশীয় ও বিজাতীয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া ভাষাকে এক প্রকার খিচুরী পাক করিয়া তুলিয়াছে। অনেক মুসলমান অগণিত পারস্য শব্দ বাঙ্গলাভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে সময়ে সময়ে বাঙ্গলা ভাষাকে চিনিয়া উঠাই কষ্টকর হইয়া পড়ে। আমরা বলি, যে ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিবার শব্দের অপ্রতুল আছে, তাহাতে অন্য ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিলে ক্ষতি নাই; কিন্তু বাঙ্গলার জননী শব্দের কাঙ্গালিনী নহেন। যে কোন ভাব সংস্কৃত শব্দে অনায়াসে ব্যক্ত হইতে পারে। অতএব পরস্ব গ্রহণ না করিয়া বাঙ্গলাকে তাহার মাতা সংস্কৃতাভিসারিণী করিতে যত্ন করাই কর্ত্তব্য।

আধুনিক বঙ্গীয় লেখকগণের এই বিশেষ রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহারা বাঙ্গলায় প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া নানা বিভিন্ন প্রদেশীয় ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের (Allusion) অবতারণা করিয়া থাকেন।

কেহ কাব্যের, কেহ কেহ গ্রীসের, কেহ বা রোমের ইতিহাসের উপর বরাত দেন। কেহ বাঙ্গালার কালিদাস, সেক্‌পিয়র, মিল্‌টন্, বাল্মিকী, হোমর প্রভৃতির তুলনা করেন অথচ ঐ সকল ইতিহাস অথবা উক্ত গ্রন্থকারবর্গের সমস্ত গ্রন্থাবলী এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয় নাই। সুতরাং ঐ সকল ভাষানভিজ্ঞ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের ঈদৃশ প্রবন্ধ পাঠে যৎপরোনাস্তি কষ্ট ও বৃথা কালক্ষয় হইয়া থাকে। ফলতঃ প্রথমে ঐ সকল গ্রন্থ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া তাহার পর তৎসম্বন্ধে অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য, অন্ততঃ প্রারব্ধ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা উচিত। তাহা না হইলে তাঁহারা সাধারণ বাঙ্গলা পাঠকের কি উপকার করিলেন? ঈদৃশ প্রবন্ধপাঠ অথবা ইংরেজী প্রবন্ধপাঠ উভয়ই তুল্য ফলোপধায়ক। ফলতঃ এই দূষণীয় প্রথা বিদূরণের চেষ্টা সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়।

সম্প্রতি বঙ্গীয় পুরসুন্দরীগণও বাঙ্গলা সাহিত্য জগতে লেখিকারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ইহা দ্বারা সমাজের কত দূর উপকার হইবে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। কারণ শিক্ষিত না হইয়া কেহই কাহাকে শিক্ষা প্রদান করিতে পারে না, উল্লিখিতা রমণীগণ তাহাই করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় কতিপয় স্ত্রীভক্ত আবার উহার পোষকতা করিতেছেন। যদি তাঁহারা শিক্ষিতা হইয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্তা হইতেন, তাহা হইলে আমরা যার পর নাই সৌভাগ্য মনে করিতাম. অন্যথা কতকগুলি নীরস অকিঞ্চিৎকর পদ্য লিখিয়া লোকের কর্ণ জ্বালাতন করিলে লাভ কি?

বঙ্গীয় পাঠকগণের চিত্তচাঞ্চল্য এখনও সম্যক বিদূরীত হয় নাই। এখনও তাঁহারা গম্ভীর বিষয় অপেক্ষা কল্পনা-বিজৃম্ভিত জুগুপ্সিত নাটক এবং উপন্যাসেই সমধিক অনুরক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইতিহাস, জীবনচরিত, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয়

এখনও অনেকের তাদৃশ শ্রদ্ধা জন্মে নাই এবং এখনও সমাজের সে অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, যখন লোকে আমোদ অপেক্ষা গম্ভীর বিষয়ের অধিক আদর করিবে। ইহা বঙ্গভাষার বিশেষ দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। ঈদৃশ রুচি বৈষম্য-নিবন্ধন অস্মদ্দেশে নাটকাদির যেরূপ বহুল প্রচার হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। এই নাটকাদির অধিকাংশই কুরুচি ও কুভাবের উদ্দীপক। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-স্রোতে প্রক্ষালিত হইয়াও অদ্যাপি বঙ্গদেশের রুচি পরিমার্জ্জিত হয় নাই। যে পঙ্ক দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব সময়ে ইংলণ্ডীয়গণের হৃদয় মলিন করিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বাঙ্গালী-সমাজের মহিমা বিস্তার করিতেছে। ইহা বঙ্গদেশের অনল্প কলঙ্কের বিষয় সন্দেহ নহে। বঙ্গবাসি! চাহিয়া দেখ এই আমোদে তোমাদের দুরবস্থার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। এখনও সুষুপ্তাবস্থা হইতে গাত্রোত্থান করিবে না? এখনও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতে সচেষ্ট হইবে না?

ভারতের ইতিবৃত্তও অদ্যাপি বহুলাংশে অপরিজ্ঞাত রহিল, ভারতবাসিগণ নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করিয়াছেন, অথবা তাঁহাদিগের তদ্রূপ আশা ও উৎসাহ নাই। যদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ সানুকম্পা দৃষ্টি করেন, তাহা হইলে ভারতবাসিগণের আনন্দের সীমা থাকে ন, তাঁহারা অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠেন, স্বহস্তে কিছুই করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন না, পরানুগৃহীত-লাভেই সাতিশয় আকিঞ্চন প্রকাশ করিয়া থাকেন। সমগ্র ভারতবাসিগণের কথা কি বলিব? কেবল বঙ্গদেশেই ইহার যথেষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। বঙ্গবাসিগণ অদ্যাপি মোহ-নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন, সর্ব্বদা গল্প এবং নীচ আলাপেই সময় যাপন করিতেছেন, যাহা কিছু লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছেন, কেবল চাকুরীর জন্য ; যদি কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে

হয়, সে কেবল কল্পনা-বিজৃম্ভিত নাটক এবং উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহাতে দেশের মঙ্গল হয়, আপনার ও স্বদেশীয়গণের উন্নতি হয়, তৎপ্রতি অধিকাংশ লোকই অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন; অদ্যাপি দেশের অধিকাংশ লোক বিদ্যার উপকারিতা সম্যক অনুভব করিতে পারিল না। যে দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কত দিনে তাহার পুনরুন্নতি সংসাধিত হইবে, তাহা চিন্তা করাও একান্ত কঠিন ব্যাপার। হে ভারতবাসিগণ! আর কত কাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদ-শয্যায় শয়ান থাকিবে? সর্ব্বদা সচেষ্ট হইয়া যাহাতে দুঃখিনী ভারত-মাতার উপকার হয়, তৎপ্রতি মনোনিবেশ কর। পৌরাণিক বৃত্তান্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও।

ফলতঃ বলিতে নিতান্ত দুঃখ হইতেছে, ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া ভারতের যত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, বঙ্গ-ভাষায় আজও তদ্রূপ অথবা তাহার অর্দ্ধাংশের সদৃশ এক খানা ইতি-হাসও প্রকটিত হইল না। যদিও ইউরোপীয় গণের ইতিহাসে নানাবিধ ভ্রমপ্রমাদ পরিদৃষ্ট হউক, তথাপি তাঁহারা যে বিশেষ আয়াস সহকারে ভারতের ইতিবৃত্ত সংকলন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। যদি কোন ভারতবাসী তাহার শতাংশের একাংশ পরিশ্রম স্বীকার করি-য়াও এক খানা ভারতেতিবৃত্ত সংকলন করিতেন, তাহাও যাহা শত সহস্র যোজন ব্যবধানে বসিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা শত গুণে উৎকৃষ্ট হইত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আশ্চর্য্য! ইউরো-পীয়গণ সাত সমুদ্রের পারে বসিয়া শুদ্ধ কৌতূহল নিবারণোদ্দেশে আমাদিগের বিবরণ সংগ্রহ করিতে যেরূপ অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন, আমরা তাহার শতাংশের একাংশ করিতেও অভিলাষী নহি। ইহা ভারতবাসিগণের কলঙ্কের বিষয়; অপার কলঙ্ক। অতঃপর আমরা ভরসা করি, বিজ্ঞ মহাত্মা-

গণ সচেষ্ট হইয়া স্বদেশের পুরাবৃত্ত সঙ্কলনপূর্ব্বক এই কলঙ্ক অপসারিত করিবেন। বাস্তবিক বিদেশীয় উইলসন, এলফিনিষ্টোন হুইলার, ইলিয়াট, জেমস মিল, অর্ম, গ্রে প্রভৃতি ইতিহাসকারগণ ভারতের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতে কত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ এইজন্য সমস্ত জীবন পর্য্যন্ত কাটাইয়াছেন। বঙ্গভাষায় তদ্রূপ একখানা গ্রন্থও নাই; ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। যাহাতে বঙ্গ-ভাষায় এতদ্রূপ একখানা উপাদেয় বৃহদায়তন, সারগর্ভ, পৌরাণিক বৃত্তান্ত-সবলিত, প্রকৃত ইতিহাস প্রকটিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গবাসিগণ মনোযোগী হইলে অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। অনেকে হয়ত বলিবেন, গ্রন্থ প্রস্তুত করিলে ক্রেতা কোথায়? তৎস্থলে আমরা ইহাই পরামর্শ দিই যে প্রথমতঃ কোন ইতিহাস পুস্তকাকারে প্রকাশ না করিয়া কোন সাময়িক পত্রে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। অবশেষে গ্রাহক-দিগের আগ্রহাতিশয় দেখিলে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে ক্ষতি নাই। সহসা বৃহৎ গ্রন্থের মূল্য অবশ্যই অধিক হইবে। কিন্তু এক-কালে এত মূল্য দিয়া এখনও বঙ্গদেশে কেহ তদ্রূপ বাঙ্গালা গ্রন্থ ক্রয় করিবে কি না সন্দেহ; কারণ এখনও বঙ্গীয় সাধারণের তদ্রূপ অবস্থা উপস্থিত হয় নাই। এরূপ স্থলে খণ্ডাকারে প্রকাশ করাই যুক্তি-সিদ্ধ। ফলতঃ যাহাতে ভারতের একখানা যথার্থ বৃহদায়তন পুরাবৃত্ত পাওয়া যাইতে পারে, তৎপ্রতি কৃতবিদ্যগণের দৃষ্টি নিক্ষেপ একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি একণে ভারতের এক অতি ক্ষুদ্র কথার প্রমাণের নিমিত্তও আমাদিগকে মার্শম্যান প্রভৃতি ইংরেজী সামান্য ইতিহাসকারগণের শরণাপন্ন হইতে হয় এবং তাঁহারা যাহার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়।

দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রকৃত পুরাবৃত্ত পাওয়া যেরূপ দুর্ঘট, ভারতবর্ষীয়গণের জীবন চরিত সংগ্রহ করা তদপেক্ষাও কষ্ট সাধ্য।

লোকবিখ্যাত দেশীয় জনগণের উৎকৃষ্ট জীবনবৃত্ত নাই বলিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে অস্মদ্দেশে প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে জীবন চরিত সংগ্রহ প্রথা প্রচলিতরূপ ছিল না। আর্য্যগণ, আধ্যাত্মিক তত্ত্বরসেই সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন, এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর মায়াময় অকিঞ্চিৎকর অসার অশ্রদ্ধেয় জীবনের মহিমা কীর্ত্তন তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না, ইহাতে কত দূর অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। ভারতের কত অমূল্য ধন এতদভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। যাহা হউক, এক্ষণও চেষ্টা করিলে অনেক জীবনী রক্ষিত হইতে পারে। আমরা বিজ্ঞ গ্রন্থকার মহোদয়গণকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে এই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়টিতে বিশেষরূপ মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রী— দাস।

ধর্ম্ম, নীতি, সভ্যতা।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

দর্শনবিদ্ ডেকার্টের মত আমরা বিগত বারে কতক বলিয়াছি। ডেকার্টের যুক্তি কেবলমাত্র বিশ্বাসভিত্তির উপরে সংন্যস্ত। তিনি বলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস মনে উদয় হয়; অতএব ঈশ্বর আছেন। ইহাঁর মতে মনের ধারণীয় বস্তুমাত্রেই সৎ এবং তদস্তিত্ব স্বীকার্য্য। আমরা মনোবেগ ও বিশ্বাস লইয়া যে কথা বলিয়াছি, তদ্দ্বারা পাঠকগণ বিচার করিবেন, এই কথা কত দূর সারবান।

মনপদার্থের কোন আকার অথবা অবয়ব নাই। মানবশরীরে মনপদার্থ নামধেয় যে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, তাহা নহে। শারীর

তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মীমাংসা করিয়াছেন, মনপদার্থের অস্তিত্ব শারীর পদার্থের ক্রিয়াজনিত ফল হইতে। চাক্ষুস স্নায়ু ও অন্যান্য সংজ্ঞা স্নায়ু দ্বারা বহির্বিষয়ের কতকগুলি প্রতিবিম্ব মস্তিকে নীত হয়। সেই স্নায়ুনীত ফলের কার্য্যই মনপদার্থ। সুতরাং মনপদার্থ স্নায়ুসঞ্চালন ও তৎক্রিয়ার ফল। স্নায়ুজনিত ক্রিয়া মাত্রকেই চেতনা নামে অভিধেয় করা যাইতে পারে। মুহূর্ত্ত মধ্যে শত শত বিষয়ে, আমরা চেতনা (Consciousness) উপলব্ধি করিয়া থাকি। স্নায়ুশক্তিজনিত ফলব্যতীত চেতনার অন্য কোন কারণ অবধারণ করা যায় না। হাক্‌-সলি বলেন, অন্যান্য অজ্ঞাত প্রাকৃতিক শক্তির ন্যায় এটিও দুর্জ্ঞের। বহিঃপদার্থের দ্বারা উত্তেজিত স্নায়বিক বিধানের ক্রিয়া-ফলব্যতীত আর কিছু চেতনার মূল বলিয়া উপলব্ধি হয় না। সমুদয় চেতনার অবস্থাকে ডেকার্ট চিন্তা (Thought) নামে অভিধেয় করেন। লক এবং বার্কলী এই অবস্থাকে [Ideas] নাম প্রদান করেন। হিউমের নিকট চেতনাকে এতদ্রূপ নাম প্রদান করা সমীচীন নহে। তিনি বলেন, সমুদয় চেতনার অবস্থাকে বহির্বোধ (perception) নাম প্রদান করাই যুক্তি সঙ্গত (২)। হিউম চেতনার অবস্থাকে যে নামে অভিধেয় করেন, তাহা মূল বিষয় ও শব্দশাস্ত্র উভয়ের অনু-মোদিত সন্দেহ নাই।

মনপদার্থ তবে কিসের ফল? হিউম বলেন, আমরা যাহাকে মন-পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করি, তাহা বিভিন্ন বহির্বোধের সমষ্টি মাত্র। এই গুলি কতকগুলি সম্বন্ধের দ্বারা একীকৃত; এবং চদিচ অবধা ভাবে

---

(২) To all these states of our consciousness, Descartes gave the name of thoughts, while Locke and Berkeley termed them Ideas. Hume says, this is very improper use ; and he employs another name "perceptions."

রক্ষিত; তথাপি ইহাতে পরিচ্ছন্ন ভাব বিদ্যমান আছে। (৩)। হামিল্ট-নের মতে আমরা তাহাকেই মন বলিয়া বিবেচনা করি, যাহা চিন্তা করে, ইচ্ছা করে ইত্যাদি। (৪)। এবারক্রম্বি বলেন, মন আমাদিগের শরী-রের সেই অংশ, যাহা চিন্তা করে, ইচ্ছা করে, স্মৃতিবোধ করে, যুক্তি বোধ করে; মনপদার্থের এইরূপ ক্রিয়া ব্যতীত আমরা কিছুই জানি না। আমরা মনপদার্থের ক্রিয়া মাত্রই জানিতে পারি। (৫)। এই সকল বাক্যের মূলেই সত্য নিহিত আছে, সন্দেহ নাই। শরীরের যে অংশ চিন্তা করিতে পারে, অনুভব করিতে পারে, তাহাই অবশ্য মন। আবার এই মন বিভিন্ন বহির্ব্বোধের সমষ্টি মাত্র। বহির্বিষয় ও বহির্ব্বোধ না থাকিলে মনের চিন্তা করিবার বিষয় কি? মনের কার্য্যশীলতা বহির্ব্বোধ হইতেই হইয়া থাকে। মনের কার্য্যের বিষয় বহির্ব্বোধ (Perceptions)। এই বাক্যানুসারে ডেকার্টের মত শিথিলবন্ধন হইতেছে। ঈশ্বরের কোন বহির্ব্বোধ (Perceptions) এ জগতে উপলব্ধি হয় না। অনেকে বলিতে পারেন, কার্য্য কারণ সম্বন্ধরূপ বহির্ব্বোধ দ্বারা ঈশ্বরের ভাব স্বতঃই মনোমধ্যে সমুদিত হয়। আমরা পরে কার্য্য কারণ সম্বন্ধে ও বৈজ্ঞানিক তর্ক প্রণালীর দ্বারা এই কথার মীমাংসা করিব। ঈশ্বর আছেন

---

(৩) What we call a mind is nothing but a heap or collection of different perceptions, united together by certain relations, and sup posed, though falsely, to be endowed with a perfect simplicity and indentity.

(৪) What we feel as the mind is si mply that which perceivs, thinks, wills &

Hamilton's Metaphysics, Lecture *IX*.

(৫) The mind is that part of our being which thinks and wills remembers and reasons. We know nothing of it, except these func-tions. Abercrombie's Intellectual power.

বলিয়া জগতের কোন কিছু প্রমাণ করিতে পারে না। বহির্বিষয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন ভাব নাই। সুতরাং এ বিষয়ের বহির্বোধ হওয়াও অসম্ভব। তবে ঈশ্বর আছেন বলিয়া যে অনেকে বিশ্বাস করেন, তাহার কারণ কি? আমরা পূর্ব্বে আধিদৈবিকাদি ভয় ও তদানুষঙ্গিক ফল জড়জগতের প্রত্যেক ক্ষমতাশীল শক্তির মূলান্বেষণে অনভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপ অনভিজ্ঞতার ফলে যে পিপাসা মানবহৃদয় অস্থির করিয়াছিল, ইহাও সেই পিপাসারূপ বহির্বোধ হইতে উৎপন্ন। একমাত্র আশা—পরলোকে দীর্ঘ জীবন ও সুখ ভোগের আশায় মানবমনকে অস্থির করে কেন? এ জগতের সুখ ভিন্ন সুখ নাই; তবুও মনে হয়, মরিলেও যেন সুখী হই। আশার কখনই খর্ব্বতা নাই। একেশ্বরের সহিত সম্মিলনজনিত যে সুখাশায় কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের অনেকে যার পর নাই লোলুপ হইয়া পড়েন, তাহার আর একটি কারণ মানব হৃদয়ের অবিশ্রান্ত প্রবাহশীল আশা জনিত অন্তর্বোধ বলিলে কোন হানি করে না। আশা যেমন মানবহৃদয়ে স্বাভাবিক, এ অন্তর্বোধটি আবার সেরূপ নহে। অন্তর্বোধ পর্য্যবেক্ষণ ও সামান্যতঃ দৃষ্টি (analogy) সাপেক্ষ।

অতএব প্রতিপন্ন হইল, বিশ্বাসের স্বাভাবিকত্ব ও তৎপ্রতিরূপ কার্য্যের অবশ্যম্ভাবিতা সর্ব্বথা ভ্রমপরিশূন্য ও স্বীকার্য্য নহে। কোন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র মধ্যে গভীর রজনীতে অগ্নিশিখা দেখিলে অশিক্ষিত লোকেরা মনে করিয়া থাকে——তাহাদিগের বিশ্বাস হয়,—ভূতে আগুন জ্বালিয়াছে। এই বিশ্বাসের প্রতিরূপ কার্য্য (Object) কি সত্য সমন্বিত? বোধ হয় কখনই না। প্রকৃতি-পর্য্যালোচনা, বিশেষতঃ ভৌতিক ও রাসায়নিক বিদ্যার প্রাধান্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে কি এই ভাব স্পষ্টতঃ ও বিশেষরূপে সমুদিত হয়? শিক্ষিত হৃদয়ে এরূপ বিশ্বাসের আবির্ভাব অসম্ভব। এক স্থানে যাহা যথার্থ হয়, অন্য স্থানে আবার

যাহা ভ্রমসংকুল হয়; অসভ্যাবস্থায় যাহা সমীচীন, বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সভ্যাবস্থায় আবার যাহা ভ্রমসংকুল বলিয়া মনে হয়, এমন বিশ্বাসের গভীরত্ব কোথায়?

কোন কিছুর অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে, প্রমাণের প্রয়োজন-শীলতা অবশ্যম্ভাবী।—তবে প্রমাণ কাহাকে বলে ও তৎপরিণাম ফলই বা কি, তদালোচনা করা, তর্ক শাস্ত্রের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। যদ্দ্বারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়, তাহাই প্রমাণ সংজ্ঞায় অভিধেয়। কোন এক বস্তুকে প্রমাণ করিতে হইলে, প্রমাণান্তরের প্রয়োজন করে। প্রমাণান্তর গ্রহণ করতঃ এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, যাহাকে প্রমাণ করিতে অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। প্রমাণান্তর প্রয়োগ-বিশিষ্ট যে প্রমাণকে আবার সপ্রমাণ করিতে কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞায় নির্দ্দেশিত এবং এইরূপ প্রমাণের পরিণাম ফল বা স্বতঃসিদ্ধকে আদিসত্য (First truth) নাম দেওয়া যাইতে পারে। ১। বিজ্ঞান-বিদ্‌পণ্ডিত মণ্ডলী, ভৌতিক আণবিক সংশ্লেষণকে বিশ্লিষ্ট করতঃ এতদ্রূপ সত্যে উপনীত হয়েন।

গ্রহ, উপগ্রহ, বৃক্ষ, লতা পরিশোভিত পরিদৃশ্যমান জগতের আদি কারণ কি, এই গভীর প্রশ্ন লইয়া অতি পুরা কাল হইতে নানা বাক্‌বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রতিভার বিস্ফুরণের ফল হইতে, জাতি বিশেষে, সম্প্রদায় বিশেষে, বিবিধ

১। ****in every process of reasoning, we proceed by founding one step upon another, which has gone before it; and when we trace such a process backwards, we must arrive at certain truths which are recognised as fundamental, requiring no proof and admitting none - These are called first truths-

Abercrombies Intellectual power - Sec: *II*

মত অবলোকিত হয়। সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা, আমাদিগের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্থান পায় না। এই আদি কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া, প্রায় সকল জাতিই একরূপ প্রমাণকেই অবলম্বন করিয়াছেন মাত্র।—সেই প্রমাণ-প্রণালী কার্য্য কারণ সম্বন্ধ। সকলেই বলিয়া থাকেন, জগতী-তলস্থ ঘটনাপুঞ্জ, কার্য্যকারণ-সূত্রে গ্রথিত।——কার্য্য-কারণ ব্যতীত কোন কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। সর্ব্ববাদি-সম্মত কার্য্যকারণ সম্বন্ধরূপ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, আমরা দেখিব, এই বিশাল জগতের আদি সত্য অথবা আদি কারণ কি? সাধারণের সংস্কার এই, যেখানেই কার্য্য দেখিবে, সেইখানেই কারণ আছে, কারণ অভাবে কার্য্যের অস্তিত্ব সর্ব্বথা অসম্ভব। বস্তুতঃ আমরা প্রত্যহই প্রতিনিয়ত দেখিয়া থাকি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট হইতে, বিশাল সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত, সকলেই একটি না একটি কারণের অনুবর্ত্তী। মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মণ্ডলীর মন-গড়া তর্কানুসারে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিচার করিতে আমরা অগ্রসর হইব না। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী যেরূপ গবেষণায় নৈসর্গিক আণবিক সংশ্লেষণকে (Natural phenomena) বিশ্লেষণ করতঃ, তর্কশাস্ত্রের মূলভিত্তি পরিস্থাপন—বিজ্ঞানের আশাতীত উৎকর্ষ—জগতের আদি কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, আমরা সেইরূপ গবেষণা ও তর্ক প্রণালীর অনুধাবন করিব।

কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ লইয়া সাধারণে যে বিচার করিয়া থাকেন, তাহার মূলে একটি প্রধান দোষ পরিলক্ষিত হয়।—সেই দোষ, সকল কার্য্যকেই একরূপ কারণসূত্রে গ্রথিত করা। কার্য্যকারণে, এবম্ভূত তর্কবিতর্কে, অনেকেই বহুদর্শনের অপলাপ করিয়াছেন। পদার্থপুঞ্জের কারণ নির্ণয় করিতে যাইলে, প্রথমতঃ পদার্থপুঞ্জের ধর্ম্ম-শীলতা সম্বন্ধে বিশদ বিচার আবশ্যক। কোন্ পদার্থটি কোন্ ধর্ম্মশীল, তন্নির্ণয় না করিয়া, পদার্থ মাত্রকেই এক শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করা সমীচীন

নহে। বিজ্ঞানবিদ্, বিশ্লেষণ দ্বারা পদার্থসমূহের দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্ম স্থিরীকৃত করিয়াছেন। আমরাও প্রকৃতিতে সচাচর, পদার্থপুঞ্জের উপাদানের [element] দুইরূপ ধর্ম্ম-শীলতা অবলোকন করিয়া থাকি।—একটিতে পরিবর্ত্তন আছে; অন্যটি অপরিবর্ত্তনশীল। বস্তুদর্শন দ্বারা একরূপ উপাদানের পরিবর্ত্তনশীলতা নির্ণীত হয়; বস্তুদর্শন আবার অন্যরূপ উপাদানের পরিবর্ত্তনশীলতা আছে কি না, তন্নির্ণয়ে অসমর্থ। বস্তুতঃ আমাদিগের জ্ঞান-বুদ্ধি-গোচরে, এবম্প্রকার অপরিবর্ত্তনশীল উপাদানের কোনরূপ কার্য্য-শীলতা-ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি না।

পরিবর্ত্তনশীল উপাদানসমূহের যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আমরা সচরাচর অবলোকন করিয়া থাকি, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিবর্ত্তনশীলতার ফল। আমরা দেখিয়া থাকি, জলরূপ কার্য্যের কারণ, অম্লজান ও জলজান নামক বাষ্পদ্বয়ের সম্মিলন। এতদ্দৃষ্টে আমরা যদি বলি, জল-কার্য্যের কারণ, অম্লজান ও জলজান বাষ্পদ্বয়, তাহা হইলে বস্তুতঃ যথার্থ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ হয় না। এই স্থলে যদি এইরূপ বলা যায় যে, জলরূপ কার্য্যের কারণ উক্ত বাষ্পের সম্মিলন বটে, কিন্তু উক্ত দুই বাষ্পের সম্মিলনজাত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনশীলতাই জলের মুখ্য কারণ।——প্রাগুক্ত বাষ্পদ্বয়ের সম্মিলনজাত পরিবর্ত্তনশীলতা ব্যতীত বাষ্পদ্বয় স্বয়ং জলের কারণ নহে। রসায়নবিদ্ পণ্ডিত মণ্ডলী পরীক্ষা দ্বারা, হয় ত অনেক স্থলেই জলজান ও অম্লজান বাষ্পের আবিষ্কার করণে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ইহাদিগের পরিবর্ত্তনশীলতা ব্যতীত জলরূপ কার্য্য দেখিতে পাইবেন না।

অম্লজান ও জলজানের সংশ্লেষণ ও তজ্জাত আশ্চর্য্য রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে জলের অস্তিত্ব। আমরা আবার বলি, জলরূপ কার্য্য, অম্ল-জান ও জলজান রূপ কারণের পূর্ব্ববর্ত্তী রাসায়নিক সম্মিলন একটি ঘটনামাত্র।—জলরূপে পরিণত হওয়া তাহার কার্য্য (Object) নহে।

প্রাগুক্ত বাষ্পদ্বয়ের সংযোগে জলের উৎপত্তি হইল। এতদ্দ্বারা আমরা এই অর্থ প্রকাশ করি, যখন কোন দ্রব্য অস্তিত্বে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়, তখন অস্তিত্বে পরিণত হইতে আরম্ভ হওয়াই কারণের কার্য্য। কিন্তু অস্তিত্বে পরিণত হইতে আরম্ভ হওয়া একটি ঘটনাব্যতীত কার্য্য নহে। ২। তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রত্যেক কার্য্যেরই তৎ উপাদান-গত একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম আছে। এই উপাদান-গত পদার্থ বস্তুতঃ কি, এবং কিরূপেই বা অস্তিত্বে পরিণত হইল, তাহা আমরা জানি না। এবম্ভূত পদার্থ অবশ্য অপরিবর্ত্তনে ধর্ম্মাক্রান্ত সংজ্ঞায় অভিধেয় হইতে পারে। সামান্যতঃ দৃষ্টি [analogy] অথবা বহুদর্শন দ্বারাও এতদবধারণ করা যায় না। এই অপরিবর্ত্তন ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ কিরূপে অস্তিত্বে পরিণত হইল, সে পথে পরিভ্রমণ করা বুদ্ধির অসাধ্য। ইহার কারণ অনুসন্ধায়ী হওয়া, কেবলমাত্র কাল্পনিক পথে নিরর্থক সময় অপব্যয় করা। প্রতিভার ন্যূনাতিরেক বিস্ফুরণে অযথা প্রাধান্য সংস্থাপন অবশ্যম্ভাবী। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ লইয়া যে প্রাধান্য একাল পর্য্যন্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহা কেবল পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের ধর্ম্ম হইতে। কেবলমাত্র পরিবর্ত্তনশীল পদার্থপুঞ্জকে মূলসূত্র মনে করিয়া কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিচার করিলে জগতের আদি সত্য অথবা আদিকারণ নির্ণয় করা যায় না। সচরাচর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ লইয়া আমরা যে বিচারে প্রবৃত্ত হই, তাহাতেও তৎউপাদানগত অপরিবর্ত্তনশীল পদার্থ পরিণামে আসিয়া পড়ে।—এবং ইহা পরিণাম বিচারের বিষয় হয়। কল্পনা সহায়ে কেবলমাত্র স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অন্য প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা অপরিবর্ত্তনশীল পদার্থের পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব।

২। When they begin to exist, their beginning is the effect of a cause. But their beginning to exist is not an object, it is an event.
Mill's three essays. argument for a first cause.

অপরিবর্ত্তনশীল পদার্থ যেটি সেটি প্রমাণান্তর গ্রহণ দ্বারা, সকল সময়ে সকলদেশে স্বকীয় ধর্ম্মে স্থিরতর থাকিবে। তবে, প্রমাণান্তর গ্রহণ দ্বারা যাহার অবস্থান্তর নাই, বহুদর্শন যাহার ঊর্দ্ধদেশ দেখিতে পায় না——তদূর্দ্ধে বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা না করিয়া,—সেই পদার্থকে অপরিবর্ত্তনশীল পদার্থ—আদি সত্য——অথবা আদি কারণ বলায় তর্কশাস্ত্রে কলঙ্ক পড়িয়া যায় না। বরং তাহাই সর্ব্ববাদী সম্মত হইবার কথাও বটে।

আমরা বিশ্লেষণ দ্বারা যে অপরিবর্ত্তনশীল পদার্থ দেখাইলাম, তাহাকে যে কোন সংজ্ঞায়, কেহ নাম করণ করিতে পারেন বটে। মূল কথা সেই ধর্ম্মটি ঠিক থাকিলেই হইল।

(ক্রমশঃ)

শিবের ষষ্ঠীবাটা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হতভাগার সুখের মত; নবগর্ভবতীর যৌবনের মত, মাতালের হাতের মদের মত, পঞ্চমীর রাত সাঁৎকরে শেষ হ'য়ে গেল। মহাদেবের অদৃষ্টেই হউক আর ডাক্তারের হাত যশেই হউক, অল্প ক্ষণের মধ্যেই শিবানীর শিরঃপীড়ার উপশম হ'ল; সেই পুর্ব্বেকার মলিন মুখে আবার হাসির রেখা দেখা দিলে—যেন বর্ষাকালের কাদা জলে ফট্‌কিরির গুঁড়া পড়লো।

বেলা দশটার মধ্যে মেনকা জামাই আশীর্ব্বাদ ক'রে জল খাবেন, অতএব সকাল সকাল হিমালয়ে পেঁছান চাই, সুতরাং পুর্ব্ব দিক ফরসা

হবার সঙ্গে সঙ্গেই শিবদুর্গা স্বগণ সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে কৈলাস হ'তে রওনা হলেন।

পুরুষ গুলো বড় নির্ব্বোধ—সংসারের মারপ্যাঁচ বড় একটা বোঝে না, ফের ফাঁপরের বড় একটা ধার ধারে না. তাই মেয়েরা তাদের নাক-ফোঁড়া বলদের মত যে দিকে ইচ্ছা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হ'ল—তিনি একবার উইলসনের সারকাসে সাহেবদের গা ঘেঁসে বসবেন, অমনি রামবল্লভকে কাছে ডেকে তাঁর সেই ভুবনমোহন চোখের যাদুমাখা চাহনি নিক্ষেপ কর্ত্তে লাগলেন, সেই তরল হিঙ্গুল মণ্ডিত অধর প্রান্তে সেই চৌদ্দভুবন বিজয়ী হাসির লহরি আরম্ভ করিলেন, শেষে বসরাই গোলাপের দোলনের মত খোপা-বাঁধা ছোট মাতাটি ধীরে ধীরে দোলা'তে দোলা'তে আপনার অভীষ্ট প্রকাশ করলেন, অম্নি আছি-গো-তারিণী-ঋণী-তব-পায় গোছের রামধন তলপি তাগাদা বেঁধে মাতায়-পাগড়ি ওটি সেজে প্রস্তুত হলেন। আমরা বাঙ্গালী, নিরীহ, দুর্ব্বল, ভীক, কাপুরুষ—পেটের দায়ে বিদেশে যাতায়াত কর্ত্তে হয় বটে,কিন্তু আপনাদের কাচা কোঁচা নিয়েই আপনারা ব্যতিব্যস্ত হই। সেকেলে বস্তাপচা বুড়াদের কথা ছেড়ে দেও, অনেক অনেক কালেজ-আউট "নিউ-এডিসনের" (New edition) টাটকা বাবুরাও রেলগাড়ীতে চ'ড়ে সাহেব দেখে কাপড় ভিজিয়ে ফেলেন, কিন্তু তথাপি গৃহ-মণিবের হুকুম তামিল করবার জন্য আমাদিগকে প্রায়ই মনসা মাতায় ক'রে হাটের দ্বারে নাস্তা নাবুদ হতে হয়। আমরা সভা করি, দেশ স্বাধীন করি, লম্বা চাওড়া কথায় সিংহনাদে বক্তৃতা করি, কিন্তু ঘরের ভিতর আমরা বোকার বোকা, গোলামের গোলাম, হুকুম বরদারের হুকুম বরদার। তাই বলি পুরুষ গুলা বড় নির্ব্বোধ।

হে সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বারাধ্যা, সর্ব্বময়ী বঙ্গবধূগণ! তোমাদের অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত, চারুচরণকমলের ভারে আমাদের হৃদয় জর্জ্জরিত,

আর ঈষৎ ভারেই বোধ হয় বিদীর্ণ হ'বে, এখনও এ অভাগাদের প্রতি একবার কৃপানয়নে দৃষ্টিপাত কর। তোমাদের উপর আমাদের লৌকিক বা পারত্রিক যে টুকু অধিকার আছে, তাহা আমরা খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে সজ্ঞানে পরিত্যাগ করছি, তোমরা তোমাদের উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি সম্বরণ কর। আমরা আমাদের স্বামিগিরি কাজের ইস্তফা প্রদান করছি—সকল কাজের ইস্তফা আছে, আমাদের এ কাজের ইস্তফা কি মঞ্জুর হবে না।

স্বগণ সমভিব্যাহারে শিবদুর্গা হিমালয়ে এসে উপস্থিত হলেন; মেনকা রাণী ভোরে উঠে স্নান করে, চুল গুলি এলিয়ে দিয়ে একখানি বারাণসি সাড়ী পড়ে ঘুর ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় শিবের শিঙ্গা বেজে উঠলো। উমার আগমনে হিমালয়পুরি আহ্লাদে নেচে উঠ্‌লো, বসন্তের প্রাতঃকালের মত চারিদিক যেন হাসতে লাগল, আঁধার ভবনে যেন ইলেক্‌ট্রিক লাইট (বৈদ্যুতিক আলোক) জ্বেলে দিলে। চারিদিকে হুলুধ্বনি পড়তে লাগল, নানাবিধ মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে মঙ্গলা অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন; পরেরছেলে জামাই বাবু জুওলজিকেল গার্ডেনের জাম্বুবানের মত বাহির বাটীর বৈঠকখানার রেল গুণ্‌তে লাগ-লেন। পূর্ব্ব জন্মে অনেক গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করলে তবে বড় মানুষের বাড়ীর জামাইবাবু হওয়া যায়। বড় মানুষের জামাই আর সাপুড়ের ঝাঁপি ভরা পাহাড়ে বোড়া, দুইই সমান। শালা শালাজের উচ্ছিষ্ট আহার ক'রে লম্বোদরের ভরে সর্ব্বদাই অচল হয়ে তাঁরা ঝাঁপির ভিতর প'ড়ে থাকেন, দর্শক এলেই—"এই আমাদের জামাই বাবু"—বলে এক এক বার তাঁদের বার করা হয়। বাড়ীর কুকুর বিড়ালগুলিও আপন ইচ্ছামত বাড়ীর সকল স্থানেই গতায়াত করে, কিন্তু এ বাবুদের হুকুম না পেলে অন্দরে প্রবেশ করবার অধিকার নাই। শালা বাবুদের ভয়ে জড়সড়, শ্বশুরের তাড়ায় তাড়ায় প্রাণটি ছকড়া নকড়া। বেচারি জামাই যেন সিঁদ

মোহানার চোর, মুখখানি সদাই ছোট ছোট, যেন কত অপরাধে অপরাধী।'

শিব বাহির বাড়ী বসে গাঁজা ফুঁকতে লাগলেন, আর সিদ্ধির ঝোঁকে ঝিম্‌কিনি ঝিম্‌কিনি নেশায় টল্‌তে লাগলেন। এ দিকে উমাকে নিয়ে মেনকারাণী আমোদের স্রোতে গা ঢেলে দিলেন। মেয়েকে কাছে বসিয়ে মেনকা রাণী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—"উমা, এবার কি কিছু নুতন গহনা করেছিস্ মা ?" গহনাই স্ত্রীলোকের বুকের রক্ত, জপের মালা, ইষ্টমন্ত্র। স্বামী সংসার-সাগরে দুঃখের তুফানে প'রে হাবু ডুবু খাচ্ছেন, উদরান্নের সংস্থানের জন্যে তাঁর মাতার ঘাম পায়ে পড়্‌ছে৷ তবুও আদ্যাশক্তি শ্রীমতী রাধার হংসগ্রীবায় ডায়মন্‌কাটা চিক ছড়াটি চাই। স্ত্রী যে স্বামীর শুভ কামনা করেন, সে কেবল ঐ গহনার জন্য। তুমি সংসারের দুঃখের পথে ঘুরে ঘুরে শরীরটি চা'লভাজা করে ঘরে এলে, যার জন্যে এই ভূতের বোঝা বয়ে বেরাচ্ছ সেই প্রাণপ্রতীমা প্রণয়িণীর হাসি মুখখানি দেখে তোমার সকল দুঃখ দূর হলো, মনে মনে ভাবলে আমার পরিবার আমা ভিন্ন বুঝি আর কিছুই জানে না,—আমি মলে বুঝি ও সহমরণে যাবে। কিন্তু তোমার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণীর নজর তোমার দগ্ধ মুখের উপর নাই; তোমার কালিপড়া চখের উপর নাই; ফোস্কা-পড়া পায়ের উপর নাই। তুমি ঘরে প্রবেশ করবার সময়ে তোমার পকেটে যে শ্রবণতৃপ্তিকর রজতবাদ্য বেজে উঠেছিল, কৃপাময়ী সেই দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, মনে মনে কেবল বলছেন—"এবারের এই টাকায় আমি সোনার চন্দ্রহার গড়াব।" পুরুষগুলা নিতান্ত পাগল, তাই মনে করে স্ত্রীর ভাল বাসা নিঃস্বার্থ; কিন্তু আমরা হলফ করে বলতে পারি—আমাদের মাতার একটি একটি চুল পাকে আর গৃহিণীরা ভাবেন—"ওর তো দিন ফুরাল; আমি এখন যা কিছু আদায় কত্তে পারি।

মেনকার প্রশ্ন শুনে পার্ব্বতী বলে উঠ্‌লেন—"পোড়া কপাল! যে উড়নচড়ে হাভ-হাবাতের হাতে পড়েছি, তা আবার গহনা পরবো! একটি পয়সার কখন মুখ দেক্তে পাই? যা হয় কেবল বার ভূতে উড়ায়।" উমার খেদের কথাটি শুনে মেনকা রাণীর প্রাণটা মুচ্‌ড়ে গেল, তিনি একটু দুঃখিত ভাবে বল্‌লেন—"মা সে তো বড় অন্যায়, লোকে কথায় বলে—"আত্ম রেখে ধর্ম্ম, তার পর পিতৃলোকের কর্ম্ম—" তা মা অত লোক জন বাড়ী রাখবার দরকার কি? শিবকে বুঝিয়ে বলতে পারিস নে—"

এই মন্ত্রণার বলেই দেবর ননদ সমুদ্র পার হয়ে যান, শাশুড়ী অনাহারে ভবলীলা সাঙ্গ করেন, সর্ব্বময়ী আর তাঁর স্বজনবর্গই সর্ব্বে সর্ব্বা হয়ে ক্ষীর-সর-নবনীতে সন্তরণ কর্ত্তে থাকেন। অনেক কথা বার্ত্তার পর শেষে উমা বল্‌লেন—"মা শুনেছি, ঢাকায় নাকি বড় চমৎকার সোনার কাণ তৈয়ার হয়, তুমি যদি আমায় একজোড়া আনিয়ে দেও।" প্রশ্নটি শুনে মেনকা কিছু অস্থিত পঞ্চে পড়লেন, মুখের উপর মেয়েকে না বলতেও পারেন না, অথচ মেয়ে পরঘরী—পরকে এত টাকার জিনিস কি বলে দিতে স্বীকার করেন! পাঠক মহাশয়েরা বিস্মিত হবেন না, অনুসন্ধান করিলে প্রতি গৃহেই দেক্তে পাবেন, কন্যাসন্তানের উপর লোকের স্নেহটা মুখেতেই কিছু বাড়া বাড়ী। শ্বশুর শাশুড়ি মুখে বলেন———"জামাই ঘরের ছেলে," কিন্তু ছেলে আর জামাইয়ে কাজে আসমান জমিন প্রভেদ। পুত্রবধূর হীরার সীঁতি, মতির মালার জন্য অকাতরে অর্থ বাহির হবে, কিন্তু কন্যার হাতের একটি জোড়া বেলোয়ারের চুড়ি কিনে দিতে হলে দশবার ইতস্তত: কর্ত্তে হয়। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে মেনকা বললেন—"মা, এদের এখন সময় তত ভাল নয়, সমস্ত তালুকে বরফ পড়ে অনেক লোকসান হয়েছে, বিশেষতঃ মৈনাকের বউকে অনেক টাকার অলঙ্কার কিনে দিতে হয়েছে—আমার বংশধর

মৈনাক প্রাতঃবাক্যে বেঁচে থাক, তার বউটিকে প্রাণ ভরে সাজাতে ইচ্ছা করে—তা মা এক কাজ কর, শিব যেন কাণের দাম এঁদের কাছে দেন—তা জামাই ঘরের ছেলে, তাঁর কাছে টাকা নিতে আর লজ্জা কি—“তা হলেই এঁরা আনিয়ে দেবেন।”——বটেই তো “জামাই ঘরের ছেলে”—ফেল কড়ি, মাখ তেল, তুমি কি আমার পর ?

মেনকা উমাকে নিয়ে এইরূপ পাঁচ গল্পে মত্ত আছেন, কলমের ফজলি আমের চাকলা কেটে কেটে উমাকে পেট চিরে খাওয়াচ্ছেন—ও দিকে ঘরের ছেলে জামাই বাহির বাটীতে বে-খবর। বেলা দেক্তে দেক্তে ১২টা বেজে গেল, তবুও শিবের ডাক প'ল না, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শিব হাড় গোড় ভাঙ্গা “দ” টি হয়ে ভেকার মত বসে রইলেন। উমাকে যখন ফজলি আম আহার করাচ্ছিলেন, তখন মেনকা জামাই আশীর্ব্বাদের কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়ে নিজেও দুই এক চাকলা বদনরন্ধ্রে নিক্ষেপ করছিলেন। স্ত্রীলোকের আহার—যেন সোন নদীর বাঁধ, যেন রেক্তার গাথুনি, যেন গ্রহণের শ্রাদ্ধ। গল্পের সঙ্গে মজিয়ে মজিয়ে টিমা চালে যখন এই কৃশোদরীরা আহারে বসেন, তখন বোধ হয় আবার বুঝি রক্তবীজের রক্ত পান জন্য এঁরা পৃথিবী জুড়ে জিহ্বা বিস্তার করলেন।

ভূতেরা পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলো দেখে বীরভদ্র শিবের কাছে এসে হাত জোড় ক'রে বললে——“প্রভু, অনুমতি করেন তো আমরা বাজারে গিয়ে আহারাদির উদ্যোগ করি, ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য হয় না।” শিবও নিজে চটেছিলেন—বল্লেন—“এখনই—আমিও এ নরাধমের বাড়ী জলগ্রহণ করবো না; শ্বশুর বাড়ী জামাইয়ের যত আদর তা আজ বিলক্ষণ বুঝলাম, আমি আজ হতে এই নিয়ম করলাম—যে জামাই ত্রিরাত্রি শ্বশুরগৃহে বাস করবে, সে জীবনান্তে বহরমপুরের একা গাড়ীর ঘোড়া হবে।

তাঁরা রাগের ভরে গাত্রোত্থান করবেন,এমন সময়ে একটি চাকরাণী এসে বল্লে—"জামাই বাবুকে বাড়ীর ভিতর ডাকছেন।" শিব আর ডাকলেও যাবেন না বলে স্থির করে বসেছিলেন, কিন্তু চাকরাণীকে দেখেই তার সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতীর সেই রাগরক্ত মুখখানি মনে হ'ল, সেই স্ফুরিতাধরের সকোপ কম্পন মনে হ'ল, সেই বাঁকা মুখের চোখা কথা মনে হ'ল। তিনি এখন রাগ ক'রে গেলে যে পরিণামে পার্ব্বতীর হাতে তাঁর প্রাণটি ওষ্ঠাগত হবে, তাও মনে হ'ল—সুতরাং মনের রাগ মনেই চেপে মুখে বাক্যব্যয়টি না করে নিতান্ত সুশীল বালকের ন্যায় বাড়ীর ভিতর চল্লেন।

"অধিক লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়,"—কথাটি মন্দ নয়,অনেক সময় এর দোহাই দেওয়া আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। আমরা এই ষষ্ঠিবাটা আরম্ভ করে বড়ই বিপদে পড়েছি, সকল কথাগুলি খুঁটিয়ে বলতে ইচ্ছাও হয়, কিন্তু বলতে গেলেও পুঁথি বেড়ে যায়—আবার পাছে পাঠকগণ একঘেয়ে কথায় বিরক্ত হন, সে ভয়ও হয়। সুতরাং সাত পাঁচ ভেবে আমরা শীঘ্র শীঘ্রই এ বিষয়টির উপসংহার করলাম, ইচ্ছা থাকলেও শিবের শালী শালাজ নিয়ে হাস্য পরিহাস লিখে উঠতে পারলাম না—পাঠক মহাশয়েরা, এ অধীনকে মাপ করবেন।

দেক্তে দেক্তে বাটা দেবার সময় উপস্থিত হ'ল, মেনকা যে পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আহার করেছিলেন, সেটি লুকিয়ে লুকিয়ে হয়েছিল, সুতরাং শিবের বাবাও টের পান নি। হিমালয় অনেক যত্ন করে সুন্দরবনে ফরমাইস দিয়ে চিতাবাঘের একখানি হাতে বহরে লম্বা ছাল আনিয়ে রেখেছিলেন, শিব পিঁড়িতে গিয়ে বসলেই মেনকা সেইখানি হাতে করে এনে বল্লেন—"বাবা শিবু, এই নূতন ছালখানি পর।"

শিব নূতন বাঘছাল পরে পিঁড়িতে বসলে, মেনকা ডালা সাজিয়ে জামাই আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে আরম্ভ করলেন। আশীর্ব্বাদ করবার জন্য

মেনকা শিবের মাতায় যেমন ধান দুর্ব্বা দিতে গিয়েছেন, অমি হাতখানি পিছলে গিয়ে জটার মধ্যে ঢুকে পড়লো। তিনি তাড়াতাড়ি হাত বার করবার চেষ্টা করছেন, ও দিকে জটাবিহারিণী গঙ্গাস্থিত একটি প্রকাণ্ড কুম্ভীরে হাতের পোঁছা পর্য্যন্ত গিলে বসে রইল।——টানাটানি ছেচড়া ছেচড়ি, কিছুতেই হাত ওঠে না। মেনকা কত কাঁদলেন, কত কাটলেন, কত ওলাবিবির পূজা মানলেন, তবুও যেখানকার হাত সেই খানেই রইল। শেষে নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে শিবকে বলতে লাগ্‌লেনঃ—

"বাবা শিবু আর কেন? ঢের হয়েছে। আমরা যেমন মনের ভাব পেটে চেপে, মুখে বলতাম জামাই ঘরের ছেলে, যেমন তোমায় নিয়ে কখনও সাধ আহ্লাদ করি নি, আজ তার সম্পূর্ণ ফল ফলেছে। এখন হাত ছাড়িয়ে দেও, বাবা। আজ হতে তুমি আর আমার মৈনাক, দুজনকেই সমান ভাববো, আজ হতে আমার কাছে জামাই সত্য সত্যই ঘরের ছেলে হবে।"

তখন শিব অর্দ্ধদৃষ্টিতে একবার মেনকার মুখ পানে চেয়ে একটু মুচকে হাঁসলেন, অমনি হাত খুলে গেল। তার পর দুদিন জামাই আদরে কাটিয়ে তিন দিনের দিন হরপার্ব্বতী কৈলাস যাত্রা করলেনঃ—কারণ শিব পূর্ব্বেই শাপ দিয়ে ফেলেছিলেন, ত্রিরাত্রি শ্বশুর গৃহে বাস ক'রলেই বহরমপুরের একাগাড়ির ঘোড়া হতে হবে।

শ্রীগ——

মূল্য-প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়
সাং আম্বুলিয়া ... ... ৩৲

" " চন্দ্রমোহন মজুমদার
সাং বঙ্গপুর ... ... ৩৲

" " ভবানীচরণ ভট্ট
সাং ভালুকা ... ... ৩৲

মাসিক সমালোচক ও খেয়াল সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় রচনা, প্রবন্ধাদি, সমালোচ্য গ্রন্থাদি ও কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

ব্যারিং বা ইন্সফিসিয়েণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না। যাঁহারা পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উত্তর লেখা যাইবে না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা ডাকের টিকিটে মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় /০ আনা কমিসন দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট যেন কেহ না পাঠান। মনি আর্ডরে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর ডাকঘরে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন, তাঁহাদিগের নিকট পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪॥ টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে, সুতরাং বিনা মূল্যে দেওয়া এক কালে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্র ৵৹ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

উকীলাবাদ, বহরমপুর। }
১২৮৯ সাল, ১৫ই বৈশাখ। } শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী।

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল

সংযোজিত।

—:*:—

(সর্ব্ব শাস্ত্র বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচক।)

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১২৮৯ সাল, আশ্বিন ও কার্ত্তিক।

বিষয়।　　পৃষ্ঠা।

বহরমপুর,—অরুণোদয় যন্ত্রে
শ্রীভগবানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা। দুই সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

মূল্য-প্রাপ্তি।

শ্রীমতী মহারানী স্বর্ণময়ী
সাং কাশীমবাজার ... ৩

„ মহারানী শরৎসুন্দরী দেবী
সাং পুটিয়া ... ... ৩।৶

শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়
সাং আমুলিয়া ১

„ „ ধনপৎ সিংহ রায় বাহাদুর
সাং আজিমগঞ্জ ১৷৹

„ „ দয়ালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সাং খাগড়া ৩

„ „ বিপীনবেহারি বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং মাহিগঞ্জ ৩

„ „ সূর্য্যকুমার পণ্ডিত
সাং বহরমপুর ৩

„ „ তারিণীপ্রসাদ রায়
সাং খাগড়া ১৷৹

„ „ রামলাল লাহিড়ী
সাং সৈদাবাদ ৩

„ „ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সাং গোরাবাজার ... ১৷৹

„ „ গিরিশনারায়ণ রায়
সাং লালগোলা ৩

„ „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সাং গোরাবাজার ... ৩

শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়
সাং বাঘডাঙ্গা ... ১৷৹

„ „ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ও
সাং লালগোলা ... ৩

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদার
সাং রংপুর ৩

„ „ জগৎচন্দ্র মোক্তার
সাং লালবাগ ... ১

„ „ বৈকুণ্ঠনাথ সেন
সাং সৈদাবাদ ... ৩

„ „ মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়
সাং বহরমপুর ... ৩

„ „ পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং বহরমপুর ৩

„ „ কেদারনাথ সাণ্ড্যাল
সাং খাগড়া ৩

„ „ গোপীমোহন মজুমদার
সাং ইছলামপুর ... ৩

„ „ হরিশচন্দ্র ঘোষ
সাং পাঁচথোপা ... ২

„ „ প্যারিমোহন সরকার
সাং অরেঙ্গাবাদ ৩

„ „ রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং বহরমপুর ৩

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল।

ছোট বৌর ঝাঁপি।

গরলে অমৃত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আশায় নিরাশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যোগেশচন্দ্র দুইবার কথা কহিবার প্রয়াস পাইলেন, দুই বারই বিফল হইলেন, হৃদয়-প্রতিঘাতে তাঁহার স্বাভাবিক দৃঢ় স্বর কণ্ঠে জড়িয়া গেল, ওষ্ঠ কম্পিত হইল, শেষে তৃতীয় বারের প্রয়াসে বলিলেন—"অনেক ক্ষণ আসিয়াছি, তোমার নিকট এই এলাম।"

জয়াবতী যাঁহার জন্য পাগল হইয়াছিলেন, তাঁহাকে পাইলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিলেন, তাঁহার হৃদয় তড়িৎগতিতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে ঘুরিয়া গেল, পর ক্ষণেই তাহাতে সেই কি-জানি-কি-এক-প্রকার ভাব প্রবেশ করিল, তাঁহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল, সেই ঘন পক্ষ্ম-শোভিত পাতা দুখানি পড়িয়া গেল, জয়াবতী নীরবে রোদন করিতে

লাগিলেন। হরি, হরি, তাঁহার হৃদয়-নাথের নিকট হৃদয় প্রকাশ, প্রেম আলাপন, চির মিলন প্রার্থনা, সমস্তই বলা হইল। এক দণ্ড পূর্ব্বে যে জয়াবতী কত কথা মনে করিতেছিলেন, দেখা হইলে এক একটি করিয়া বলিব বলিয়া কত কথা মনের ভাঁজে ভাঁজে গাঁথিয়া রাখিতেছিলেন, সে জয়াবতীর মুখে এখন আর কথাটি নাই; তাঁহার একণকার ভাব দেখিলে তিনি যে কখন কথা কহিয়াছিলেন, কি কথা কহিতে জানেন, এমন বোধও হয় না। জয়াবতী তাঁহার মনের সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলেন, মন ভুলিয়া গেলেন, আপনাকে ভুলিয়া গেলেন, জগৎ সংসার ভুলিলেন, কেবল সেই হৃদয়ের শোণিত, অস্থির মজ্জা, জীবনের জীবন, ভালবাসার ধনকে জগৎময় দেখিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পরে জয়াবতীর চক্ষের পাতা দুখানি উঠিল, মেঘ-মুক্ত চন্দ্র-রশ্মির প্রতিবিম্বে পার্শ্বস্থ মেঘরাশির ন্যায় সে চক্ষু হাসিল, তিনি অর্দ্ধ-মুকুলিত-নয়নে যোগেশের মুখ প্রতি চাহিয়া ঘাটের আলিসার দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিলেন—"বস।"

আজ যোগেশচন্দ্র জয়াবতীর নিকট বিশেষ কার্য্যে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, তিনি এত দিন সরলা জয়াবতীর সহিত প্রতারণা করিয়া আসিতেছেন, ধূর্ত্ত ব্যাধের ন্যায় তিনি কপট বংশী-বাদন-চ্ছলে সেই মুগ্ধা হরিণীকে এক এক পা করিয়া চির দুঃখ-জালে নিক্ষেপ করিতেছেন, তিনি সেই দেবদুর্লভ, অমৃতপয়োধি, স্নেহাপ্লুত বিমল অমূল্য হৃদয় লোষ্ট্রবৎ উপেক্ষা করিতেছেন। তিনি দুর্দ্দান্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রফুল্ল কমল দলন করিতেছেন; নিষ্ঠুর কীটের ন্যায় সুকোমল গোলাপ-দাম ছিন্ন করিতেছেন, পাষণ্ডের ন্যায় নবীনা লতা অনলে নিক্ষেপ করিতেছেন। এত দিন জয়া তাঁহাকে কোন বিষয় খুলিয়া বলেন নাই, সুতরাং যোগেশও আপন হৃদয় জানাইবার অবসর পান নাই; তথাপি যোগেশ ভাবিতেছিলেন, তিনি তো প্রথম অঙ্কুরেই

জয়াবতীর প্রেমভাব বুঝিয়াছিলেন,কেন তিনি তখন সেই প্রণয়াঙ্কুরিতা লতার মুখ অন্যদিকে ফিরাইলেন না,কেন তাহাকে তাঁহার সেই দেহবৃক্ষে জড়াইতে দিলেন? যোগেশ, মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে-ছিলেন, —আমি শঠ, প্রতারক, প্রবঞ্চক, বিশ্বাস-ঘাতক; আমি যে হৃদয় জয়াবতীকে কখনই দিতে পারিব না, সেই হৃদয়ের প্রলোভন দেখাইয়া, সেই হৃদয়ের প্রকৃত ভাব প্রচ্ছন্ন করিয়া, জয়াবতীর সেই অমূল্য হৃদয় রত্ন ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়া বসিয়াছি।—আমি পাষণ্ড, পামর, দুরাচার, তস্কর। এখনও সময় আছে, এখনও জয়াবতী আমায় কিছুই প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিব, আপন দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ করিব, সেই সরল হৃদয়ের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিব। কিন্তু সে কোমল অন্তর পেষিত হইবে, সে ললিতা লতার মস্তকে বজ্রাঘাত হইবে, সে বিপুল আশার মূলোচ্ছেদ হইবে; তাহা বলিয়া উপায় কি? আজ হইলেও হইবে, দশ দিবস পরে হই-লেও হইবে, এই দুরূহ সর্ব্বনাশকর ভ্রান্তি যত শীঘ্র সংশোধন হয়, ততই মঙ্গল।”

এই রূপ ভাব হৃদয়ে করিয়া যোগেশচন্দ্র সরোবর তীরে জয়াবতীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই আলিসার উপর উপবেশন করিলেন। যোগেশ একবার জয়ার মুখ পানে চাহিলেন, দেখি-লেন তাহাতে মধুরতা,আনন্দ,আশা, ভালবাসা দীপ্তি পাইতেছে, অমনি তাঁহার হৃদয় ভেদ হইয়া গেল, আর সে মুখ প্রতি চাহিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়ন পড়িয়া গেল। অনেক ক্ষণের পর যোগেশচন্দ্র বলি-লেন—“জয়াবতী, রাত্রি হইয়াছে এখনও একাটি এইখানে আছ?” জয়াবতীর নয়ন দুইটি যোগেশের মুখের উপর ঘুরিতে লাগিল, যোগে-শের কথার উত্তর দিতে হইবে, তিনি মনে মনে বুঝিলেন, কিন্তু উত্তরের কথা খুঁজিয়া পাইলেন না, শোষে তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটি কথা

নির্গত হইল, কি বলিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন না।— যোগেশচন্দ্র শুনিলেন—"তুমি যে এই সময়ে এই স্থানে বসিতে ভাল বাসিতেন," যোগেশের হৃদয়বহ্নিতে ঘৃতাহুতি হইল, এই সুধার সরোবরে গরল ঢালিতে আসিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল; তিনি দক্ষিণ হস্তে আপন বক্ষস্থল চাপিয়া ধরিয়া অনেক ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে ভগ্নকণ্ঠে শ্বাসমিশ্রিত স্বরে ডাকিলেন;——

"জয়াবতি"

জয়া নমিত বদনখানি উঠাইলেন—যেন বসন্ত-বাতাসে নম্রমুখ গোলাপ পুষ্প ধীরে ধীরে উর্দ্ধমুখ হইল—আপনার নীলাব্জ নয়ন দুটি যোগেশের মুখের প্রতি স্থির করিয়া নীরব উত্তর প্রদান করিলেন।

যোগেশ বলিতে লাগিলেন;—"জয়া, আমি তোমায় একটি গুরুতর বিষয় বলিতে আসিয়াছি, কথাটি আমাদের উভয়ের পক্ষে কাহারই সুখকর নহে, বলিতে আমার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে, শুনিলে তোমারও হৃদয়ে কষ্ট হইবে; কিন্তু আপাততঃ কষ্টের ভয়ে কর্ত্তব্য হইতে পরাঙ্মুখ হওয়া মনুষ্যের কার্য্য নহে—"। যোগেশচন্দ্র এইখানে এক বার থামিয়া জয়াবতীর মুখ প্রতি চাহিলেন; দেখিলেন, বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে ভয়-বিকাশকবদনে তিনি তাঁহার মুখ প্রতি চাহিয়া আছেন।

যোগেশ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"জয়া, আমরা বাল্যকালে এক মায়ের অঙ্কে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, একত্র ভোজন করিয়াছি, একত্র এক শয্যায় শয়ন করিয়াছি। কৈশোরে এক আনন্দে উভয়ে হাসিয়াছি, এক অভাবে উভয়ে কাঁদিয়াছি, উভয়ে এক সঙ্গে ক্রীড়া করিয়াছি। তখন আমাদের কি সুখের দিনই গিয়াছিল। নির্ম্মল সরল চিত্তে যাহা দেখিতাম, তাহাতেই আনন্দ পাইতাম; যাহা করিতাম, তাহাই ভাল লাগিত; যেখানে যাইতাম, সেইখানেই মন মজিয়া যাইত। ক্রমে ক্রমে আমরা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি। এই বিষম বিপদসংকুল, প্রলোভন-

পূর্ণ যৌবনে পড়িয়া আমরা পূর্ব্বেকার সে নির্ব্বিকার, নির্ম্মল সুখপূর্ণ চিত্ত হারাইয়াছি, এখন আমাদের অন্তরে নবনব ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছে—কিন্তু এ সমস্ত ভাব বিষাদপূর্ণ—”।

যোগেশচন্দ্র এই স্থানে আর একবার থামিয়া জয়াবতীর মুখ প্রতি চাহিলেন। অভাগিনী জয়ার নিশ্বাস অবরুদ্ধ প্রায় হইয়াছে; ইহা যোগেশের প্রথম প্রেমপরিচয় ভাবিয়া লজ্জায় তাঁহার মুখ ছাইয়া গিয়াছে, বক্ষস্থল গুর্ গুর্ করিতেছে। তাঁহার দৃষ্টি এক্ষণে আর পূর্ব্বেকার ন্যায় যোগেশের মুখের প্রতি নাই, তাহা ধরাবদ্ধ হইয়াছে। জয়া গঠিত প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন।

যোগেশ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“জয়া, দিদি, তুমি আমার সহোদরা অপেক্ষা অধিক। তোমার সুখের জন্য আমি সব করিতে পারি, উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ সাগরে ডুবিতে পারি, জ্বলন্ত হুতাশনে প্রবেশ করিতে পারি, কালফণীর বিষপূর্ণ বদন চুম্বন করিতে পারি। জয়া, আমার এত কথা বলিবার কারণ আছে আমি তোমার নিকট একটি গুরুতর বিষয়ে অপরাধী হইয়া আছি।”

যোগেশ নিশ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিবার জন্য থামিলেন। মুগ্ধা জয়া এখনও ভাবিলেন “যোগেশের প্রেম পরিচয়ের এই প্রথম সূত্রপাত।”

যোগেশচন্দ্র আবার আরম্ভ করিলেন;——“দিদি, তুমি আমার শৈশব-সহচরী, আমি বাল্যকালাবধি যখন যে কার্য্য করিয়াছি, তাহা সমস্তই তুমি জান, তোমার অজ্ঞাতে বা বিনা অভিপ্রায়ে আমি কোন কর্ম্ম করি নাই, কিন্তু সংপ্রতি একটি গুরুতর কার্য্য আমি তোমার অমতে ও অজ্ঞাতে করিয়া ফেলিয়াছি—জয়াবতি, আমি আপন হৃদয় পরের হস্তে বিলাইয়া দিয়াছি—”

জয়াবতী আপনাকে এই “পর” করিয়া লইলেন, তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র ভাব এককালে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার হৃদয়-

কবাটে সবলে আঘাত করিতে লাগিল, কি ভাবিয়া বলিতে পারি না, তিনি একবার অপাঙ্গে অর্দ্ধদৃষ্টিতে যোগেশচন্দ্রের মুখখানি দেখিয়া লইলেন।

যোগেশ পুনরায় আরম্ভ করিলেন;—"জয়াবতি, আমি তোমার অভিমতি লইবার অবকাশও পাই নাই। আমি এখান হইতে অক্ষত হৃদয় লইয়াই কাঞ্চন পাহাড়ীতে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে শৈলমূলে এক দিন অকস্মাৎ একটি অমূল্য রত্ন দেখিতে পাইলাম, যত্নে সেই রত্নটি গৃহে আনিলাম, হৃদয়—"

যোগেশের মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল, তাঁহার কর্ণে অতি ক্ষীণ স্বরে—"নিষ্ঠুর" কথাটি প্রবেশ করিল এবং পর ক্ষণেই সংজ্ঞাশূন্য জয়াবতী তাঁহার অঙ্ক দেশে ঢলিয়া পড়িলেন। বাহু বিস্তার করিয়া যোগেশচন্দ্র সেই বৃন্তচ্যুত পতনোন্মুখ গোলাপকুসুম হৃদয়ে ধরিলেন। তিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত বহুকষ্টে হৃদয়বেগ সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় জয়াবতীর সেই পাণ্ডবর্ণ জ্যোতিহীন মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তিনি বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন।

ক্ষণেক পরে জয়াবতীর অধরদ্বয় ঈষৎ প্রস্ফুরিত হইল, চক্ষের পাতা দুখানি ঈষৎ উন্মুক্ত হইল; যোগেশচন্দ্র তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"দিদি, প্রাণের ভগিনী, জয়াবতী ওঠ, আমি তোমার সম্মুখে এই অন্ধ হৃদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করি। পৃথিবীতে এ অভাগার অদৃষ্ট জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, কেন তুমি সে প্রচণ্ড অনলরাশি স্পর্শ করিয়া নবীন জীবনে অকালে দগ্ধ হইলে?"

ধীরে ধীরে দুই হস্তে যোগেশের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, ধীরে ধীরে বদনখানি তুলিয়া, জয়াবতী একবার যোগেশের মুখখানি দেখিলেন এবং পর ক্ষণেই তাঁহার বক্ষস্থলে মস্তক রক্ষা করিয়া ক্ষীণস্বরে বলি-

লেন;—“যোগেশ, অবলার অপরাধ লইও না, আমার কাছে ক্ষণেক বস।”

অর্দ্ধ ঘণ্টাপরে জয়াবতী অতি মৃদুগতিতে পুষ্পোদ্যান হইতে গৃহে গমন করিয়া শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, যোগেশচন্দ্র চক্ষু মুছিতে মুছিতে বহির্বাটী-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সমস্ত রাত্রি যোগেশচন্দ্রের নিদ্রা হইল না। তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া, পুষ্পোদ্যানে পাদচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটি অন্তঃপুর-পরিচারিকা আসিয়া বলিল—“আপনাকে একবার বাড়ীর ভিতর ডাকিতেছেন।”

যোগেশচন্দ্র বুঝিলেন, জয়াবতীও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যান নাই। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তিনি যতই জয়াবতীর গৃহের নিকট হইতে লাগিলেন, তাঁহার অন্তর ততই বসিয়া যাইতে লাগিল, উরুদ্বয় কাঁপিল, নয়ন জলভারাকুল হইয়া আসিল। বিষণ্ণমুখে, ধীরগতিতে, এক এক পা করিয়া যোগেশ জয়াবতীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। জয়া একাকিনী পালঙ্কের উপর নতমস্তকে বসিয়া আছেন। যোগেশচন্দ্র গৃহ প্রবেশ করিবামাত্র তিনি মুখ তুলিলেন। যোগেশচন্দ্র সে মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কাতরস্বরে বলিলেন,—“সর্ব্বনাশ, জয়াবতি, করিয়াছ কি!” নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ক্ষীণ জ্যোতির ন্যায় কপোরহীন শ্বেত অধরে ক্ষীণ হাস্য প্রকটিত করিয়া জয়াবতী বলিলেন—“হৃদয় জয় করিয়াছি।”

যোগেশ জয়ার মুখের প্রতি সজল নয়ন দুটি স্থাপন করিলে জয়াবতী বলিলেন—“আমি যে কোন কালে তোমার প্রেম-প্রার্থী হইয়াছিলাম, সে কথা যেন তোমার অন্তরে স্থান না পায়; কেন না, আমি তোমার মন বিশেষ জানি, এ কথা তোমার মনে জাগ্রত থাকিলে তুমি চিরজীবন কখনই সুখী হইতে পারিবে না। আর একটি কথা, তোমাদের বিবাহের পূর্ব্বে সেই সৌভাগ্যবতীকে একবার দেখিব, তাহার

সহিত দুটি দুই কথা কহিব—”বলিতে বলিতে সেই পূর্ব্ববৎ ক্ষীণ হাস্য করিয়া বলিলেন—“যোগেশ, ভয় করিও না, আমি সপত্নী কলহ আরম্ভ করিব না—”।

যোগেশচন্দ্র একটিও কথা কহিতে পারিলেন না, নয়নজলে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

“কাঁদালে কাঁদিতে হয়”।

আমাদের গত পরিচ্ছেদ-বিবৃত ঘটনার পর প্রায় পক্ষান্ত হইয়া গিয়াছে। গ্যাট্রে মহারাজা জয়হরিচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে লৌহ কারখানা হইতে বিদূরিত হইয়াছে। কুটীল দিগম্বর ও গোবিন্দ দারোগার এ পর্য্যন্ত কোন সাড়া শব্দ নাই। সাঁওতাল রাজ্যে সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি পুনঃস্থাপনের চিহ্ন সর্ব্ব প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। যোগিনী মাঙ্গক মাঝির গৃহে কাঞ্চনমালাকে রক্ষা করিয়া তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইয়াছেন; সাঁওতালগণের বিষণ্ণ মুখে পুনরায় হাসি প্রকাশ হইয়াছে; সাঁওতাল কন্যাগণ পূর্ব্ববৎ পর্ব্বতপ্রদেশে মধুর স্বরলহরী তুলিয়া সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুঃখজলদ অন্তর্হিত হইল দেখিয়া মাঙ্গক মাঝি বহুকালের ইচ্ছাকার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়া বুদ্ধির হস্তে স্বরণীকে সম্প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বিবাহের সপ্তাহকাল পূর্ব্বাবধি সাঁওতাল পুরি আনন্দে ভাসমান। যুবক যুবতীগণ কখন পর্ব্বতের মূলে, কখন কন্দরে, কখন উপত্যকায়, কখন অধিত্যকায় নাচিতেছে, গায়িতেছে, প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে; আমোদের সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল, মাঙ্গকর বাড়ীতে যেন আনন্দের হাট বসিয়া গেল। বিবাহিত

দম্পতী, প্রণয়ি-যুগল দলে দলে হাত ধরাধরি করিয়া মাঙ্গকর বাড়ীতে উপস্থিত হইতেছে। বৃদ্ধ মাঙ্গক সকলকে মদিরাদানে অভ্যর্থনা করিতেছে, যুবকেরা আপনাপন প্রণয়িনীর মুখে মদিরাভাণ্ড তুলিয়া ধরিতেছে, যুবতীরা হাসিতে হাসিতে ভাণ্ড ঈষৎ চুম্বন করিয়া প্রণয়ীর হস্তে প্রদান করিতেছে, যুবকগণ উচ্ছিষ্ট প্রসাদ অমৃত-জ্ঞানে এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া প্রণয়িনীর মুখ চুম্বন করিতেছে। সরল সাঁওতাল-গণের সমস্ত কার্য্য সরলতাপূর্ণ, সভ্য সমাজে ঈদৃশ কার্য্য হইলে কত জনে কত প্রকার ভ্রূকুটি করিত, কত লোকে কত কথা বলিত, দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কলঙ্কের দামামা গম্ভীর-নির্ঘোষে নিনাদিত হইত, কিন্তু স্বভাবসন্তান সাঁওতালগণ নির্ব্বিকার, অকপট, সরলগতি।

বিবাহের পূর্ব্ব রজনীতে মাঙ্গকর বাটীর প্রাঙ্গণে মহা ধুম ধাম হইতেছে, বৃদ্ধেরা এক স্থানে মণ্ডলাকারে বসিয়া মাদল বাদন করিতেছে, প্রবীণা রমণীরা উচ্চকণ্ঠে সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিতেছে—যুবতীরা সেই তালে তালে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেছে। দূরে একটি নির্জ্জন স্থানে কাঞ্চনমালা বসিয়া আছেন, এই আনন্দ বাজারের মধ্যে থাকিয়াও অদ্য তাঁহার মুখখানি বিষাদপূর্ণ, হৃদয় ঘন চিন্তামেঘে আবৃত। তিনি একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছেন—"স্বরনী আমার কত আদরের, বোধ হয় আমার ছোট ভগিনী থাকিলে তাহাকে স্বরণীর অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতে পারিতাম না। কা'ল তাহার বিবাহ, তাহাতে আমার মনে তো আনন্দ হইবারই কথা, কিন্তু এ পোড়া মন থাকিয়া থাকিয়া এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে কেন?—যেন বোধ হইতেছে, শীঘ্রই এ আনন্দধামে অগ্নি লাগিবে, সুখের মূল শুকাইবে, স্বরণীর মনের সাধ মনেই মিশাইবে।" কাঞ্চনমালা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় যোগেশচন্দ্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হাসিতে

হাসিতে বলিলেন—"কাঞ্চনমালা, আর এক দিন সাঁওতাল এই-রূপ আনন্দ-লহরীতে ভাসিবে।"

সরলা কাঞ্চনমালা যোগেশের কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, কেবল মাত্র তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যোগেশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন—"যে দিন আমার জীবন সার্থক হইবে, এই হৃদয়ে কাঞ্চনলতা জড়াইয়া দিব, সেই দিন আবার সাঁওতাল পুরি এইরূপ সুখতরঙ্গে ভাসিতে থাকিবে।"

কথাটি শুনিয়া কাঞ্চনমালা ব্রীড়াসঙ্কুচিত-বদনে একটু মৃদু হাস্য করিলেন, এবং পরক্ষণেই একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"কেমন যে অদৃষ্ট, এত সুখেও সুখ পাইতেছি না। কি জানি কিসের জন্য, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, মনে নানা প্রকার অশুভ আশঙ্কা আপনাপনি উদয় হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন শীঘ্রই আবার কোন বিপদ উপস্থিত হইবে।

কাঞ্চনমালার প্রফুল্ল কর-পল্লব দুখানি অঞ্জলি মধ্যে রক্ষা করিয়া যোগেশচন্দ্র সাদরে মধুর-সম্ভাষণে বলিলেন—"আমার জীবন-সর্ব্বস্ব, আমার দেহে জীবন থাকিতে তোমার বিপদের আশঙ্কা? কাঞ্চনমালা পূর্ণ-হৃদয়ে ছল ছল চক্ষে বলিলেন—"আমি যে জন্ম-দুঃখিনী, চির হত ভাগিনী—"

হৃদয়বেগে কাঞ্চনমালা আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার বদনখানি যোগেশের বক্ষে ঢলিয়া পড়িল, যোগেশ কাঞ্চন মালার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া দুই হস্তে সন্তর্পণে সেই প্রফুল্ল কমলটি ধারণ করিলেন ও নিঃশব্দে অনিমেষ-লোচনে সেই মুখখানির চারু শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা এই ভাবে সুখের বিমল স্রোতে ভাসিতেছেন, বিপুল জগতে উভয়ের অস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই জানিতেছেন না, দেখিতেছেন

না, এমন সময় অপর এক জন তাঁহাদের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া গম্ভীর-স্বরে বলিল—"বিশ্বাস ঘাতক—যোগেশ—এ কি !!"

উভয়ে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় মস্তকোত্তলন করিয়া বিস্মিতনেত্রে দেখিলেন—পার্শ্বে—যোগিনী !!

যোগিনীকে দেখিবামাত্র কাঞ্চনমালা তাঁহার চরণ-প্রান্তে আছাড়িয়া পড়িলেন, যোগিনী তাঁহার মুখ প্রতি ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"হতভাগিনী, যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটাইয়াছিস্ !" পরক্ষণেই তিনি যোগেশের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"এস, নির্জ্জনে তোমার সহিত কথা আছে।"

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় যোগেশচন্দ্র নিঃশব্দে যোগিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যোগিনী গিরি-শিখরের একটি নির্জ্জন প্রদেশে উপস্থিত হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইলেন এবং যোগেশের মুখের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন।——

"যোগেশ, শপথ কর, যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার যথার্থ উত্তর দিবে।" স্থির ও গম্ভীর ভাবে যোগেশচন্দ্র বলিলেন ;—

"শপথের প্রয়োজন নাই, মিথ্যা বলা আমার স্বভাব নহে, বিশেষ আপনাকে মাতৃজ্ঞান করিয়া থাকি, যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, করুন, মিথ্যা উত্তরের আশঙ্কা করিবেন না।"

উত্তর শুনিয়া যোগিনীর অন্তর পূর্ব্বাপেক্ষা কোমল হইয়া আসিল, তিনি যোগেশের মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন ;—"বাবা, তোমাকেও তো আমি দেখিয়া পর্য্যন্ত পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া থাকি, কিন্তু—" বলিতে বলিতে যোগিনীর নয়ন জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতরস্বরে বলিলেন ;—"বাবা একটি কথা বলিয়া আমার হৃদয়ের ভার দূর কর—আমার কাঞ্চনমালাকে পবিত্র রাখিয়াছ কি না ?"

স্থির-গম্ভীর-স্বরে যোগেশচন্দ্র বলিলেন—"কাঞ্চনমালা যদি অপবিত্রা হন, তাহা হইলে জগতে সতী স্ত্রী নাই—তবে আমি কাঞ্চনমালার হৃদয় পাইয়াছি, আপনার হৃদয়ও অকপটে কাঞ্চনমালাকে দান করিয়াছি, কেবল আপনার অনুমতির জন্য আমরা এত দিন প্রতীক্ষা করিয়া আছি।" একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যোগিনী বলিলেন—" "বাবা, যোগেশ, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন——কিন্তু কাঞ্চনমালার আশা মন হইতে পরিত্যাগ কর।"

ক্ষুণ্ণমনে যোগেশ বলিলেন—"মা, আমার জীবন পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করুন, তাহা সহজে করিব, কিন্তু কাঞ্চনমালা পরিত্যাগ করা আমার সাধ্য নহে।"

স্থিরভাবে যোগিনী বলিলেন;—কাঞ্চনমালা তোমার হইতেই পারে না; যাহা কখন হইবার নহে, তাহার আশা করা বাতুলতা।"

যোগেশচন্দ্র বলিলেন—"কাঞ্চনমালা আমাকে তাঁহার বিমল হৃদয় দান করিয়াছেন।"

যোগিনী বলিলেন;—"কাঞ্চনমালা হৃদয় দান করিবার কে? কাঞ্চনমালার হৃদয় তাহার নহে, তাহার উপর তাহার ক্ষমতা কি?"

যোগেশচন্দ্র ক্ষণেক বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে স্থির-ভাবে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার অন্তর স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে ঘুরিয়া গেল। তিনি জড় জগতের সচেতন জগতের, এমন কি নিজের পর্য্যন্ত অস্তিত্ব বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল পৃথিবী তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া ছুটিতেছে। ক্ষণেক পরে প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি কতক বা যোগিনীকে উদ্দেশ করিয়া, কতক বা নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন—"না, না, তাও কি সম্ভব—প্রতারণা!—ছলনা!—সেই সরলচিত্তে—হইতেই পারে না—মা, বোধ হয়, আপনি আমার হৃদয় পরীক্ষা করিতেছেন——"

যোগিনী বলিলেন—"তবে শুন," এই বলিয়া তিনি যোগেশের কর্ণে কর্ণে কি একটি কথা বলিলেন, শুনিয়া যোগেশ আর মুহূর্ত্ত জন্য তথায় থাকিতে পারিলেন না, সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় যে দিকে দৃষ্টি পতিত হইল, সেই দিকেই ছুটিলেন। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, পৃথিবী, গিরি, বৃক্ষ সকলই তাঁহার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল, হৃদয়ে যেন এককালে সহস্র বৃশ্চিকে দংশন আরম্ভ করিল। তিনি প্রকৃত উন্মাদের ন্যায় পর্ব্বতের প্রান্ত দেশাভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন। তিনি কতক্ষণ এইরূপ ভাবে গমন করিলেন, তাহার নিশ্চয় নাই, হঠাৎ একখানি উপলখণ্ডে পদস্খলিত হইয়া তিনি ধরাতলে আছাড়িয়া পড়িলেন, আর তথা হইতে উঠিতে ইচ্ছা হইল না, ক্রমে ক্রমে সেই ভূপৃষ্ঠে বক্ষ সংস্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, ও শেষে দুই হস্তে বদন আবরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ;—

"দিদি, প্রাণের ভগিনী, জয়াবতী—যেমন তোমার বিমল সরল হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়াছিলাম, যেমন তোমায় কাঁদাইয়াছিলাম, আজ তেমনি তাহার প্রতিফল পাইলাম—আজ তেমনি কাঁদিলাম!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নৈশ আক্রমণ।

রাত্রি ৩ টা বাজিয়া গিয়াছে, যোগেশচন্দ্র শয্যায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছেন, হৃদয়ে শান্তি নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, চক্ষুজলে উপাধান ভিজিয়া যাইতেছে, তিনি মধ্যে মধ্যে দীর্ঘোষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। সহসা তাঁহার কর্ণে একটি চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করিল। যোগেশ প্রথমে শুনিয়াও শুনিলেন না, চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ও মস্তিষ্ক পূর্ণ হইয়াছিল, বাহিরের কথা সে হৃদয়ে প্রথমে স্থান পাইল না। গোলযোগ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, শত শত আততায়ীর ভীষণ

গর্জ্জা, পীড়িতের রোদন, তৎসঙ্গে রমণীগণের কাতরধ্বনি, কাঞ্চন পাহাড়ীর মূলদেশ পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া যোগেশচন্দ্রের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন—হরি, হরি—সর্ব্বনাশ—ভীষণ দৃশ্যে তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, মস্তক ঘুরিল, চক্ষু ক্ষণেকের জন্য মুদিত হইল। তিনি দেখিলেন, সেই গভীর কৃষ্ণ রজনীতে সাঁওতাল পল্লীমধ্যে ভীষণ অগ্নিক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে; দুরন্ত অগ্নির দুরন্ত জিহ্বা লক লক করিয়া নীল গগনস্পর্শ করিতেছে; দুরন্ত পবনে নাচিয়া নাচিয়া অগ্নিশিখা দুলিতেছে, এক গৃহের শীর্ষদেশ হইতে অন্য গৃহে লাফাইয়া পড়িতেছে; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল গগন ছাইয়া পড়িতেছে, দগ্ধ গৃহ গুলি মড় মড় শব্দে ভূতলশায়ী হইতেছে। যোগেশচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাঞ্চনমালার অলৌকিক রূপ, বিমল প্রেম, সকলই ভুলিয়া গেলেন। সাঁওতালগণের বিপদশান্তি করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘটনার স্থলাভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধপথ যাইয়াই যোগেশচন্দ্র দেখিলেন, একটি রমণী আলুথালু বেশে, বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে রোদন করিতেছে, ও প্রকৃত উন্মাদিনীর ন্যায় দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্যা হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। যোগেশচন্দ্র অগ্নিকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে যাইতেছিলেন, তাই প্রথমে রমণীর আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করেন নাই। রমণী তাঁহার নিকটস্থ হইলে তিনি দেখিলেন,—যোগিনী কাঞ্চনমালার নাম করিয়া চীৎকারস্বরে আকাশ ভেদ করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। যোগেশ বুঝিলেন, কাঞ্চনমালার বিপদ ঘটিয়াছে, তাঁহার হৃদয় শুকাইয়া গেল, গতিরোধ হইল, বক্ষস্থল নিমেষের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই যোগিনী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং যোগেশকে

সম্মুখে দেখিয়া উচ্চতর রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"বাবা, দুঃখিনীর সর্ব্বস্বধন—কি হ'ল!—যোগেশ—বাপ্—যাদু এনে দেও—রক্ষা কর—বাবা আমার—আমার কাঞ্চনমালা——"

যোগেশ যোগিনীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মা, আপনার কথায় বোধ হইতেছে, কাঞ্চনমালার বিপদ ঘটিয়াছে, কিন্তু কি হইয়াছে, শীঘ্র বলুন, আমার দেহে জীবন থাকিতে কাহার সাধ্য কাঞ্চনমালার কেশ স্পর্শ করে—।" যোগিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে যাহা বলিলেন, তাহাতে যোগেশচন্দ্র বুঝিলেন,—তৃতীয় প্রহর রাত্রে গাট্রে সাহেব কাঞ্চনপাহাড়ীর সাঁওতাল পুরীতে অনেক লোক সঙ্গে প্রবেশ করিয়া সাঁওতালগণকে যথেষ্ট উৎপীড়ন করিয়া তাহাদের গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়াছে ও স্বরণী ও কাঞ্চনমালাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। যোগেশের হৃদয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল. তাঁহার নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, তিনি দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"আজ ইংরাজ-নরাধম দেখিবে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে কত সাহস. বাঙ্গালীর শরীরে কত বল।" তিনি আর ক্ষণমাত্র তথায় অপেক্ষা করিলেন না, যেখানে ভীষণ অনল সাঁওতাল পুরী দগ্ধ করিতেছিল, যেখানে গাটের অত্যাচারের জীবন্ত নিশান উড়িতেছিল, তিনি সেই দিকে বায়ুগতিতে ছুটিতে লাগিলেন। ঘটনাস্থানে উপস্থিত হইয়া যোগেশ দেখিলেন, তথায় পুরুষমাত্র নাই, কেবল রমণী ও শিশুগণ প্রজ্বলিত গৃহ সকলের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া হাহাকার করিতেছে। সেখানে অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া যোগেশ পাহাড়ীর দক্ষিণ দিগস্থ উপত্যকাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ক্ষণেক দূর যাইয়াই তিনি দেখিলেন, এক স্থানে কতকগুলি সাঁওতাল মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া আছে। মাঙ্কু ধরাতলে উপবেশন করিয়া মস্তকে হস্ত দিয়া রোদন করিতেছে। যোগেশ নিমেষ মধ্যে তাহাদের

নিকটে আসিয়া দেখিলেন, বুদ্ধি চাঙ্গের নিষ্পন্দ দেহ ধরাতলে পড়িয়া রহিয়াছে, সর্ব্বশরীর রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে, মাঙ্গক তাহার শিয়রে বসিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় হাহাকার রবে রোদন করিতেছে। যোগেশকে দেখিয়া সাঁওতালগণের পেষিত হৃদয়ে বল সঞ্চার হইল। তাহারা সকলে একযোগে "ঐ রাজা" বলিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল। যোগেশচন্দ্র তাহাদের মুখে শুনিলেন, গাট্রে, কাঞ্চনমালা ও স্বরণীকে লইয়া যখন গমন করিতেছিল, তখন বুদ্ধিচাঙ্গ পাঁচ জন সাঁওতাল সমভিব্যাহারে তাহাকে আক্রমণ করে। গাট্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছিল, শেষে বুদ্ধি তাহার চরণ ধরিয়া ঘোটক হইতে ফেলাইয়া দিল। কিন্তু এই সময় গাট্রের সমভিব্যাহারী অন্যান্য লাঠিয়ালগণ বুদ্ধির সমভিব্যাহারী সাঁওতালগণের প্রতি একযোগে আক্রমণ করিল, গাট্রেও অবসর পাইয়া আপন পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি হতচেতন হইয়া পড়িল, সাহেব স্বরণীও কাঞ্চনমালাকে লইয়া পলায়ন করিল।

যোগেশচন্দ্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বুদ্ধির জীবন আছে। তিনি তখন সাঁওতালগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহেব কত দূর? সাঁওতালেরা বলিল, যেপ্রকার দ্রুতগতিতে সাহেব যাইতেছে, তাহাতে সে এতক্ষণ প্রায় দুই ক্রোশ যাইয়া থাকিবে। যোগেশচন্দ্রের নিকট অশ্ব ছিল না, এত পশ্চাৎ হইতে পদব্রজে যাইয়া সাহেবকে ধরা নিতান্ত অসম্ভব; দ্বিতীয়তঃ শীঘ্র শুশ্রূষা না করিলে বুদ্ধির জীবনের আশঙ্কা আছে। সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "বুদ্ধির জন্য ভয় পাইও না, আমার কাঞ্চনভবনে উহাকে লইয়া আইস, গুলি বাহির করিয়া দিলেই আরোগ্য হইবে—কল্য প্রত্যূষে অত্যাচারী ইংরাজের শ্রাদ্ধের বিহিত বিবেচনা করিব।" দশ জন সাঁওতালকে গাট্রের গন্তব্য পথ অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিয়া যোগেশ অন্যান্য সকলের সহিত নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।

(৩য় খণ্ড।) (৮ম সংখ্যা।)

মাসিক সমালোচক
ও
খেয়াল
সংযোজিত।

(সর্ব্ব শাস্ত্র-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচক।)

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
সন১২৮৯ সাল, অগ্রহায়ন।

বহরমপুর,—অরুণোদয় যন্ত্রে
শ্রীভগবানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য।৵ আনা।

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল।

ছোট বৌর ঝাঁপি।

গরলে অমৃত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

অমাবস্যার রজনী। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে আকাশে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর হইয়া অন্ধকারে দিগন্ত গ্রাস করিয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি. তখন রাত্রি ৭ টা মাত্র বাজিয়াছে, কিন্তু এই সন্ধ্যা-কালেই অন্ধকারে নিকটস্থ বস্তু লক্ষ্য হইতেছে না। এক্ষণ পর্য্যন্ত ঝড় কি বৃষ্টি কিছুই আরম্ভ হয় নাই, প্রকৃতি স্থির, গম্ভীর, নীরব; কেবল-মাত্র মস্তকোপরি গম্ভীর মেঘমালা ভয়ঙ্করী তমোময়ী রজনীকে ভীমতর করিতেছে। গাট্রের আদেশ মত বেদে সমস্ত দিন স্বরণীর আজ্ঞাবহ হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু গাট্রে দেখে নাই তাই রক্ষা, অন্যান্য আজ্ঞা-বাহকগণ অপেক্ষা এ বেদে স্বরণীর উপর কিঞ্চিৎ অধিক স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়াছে,—আমরা দেখিয়াছি, বেদে আপন বেদেনীকে দূরে রাখিয়া স্বরণীর সহিত নির্জ্জনে, নিভৃতে হস্ত ধরিয়া, কখন কটি বেষ্টন, কখন বা কণ্ঠ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে, দুই জনে দুই জনকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছে, চক্ষে করিয়া তুলিয়া লইয়াছে, হৃদয়ের গূঢ়তম

প্রদেশে বসাইয়াছে। বোধ হয়, এক মুখে তাহাদের সমস্ত মনের কথা বলা হয় না, তাই তাহারা চক্ষে চক্ষে জিজ্ঞাসা করিয়াছে. চক্ষে চক্ষে উত্তর দিয়াছে, চক্ষে চক্ষে হাসিয়াছে।

যাক্—রাত্রি প্রায় ৭ টা বাজিয়াছে। আজ কাঞ্চনমালার অন্তর অন্য দিন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল। তিনি স্বরণীর অঙ্কে মস্তক রাখিয়া শুইয়া আছেন. আমোদমাখা স্বরণী হাসিতে হাসিতে কাঞ্চনমালাকে বলিল—"দিদি, শুয়েই যে র'লে, উঠ্‌বে না ?"

কাঞ্চনমালা স্বরণীর মুখে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন—"কেন বোন, উঠে কি হ'বে ?"

পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে স্বরণী বলিল—"সাহেব যে তোমার জন্য এত পোষাক পাঠিয়েছে, তা একবার পরবে না ?"

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাঞ্চনমালা বলিলেন—"দিদি, ও কথা পরিহাস করিয়া বলিলেও প্রাণ সিহরিয়া উঠে, এ নরক হইতে যত ক্ষণ না বাহির হইতেছি, ততক্ষণ প্রাণ সুস্থির হইতেছে না।"

তাঁহাদের এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হইল. বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদির আমূল কম্পিত করিয়া দুরন্ত পবন পৃথিবী তোলপাড় করিতে লাগিল। ধূলা ও পতিত বৃক্ষপত্রাদিতে দিগন্ত ছাইয়া গেল। প্রথমে উষ্ণ বায়ু বহিয়া শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, বৃষ্টি আসে আসে, এমন সময় গার্ট্রে সাহেব দৌড়িতে দৌড়িতে সেই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। সাহেবকে দেখিয়াই কাঞ্চনমালা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, স্বরণী দেখিল, তাঁহার অন্যান্য দিনের ন্যায় আবার মূর্চ্ছার লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে. অমনি তাঁহাকে অন্য একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া বেদেনীকে ডাকিয়া বলিল—"শীঘ্র দিদির মুখে চোখে জল দেও, কাছে ব'সে একটু বাতাস ক'র. আমি এলাম ব'লে" এই বলিয়াই দ্রুতপদে কক্ষান্তরে

সাহেবের সম্মুখে আসিয়া প্রগাঢ় ভক্তি ভাবে একটি সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আজ সাহেবের আনন্দের সীমা নাই। সাহেবি প্রেম, সাহেবি ভালবাসা, বাঙ্গালীদিগের ন্যায় রসভরে টল মল কি না জানি না; আমরা বাঙ্গালী হইয়া বলিতে পারি না, তাঁহাদের রসিকতার গাম্ভীর্য্য কত দূর; তবে গাট্রের অদ্যকার ভাবে স্থির করা যায় যে, ইহাদের মধ্যেও চিকণ ভাবের অভাব নাই। গাট্রে আজ কাঞ্চনমালার মন ভুলাইবার আশায় বৈকাল হইতে বিশেষ যত্ন সহকারে বেশ বিন্যাস করিয়াছে, সুচিক্কণ কৃষ্ণমখ্‌মলের পরিচ্ছদে অঙ্গশোভা করিয়াছে, মস্তকের কেশদাম আলবার্ট ফ্যাসনে অতি সন্তর্পণে বিন্যাস করিয়াছে, অঙ্গে সৌরভের হাট বসাইয়াছে। সাহেব সিসে গান করিতে করিতে কামরার মধ্যস্থিত বৃহৎ দালানে আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি স্মরণী আসিয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া অভ্যর্থনা করিল। সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিল, "তবে সব ঠিক?" হস্ত যোড় করিয়া বিনীতভাবে স্মরণী বলিল—"সাহেব সমস্তই ঠিক, কিন্তু একটির অভাব হইবে।" সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—"কি অভাব?" স্মরণী পূর্ব্ববৎ বিনীতভাবে বলিল—"তাঁহার সহিত আজ অন্ধকারে দেখা করিতে হইবে, বাঙ্গালীর মেয়েদের লজ্জা অধিক, প্রথম দিনেই আলোতে তোমার সম্মুখে আসিতে পারিবে না।" হাসিতে হাসিতে সাহেব বলিল, "দেখ আয়াজি, আমি তোমার উপর বড় রাজি হইয়াছি, দেখিবে আমি তোমায় কেমন খুসি করিব। তুমি জান না, আমি আমার বিবি সাহেবকে কত পেয়ার করি, বিবির জন্যই আমি বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছি, আজ বিবির সহিত বাঙ্গালা কহিয়া আমি এ বিদ্যার সার্থকতা করিব। এখন আমায় শীঘ্র বল, বিবি কোন ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন?"

অঙ্গুলি হেলাইয়া স্বরণী সাহেবকে একটি ঘর দেখাইয়া দিল, সাহেব আহ্লাদে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য হস্তপীড়ন করিবার আশায় স্বরণীর দিকে হস্ত প্রসরণ করিল, স্বরণী অমনি "মর্ মিনসে, আমায় কেন? যেখানে দেখাইলাম, সেইখানে তোর সদ্য মুক্তি"—বলিয়াই তীরবেগে সে ঘর হইতে কাঞ্চনমালার নিকট উপস্থিত হইল।

স্বরণী আসিয়া দেখিল, কাঞ্চনমালা আর একবার মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন, বেদেনীর যত্নে তিনি অনেক সুস্থ হইয়াছেন, কিন্তু তখনও বিহ্বল রহিয়াছেন। স্বরণী ও বেদেনী উভয়ে কাঞ্চনমালাকে সুশ্রূষা করিতেছে, এমন সময়ে পার্শ্বস্থিত প্রকোষ্ঠে ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল, তখন দ্বিগুণবেগে ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল, ভিতরের কোন শব্দ বাহিরে যাইতেছিল না। স্বরণী ও বেদেনী প্রথমে গার্ট্রে সাহেবের তর্জ্জন গর্জ্জন, পরে কাতরোক্তি শুনিতে পাইল, কিন্তু তাহাদিগকে আর অধিকক্ষণ শুনিতে হইল না, কাঞ্চনপাহাড়ীর এক জন অন্যতর সাঁওতাল তাহাদের নিকট দ্রুতগতি উপস্থিত হইয়া বলিল, "শীঘ্র, শীঘ্র—বাহিরে শিবিকা প্রস্তুত।" স্বরণী নিমেষ মধ্যে কাঞ্চনমালাকে ক্রোড়ে লইয়া সেই দুর্য্যোগেই বাটীর বাহিরে উপস্থিত হইল, ক্ষণমাত্র পরেই আমাদের পরিচিত বেদে স্বরণীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বরণী বেদেকে দেখিয়াই তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল—"আমার প্রাণের বুদ্ধি, আমার কথা রাখিয়াছ তো, সাহেবকে প্রাণে মার নাই? স্বরণীর গাল টিপিয়া বুদ্ধি বলিল, "আমার প্রাণের প্রাণ যাহাতে বাদী, সে কাজ কি আমি করিতে পারি?"

কাঞ্চনমালা ও স্বরণীর শিবিকা হুহু শব্দে কাঞ্চনপাহাড়ী অভিমুখে ছুটিল।

প্রাতে নবিপুর গ্রামের লোকে দেখিল, গার্ট্রে সাহেব উলঙ্গ অবস্থায় বাঙ্গালার প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, রুধির-ধারায়

অঙ্গ রঞ্জিত, কখন দুই এক পা অগ্রসর হইতেছে. আবার আছাড় খাইয়া পড়িতেছে; ক্ষণেক মৃত্তিকায় গড়াইতেছে, আবার উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। ঈদৃশ দশা দেখিয়া সকলে নিকটে আসিয়া দেখে তাহার উভয় কর্ণ ও নাসিকা ছিন্ন, চক্ষু দুইটি উৎপাটিত। এই প্রকার অন্ধ ও নাসাকর্ণহীন হইয়া পাষণ্ড গাঙ্গে দুই দিন নবিপুর গ্রাম মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বেড়াইল, তৃতীয় দিবসে একটি কূপমধ্যে পতিত হইয়া পাপ জীবন পরিত্যাগ করিল. পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

যে রাত্রে কাঞ্চনমালার উদ্ধার সাধন হয়.তাহার পর দিবস অপরাহ্ণে যোগেশচন্দ্র দিগম্বরের গৃহের সেই প্রকোষ্ঠে বাতায়ন নিম্নে উপবেশন করিয়া আছেন,এমন সময়ে জয়াবতী ঊর্দ্ধমুখে ধীরপদবিক্ষেপে নিম্নস্থিত পুষ্পোদ্যানে একটি কামিনী বৃক্ষতলায় আসিয়া বসিলেন। জয়া এখন যদিও পাগলিনী, কিন্তু এ প্রকারের পাগল প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। পাগলের ন্যায় জয়ার বাচালতা নাই, উচ্চ হাস্য নাই, প্রলাপ নাই. ক্ষিপ্ততার লক্ষণ কিছুই নাই। জ্ঞান হারাইয়া পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে এক প্রকার অলৌকিক দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়াছে, সে মুখের ভঙ্গি, চখের ভাব, সে ধীর; গম্ভীর মন্থর পদবিক্ষেপ দেখিলে তাঁহাকে মানবী বলিয়া বোধ হয় না. যেন কোন দেবকন্যা স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন;আবার তাঁহার মধুর স্বরের সঙ্গীতাংশ শ্রবণ করিলে, বোধ হয়—এ কোন আকাশের পাখী। সে মুখের সে যে কি এক প্রকার বিষণ্ণ অথচ প্রফুল্ল, গম্ভীর অথচ চঞ্চল, কঠিন অথচ কমনীয়, বিহ্বল অথচ প্রশান্ত ভাব, তাহা চিত্র করা পার্থিব কবি

চিত্রকরের সাধ্যাতীত, সে মূর্ত্তি এক বার দেখিলে চক্ষু ডুবিয়া যায়, হৃদয় গলিয়া যায়, প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তাঁহার ক্ষিপ্ততার লক্ষণের মধ্যে কেবল তাঁহার উর্দ্ধদৃষ্টে মেঘদর্শন ও অসম্বদ্ধ সঙ্গীতে মেঘের সহিত কথোপকথন। তিনি পৃথিবীর কোন ব্যক্তির সহিত কথা কহেন না, কেহ ডাকিলে ক্ষণেক শূন্যদৃষ্টিতে তাহার মুখ প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, যেন—কিছুই-স্মরণ-হইল-না ভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, আকাশ প্রতি চাহিতে চাহিতে, তাঁহার সেই প্রকার গান করিতে করিতে, অন্য দিকে চলিয়া যান।

জয়াবতী কামিনী বৃক্ষতলে বসিয়া নাভিনিম্নে যুগ্মকর স্থাপন করিয়া আলুলায়িত-কেশে উর্দ্ধদৃষ্টে মূর্ত্তিমতী আরাধনার ন্যায় অনেকক্ষণ স্থিরভাবে ভাবিলেন, ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে মধুর ঝঙ্কারে গায়িয়া উঠিলেন ;—

হন্ হন্ ক'রে আয় ছুটে আয়,
থাক্ থাক্ মেঘ যাস্‌নে চ'লে,
তুলেছি কুসুম আঁচল ভরিয়া,
বস্ বস্ দেই চরণ-তলে।

নিবিয়া গিয়াছে আকাশের তারা,
খসিয়া পড়েছে আকাশ-শশি,
টিপি টিপি টিপি হেসে হেসে হেসে,
কি বলিলি মেঘ আকাশে বসি ?

পাগলিনী গীত গায়িতে গায়িতে সেখান হইতে উঠিলেন, একটি বকুল বৃক্ষমূলে যাইয়া বসিলেন এবং তথায় পতিত পুষ্প কুড়াইয়া লইয়া হার গাঁথিতে গাঁথিতে পুনরায় গান করিতে লাগিলেন;—

কে দিলে কুসুম ফেলাইয়ে তোরে ?
আহা মরে যাই এত খোয়ার,
যাও যদি ফুল ও মেঘের পাশে,
কাঁদিতে হবে না তা হলে আর।

হেসে হেসে হেসে কলিকা বয়সে
কত রসে ভেসে ছিলি লো তোর,
এখন কি লাগি শুকায়েছে মুখ ?
পলায়েছে বুঝি হৃদয়-চোর ?

পরাইব তোরে মেঘের গলায়,
হাসিবি কুসুম মেঘের পাশে,
হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া বেড়াবি
মেঘেতে বিজলি সদাই হাসে।

চুপ্ চুপ্ চুপ্ ঘুমাক জগৎ
ঘুমালো কুসুম—প্রাণের সই—
সর সর সর দেখি দেখি দেখি
মেঘেতে চড়িয়া কে এলো ঐ—

এস বাবা এস অমন করিয়ে
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াও কেন ?
ফুলহার দিয়ে এবার বাঁধিব
আর পলাইয়ে না যাও যেন।

আর এক জন, মনে তো পড়ে না,
কিবা তার নাম, কোথায় ছিল,

সোহাগ করিয়ে কুসুম তুলিয়ে,
কুসুমের কাঁটা বিঁধিয়া দিল।

মাতার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
বাতাসে সাঁতার খেলিছ যেন,
মনে মনে করি ধরি ধরি ধরি,
ধরিতে তোমায় পারিনে কেন?

'ঐ পলাইলে—!

জয়াবতীর গান ভাঙ্গিয়া গেল. তিনি উঠিয়া মেঘের প্রতি চাহিলেন। শিশু বালিকাগণের কোন আদরের দ্রব্য হারাইলে তাহারা যে প্রকার বিষাদ মাখা দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে, জয়া সেই প্রকার ভাবে চাহিয়া রহিলেন। যোগেশচন্দ্র উপর হইতে জয়ার সমস্ত কার্য্য দেখিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, জয়ার বর্ত্তমান মুখ ভঙ্গি দেখিয়া তাঁহার শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, তিনি পূর্ণহৃদয়ে বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে ডাকিলেন—"জয়াবতি—"

জয়াবতী চক্ষু ফিরাইলেন, যোগেশের চক্ষুর সহিত সে চক্ষু মিশিল, যোগেশচন্দ্র দেখিলেন, জয়াবতীর সেই পূর্ব্বকার লীলাবিলাস নয়নে একণে দিব্যজ্যোতিঃ বিরাজিত। জয়াবতী অনেকক্ষণ ধরিয়া নীরবে যোগেশের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, যোগেশ কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"দিদি অমন হইলে কেন, একবার যোগেশ বলিয়া আমায় ডাক, আমায় যে দিদি কত ভাল বাসিতে!

ভালবাসার কথা শুনিয়া জয়াবতী ললাট টিপিয়া ধরিয়া আবার অনেকক্ষণ ভাবিলেন, শেষে সহসা গায়িয়া উঠিলেন;—

"ভাল বাসি যারে আকাশে তো সে,
পৃথিবীতে ভাল বাস তুমি কে?

পার যদি যাও মেঘে গিয়ে বস,
দেখিব তখন কত ভালবাস।

গায়িতে গায়িতে জয়াবতী অন্য দিকে চলিয়া গেলেন, আকাশের পক্ষী মধুর স্বর-লহরীতে আকাশ মাতাইয়া আকাশের অপর প্রান্তে উড়িয়া গেল, যোগেশচন্দ্র বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন।

সূর্য্য অস্ত হইল, অন্ধকারে পৃথিবী ছাইয়া গেল, রাত্রি ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল, দুই প্রহর অতীত হইল, তখনও যোগেশচন্দ্র জয়াবতীর বিষয় ভাবিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইল, তিনি সেই গভীর কৃষ্ণ রজনীতে পুষ্পবনের প্রাচীরের উপর কি একটি কৃষ্ণ পদার্থ দেখিতে পাইলেন। স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু সে স্থানটি তাঁহার নিকট হইতে অধিক দূরে অবস্থিত বলিয়া কিছুই চিনিতে পারিলেন না। সেইরূপ পদার্থ একটি দুইটি করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেক-গুলি প্রাচীর মস্তকে দেখা যাইতে লাগিল। তাহারা কখন কখন খর্ব্ব হইয়া প্রাচীরের সহিত মিশাইয়া যায়, আবার কখন কখন উচ্চ হইয়া যেন মনুষ্যের আকার ধারণ করে। যোগেশচন্দ্র এক মনে স্থিরদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির মীমাংসা করিতে পারিলেন না। সহসা তাহার বোধ হইল, সেই সমস্ত কৃষ্ণ-পদার্থ প্রাচীরের শিরোদেশ হইতে পুষ্পবন মধ্যে অবতরণ করিয়া তাঁহার কক্ষ প্রতি অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদিগকে একবার স্পষ্ট দেখা যায়, আবার এক একবার তাহারা অন্ধকারে লুকাইয়া যায়। যোগেশের মনে নানা রূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল, তাঁহার কক্ষের বহিঃ প্রকোষ্ঠে দিগম্বরের চারিজন বর-কন্দাজ দিবারাত্র তাঁহার প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত, যোগেশ একবার ভাবিলেন, তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া ইহার তথ্যানুসন্ধান করিতে বলেন, কিন্তু তখনি দিগম্বরের পুষ্পবন মধ্যে প্রশান্ত রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিশাল শৃঙ্গ রব আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল,

শৃঙ্গধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয় লাফাইয়া উঠিল, তিনি শব্দে বুঝিতে পারিলেন, ইহা বুদ্ধিচাঙ্গের শৃঙ্গ-রব। যোগেশচন্দ্র তখন বুঝিলেন, তাঁহার বিপদকালে তাঁহার সাঁওতাল বন্ধুগণ তাঁহাকে বিস্মৃত হয় নাই, তাহারা তাঁহারই উদ্ধার সাধনায় দিগম্বরের বাটীতে নৈশ আক্রমণ করিয়াছে। শৃঙ্গধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দিগম্বরের বাটীর চারিদিকে বিষম কোলাহল উত্থিত হইল, ক্ষণেক অবিশ্রান্ত শন্ শন্ বেগে তীর ছুটিতে লাগিল, পরে পীড়িতগণের আর্ত্তনাদ, তাহার পরেই অন্তঃপুর মধ্যে হুল স্থূল গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। কেহ প্রাণ লইয়া ছুটিতেছে, কেহ দ্বার ভাঙ্গিতেছে, কোথায় বা গৃহ লুট হইতেছে; কোন খানে মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, বালকের রোদন, অবলার কাতরোক্তি; যোগেশের মনে হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল, তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল পাছে উত্তেজিত সাঁওতালগণ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে গিয়া স্ত্রীলোকের প্রতি আক্রমণ করে। তিনি এবম্প্রকার ভাবিতেছেন এমন সময় তিনি তাঁহার গৃহ দ্বারে বুদ্ধিচাঙ্গের ভীম গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন—সে ভীষণ নাদে বলিতেছে—"দুরাচার শীঘ্র আমাদের রাজাকে বাহির করিয়া দে, নচেৎ এই দণ্ডে আমার হস্তে তোর মৃত্যু"। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তেই বুদ্ধি যোগেশের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগেশচন্দ্রের বন্ধন মোচন করিল। স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া যোগেশ ক্ষণেক আত্মবিস্মৃত হইয়া বুদ্ধিকে হৃদয়ে ধরিয়া পূর্ণহৃদয়ে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রথম বেগ শমিত হইলে যোগেশচন্দ্র বলিলেন—"বুদ্ধি, স্ত্রীলোক বালকের উপর অত্যাচার হয় নাই তো? বুদ্ধি বলিল— "রাজা যদি সেইরূপ পাশব আচরণই করিব, তবে এত দিন তোমার নিকট কি নীতি শিক্ষা করিলাম।"

যোগেশচন্দ্র বলিলেন,—"বুদ্ধি, বাহিরে এখনও গোল হইতেছে, শীঘ্র একজন লোক পাঠাও, যেন অনর্থক রক্তপাত না হয়—দিগম্বর

কোথায় ? বৃদ্ধি বলিল—“দিগম্বর বন্ধন দশায় বাহিরে আছে,তোমার বিনা অভিপ্রায়ে তাহাকে কোন দণ্ড দেই নাই,,।

তাঁহাদের এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে উচ্চ সরল মধুর হাস্যরবে দিক ছাইয়া গেল এবং পর ক্ষণেই সকলে জয়াবতীর মধুর কণ্ঠের সেই অসম্বদ্ধ গীত ধ্বনি শুনিতে পাইল—জয়া আসিতে আসিতে গায়িতেছিলেনঃ—

এস এস সবে যাই যাই যাই,
এ নরকে আর থাকিতে না চাই।
ঐ দেখ চেয়ে মাথার উপরে
ঘুরিছেন বাবা ঘর আলো ক'রে।
এস এস সবে কি ভয় কি ভয়,
বাবা বলেছেন, সাঁওতালের জয়!

সে দৈব মূর্ত্তি দেখিয়া,সে স্বর্গীয় স্বর শুনিয়া, সকলের হৃদয়ে আঘাত লাগিল, সকলে তাঁহার পথ পরিষ্কার করিয়া দাঁড়াইল৷ যোগেশচন্দ্র হৃদয়বেগ আর দমন করিতে পারিলেন না, তিনি দ্রুতগতি আসিয়া জয়াবতীকে বক্ষে ধারণ করিলেন ও তাঁহার মস্তকে হস্ত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—“দিদি জয়াবতি, সেই রমণীরত্নের এই অবস্থা।”

শ্যেনপক্ষী-ভীতা কপোতী যেরূপ মনুষ্যের ক্রোড়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া নীরবে অবস্থান করে ও ভীতচক্ষে এক একবার আশ্রয়দাতার মুখ নিরীক্ষণ করে, জয়াবতী সেইরূপ যোগেশের ক্রোড়ে নীরবে অবস্থান করিয়া এক একবার চক্ষু দুইটি উঠাইয়া তাঁহার মুখ দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া, দেখিয়া, দেখিয়া, আবার চক্ষের পাতা দুখানি নামাইয়া আপন মনে মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন।—

চেন চেন করি, চিনিতে না পারি,
ভাই কি ভগিনী, পুরুষ কি নারী ?
দেখেছি দেখেছি মনে মনে হয়,
বল দেখি ভালবাস কি নিশ্চয় ?

এই শেষ কথাটি বলিয়া জয়াবতী যোগেশের মুখ প্রতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। যোগেশচন্দ্র বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

তাঁহারা যখন সকলে বহির্বাটীতে আসিলেন, তখন এক জন সাঁওতাল তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"দিগম্বর পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, রক্ষক সেইজন্য তাহার প্রতি শর লক্ষ্য করিয়াছিল, শর তাহার হৃদয় ভেদ করিয়াছে। তাহার মৃত্যু নিকট, মৃত্যুকালে সে একবার রাজার সহিত সাক্ষাত করিতে চাহিতেছে।"

সংবাদ পাইয়াই যোগেশচন্দ্র বুদ্ধিচাঙ্গকে সঙ্গে লইয়া দিগম্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন. দেখিলেন বাস্তবিকই তাহার মৃত্যু নিকট। সে যোগেশচন্দ্রকে দেখিয়া অতি কাতর ও ক্ষীণ স্বরে বলিল—— "যোগেশচন্দ্র আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, জয়াবতী আমার মা——তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, আমি চলিলাম, আমার শয্যাতলে যে কাগজ আছে লইও, উপকার হইবে"। এই বলিয়া দিগম্বর চক্ষু মুদিত করিল, যোগেশচন্দ্র কথিত কাগজ সংগ্রহ করিয়া এক-খানি শিবিকায় জয়াবতীতে উঠাইয়া, সেই রাত্রেই সমস্ত সাঁওতাল সমভিব্যাহারে কাঞ্চন পাহাড়ীতে যাত্রা করিলেন।

——

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নরবলী।

চারিদিকের সাঁওতালে কাঞ্চন পাহাড়ী পূর্ণ হইয়াছে, পাহাড়ীর শিখরদেশে, উপত্যকায়, অধিত্যকায়, সানুদেশে, সমতল প্রান্তরে যত দূর দৃষ্টি প্রসারিত হয়, কেবল ধনুর্ব্বাণধারী সাঁওতালগণের ভীম-মূর্ত্তি নয়ন গোচর হইতেছে। কোন স্থলে কতকগুলি সাঁওতাল মণ্ডলাকারে বসিয়া মাদল বাদন করিতেছে ও সেই তালে তালে হস্ত ধরা ধরি করিয়া গায়িতে গায়িতে নাচিতেছে, বৃদ্ধেরা একত্র বসিয়া গম্ভীরভাবে তর্ক বিতর্ক করিতেছে, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ভুবনবিজয়ী ইংরাজের সহিত যুদ্ধ, সহজ কথা নহে, তাই তাহারা স্থিরচিত্তে বসিয়া ভাবী ফলাফল নির্ব্বাচন করিতেছে। কোথাও অমিততেজা যুবকগণ যুদ্ধের নামে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছে, তাহাদের আর বিলম্ব সহিতেছে না, কেহ অধৈর্য্য হইয়া বহ্বাস্ফোটন করিতেছে, কেহ বীরদর্পে হস্তস্থিত দুর্জ্জয় ধনুকে টঙ্কার দিতেছে, কেহ কেহ বা নীরবে বসিয়া শর প্রস্তুত করিতেছে, শরের ফলা শাণাইতেছে, তাহাতে বিষ মাখাইতেছে। কোন স্থলে চক্র মধ্যে মদিরা ভাণ্ড চক্রবৎ ঘুরিতেছে, চক্রস্থ সাঁওতালগণ মধুপানে উন্মত্ত হইয়া কখন কখন ঊর্দ্ধে উল্লম্ফন করিতেছে, কখন বা জাতীয় পতাকা দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া ভীমনাদে বলিতেছে, "যাহার মৃত্যু আসন্ন হইয়া থাকে, সেই সাঁওতালের জীবন সর্ব্বস্ব স্বাধীনতার নিশানে হস্তক্ষেপণ করুক।"

পাহাড়ীর অন্যতর প্রদেশে আজ মহা ধুমধামে মারং বুড়ুর পূজা হইতেছে। মারংবুড়ু সাঁওতালদিগের দেবতা। অনেকাংশে আমাদের ব্রহ্মার ন্যায়। সাঁওতালেরা মারংবুড়ুর পূজা না করিয়া কোন কার্য্যে হস্ত ক্ষেপণ করে না, তাহাদের বিশ্বাস, মারং বুড়ু সদয় থাকিলে

কোন স্থানেই তাহাদের বিঘ্ন নাই। গো, মেষ মহিষাদি নানাবিধ বলী দেববেদীর সম্মুখে পালে পালে বাঁধা রহিয়াছে, শত শত খড়্গ সূর্য্যকিরণে নয়ন ঝলসিয়া চক্‌ মক্‌ করিতেছে, বিবিধ প্রকার ধনুক, রাশি রাশি শর উৎসর্গার্থ দেব সম্মুখে স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। নবজাতশ্মশ্রু বহুসংখ্যক সাঁওতাল যুবক আজ মারং বুড়ুর সম্মুখে শুভক্ষণে যোদ্ধৃপদে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া পর দিবস হইতে উপবাস করিয়া শুদ্ধাচারে রহিয়াছে, তাহাদের শিক্ষাগুরু-গণ দেব সম্মুখে তাহাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছে।

সকলেই ধুম ধামে ব্যস্ত, কেবল কাঞ্চন ভবনের একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে যোগেশচন্দ্র একাকী বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সাঁওতাল রাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত দেখিয়া যোগেশচন্দ্র কাঞ্চনমালাও জয়াবতীকে স্বরণীর সঙ্গে কাঞ্চন পাহাড়ীর বিংশতি ক্রোশ পশ্চিমে একটি নির্জ্জন বনমধ্যে এক মাঝির গৃহে পাঠাইয়াছেন। জয়াবতীকে পাইয়া পর্য্যন্ত কাঞ্চনমালা তাঁহাকে কণ্ঠহার করিয়াছেন, জয়া কাঞ্চনমালার ধ্যান জ্ঞান সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছেন। এক্ষণে কাঞ্চনমালা এক মনে দিবা নিশি কেবল জয়াবতীর সেবাতেই নিযুক্তা আছেন। জয়ার আহার, জয়ার গাত্র মার্জ্জন, জয়ার কবরী বন্ধন, জয়ার জন্য কুসুমহার গ্রন্থন, কাঞ্চনমালার কার্য্য। কাঞ্চনমালার ঐকান্তিক যত্নে জয়াবতীও কাঞ্চনমালাগত প্রাণ হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে কাহারও সহিত কথা কহিতেন না, কেবল আপন মনে গান করিয়া বেড়াইতেন, এক্ষণে সে গানের অংশ কমিয়াছে, তিনি পৃথিবীর মধ্যে কাঞ্চনমালাকে আপন বলিয়া জানিয়াছেন, যেখানেই থাকেন, মনে কোনরূপ ভয় কি কষ্ট উপস্থিত হইলেই, শিশু যেরূপ মাতৃক্রোড় অন্বেষণ করে, জয়াবতী সেইরূপ দ্রুত আসিয়া কাঞ্চনমালার বক্ষমধ্যে মস্তক রক্ষা করিয়া বসেন। জয়াবতীর চিত্তবিকার উপশমের লক্ষণ অনেক প্রকাশ পাইয়াছে,

কিন্তু সে শান্তিচিহ্ন কাঞ্চনমালার আশঙ্কার কারণ হইয়াছে, তিনি সভয়চিত্তে দেখেন, জয়াবতীর মনোরোগ মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহ যেন চন্দ্রকলার ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, যেন সে দিব্য কান্তি ক্রমে ক্রমে স্বচ্ছভাব ধারণ করিতেছে।

যাক্—যোগেশচন্দ্র নির্জ্জন কক্ষে একাকী বসিয়া নিবিষ্টমনে চিন্তা করিতেছেনঃ—সম্মুখে বিপদ-সমুদ্র, অল্পমতি সাঁওতালগণ না বুঝিয়া অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিতে বসিয়াছে। যাহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রসাতল পর্য্যন্ত কম্পান্বিত, যাহারা সামান্য বণিকভাবে আসিয়া সমস্ত ভারত গ্রাস করিয়া বসিয়াছে, যাহারা ইঙ্গিতে অটল মুসলমান রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি উৎপাটিত করিয়াছে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা কি অসভ্য সাঁওতালের কাজ!

যোগেশচন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একজন সাঁও- তাল আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি কাগজ প্রদান করিল, যোগেশ পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে এইরূপ লেখা আছে;——

"ইহা মহামান্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেলের গোচর হইয়াছে যে, যোগেশচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক বাঙ্গালী পরামর্শ দিয়া সরল সাঁওতাল- গণকে রাজবিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে। সাঁওতালগণ অসভ্য, তাহাদের হিতাহিত-জ্ঞান নাই, অতএব তাহাদের এরূপ আচরণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দুঃখিত ব্যতীত রুষ্ট নহেন। মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের অভিমত এই যে, যোগেশচন্দ্র মিত্রই সমস্ত অপরাধের মূল, অতএব এতদ্দ্বারা সমস্ত সাঁওতালগণকে জানান যাইতেছে যে, যোগেশ মিত্র গার্ট্রে সাহেবকে ও দিগম্বর ও জয়হরিচন্দ্র মহারাজাকে খুণ করিয়া যে স্ত্রীলোকগুলিকে লইয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত স্ত্রীলোকের সহিত যদি তাহাকে সাঁওতালেরা তিন দিবস

মধ্যে হাজির করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করা যাইবে, নতুবা তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইবে।”

সমস্ত পাঠ করিয়া যোগেশচন্দ্র সাঁওতালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি এ কাগজ কোথায় পাইলে?

সাঁওতাল বলিল, ৫০ জন বরকন্দাজ সঙ্গে গোবিন্দ দারোগা এই কাগজ লইয়া পাহাড়ীতে উঠিতেছিল, সকলে তাহাদিগকে মারংবুড়ুর পূজার কাছে ধরিয়া লইয়া গেল, তোমার কাছে কাগজ পাঠাইয়া দিল।”

যোগেশচন্দ্রের মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। একেই তো সাঁওতালেরা উত্তেজিত হইয়াছে, তাহাতে মারংবুড়ুর বলীর সময়ে তাহাদের জ্ঞানকাণ্ড থাকে না, কি জানি যদি ক্রোধভরে দারোগা ও বরকন্দাজগণকেই বলী দিয়া বসে? যোগেশ আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পুজার স্থানাভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি দূর হইতেই দেখিলেন, এককালে একান্ন খানি খড়্গা শূন্যে উঠিল, এককালে সমস্ত খড়্গা সূর্য্যকিরণে চকমক করিয়া ভূতলে পড়িল, সাঁওতালেরা মাদল বাদন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। যোগেশচন্দ্র নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখেন, গোবিন্দ দারোগার ও তাহার পঞ্চাশৎ জন বরকন্দাজের ছিন্ন মুণ্ড ও দেহ ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছে।

———

মানব-প্রকৃতি।

প্রথম পল্লব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অসভ্যদিগের জীবন। অতি সামান্য কার্য্যেও ইহারা অন্যের আজ্ঞামত চলিতে ভালবাসে না। মলকসের মস্ত্র জাতির স্বাধীনতা জীবনের উপকরণ। প্রত্যেকে এমনি ভাবে কর্ম্ম করে, যেন দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতে নাই। কাহারও সহিত একটু কথান্তর হইলে অমনি তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া দেয়। বোর্ণিয়োর বন্যগণ প্রতিবেশীর সহিত কোন সংস্রব রাখে না। সন্তানেরা একটু কর্ম্মক্ষম হইলেই পিতা মাতা হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে, তাহারা পরস্পরের জন্য আর কোন চিন্তা করে না। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে যতই কেন দুরবস্থা হউক না, অসভ্যেরা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। দক্ষিণ আমেরিকার মাপুচে জাতি অন্যের দ্বিরুক্তি সহ্য করিতে পারে না এবং হুকুম করিলে অমান্য করিবেই করিবে। কারিবদিগের স্বাধীনতার একটু ব্যত্যয় হইলে তাহারা অধীর হইয়া পড়ে। বোদো ও ধিমল জাতিকে কেহ অন্যায় আদেশ করিলে তাহারা প্রাণান্তে স্বীকার করিবে না। বেড্‌উইনদিগকে মিষ্ট কথায় নানা কার্য্য করান যায়, কিন্তু হুকুম করিবামাত্র অবাধ্য হইয়া উঠে। ইহারা রাজা বা সর্দ্দারকে শ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া কখন স্বীকার করে না। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রভাব এবং অন্যের হিতাহিত লক্ষ না করিয়া স্বেচ্ছাচারের আতিশয্য অসভ্যদিগের সমাজ-বন্ধনের গুরুতর অন্তরায়।

অসভ্যেরা বড় গৌরবপ্রিয়। জীব জন্তু হইতে সুসভ্য মনুষ্য পর্য্যন্ত অন্যের বাহবা লইতে সকলেরই ইচ্ছা, কিন্তু সভ্যদিগের অপেক্ষা অসভ্যেরা গৌরবের অধিক প্রয়াসী। ম্যাগথ ও বল্‌গা হরিণের সহিত একত্র

লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা ফরাসীদেশে বাস করিত, তাহারাও ঝিনুকের মালা পরিত ও এবং গায়ে রাঙ্গা রং মাখিয়া দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিত। প্যারিসের বিলাসিনী অপেক্ষা অঙ্গরাগে বন্য সর্দ্দারদিগের অধিক যত্ন দেখা যায়। যাহারা কাপড় পরা আবশ্যক মনে করে না, নানা রঙ্গে দেহ চিত্র করা তাহাদেরও বিশেষ আবশ্যক। অলঙ্কার পরিবার জন্য নাক কান ঠোঁট ও গাল ফুঁড়িবার সময়ে এবং সমস্ত দেহে উল্কী পরিতে তাহারা যে কষ্ট সহ্য করে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। গৌরবের লোভে ইহারা সর্ব্বত্র অঙ্গরাগে পরস্পরের অনুকরণ করে। বিদ্রূপভয়ে এই বিষয়ে ইহারা অন্যের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লয়। অনেক সময়ে অসভ্যদিগের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি এই গৌরব লোভ প্রণোদিত। জ্ঞাতিঘাতককে যে হত্যা করিতে না পারে, নিন্দায় তাহার প্রাণ বাঁচান ভার হয়। জিঘাংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারিয়া অনেক সময়ে অসভ্যদিগকে আত্মহত্যা করিতে দেখা গিয়াছে। সভ্য সমাজে অন্ত্যেষ্টি ব্যয়ে সর্ব্বস্ব বিনাশ এবং অকুলীন-বিবাহ-ভয়ে কন্যাপণের প্রসূ গৌরবস্পৃহা। এক দিকে স্বেচ্ছাচার সমাজবন্ধনের যেমন অন্তরায়, গৌরবস্পৃহা অন্য দিকে তেমনি সহযোগী। এই গৌরব-স্পৃহা হইতে অসভ্যেরা জ্ঞাতি-প্রথা-মত কার্য্য করিতে প্রথম প্রবৃত্ত হয়। শত্রুদিগের অত্যাচার-ভয় সমাজ-বন্ধনের দ্বিতীয় কারণ।

সন্তানস্নেহের তীব্রতা সভ্য জাতি অপেক্ষা অসভ্যদিগের অধিক। সন্তান রক্ষা করিবার জন্য অতি নিরীহ পশুপক্ষীও প্রাণের মমতা ছাড়িয়া দিয়া হিংস্র জন্তুদিগের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রযুক্ত সন্তানের প্রতি যথেষ্ট নির্দ্দয় ব্যবহারেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ফিজি ও নবগিনির অধিবাসীরা সন্তানদিগকে বড় ভালবাসে, অথচ আবশ্যক হইলে দাসরূপেও বিক্রয় করিয়া থাকে। অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা সন্তানস্নেহের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু কখন কখন সন্তান কাটিয়া

তাহার চর্ব্বিতে মাছ ধরিবার এবং মাংসে কুম্ভীর ধরিবার টোপ করিয়া থাকে এবং পীড়িত হইলে সন্তানকে ফেলিয়া দেয়। টাস্‌মেনিয়াতেও শিশুবধের বড় প্রাদুর্ভাব। প্রসব বেদনায় মায়ের মৃত্যু হইলে তথাকার অসভ্যেরা জীবন্ত শিশুকে হত্যা করিতে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করে না। যে সকল বন্য জাতি কিয়ৎ পরিমাণে সভ্য হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত নির্দ্দয়তাশূন্য। নবকালিডোনিয়ার ও নবগিনির অসভ্যেরা নম্র ও শান্ত। টানিস জাতি সাধ্যমত পরোপকার করিয়া থাকে। সাণ্ডুইচ, টাহিটি, জাভা, মলক্কস ও বোর্ণিয়ো দ্বীপে এইরূপ দেখিতে পাই। আবার এক অবস্থাপন্ন জাতির মধ্যেও কখন কখন বিভিন্ন প্রকৃতি লক্ষিত হয়। টুপি জাতি বড় হিংস্রক। ফিজিয়ানেরা কঠোর জিঘাংসাপ্রিয়। দামারা জাতি চোর, দুরন্ত ও নরহত্যাকারী; নাগা জাতি সৎ ও শান্ত, কিন্তু ভীলেরা নিষ্ঠুর ও জিঘাংসাপ্রিয়। বোদো ও ধীমলেরা নিরহঙ্কার, সৎস্বভাব ও সত্যপ্রিয়, লেপ্‌চাগণ নিরীহ ও মধুর প্রকৃতি।

অসভ্য-স্বভাব সাধারণতঃ স্থিতিশীল। যে জাতি যত অসভ্য, পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা তাহাদের তত অল্প। দেহের ন্যায় তাহাদের মনেরও স্থিতিস্থাপকতা জন্মে নাই। অতি সামান্য আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিতে বলিলে তাহারা হাঁসিয়া উঠে ও বলে যাহাতে বাপের চলিয়াছে, আমাদেরও তাহাতে চলিবে। লিভিংষ্টোন সাহেব আফ্রিকার কতগুলি লোককে চামচ ব্যবহার করিতে শিখাইয়াছিলেন। তাহারা চামচে দুগ্ধ তুলিয়া, বাম হাতে ঢালিয়া খাইত। বোর্ণিয়োর দায়াক্‌-দের মধ্যে কেহ বিদেশী ধরণে কাঠ কাটিলে তাহার জরিমানা হয়।

বালকের মত অসভ্যদিগের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বড় অল্প। একটি নির্দ্দিষ্ট ঘটনা বুঝাইয়া দিলেও তাহারি মত আর একটি তাহারা বুঝিতে পারে না। দশটি দ্রব্য তুলনা করিয়া তাহাদের একটি সাধা-রণ ধর্ম্ম নির্ণয় করিবার ক্ষমতা নাই। এইরূপ দশটি কারণ

মিলিয়া যদি একটি কার্য্য উৎপাদন করে, কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ব কারণটি তাহারা হিসাবে ধরিয়া থাকে। উপস্থিত কারণ বা কার্য্য তাহারা বুঝে, দূরতর কারণ ও দূরতর ফল উভয়ই তাহাদের বুদ্ধির অতীত। সংক্ষেপে বলা যায়, অসভ্যদিগের ইন্দ্রিয় শক্তি যত প্রখর, বুদ্ধি বৃত্তি তেমনি অস্ফুট। মুসমানদিগের চক্ষু সর্ব্বদাই চারিদিকে ঘুরে, এবং আমরা যাহা দূরবীক্ষণ বিনা দেখিতে পাই না, তাহারা সহজ চক্ষে অনায়াসে দেখিতে পায়। ব্রহ্মবাসী কিরাত জাতি, সাইবিরিয়া ও আমেরিকা বাসীদিগেরও প্রখর দৃষ্টি। আমরা যাহা দেখিতে বা শুনিতে পাই না, ব্রাজিলবাসী ইণ্ডিয়ান ও টুপি জাতি তাহা দেখে ও শুনে। আবিপোন জাতি মর্কটের মত সর্ব্বদাই অস্থির ও প্রখর-দৃষ্টি। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান ও সিংহলের ব্যাধ জাতি অতি মৃদুস্বরও শুনিতে পায়। দল মধ্যগত একটি পশু একবার দেখিলে দামারা জাতি ও উত্তর আমেরিকার অসভ্যেরা সময়ান্তরে সেটি চিনিতে পারে। হিলহাউস সাহেব বলেন "যেখানে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, অরবাকেরা সেখানে পায়ের দাগ দেখিয়া বলিয়া দেয়, কখন কোন জাতির কতগুলি লোক বনের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পদচিহ্ন দেখিয়া গায়েনার লোকেরা বলিতে পারে, যাহারা গিয়াছে তাহাদের কতগুলি পুরুষ ও কতগুলি স্ত্রীলোক, কতগুলি বয়স্ক ও কতগুলি শিশু, কতগুলি দেশীয় ও কতগুলি বিদেশী। ইন্দ্রিয় শক্তির প্রখরতার উপর তীরক্ষেপ, নৌকাচালন প্রভৃতি যে যে কার্য্য নির্ভর করে, সে সকলেই অসভ্যেরা সুপটু। কিন্তু দুইটি কারণ একত্র করিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া কোন কার্য্য করিতে হইলে তাহারা শিশুর মত দিশাহারা হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয় শক্তির প্রখরতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির অস্ফুটতা হেতু অসভ্যেরা অনুকরণ কার্য্যে বানরের মত সুপটু। নবজী-লণ্ড, বোর্ণিয়ো, পোলিনেসিয়া, ব্রাজিল, পাটাগোনিয়া, চীন, ও

ব্রহ্মদেশের লোকেরা অনুকরণের জন্য বিখ্যাত। কাম্‌স্‌কাট্‌কার লোকেরা অপরের ভঙ্গি, এবং আমেরিকার স্নেক ইণ্ডিয়ানেরা, পশুপক্ষীর শব্দ আশ্চর্য্য অনুকরণ করিতে পারে। গুয়ারাণী জাতিকে কিছু অনুকরণ করিতে দাও, কোনটি আসল ও কোনটি নকল বুঝা ভার হইবে। ফিজির লোকদিগকে তোমার ভাষায় কিছু বল, সে তোমার মত ভঙ্গি করিয়া কথাগুলি ঠিক উচ্চারণ করিবে। আণ্ডামান ও অষ্ট্রেলিয়ার লোকদিগকে প্রশ্নের যথাযথ উচ্চারণ করিতে দেখা যায়। স্মৃতি বা চিন্তা শক্তি খাটাইতে হয়, এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অসভ্যের মন যেন টলমল করিতে থাকে। ব্রাজিলের অসভ্যেরা দুই একটী উত্তর দিয়া অধীর হইয়া পড়ে ও নির্ব্বোধের মত কথা বলিতে থাকে। দামারা জাতি পাঁচটির অধিক গণিতে হইলে বিষম গোলে পড়ে। একটা ভেড়ার দুই আটি তামাক দাম হইলে, দুইটী ভেড়ার পরিবর্ত্তে কয় আটি তামাক পাইবে হিসাব করিতে পারে না। এক বার দুই আটি দিয়া একটী লইয়া লুকাইয়া, আবার দুই আটি তামাক দিতে হয়। অথচ একপাল গরুর মধ্যে একটি হারাইলে অনায়াসে বুঝিতে পারে, কারণ ভিন্ন ভিন্ন গরুর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি তাহাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে,,।

অতিবিশ্বাস অসভ্যের লক্ষণ। অথচ একটী নূতন পদার্থ দেখিলে তাহার তথ্য জানিতে তাহাদের কিছুমাত্র কৌতুহল হয় না, বুঝিবার ক্ষমতা না থাকিলে বুঝিতে ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছার অভাবে চেষ্টা জন্মে না। আজ যে সূর্য্য উঠিল, এটী কাল উঠিয়া ছিল কি না জিজ্ঞাসা করিলে অনেক জাতি বলিতে পারে না।

দেহের ন্যায় অসভ্যের বুদ্ধি বৃত্তি অতি অল্প বয়সেই ফুটিয়া যায়। অসভ্য বালক সভ্য বালক অপেক্ষা প্রখর। ইহা হিন্দু, নিগ্রো ও জাতির মধ্যে পরীক্ষা করিয়া বিশেষ দেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয় পল্লব।

আমরা স্থানান্তরে দেখাইব, প্রাচীন কালে সাধারণতঃ শত্রুকুল হইতে স্ত্রী গ্রহণের পদ্ধতি ছিল। তাহারই ফলে অসভ্য-সমাজে শ্বশুর বংশীয়দিগের প্রতি বিচিত্র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালি বধুরা স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কথা কওয়া বা তাঁহাকে মুখ দেখান বড় লজ্জার বিষয় মনে করে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় কোন কোন স্থানে শাশুড়ির সহিত স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী বা বয়োজ্যেষ্ঠ দেবরের সহিত বাক্যালাপ রীতি-বিরুদ্ধ। আমাদের দেশে মামা শ্বশুরের অঙ্গ স্পর্শ করিতে বা তাহার সহিত কথা কহিতে নাই। মানভুম অঞ্চলে কোড়া কুর্ম্মি প্রভৃতি আদিম জাতিদিগের মধ্যেও এই রীতি, কিন্তু মামা শ্বশুরের বাজনার তালে তালে নৃত্য করা ভাগিনেয়-বধুর পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। উত্তর আমেরিকায় অসভ্যদিগের মধ্যে শাশুড়ি জামাতার সহিত কথা কয় না। বিশেষ আবশ্যক হইলে জামাতার দিকে পিছন করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা কথা চালাইতে হয়। ওমাহা জাতির মধ্যে শ্বশুর কি শাশুড়ি জামায়ের সহিত কথা কয় না। তাহা-দের মুখ দর্শন করা কি নাম উচ্চারণ করা জামায়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। কালিফর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে জামাতা শ্বশুরপক্ষীয় কাহারও মুখ দর্শন করে না। কেহ আসিয়া পড়িলে পাশ কাটিয়া পলাইতে হয়, বা লুকাইতে হয়। কিরি দাকোটা ও কারিব জাতির মধ্যে, ফ্লরিডা দেশে ও ব্রাজিলবাসি অরবাক জাতির মধ্যেও এই নিয়ম। কারিব জামায়েরা শ্বশুরের বাড়ীতে, শ্বশুর জামায়ের বাড়ীতে প্রবেশ করে না। মোগল ও কালমক বধুরা শ্বশুরের সহিত কথা কহিতে বা তাহার সমক্ষে বসিয়া থাকিতে পারে না। চিন দেশে শ্বশুর পুত্রবধুর মুখ দর্শন করে না, হঠাৎ দেখা হইলে শ্বশুরকে মুখ লুকাইতে হয়। বোর্ণিয়ো ও

ফিজি দ্বীপেও এই রীতি। অষ্ট্রেলিয়ায় শ্বশুর শাশুড়ি ও জামাতার নাম ধরা নিষেধ। মধ্য আফরিকায় বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া গেলে ভবিষ্যৎ শ্বশুর শাশুড়ীর মুখ দর্শন রীতি-বিরুদ্ধ। কখন সে কুকার্য্য সম্ভব হইলে শ্বশুর শাশুড়ীকে ঘোমটা দিতে হয়। কাফির মহিলারা স্বামীর গুরুপক্ষীয় কাহারও নাম মনে আনিতে পারে না। দায়ে পড়িয়া আমাদের মেয়েরা যেমন "কৃষ্ণ" কে "কেষ্ট"ও"হরি" কে "ফরি"বলে, সেখানেও সেইরূপ। জামায়েরা শাশুড়ীর সহিত এক বাড়ীতে বাস করিতে বা তাহার নাম ধরিতে পারে না। দক্ষিণ আফরিকার বুসমান ও বাসুট জাতির মধ্যেও এই রীতি।

আসিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে এবং পলিনেসিয়ার সর্ব্বত্র রাজার নামের প্রতি দেবভক্তি দেখাইতে হয়। বস্তুতঃ পূর্ব্ব পুরুষ বা দেশীয় প্রধানগণই মৃত্যুর পরে দেব নামে পূজিত হয়। দেব জাতির জন্ম কথা ষোড়শপল্লবে আলোচিত হইবে। ভারতবর্ষের রাজা দেবতার অবতার। শ্যাম দেশে রাজার নাম ধরিতে নাই, উপাধি ধরিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ব্রহ্মদেশে রাজার নাম বীজমন্ত্রের ন্যায় গোপনীয়। কোন জন্তুর নামে টাহিটি সর্দ্দারের নাম হইলে সেই জন্তুর নাম পরিবর্ত্তন করিতে হয়। নবজিলণ্ডে সর্দ্দারের নাম জল বলিয়া জলের নাম বদলাইয়া দিতে দেখা গিয়াছে। ট্যাসমেনিয়ার আদিপোন জাতির মধ্যে, কাফির ও জুলুদের মধ্যেও এই প্রথা। উত্তর আমেরিকায় মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়ের নিকট সে কথা আনিতে নাই। আবিপোন জাতি মৃত ব্যক্তির নাম না করিয়া অতীত পুরুষ বা গত মহাশয় বলে। যদি কোন ফুয়েজিয়ান শিশু মৃত পিতা মাতার কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, সে অমনি বলে "চুপ চুপ, খারাপ কথা মুখে আনিও না।" সামোয়া জাতি সঙ্কেতে মৃত ব্যক্তির উল্লেখ করে, নাম করে না। অষ্ট্রেলিয়ার পাপুয়ান জাতির মধ্যে, আফ্রি-

কার মশাই জাতির মধ্যে এবং য়ুরোপে শেটল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে এই রীতি লক্ষিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার মৃত ব্যক্তির নাম কোন বস্তুর নাম হইলে সে বস্তুর নাম পরিবর্ত্তিত হয়। ভূতের নাম সয়তান বলিয়া য়েজিদ্ জাতি নদীকে সৎ না বলিয়া লহর বলে, এবং সুতার নাম কয়তান বলিয়া সে নাম উচ্চারণ করে না। দায়াক জাতি বসন্তরোগের নাম উচ্চারণ করে না, সর্দ্দার বা বন পাতা অভিধানে ইঙ্গিত করিয়া থাকে; উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা দেশে "দেবীর দৃষ্টি" বা "মায়ের অনুগ্রহ" বলে। এ দেশে রাত্রিতে সাপকে লতা, বাঘকে মামা এবং মাছ ধরিবার সময় কাঁকড়া না বলিয়া দশরথ বলিতে হয়। সুন্দরবনের লোকেরা বাঘকে শৃগাল বলে। সাইবিরিয়ার তুঙ্গুজ জাতি ও আনামদেশের লোকেরা ঠাকুরদাদা বা প্রভু এবং সুমাত্রা দ্বীপে বুনো বা পূর্ব্ব পুরুষ বলে। লাপলাণ্ডের লোকেরা ভালুককে বুড় মানুষ বলিয়া থাকে।

অসভ্য সমাজে একটি আশ্চর্য্য রীতির কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। আবিপোন জাতির সন্তান হইলে পিতাকে মাদুর মুড়ি দিয়া সন্তান কোলে করিয়া এক কোণে পড়িয়া থাকিতে হয়, গায়ে যেন বাতাস না লাগে; তাহাকেই আঁতুর ঘরে থাকিতে হয় ও উপবাস করিতে হয়। ছেলের কোন ভাল মন্দ হইলে সকলেই পিতাকে দোষী করে। ব্রাজিল দেশে কোরোডো জাতির কাহারও স্ত্রী গর্ভবতী হইলে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস করিতে হয়। সন্তান হইবার পূর্ব্বে তাহাকে আহার বিষয়ে সাবধান হইয়া চলিতে হয়, মাংস খাইতে নাই, মাছ ও ফল খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয়। গায়েনার উত্তরাংশে আকয়িবো ও কারিবি জাতি বাস করে। তাহাদের কাহারও সন্তান হইলে পিতাকে কাপড় মুড়ি দিয়া শিশু কোলে করিয়া শুইয়া থাকিতে হয়, ধাত্রী তাহারই সেবা করে।

সন্তান-প্রসবের পরেই প্রসূতি রন্ধন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। উত্তর আমেরিকার শোষোণ জাতির মধ্যে স্ত্রীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে স্বামীকে দ্বার বন্ধ করিয়া একাকী বসিয়া থাকিতে হয়। গ্রীনলাণ্ডে কাহারও সন্তান হইলে পিতা কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সকল প্রকার কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে। কামাস্কাটকায় কাহারও সন্তান সম্ভাবনা হইলে প্রসবের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে স্বামীকে সকল প্রকার কঠিন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। কারিব জাতির স্ত্রী প্রসব-কার্য্যের অব্যবহিত পরেই গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। স্বামী শিশু পালন করে। তাহাকেই ঝাল মসলা পাঁচন খাইয়া উপবাস করিতে হয়। এইরূপে চল্লিশ দিন প্রসবগৃহে বাস করিবার পরে নিমন্ত্রিত বন্ধু বান্ধব আসিয়া তাহাকে প্রহার করিতে থাকে। প্রহারে সর্ব্বশরীর রক্তাক্ত হইলে গোলমরিচের গুঁড়া-মিশ্রিত জলে দেহ ধৌত করিয়া আবার শোয়াইয়া দেয়। এইরূপে আঁতুড়ঘরে আরও দশ বার দিন তাহাকে কাটাইতে হয়। প্রহারের সময় অভাগা কাঁদিলে বা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে শিশুর অমঙ্গল হয়। শিশুর ছয় মাস বয়স পর্য্যন্ত মৎস্য মাংস আহার পিতার পক্ষে নিষেধ। দায়াকদের সন্তান হইলে পিতা ধারাল অস্ত্র বা বন্দুক ব্যবহার করিতে পারে না এবং কয়েক দিন নির্জ্জন বাস করিতে এবং নিরামিষ খাইয়া থাকিতে হয়। পিতার আহার গুরুতর হইলে শিশুর উদরাময় হইতে পারে। (১) কালিফর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ান, পশ্চিম আফরিকার জুকেলি ও চীন দেশবাসী মিয়াঞ্জি

(১) কোন কোন জাতির মধ্যে স্বামী পাখী পুষিলে স্ত্রীকে মাছ মাংস মসলা পরিত্যাগ করিতে হয়. নতুবা পাখীর পেটের পীড়া হইতে পারে। যদি কোন কারণে পাখী মরিয়া যায়, স্ত্রীকে প্রহার সহ্য করিতে হয়। কারণ তাহারই আহারদোষে যে পাখী মরিয়াছে, তাহার সন্দেহ কি?

জাতির মধ্যে এবং পুর্ব্বোপদ্বীপের বোরো দেশে সন্তান হইলে পিতাকে ঔষধ ও পথ্য খাইতে হয়। কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী তিবারেণী জাতির স্ত্রী প্রসব করিলে স্বামী বিছানায় পড়িয়া গোঁয়াইতে থাকে, স্ত্রী স্বামীর সেবা করে ও পথ্য দেয়। পুর্ব্বে স্পেন দেশে এই রীতি প্রচলিত ছিল। এখনও পিরানিস পাহাড়ে বাস্ক জাতির মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে। শ্রীরঙ্গপত্তন এবং মলয় উপকূলে কোন কোন জাতির কাহার সন্তান হইলে পিতাকে এক মাস শুধু ভাত খাইয়া থাকিতে হয়। গুরুপাক দ্রব্য আহার ও তামাক সেবন তাহার পক্ষে নিষেধ।

জন্তু বিশেষের মাংস ভক্ষণ করিলে সেই সব জন্তুর গুণাগুণ ভক্ষয়িতা প্রাপ্ত হন, ইহা অনেক দেশে বিশ্বাস। এ দেশে রাতকানা রোগ সারাইবার জন্য কলার মধ্যে জোনাকি পোকা খাইতে দেয়; সন্তানের চক্ষু আয়ত হইবে বলিয়া গর্ভিণীরা হরিণ মাংস খায়; কিন্তু চক্রযুক্ত মৎস্য আহার নিষেধ, ছেলের গায়ে চক্র হইতে পারে। কাঁকড়া খাইলে শিশুর মুখে গাঁজলা উঠে। বাঘের মত সাহসী হইবে এবং পেচকের মত রাত্রিতে দেখিতে পাইবে বলিয়া মাহুতেরা হাতীকে বাঘের ও পেচকের মাংস খাওয়ায়। দায়কেরা পুরুষদিগকে হরিণ মাংস খাইতে দেয় না। পুরুষদিগকে যুদ্ধ করিতে হয়। হরিণ মাংস খাইয়া তাহারা হরিণের ন্যায় ভীরুচিত্ত হইতে পারে। নানা দেশে যুবতীকে ভেক মাংস খাওয়ায়, কারণ ভেক রমণী এককালে অনেকগুলি ডিম্ব প্রসব করে। উকুন ও ছারপোকা শীঘ্র শীঘ্র প্রসব করে, প্রসব বেদনায় কষ্ট না হইবার জন্য বাঙ্গালা দেশে গর্ভিণীকে পানের মধ্যে উকুন ও ছারপোকা খাওয়ায়। কারিব জাতিরা কচ্ছপ ও শূকরের মাংস খায় না। খাইলে তাহাদের মত চক্ষু ক্ষুদ্র হইতে পারে। ইহারা কুকুরের মত সাহস ও বুদ্ধি হইবে বলিয়া কুকুরের যকৃৎ খায়।

আরবেরা বলে, উটের মাংস খায় বলিয়া তাহারা এত উদ্ধত স্বভাব। শীকারে উৎসাহী এবং নির্ভয় হইবার জন্য সাইবিরিয়ার লোকেরা ভল্লুক মাংস ভক্ষণ করে। কাফির জাতি ব্যাঘ্র, সিংহ, সর্প ও হস্তী মাংস শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া রাখে। উহার এক একটু খাইলে ঐ সকল জীবের গুণ তাহাদের দেহে প্রবেশ করে। চীন দেশীয় একটী ভৃত্যকে গোপনে নর ফুস্ ফুস্ খাইতে দেখা গিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল যে, উহা এক জন বীর পুরুষের ফুস্ ফুস্। অনেক অসভ্য জাতি এই কারণে যুদ্ধহত শত্রুর মাংস ভক্ষণ করে। নবজিলণ্ডের লোকেরা শিশুকে প্রস্তর কুচি খাইতে দেয়, আশা শিশুর হৃদয় কোমলতাশূন্য হইবে। এস্কিমো জাতি বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের গলায় ইংরাজদিগের জুতার তলার মালা পরাইয়া দেয়; তাহাদের বিশ্বাস যে ইংরাজের অনেক সন্তান হয়, সুতরাং সংসর্গ গুণে তাহাদের জুতারও সে শক্তি জন্মিয়া থাকে। দেহ-সংস্পর্শে কাপড় বা জুতা, নখ বা চুল, হাতের লেখা, দেহের প্রতিকৃতি এবং দেহীর নামও পর্য্যন্ত দেহীর সকল গুণ সংযুক্ত হয়, অল্পবুদ্ধি নানা জাতি অসভ্যের ইহা সাধারণ বিশ্বাস। কাহাকেও তাহাদের প্রতিকৃতি আঁকিতে দেখিলে অসভ্যেরা ভীত হয়। কারণ চোখ, কাণ, হাতের প্রতিমূর্ত্তির সহিত তাহাদের প্রাণের অংশও ছবিতে অবশ্য উঠিয়া যায়। সুতরাং ছবি যত ভাল হয়, তাহাদের ভয়ের কারণও তত বৃদ্ধি হয়। উত্তর আমেরিকা, বোর্ণিও, দাহোমি, ল্যাপলাণ্ড ও অন্যান্য অনেক স্থলে ইহা দেখা গিয়াছে। অসভ্যেরা মনে করে যে, শত্রুর একটা ছবি পাইলে তাহাকে যাদু করিতে বা বাণ মারিতে বড় সুবিধা হয়। উত্তর আমেরিকার গুণীরা বনের কোন পশু মারিতে হইলে ঘাস কি কাপড় দিয়া তাহার মুর্ত্তি গড়িয়া তাহার উপর তীর মারে।

পেরুদেশের যাদুকরেরা কাহাকে পাগল করিতে বা মারিয়া ফেলিতে হইলে হস্ত নির্ম্মিত তাহার মুর্ত্তিতে ছুঁচ ফোটায়, চাপিয়া ধরে বা

অন্ধকারে বসাইয়া রাখে। আমাদের দেশে সাধারণের বিশ্বাস, গঙ্গা-তীরে গোবরে কাহার মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার উপর বাণ মারিলে সে মরিয়া যায়। পূর্ব্বে য়ুরোপে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল। বোর্ণিওর যাদু-করেরা মোম দিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া ক্রমে ক্রমে গলাইয়া ফেলে। ব্রহ্মদেশের কিরাত জাতি যেখানে শত্রুর পায়ের দাগ পড়ে, সেখানকার মাটীতে মূর্ত্তি গড়িয়া তুলার বীজ ফুটাইয়া দেয়, অমনি শত্রু বোবা হইয়া যায়। নাম দেহের অংশ বলিয়া বিশ্বাস থাকাতে এবং নাম জানিতে পারিলে লোকে ক্ষতি করিতে পারে ভাবিয়া অসভ্যেরা আপন নাম কাহাকেও বলিতে চায় না। এমন কি প্রতিবেশীমণ্ডলেও প্রকৃত নাম গোপন করিতে চেষ্টা করে। আমাদের রাশিনাম বীজ-মন্ত্রের ন্যায় বন্ধুবান্ধবের নিকটেও গোপনীয়। রোমকেরা রোমনগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম কাহাকে বলিত না, পাছে শত্রুরা পাণ্ডু-শিবির-প্রহরী মহাদেবের ন্যায় দেবতাকে ভুলাইয়া দেশটি কাড়িয়া লয়। বোর্ণিওর লোকেরা কাহারও পীড়া হইলে তাহার নামটি বদলাইয়া ফেলে, কারণ যে অপদেবতা তাহার নাম জানিতে পারিয়া এত উৎপাত করিতে ছিল; নূতন নাম জানিতে না পারিয়া সে আর কষ্ট দিতে পারিবে না। মোহক জাতীয় একটি বৃদ্ধ এক জন সাহেবকে বড় ভালবাসিত, সেইজন্য সে আপন নামটি সাহেবকে দিয়াছিল। নামের সহিত সেই দিন হইতে মোহক বৃদ্ধের সমস্ত পুণ্য-গৌরব সাহেব লাভ করিয়াছিলেন। চীনদেশীয় চিকিৎসকেরা ঔষধ না মিলিলে একখানি কাগজে ঔষধের নাম লিখিয়া কাগজ-খানি ধুইয়া জল খাইতে বা দগ্ধ করিয়া ভস্ম সেবন করিতে ব্যবস্থা দেয়। কোরাণের শ্লোক ধোয়া জল খাইলে পীড়া আরোগ্য হয়, ইহা মুসলমান সাধারণের বিশ্বাস। শিকন্দ্রার আকবরের কবর প্রাসাদের একখানি প্রস্তর এইরূপে ধুইয়া অর্দ্ধেক ক্ষয় করা হইয়াছে।

প্রতিকৃতি ও নামের ন্যায় নখ চুল দন্ত বা উচ্ছিষ্ট যাদুকরের নিকট বড় মূল্যবান। দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপ পুঞ্জের সর্দ্দারেরা নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলে ভৃত্যগণ যত্নের সহিত লুকাইয়া ফেলে। কোন গুণী জানিতে পারিলে বিষম বিপদ ঘটাইতে পারে। টানা দেশে কাহারও পীড়া হইলে সে বুঝিয়া লয়, দুর্ব্বৃত্ত যাদুকর তাহার উচ্ছিষ্টে নল পাকাইয়া পোড়াইতেছে। যাদুকরের অনুসন্ধান করিয়া উৎকোচ দিবার জন্য বন্ধুবান্ধবগণ ডঙ্কাবাজাইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। এইরূপ বিশ্বাস আমেরিকা, পলিনেসিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, সিংহল, আফরিকা ও ইতালী দেশে অদ্যাপি লক্ষিত হয়। আফরিকার লোকেরা মৃত শত্রুর দেহাংশ শিঙ্গা ও ঢাকের সহিত বাঁধিয়া রাখে। সে যন্ত্রগুলি বাজাইবার সময় শত্রুর প্রেতাত্মা পর্য্যন্ত যন্ত্রনায় অস্থির হয়।

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্মতত্ত্ব।

রামকৃষ্ণ কেরাণী আফিষ হইতে আসিয়া জলযোগান্তে অন্তঃপুরের খোলা ছাদে আড় হইয়া পড়িয়া আছেন, তাঁহার সেকেলে গোছের ধর্ম্মনিষ্ঠ-পতিব্রতা গৃহিণী পার্শ্বে বসিয়া মৃদু মধুর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"নাথ, ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব কি, কলিতে কোন্ দেবতা সর্ব্বপূজনীয়, তাহা আমাকে সবিস্তারে উপদেশ প্রদান করুন।"

রামকৃষ্ণ অহিফেন-স্তিমিত-নেত্রে গম্ভীর, বদনে বলিলেন,—"প্রিয়ে, অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। ধর্ম্মবিষয়ে নানা মুনির নানা মত, বিশেষ পূর্ব্ব ঋষিগণ ধর্ম্মের যে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন, কলিতে তাহা গতাব্দী পঞ্জিকা হইয়াছে, অতএব কলির প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব ও কলির সর্ব্বারাধ্য দেবতার বিষয় আমি সংক্ষেপে যাহা বলিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।—

শ্রীরামকৃষ্ণোবাচ।

চাকুরি-ব্রতই কলির প্রকৃত ধর্ম্ম, চাকুরেই কলির সর্ব্বপূজনীয়, সর্ব্ব-শক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসহিষ্ণু দেবতা।

এই সূত্রের টীকা ভাষ্য করিতে হইলে, রাশি রাশি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গ্রন্থ লিখিয়াও শেষ করা যায় না, কিন্তু তোমরা কোমলাঙ্গরা রমণী, তোমাদের স্বল্প বুদ্ধির উপযোগিতা অনুসারে আমি সংক্ষেপতঃ যাহা বলিতেছি, তাহাই শ্রবণ কর—তোমার মুক্তিমন্দিরের দ্বার আর অর্গল-বদ্ধ রহিবে না।

কোন্ কাল হইতে চাকুরির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা প্রত্ন-তত্ত্ববিদের প্রপিতামহের সাধ্য নাই। যুগান্ত হইতেছে, মহাপ্রলয় ঘটিতেছে, পৃথিবী প্রলয়কারণ-বারিতে ধুইয়া মুছিয়া যাইতেছে, তথাপি যখনই মানবচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তখনই চাকুরের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাহার নয়নে নিপতিত হইয়াছে। অতএব ইহা দ্বারাই সিদ্ধান্ত হইতেছে, চাকুরের আদি নাই—সুতরাং চাকুরেই **অনাদি**।

যে শক্তি দ্বারা প্রকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, যদ্দ্বারা প্রকৃতি-পুরুষ একত্র মিলিত হইয়া প্রজা-উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছে, তাহাই সংসারে আদি কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। চাকুরি দ্বারাই জগতে পুরুষ প্রকৃতির সহিত মিলিত হইতে সক্ষম হয়। চাকুরে চাকুরি দ্বারা সংসার সৃষ্টি করিয়া তবে অপত্যাদি প্রজাগণের উদ্ভব করেন, অতএব চাকুরেই—**আদি**।

পৃথিবীর এমন স্থান নাই, যেখানে চাকুরে নাই, সুতরাং চাকুরেই **সর্ব্বব্যাপী**।

চাকুরের গা আর গণ্ডারের গা উভয়ই তুল্য—মারিলে দাগ-চড়ে না, প্রভুর লৌহ-গজাল-বিদ্ধ সপাদুক পদাঘাত-আহারে ইহাদের শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ঊষা হইতে পুনরায় ঊষা পর্য্যন্ত

এক স্থানে বসিয়া অনাহারে অনিদ্রায় লেখনী সঞ্চালনই ইহাদের শক্তির প্রভূত প্রমাণ। যাহার এত শক্তি, সেই চাকুরেই সর্ব্বশক্তিমান্।

পৃথিবীতে চাকুরে সকলই সহিতে পারে, সুতরাং চাকুরেই সর্ব্বসহিষ্ণু।

প্রভুর বাপান্ত আহার করিতে, পাদুকা-প্রহার সহ্য করিতে, প্রভুর মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য মিথ্যা কহিতে, অপরের সর্ব্বনাশ করিতে, ধর্ম্ম-জ্ঞানকে বিসর্জ্জন করিতে, চাকুরের মনে কোনই বিকার নাই, সুতরাং চাকুরেই নির্ব্বিকার।

কৃষি ও বাণিজ্য করিলে লোকে মুদি ও চাষা বলিয়া কলঙ্কিত হয়; চাকুরের অঙ্গে এরূপ কোন অঞ্জন নাই, সুতরাং চাকুরেই নিরঞ্জন।

চাকুরে নিত্য বর্ত্তমান, বিশ্ববিদ্যালয় সকল যে সমস্ত অকাল কুষ্মাণ্ড কাঁঠালের আমসত্ত্ব নিরন্তর প্রসব করিতেছেন, তাহাতে ভাবী কালেও কখন চাকুরের অভাব হইবে না, সুতরাং চাকুরেই—সনাতন।

চাকুরে প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, মূর্খতাদি ত্রিগুণ-বিশিষ্ট, সুতরাং চাকুরেই সগুণ।

চাকুরের উদরে বোমা মারিলেও ক অক্ষর বাহির হয় না, সুতরাং চাকুরেই নির্গুণ।

ঘটনা-সমুদ্রে প্রভুর খেয়ালরূপ বটপত্রে ইহাঁরা দিবা নিশি টল-টলায়মান; প্রভুর অনন্ত ক্রোধের অনন্ত ফণার উপর ইহাঁরা অবিশ্রান্ত শয়ান; কলির ব্রাহ্মণ ইংরাজের পদচিহ্ন ইহাঁদের বক্ষে বিরাজমান, সুতরাং চাকুরেই বিষ্ণু।

নিজ পদ-বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট পরনিন্দা করিতে ইহারা চতুর্ম্মুখ। ইহাঁদের গৃহে স্ফাটিক কমণ্ডলুতে সুরারূপা সুরধুনী

বিরাজমানা, হংসপুচ্ছ লইয়াই ইহাঁদের প্রধান কারবার, সুতরাং চাকুরেই **ব্রহ্মা**।

• প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবার জন্য ইহাঁরা হিন্দু হইয়াও মুদ্দাফরাসের কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত নহেন; পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে ইহাঁদের লোহিত চক্ষু দিবানিশি ঢুলু ঢুলু; রাজপথের ধুলায় অঙ্গ ধুসরিত, কণ্ঠে হিংসারূপ কালকুট। সুতরাং চাকুরেই **মহেশ্বর**।

ইহাঁরা সকলের নিকট হইতেই উৎকোচাদিরূপ পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং চাকুরেই **সর্ব্বারাধ্য**।

পরছিদ্র অন্বেষণ করিতে ইহাঁরা সহস্রলোচন, মনুষ্যে শত অশ্বমেধ করিতে উদ্যত হইলে শতক্রতু যেরূপ যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করিয়া থাকেন, ইহাঁরাও সেইরূপ আপন সমকক্ষ চাকুরেকে বিপদে ফেলিতে তাহার বাণ্ডিল হরণ করেন; অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের বিপক্ষে রিপোর্ট প্রদানই ইহাদের বজ্রাঘাত। সুতরাং চাকুরেই **ইন্দ্র**।

প্রভুরূপ সূর্য্যের পার্শ্বে ঘুরিতে ঘুরিতে যদি ভাগ্যবশতঃ একটু সেই সূর্য্যের কৃপারশ্মি তাঁহার উপর নিপতিত হয়, অমনি তাঁহার বিমল সুখ্যাতি-জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ছাইয়া পড়ে, গেজেটে গেজেটে সে কৌমুদী বিকীর্ণ হয়, কিন্তু প্রভুর চরণ সেবার কলঙ্ক টুকু তাঁহার হৃদয়ে লাগিয়াই থাকে, সুতরাং চাকুরেই **চন্দ্র**।

যদি মধ্যম নারায়ণ বিষ্ণুতৈল প্রদানের ফলে চাকুরে হাকিমি আকাশে উদয় হন, তখন তাঁহার নিকটে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য? সে প্রখর তেজে মস্তক পুড়িয়া যায়, প্রাণ আইঢাই করে, সকলে পলাই পলাই ডাক ছাড়িতে থাকে। সুতরাং চাকুরেই **সূর্য্য**।

বায়ু যেমন এখানকার কথাটি ওখানে বহন করিয়া থাকে, চাকুরেকেও সেইরূপ সকল স্থানের সংবাদ—সত্য হউক মিথ্যা হউক—প্রভুর কর্ণে তুলিতে হয়, সুতরাং চাকুরেই **বায়ু**।

অধীনস্থগণের প্রতি কুপিত হইলে ইহাঁরা কৃতান্তরূপে তখনই তাহা-দের চাকুরি-লীলা সাঙ্গ করেন, সুতরাং চাকুরেই যম।

চাকুরেই পুরুষ, চাকুরেই প্রকৃতি। যেহেতু যখন ধড়াচূড়া বান্ধিয়া চাকুরে কাছারি উজ্জ্বল করিতে গমন করেন, পাঁচীর মা প্রভৃতি ইহাঁদের রূপ দেখিয়া হয়তো মনে মনে কতই পতিনিন্দা করিতে বসে। আবার যখন ইহাঁরা কাছারি হইতে আসিয়া রন্ধনশালায় হাঁড়ী লইয়া ব্যস্ত হন, তখন প্রকৃতি ইহাদের নিকট লজ্জা পাইয়া অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করে।

অতএব প্রিয়ে, কায়মনোবাক্যে চাকুরের উপাসনা কর, ভবসমুদ্রের জল ভাগিরথীর ন্যায় দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া যাইবে, তখন অনা-য়াসে হাঁটিয়া পার হইতে পারিবে। ইতি

শ্মশান-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আবার সেই জলদ-গম্ভীর স্বরে শ্মশান প্রাঙ্গন ধ্বনিত হইতে লাগিল, বক্তা আবার সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ভ্রাতৃগণ, সেই কুচক্রপূর্ণ, কুটিলতাময় সংসারের পাপজাল কি অদ্যাপি তোমাদের স্মরণ আছে? সে দুর্দ্দান্ত লোভ, সে পিশাচ-মোহ, সে অনিত্য আত্ম-সুখ-স্পৃহা কি সকলে ভুলিয়াছ? যদি ভুলিয়া থাক, তবে আমাদের এই নবাগত বন্ধুর আত্মবিবরণ শ্রবণে সকলে আপনা-পন নিদ্রিত স্মৃতি জাগ্রত করিয়া লও, তাহা হইলে জানিতে পারিবে, আমরা কি ভীষণ দুঃখময় নরকের পরিবর্ত্তে কেমন শান্তিময় অমৃতধাম লাভ করিয়াছি।"

এই বলিয়া বক্তা পার্শ্বস্থিত একটি প্রেতের হস্তধারণ করিয়া সম্মুখে আনিলেন; কিন্তু, হরি হরি, কি দেখিলাম! প্রেতের পদনখর হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে নীল অনল গম্ গম্ করিয়া জ্বলিতেছে, স্থির নিষ্কম্পভাবে সে শিখা অনবরত ধু ধু করিতেছে, অথচ সে দেহ পুড়িয়া ছাই হইতেছে না। যেমন ভাবে সেই ১১এ ফাল্গুন শুক্রবার রাত্রে আমার সোণার কমলের চতুর্দ্দিকে ধু ধু করিয়া জ্বলিয়াছিল, প্রেতের শরীরে তেমনি করিয়া অনল জ্বলিতেছে, অথচ তেমন করিয়া পোড়াইয়া ছাই করিতে পারিতেছে না। কেন পারিবে?—অগ্নিদেব! এ ত আর কালের ক্ষণভঙ্গুর রাজ্য নহে। এখানে যাহারা আসিয়াছে, তাহারা কালজয়ী। অনল! তোমাদের আমি ভাল করিয়া চিনিয়াছি, তোমরা মর্ত্ত্যধামে পঞ্চভূতরূপে মহাকালের পাঁচটি ভৃত্য মাত্র। তোমরা নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, পরশ্রীকাতর, পরপীড়ক। পরের সুখ দেখিলে তোমাদের হৃদয় ফাটিয়া যায়, অমনি বজ্রমুষ্টিতে সেই সুখলতার মূল ধরিয়া টানাটানি করিতে থাক। এই হৃদয়-পিঞ্জরে সাধ করিয়া একটি পাখী পুষিয়া রাখিয়াছিলাম, পাখিটি আমার মনের মন, প্রাণের প্রাণ ছিল। সংসারে আমি আর কোন সুখে সুখী ছিলাম না, আর কোন সুখ বাঞ্ছাও করিতাম না, কেবল নির্জ্জনে বসিয়া হৃদয়-পিঞ্জরের দ্বার খুলিয়া পাখীটির সহিত হৃদয়ের খেলা খেলিতাম, হৃদয়ের কথা বলিতাম। মরি, মরি, সে কত সুখেই ছিলাম; কিন্তু তোমাদের ক্রূর হৃদয়ে সে সুখ সহিল না। বল দেখি, আমার সে পাখীটির প্রাণ-বায়ু টুকু বাহির করিয়া তোমার সহভূত মরুতের কি লাভ হইল? যে মরুতের অসীম দেহ বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে, আমার প্রাণপাখীর প্রাণের ভিতর তাহার কণিকামাত্র রাখিতে কি তোমাদের সহিল না? সে অণুমাত্র বায়ু বাহির করিয়া লইয়া তোমাদের কি লাভ হইল?—আর তুমি, অগ্নিদেব! তোমাকেও জানিলাম, এই তো

এখানে কত বেগে জ্বলিতেছ, কত বল প্রকাশ করিতেছ, অথচ কৈ. কিছুই তো করিতে পারিতেছ না। কিন্তু মনে করিয়া দেখ দেখি. সেই শ্মশান ক্ষেত্রে আমি ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া বিনীত-ভাবে, কাতর-স্বরে তোমায় দুই দণ্ড কাল অপেক্ষা করিতে বলিলাম, একটু রহিয়া রহিয়া জ্বলিতে বলিলাম, তুমি তাহা শুনিলে না, আমার প্রাণময়ীর চিতার তলদেশ হইতে হাসিয়া হাসিয়া আমায় বিদ্রুপ করিলে, দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমেষে সেই অমূল্য রূপরাশি ভস্ম করিয়া ফেলিলে। কিন্তু যাক্——আমার নিজের দুঃখগীত গাইয়া আর কি করিব?

নবাগত প্রেত শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই গম্ভীর-বদনে নবাগত প্রেতের মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। নবাগত একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আত্ম বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিল।

আমি জমিদার।

"তবে বলিব, আমার জমিদারি-জীবনের কুটিলগতি এক একটি করিয়া অঙ্কিত করিব; এ হৃদয় মধ্যে যাহা কিছু এত দিবস লুকাইয়া রাখিয়া-ছিলাম, তাহা ভাঁজে ভাঁজে, পরদায় পরদায় খুলিয়া দেখাইব। আর সহ্য হয় না, এই দেখ, হৃদয় ক্রমাগত জ্বলিতেছে, পাপানলে হৃদয় পুড়িয়া গেল, আর কত সহিব, হৃদয় জ্বালা নির্ব্বাণ হয় না। সব যায়, স্মৃতি যায় না; এ পাপ স্মৃতি যায় যায়, যায় না; অনবরত গমে গমে পুড়িতেছে, তথাপি একেবারে পুড়িয়া ছাই হইতেছে না। সেই পৃথিবীর কথা এখন মনে পড়িতেছে, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরকের কথা এখন বুঝিতেছি। যখন সময় ছিল, বুঝাইবার লোক ছিল, তখন বুঝিলাম না; যখন বুঝিলে মজিতাম না, তখন বুঝিলাম না, এখন মজিয়াছি, বুঝিয়াছি। যত দিন পৃথিবীতে ছিলাম, তখন পাপীর দণ্ডের কথায় হাসিতাম, নরকের ভীষণ কল্পনা তর্কজালে আচ্ছন্ন

রাখিবার চেষ্টা করিতাম——সে সমস্ত কথা কেমন করিয়া বলিব? জগদীশ, তোমার অস্তিত্বে সংশয় করিয়া নাস্তিক উপাধি লাভে ব্যগ্র হইতাম। এখন সব জানিয়াছি, এখন সব দেখিয়াছি। এখন বুঝিয়াছি, তুমি অপূর্ব্ব কৌশলে মানবের স্মৃতি মধ্যেই স্বর্গ নরকের সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি সকলই আমাদের আয়ত্বাধীনে রাখিয়াছিলে, আমি ইচ্ছা করিলেই অনেকানেক মহাপুরুষের ন্যায় এই ভীষণ যন্ত্রণার পরিবর্ত্তে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে পারিতাম, কিন্তু আমি মূর্খ, পাপী, দুরাচার, পাষণ্ড——আপন দুষ্কৃতির ফলে সেই অপার অনন্ত সুখের বিনিময়ে এই ভীষণ দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ক্রয় করিয়াছি।

১২৪৫ সালে কুদিনে, কুক্ষণে, এই হতভাগা সংসার-সোপানে প্রথম পদার্পণ করে। সংসার—পাপের খনি, যন্ত্রণার রঙ্গভূমি, বিলাস-কানন। এ সংসারে পদে পদে ভয়, পদে পদে বিড়ম্বনা, পদে পদে সর্ব্বনাশ। ইহাতে সুপথ কুপথ দুইই আছে, কিন্তু প্রকৃত পথ অবলম্বন করা কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? সুপথ গিরিসঙ্কটাবর্ত্মের ন্যায় বন্ধুর, দুরারোহ, দুর্গম—পথিক দূর হইতেই সে পথে প্রণিপাত করে। আর কুপথ?—সুন্দর, সুদূর-বিস্তৃত, সুপ্রশস্ত রাজমার্গের ন্যায় পথিকের নয়ন সম্মুখে হাসিতেছে, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ বিবিধ কুসুমিত বৃক্ষ লতাদি বসন্ত সমীরণে দুলিয়া দুলিয়া হাত তুলিয়া পথিককে নিমন্ত্রণ করিতেছে—উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের সাধ্য কি সে লোভ দমন করে?—আমিও এই লোভে পড়িয়াছিলাম, এই ভ্রমে ভুলিয়াছিলাম, এইরূপে মজিয়াছিলাম। তখন বুঝিলাম না যে, ঐ দৃষ্টিশোভাকরবর্ত্ম অগার অভ্যন্তরস্থ নরকগর্ভ প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য একখানি তরল আবরণ মাত্র। কিন্তু যাক্—এ শাস্তিধামে এ কথা সকলেই জানেন।

অতুল ঐশ্বর্য্যবান জমিদারের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাই স্বর্ণাদি খচিত হইয়া আদরে আদরে, কোলে কোলে, নব নব সোহাগে

শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আহা—সে সুখের কাল আর আসিবে না। শৈশবকালই মানবের প্রকৃত সুখের কাল, তখন অন্তর অকপট, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার। অন্তরে, বাহিরে, চক্ষে, কার্য্যে সর্ব্বত্রই সরলতা; তখন চিন্তার কণ্টকে অন্তর বিদ্ধ করে না, পাপতরঙ্গে হৃদয় আন্দোলিত হয় না, পিশাচলোভ লৌহকরে কেশাকর্ষণ করিতে পারে না। তখন সুনীল গগনে জলদস্তর থাকে না; কুসুমে কীট থাকে না; সুমধুর, সুমন্দ, দক্ষিণ পবনে সংক্রামকতা স্পর্শ করে না। তখন ভক্তিতে ভয় থাকে না, শ্রদ্ধায় বিদ্বেষ থাকে না, স্নেহে ক্রোধ থাকে না। মরি মরি—সে কি সুখের কাল—তখন অমল হৃদয় ঝিতল হয় না। ভালবাসায় ভাগী থাকে না, প্রণয়ে কণ্টক সঞ্চার হয় না।

ক্রমে ক্রমে আমার বাল্যকাল উপস্থিত হইল। তখন হৃদয়ে জ্ঞানের কলি দেখা দিয়াছে, তাহারই বলে বুঝিলাম—আমি জমিদারের পুত্র, যাহা ইচ্ছা করিব, তাহাই হইবে, যাহাকে রাখিব, সেই থাকিবে, যাহাকে মারিব, তাহাকে কেহই রাখিতে পারিবে না। দুরন্ত মাৎসর্য্য এই নবীন বয়সেই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল, সেই বয়সেই আমার নবীন মস্তক ঘুরাইয়া দিল; নবীন কুসুমে কীট প্রবেশ করিল। প্রতিবেশী দরিদ্র সন্তানগণের সহিত ক্রীড়া করিতে মন উঠিত না, দরিদ্র-গৃহে গমন করিতে ঘৃণা বোধ হইত, মনে মনে ভাবিতাম, দরিদ্রগণ কুক্কুর বিড়ালের ন্যায় আমাদের ক্রীড়ার উপকরণ মাত্র। সর্ব্বনেশে চাটুকারগণ সেই বাল্যকালেই আমার সর্ব্বনাশে রত হইল, আমাকে স্বর্গে উঠাইয়া, ইন্দ্রের সিংহাসনে বসাইয়া, আমার নবীন হৃদয়ে অনল প্রজ্বলিত করিয়া দিল—আমার সর্ব্বনাশ হইল। পৃথিবীতে এই চাটুকার অপেক্ষা ভয়ানক জীব নাই। আপন স্বার্থসিদ্ধির মানসে তোমার গৃহে আসিবে, তোমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে ছিদ্র করিবে, শোণিতে শোণিতে মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিবে, তোমার গাত্রের

চর্ম্ম, চরণের ধূলি হইয়া থাকিবে, কিন্তু অনবরত অতর্কিতে গরল ঢালিয়া তোমার সুখময় জীবন একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিবে। এখন ইচ্ছা করে, এই গভীরা রজনীতে আমার এই মূর্ত্তিতে একবার সেই সংসারে যাই, রাজ-অট্টালিকা হইতে ভিখারীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া সকলকে জাগ্রত করি, আমার হৃদয়ের অগ্নি সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া তারস্বরে বলি—"এ জ্বালার প্রধান কারণ চাটুকার, চাটুকারের হস্তে সাবধান"।

এই ভাবেই বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিলাম; এই সময়ে সংসারের অমৃতস্বরূপ, মরুভূমির সরোবরস্বরূপ, নিদাঘের অনিলস্বরূপ সুখময় মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইলাম—মা আমার ভবলীলা সাঙ্গ করিলেন।

মার জন্য দুই দিন কাঁদিলাম, তৃতীয় দিনে আমার চাটুকারগণ মায়ের মঙ্গলময়ী ছবিখানি আমার অন্তর হইতে মুছাইয়া লইল। ধনী মাত্রেরই এরূপ হয় কি না, তাহা জানি না, তবে আমার নিজের বিষয় বলিতে পারি,—ধন-মদে আমার হৃদয়ের সমুদায় কোমলভাব অন্তর করিয়াছিল। মাতার মৃত্যুর পর আমার স্নেহময় পিতার স্নেহ আমার প্রতি গাঢ়তর হইতে লাগিল; আমিই তাঁহার একমাত্র সন্তান ছিলাম, তিনি আমায় এক দণ্ড নয়নের অন্তরালে রাখিতেন না। আমি যাহা করিতাম, তাহাই তাঁহার চক্ষে সুন্দর বোধ হইত, আমার কুপথ গমনের কথা কেহ তাঁহার কর্ণগোচর করিলে, তিনি স্নেহভরে তাহা বিশ্বাস করিতেন না—বরং "চাঁদে কলঙ্ক" বলিয়া তাহা উড়াইয়া দিতেন। বস্তুতঃ পিতা আমার প্রতি ঐকান্তিক স্নেহে এত অন্ধ ছিলেন যে, আমাকে তিনি অকলঙ্ক চাঁদের অবতার বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন,—আমি যে কুকর্ম্ম করিতে পারি, এ ভাব তাঁহার মনে ভ্রমেও হইত না। পিতা আদর দিয়া আমার মাথাটি বিশেষ করিয়া খাইলেন।

আমি হিন্দুস্কুলে ইংরাজি পড়িবার জন্য কলিকাতায় গেলাম। সংসারে থাকিতে সে প্রসিদ্ধ প্রবাদটি বোধ হয় আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন যে, লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়ে এক স্থানে কখনই থাকিতে পারেন না। আপনাদের এ কথায় কত দূর বিশ্বাস বলিতে পারি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস তো অটল। বড় মানুষের ছেলের বিদ্যাভ্যাস!!— কথাটি মনে হইলে; আমার এত দুঃখেও একটু হাসি পায়। বরং সমুদ্রজল সুস্বাদ হইবে, কুইনাইনে মিষ্টতা হইবে, কম্বল লোমশূন্য হইবে, তথাপি, আমি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি, বড় মানুষের ছেলের মস্তিষ্কে বিদ্যার আদ্যক্ষর প্রবেশ করিবে না। এক জন জমিদার যথার্থই বলিয়াছিলেন,—"বড় মানুষের ছেলে সকল বেটাই মূর্খ, কেবল ধরা পড়িয়াছি আমি।" তবে আপনারা দৃষ্টান্তস্থলে বলিতে পারেন—কেন, ঘটীন্দ্রকুমার, বাটীন্দ্র বাহাদুর?—আমি স্বীকার করি, সে বাহাদুরের বাহাদুরি যথেষ্ট· নাম যথেষ্ট, সম্মান যথেষ্ট। তাহার পণ্ডিতমণ্ডলীতে আদর যথেষ্ট, রমণী-সমাজে আদর যথেষ্ট, রাজকুলে আদর যথেষ্ট। কিন্তু সে আদর কিসের? ধনের, না বিদ্যার? অতি মহামূর্খেও যদি তাহার ন্যায় লোষ্ট্রবৎ অর্থ নিক্ষেপ করে, লোভী ব্রাহ্মণের নৈবেদ্যের বারকোসে টাকার খুরি বসাইয়া দেয়, ষোড়শোপচারে পূজার উপকরণ সম্মুখে রাখিয়া গললগ্নীকৃতবাসে দীনভাবে রাজপুরুষের চরণ লেহন করে, তাহা হইলে সেও তাঁহার ন্যায় মূর্খেন্দ্রকৃষ্ণ, বর্ব্বরেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিতে পারে, তাহার নামও পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোষিত হয়। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এক জন মূর্খদাস জমিদার কেবলমাত্র নাম কিনিবার আশায় অন্য-কল্পিত বিষয়াবলি দেশ বিদেশে আপন বলিয়া প্রচার করিতেছে। এই সমস্ত প্রতারক মূর্খাদপিমূর্খ! কিন্তু যাক্—পরের কথায় আমার কাজ কি?

আমি স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। অল্প দিবসের মধ্যে সেখানেও আমার ন্যায় অন্যান্য বড় মানুষের অকালকুষ্মাণ্ডগণের সহিত বন্ধুত্ব জন্মিল। পড়া শুনায় জমিদারের ছেলেদের চিরকাল যে প্রকার আস্থা থাকে, আমাদেরও সেই প্রকার ছিল। কলিকাতার প্রলোভনহ্রদে পড়িয়া প্রতিদিন নূতন নূতন পাপে হৃদয় পঙ্কিল করিতে আরম্ভ করিলাম। পৃথিবীতে পাপের সাজা হাতে হাতেই পাওয়া যায়, আমিও পাইলাম। ব্যভিচারের ভীষণ পরিণাম, অবশ্যম্ভাবী ফল, আমার অঙ্গে ফুটিয়া উঠিল—দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া স্কুল ছাড়িয়া বাড়ী গেলাম,—কালেজের পড়া শুনা শেষ হইল।

স্নেহান্ধ পিতা তখনও "চাঁদে কলঙ্ক" বলিয়া আমার কলঙ্ক উড়াইয়া দিতেন। তিনি এই সময়ে বৃন্দাবন দর্শনাভিলাষী হইয়া আমার হস্তে সমুদায় বিষয়ের ভার অর্পণ করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। আমি ভৃত্যগণের প্রভু, প্রজার জমিদার, বাড়ীর কর্ত্তা হইয়া পিতার গদিতে বসিলাম—আপনাকে সর্ব্বেসর্ব্বা ভাবিলাম।

(ক্রমশঃ)

মাসিক সমালোচক ও খেয়াল সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় রচনা প্রবন্ধাদি, সমালোচ্য গ্রন্থাদি ও কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

ব্যারিং বা ইন্সফিসিয়েণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না। যাঁহারা পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উত্তর লেখা যাইবে না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা ডাকের টিকিটে মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় ৵০ আনা কমিসন দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যে টিকিট যেন কেহ না পাঠান। মনি অর্ডারে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর ডাকঘরে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন, তাঁহাদিগের নিকট পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪৲ টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে, সুতরাং বিনা মূল্যে দেওয়া এক কালে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্র ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

উকীলাবাদ, বহরমপুর।
১২৮৯ সাল, ১৫ই বৈশাখ।

শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী।

(৩য় খণ্ড।) (৯ম সংখ্যা।)

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল

সংযোজিত।

(সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচক।)

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১২৮৯ সাল, পৌষ।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বহরমপুর,—অরুণোদয় যন্ত্রে
শ্রীভগবানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৶ আনা।

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল।

ছোট বৌর ঝাঁপি।

গরলে অমৃত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ছত্র-ভঙ্গ।

গোবিন্দ দারোগাকে বন্দী দিয়া সাঁওতালগণ একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, পাঁচ সাত শত সাঁওতাল এক এক মাঝির অধীনে দলবদ্ধ হইয়া এক এক দিকে গ্রাম লুটিতে যাত্রা করিল; কেবল যোগেশের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে মাঙ্করু অধীনস্থ সাঁওতালগণ রক্তপাত হইতে বিরত রহিল। বিদ্রোহী সাঁওতালগণ গঙ্গাদেবের রাজবাটী কেন্দ্র করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম সকলের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি তথায় সংগ্রহ করিতে লাগিল, দশ পনের দিবস মধ্যেই গঙ্গাদেবের রাজবাটী নানাবিধ দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া গেল। অবোধ সাঁওতালগণ ইংরাজের বল কখনই দেখে নাই, ইংরাজের কামানের কত বিক্রম, তাহা তাহারা কখনই অনুভব করে নাই। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, ইংরাজেও বুঝি তাহাদিগের ন্যায় ধনুর্ব্বাণহস্তে রণক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইবে, তাই তাহারা বিজয়-নিশ্চয় হইয়া রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

যোগেশচন্দ্র দুঃখিত-হৃদয়ে সাঁওতালগণের এই সমস্ত গর্হিত কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। তিনি এক এক বার মনে করিতে লাগিলেন—"ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করি, তথায়

সুবিচার হয়, নিষ্কৃতি পাইব, অবিচার হয়, ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন করিব, তথাপি যে কার্য্য কর্ত্তব্য-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে মনে জানিতেছি, নিকটে থাকিয়া তাহার প্রশ্রয় দিতে পারিব না„। তিনি আবার ভাবিলেন, “আমি যদি এখন সাঁওতাল রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাই, তাহা হইলে কাঞ্চনপাহাড়ীর সাঁওতালগণ, যাহারা কেবল আমার কথাতেই এতাবৎ কাল বিশুদ্ধ রহিয়াছে, তাহারা উত্তেজিতগণের সহিত মিশ্রিত হইয়া নরশোণিতপাতে লিপ্ত হইবে। ইংরাজ রাজ তো আমার সকল দোষের মূল বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের জন্য তাঁহাদের ফাঁসী কাষ্ঠ অপেক্ষা করিতেছে—করুক্—তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, তবে শেষ পর্য্যন্ত আমি যেন কর্ত্তব্যসাধনে বিরত না হই। বুঝাইয়া সাওতালগণকে নিরস্ত করা আমার কর্ত্তব্য। যাহারা শত শত বার আমার উপকার করিয়াছে, তাহাদিগকে যদি এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষা করিতে না পারি, তবে আমার জীবনই বৃথা। সাঁওতালগণ এক্ষণে অন্ধ হইয়াছে, তাহাদের সম্মুখে যে কি ভয়ানক অগ্নি প্রজ্বলিত, তাহা না দেখিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহাদিগকে এই বিপদ-সঙ্কুল স্থানে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করা কি আমার উচিত? এখন পলাইয়াই বা কি ফল হইবে? আমি ইংরাজের নিকট যে দোষী, সেই দোষীই থাকিব, লাভে হইতে সাঁওতালগণের উপকার হইবে না। ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করা তো কেবল মরিতে যাওয়া। মৃত্যু তো যখন তখনই আছে, মরিলে তো আর কাহারও উপকার করিতে পারিব না, মরিবার পূর্ব্বে সাঁওতাল রাজ্যের এই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারি কি না দেখিব। সাঁওতালেরা আমার কথা এক বার শুনে নাই, দুই বার শুনে নাই, তিন বার শুনে নাই, চতুর্থ বারে শুনিবে। এবার আমি তাহাদের পায়ে ধরিয়া কাঁদিব, তাহাদের প্রতি জনকে সাধিব,

তাহাদের বিপদ তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিব—বিপদ হইতে উদ্ধার করিব—তখন নিশ্চিন্তচিত্তে ইংরাজের ফাঁস রজ্জু গলায় পরিব।”

এই প্রকার স্থির করিয়া যোগেশচন্দ্র মাঙ্গক, বুদ্ধি প্রভৃতি কাঞ্চন-পাহাড়ীর প্রধান প্রধান সাঁওতালগণকে ডাকাইয়া বিদ্রোহানল-নির্ব্বাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রে কাঞ্চন পাহাড়ীর শিরোদেশে সমাগত সমস্ত সাঁওতাল মাঝি একত্রিত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বসিল। যোগেশচন্দ্র, এক এক করিয়া স্পষ্টরূপে তাহাদিগকে প্রকৃত বিপদ বুঝাইয়া দিলেন, তাহাদের ইংরাজজয়ের আশা যে আকাশ-কুসুম, অর্থহীন ও বলহীন হইয়া এ প্রকার স্বাধীনতা-লাভের উদ্যম যে কাষ্ঠ-মার্জ্জারের সাগর বন্ধনের উদ্যমের ন্যায়, তাহা তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলেন, সমস্ত শুনিয়া মাঝিরা শান্তমূর্ত্তিতে স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিল।

অতি প্রত্যূষে সাঁওতাল সৈন্য কুচ হইতে লাগিল, যোগেশচন্দ্র স্বয়ং তাহাদিগকে বিন্ধ্যাচলে পার করিয়া রাখিয়া আসিবেন স্থির করিয়া সুসজ্জীভূত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন, মাঙ্গক, বুদ্ধি প্রভৃতি সাঁওতালগণও তাঁহার অনুকরণ করিল। হিরণ গড়ের নিবিড় জঙ্গল অতিক্রম করিতে তাঁহাদের প্রায় এক প্রহর বেলা হইল। তৎপরেই ব্রহ্মাণী নদী, নদী পার হইয়া এক ক্রোশ অন্তরে একটি প্রান্তর মধ্যে সাঁওতালেরা ছাউনী ফেলিয়া আহার করিতেছে, কেহ আহার করিয়া শয়ন করিয়াছে, কেহ বসিয়া গল্প করিতেছে, কেহ নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময়ে যোগেশচন্দ্র দেখিলেন, পূর্ব্বদিকে তাঁহাদের অৰ্দ্ধ ক্রোশ মাত্র দূরে প্রান্তর জুড়িয়া ইংরাজসৈন্য আসিতেছে। আর সময় নাই, সকলকে সাবধান করিতে করিতে শত্রুসৈন্য নিকটস্থ হইয়া পড়িল; তখন যোগেশচন্দ্র শত্রুকে তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানাইবার জন্য

এক জন সাঁওতালকে একটি শ্বেত পতাকা-হস্তে শত্রু মধ্যে প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ সেনানায়ক এই যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে মনে মনে কালমেমীর লঙ্কাভাগ করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি সাঁওতাল জয় করিবেন, গবর্ণর জেনারেল তাঁহার মস্তকে হস্ত দিয়া তাঁহাকে স্বর্গে উঠাইবেন, দেশে বিদেশে বৃহৎ বৃহৎ সংবাদপত্রে তাঁহার যশঃ নিনাদিত হইবে, শেষে ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে „ব্যারণ সাঁওতেলা„ উপাধি দিবেন, তাঁহার মনের এই প্রকার ভাব। শ্বেত পতাকা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, সাঁওতালেরা যুদ্ধ না করিলে তাঁহার তো সমস্ত আশাই বিফল হইয়া যায়, যুদ্ধ করিতেই হইবে, অতএব তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিয়া পতাকাধারীর প্রতি গুলি বর্ষণ করাইলেন। নিরীহ নির্দ্দোষ সাঁওতাল পতাকা-হস্তে ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব পাইল। পতাকাধারী পড়িল দেখিয়া যোগেশচন্দ্র অন্যান্য সাঁওতালগণকে সাবধান হইতে বলিবেন ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে সাঁও-তাল সৈন্য মধ্যে শিলাবৃষ্টির ন্যায় গুলিবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে সাঁওতালের মৃতদেহে প্রান্তর ছাইয়া গেল, অনেকে প্রাণের দায়ে ব্রহ্মাণী নদীতে ঝম্পা প্রদান করিল। চারি দিকে ছত্র ভঙ্গ, যে যে দিকে পাইতেছে, প্রাণ লইয়া পলাইতেছে, পশ্চাতে চাহিবার অবসর নাই, ইংরাজ সৈন্যের বন্দুক অবিশ্রান্ত কর্ণ বধির করিয়া গর্জ্জন করিতেছে, ও প্রতি গর্জ্জনে সাঁওতালরক্তে পৃথিবী প্লাবিত হইতেছে। যখন প্রথমে গুলি বর্ষণ আরম্ভ হয়, তখন যোগে-শচন্দ্র ক্ষিপ্র হস্তে আপনার অশ্ব সজ্জিত করিয়া অশ্ববল্‌গা হস্তে নদী তীরবর্ত্তী একটি বনপার্শ্বে বুদ্ধিচাঙ্গের সহিত দাড়াইয়াছিলেন, এক্ষণে ইংরাজগণকে আগতপ্রায় দেখিয়া বলিলেন "বুদ্ধি আর সময় নাই, শীঘ্র নদীপার হইয়া হিরণগড়ের বনে আশ্রয় লও, যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে দেখা হইবে, নচেৎ——কাঞ্চনমালা ও জয়াবতী—"

যোগেশচন্দ্র আর বলিতে পারিলেন না, শত্রু আসিয়া পড়িল, তিনিও তড়িদ্বেগে অশ্বারোহণ করিয়া ব্রহ্মাণীর জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। ইংরাজের বিজয়-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল, সাঁওতাল যুদ্ধ জয় হইল, সেনাপতি স্ফীতহৃদয়ে অশ্বপৃষ্ঠে সোজা হইয়া বসিলেন, শেষে যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, বৃক্ষ-শাখায় তাহাকেই ফাঁসি দিতে লাগিলেন।

—— ——

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দরবার।

রাত্রি ৭টা বাজিয়াছে। হুমায়ুনমঞ্জিলের উদ্যানভবনে একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে নবাব নাজিম একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক জন রক্ষক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জনাবালীকে বিনীতভাবে অভিবাদনপূর্ব্বক করযোড়ে হেটমুণ্ডে দাঁড়াইল। জনাবালী তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিলে সে তাঁহার সম্মুখে একটি হীরক-অঙ্গুরীয় স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—“জনাব, এই অঙ্গুরীয়-বাহক এক জন বাঙ্গালী জনাবালীর দর্শন-প্রত্যাশী—বান্দার গোস্তাকী মাপ হয়।” অঙ্গুরীটি হস্তে করিয়া জনাবালী অনেকক্ষণ বিস্মিতভাবে ভাবিলেন, শেষে রক্ষককে বলিলেন—“অঙ্গুরীয়-বাহককে লইয়া আইস।” দুই মুহূর্ত্ত অন্তে ধীরে ধীরে গৃহদ্বার পুনরুন্মুক্ত হইল এবং পরক্ষণেই যোগেশচন্দ্র ছিন্নমূল তরুর ন্যায় নবাব নাজিমের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। নবাব নাজিম অনেক ক্ষণ ধরিয়া বিষণ্ণদৃষ্টিতে যোগেশের মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন, শেষে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে বলিলেন—“হতভাগা, যাহা নিষেধ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাই ঘটাইয়া বসিয়াছ!” যোগেশের মনোমধ্যে রাশি রাশি কথা থাকিলেও মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি দুই হস্তে

নবাব নাজিমের দুইখানি চরণ ধরিয়া, চরণের উপর বদন রাখিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পরে নবাব নাজিম বলিলেন—“যোগেশ, রাজদ্বারে যাহা অপেক্ষা অপরাধ নাই, তুমি সেই অপরাধে অপরাধী,—তুমি এখন রাজদ্রোহী! পূর্ব্বে আমার নিষেধবাক্য শুনিলে না, এ অন্তিম কালে আমি এখন তোমার কি করিব?” যোগেশচন্দ্র এবার ধীরে ধীরে বদন তুলিয়া ছল ছল চক্ষে নবাব নাজিমের মুখ প্রতি চাহিলেন, যেন কি বলিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। আবার নবাব নাজিম বলিলেন—“যোগেশ, জান, গবর্ণমেণ্ট তোমার প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করিয়াছেন?”

ধীরে ধীরে গদগদ কণ্ঠে যোগেশচন্দ্র বলিলেন—“জনাব, পিতঃ, অধম সকলই জানে, এই নরাধমের অকিঞ্চিৎকর জীবন গ্রহণ করিতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ব্যগ্র হইয়াছেন। নিতান্ত দুঃখিতহৃদয়ে জনাবালী বলিলেন—“যদি জান, তবে শেষ সময়ে আমার হৃদয়ে আঘাত করিবার জন্য কেন আমার সহিত দেখা করিতে আসিলে?”

যোগেশচন্দ্র বলিলেন—“পিতঃ, শেষ সময়ে আপনার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি, বিশেষ আপনাকে একটি কথা জানাইবার জন্য আসা—অধম শেষ কাল পর্য্যন্ত আপনার আজ্ঞাবহ দাস এক দিনের জন্যও এ দাস জনাবালীর আজ্ঞার বিরুদ্ধ কার্য্য করে নাই।

বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে জনাবালী বলিলেন—“যোগেশ, তুমি কি পাগল হইয়াছ——আমি কবে তোমায় বিদ্রোহী হইতে আজ্ঞা করিয়াছিলাম? যোগেশচন্দ্র বলিলেন—“যে দিন সে কথা বলিব, সে দিন মস্তকে বজ্রাঘাত হইবে।”

নবাব নাজিম বলিলেন—“তবে কি তুমি বিদ্রোহাচরণ কর নাই?” যোগেশচন্দ্র বিনীতভাবে বলিলেন—“দেব, পৃথিবীতে যদি ন্যায়

বিচার থাকিত, তাহা হইলে আজ আমার প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে পুরস্কার বিধান হইত।"

এই বলিয়া যোগেশচন্দ্র সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিলেন ও শেষে তিনি দিগম্বরের গৃহ হইতে যে সমস্ত কাগজ লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা নবাব নাজিমের হস্তে প্রদান করিলেন। সে সমস্ত কাগজ গাট্রে ও গোবিন্দ দারোগার চিঠি। তাহারা সময়ে সময়ে যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, সাঁওতালগণকে অস্ত্রধারণ করিতে তাহারা যেপ্রকারে বাধ্য করিয়াছিল, তাহারা অত্যাচার নিবারণ করিতে অস্ত্রধারণ করিলে গাট্রে প্রভৃতি সেই কার্য্যটিকে যে প্রকার ছলনায় রাজবিদ্রোহ বলিয়া অতিরঞ্জন করিয়াছিল, তৎসমুদায় ঐ সকল কাগজে প্রকাশ ছিল।

নবাব নাজিম এক একখানি করিয়া সমস্ত কাগজ পাঠ করিলেন—শেষে যোগেশের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—যোগেশ, তুমি নিশ্চয় বলিতেছ, তুমি রাজদ্রোহিতা অপরাধে অপরাধী নও?"

যোগেশচন্দ্র বলিলেন—"আমার তো মৃত্যু আসন্ন, এই মৃত্যুকালে কি দেবসদৃশ জনাবালীর নিকট মিথ্যা কহিতে আসিয়াছি?"

নবাব নাজিম বলিলেন—"যোগেশ, বোধ হয় তুমি অবগত আছ, এই সাঁওতালী হাঙ্গামার জন্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর স্বয়ং এখনি আসিয়া আমার হাজারদুয়ারী গৃহে বাস করিতেছেন। কল্য তিনি দরবার করিবেন। আমি তোমায় পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি, মুর্শিদাবাদের নবাব এক্ষণে বিষহীন ফণী—যাহাহউক তোমার জন্য আমি একবার শেষ পর্য্যন্ত দেখিব।—আমার সহিত আইস—"

নবাব নাজিম যোগেশকে সঙ্গে লইয়া চারি ঘোড়ার গাড়িতে হাজারদুয়ারী ভবনে গবর্ণর জেনারেলের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিলেন।

পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী গৃহে মহাধুম ধামে দরবার বসিয়াছে। সর্ব্বোচ্চ আসনে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর, তন্নিম্নে নবাব নাজিম, তন্নিম্নে অন্যান্য বাদসাহজাদা আকর্ব্বা, আমীর ওমরাহ উচ্চ পদস্থ সাহেবগণ বসিয়াছেন। দরবার গৃহ জম্ জম্ করিতেছে। প্রহরী পরিবেষ্টিত যোগেশচন্দ্র পার্শ্বে হেটমুণ্ডে দাঁড়াইয়া আছেন, গবর্ণর জেনারেল স্বয়ং তাহার বিচার করিবেন, সকলেই সোৎসুকচিত্তে সেই বিচারের প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্যান্য কার্য্য সমাধা হইলে গবর্ণর জেনারেল যোগেশচন্দ্রকে ডাকিলেন। যোগেশ যথাবিহিত বিনীত-ভাবে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন, গবর্ণর জেনারেল বলিতে লাগিলেন—

"যোগেশচন্দ্র তোমার সমুদয় কাগজ পাঠ করিয়া তোমার প্রকৃত অবস্থা আমরা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। পূর্ব্বে ঘটনার অবস্থা আমরা যে প্রকার জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে তোমার প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা বিহিত বলিয়াই আমাদের বিবেচনা হইয়াছিল এবং সেই-জন্যই আমরা সে প্রকার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে তোমাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জানিয়া আমরা তোমায় সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি দিলাম।

"তোমার এক প্রধান স্বাক্ষীর মুখে শুনিলাম, (এই বলিয়া গবর্ণর জেনারেল নবাব নাজিমের প্রতি মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিলেন) তুমি এত দিবস সাঁওতালগণের মধ্যে কল্পিত রাজা হইয়া ছিলে, সাঁও-তালগণ তোমায় প্রকৃত রাজার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে, অতএব তুমি সাঁওতাল রাজা কেমন সুশৃঙ্খলায় শাসন করিতে পার, তাহা দেখিবার জন্য আমি এই প্রকাশ্য দরবারে তোমায় মহারাজা উপাধি প্রদান করিলাম। এই বিদ্রোহকাণ্ডে যে সমস্ত সাঁওতাল লিপ্ত ছিল, তাহাদের সকলকেই আমরা মার্জ্জনা করিলাম।"

গবর্ণর জেনারেলের বলা সাঙ্গ হইলে নবাব নাজিম বলিলেন, সাঁওতাল পরগণার মধ্যে ব্যাঙ্গভোর ও মশাদহ পরগণায় আমার যে স্বত্ব আছে, তাহা এই প্রকাশ্য দরবারে আমি যোগেশচন্দ্রকে প্রদান করিলাম। যোগেশ, তুমি অদ্য হইতে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐ দুই পরগণা পরমসুখে ভোগ দখল কর, আমার উত্তরাধিকারিগণের তাহাতে কোন অধিকার থাকিবে না।

নবাবের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ এক জন ওমরাহ একখানি দানপত্র (বোধ হয় পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিল) নবাব নাজিমের হস্তে প্রদান করিলেন। নবাব তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া যোগেশের হস্তে অর্পণ করিলেন, যোগেশচন্দ্র পূর্ণহৃদয়ে নবাবের চরণ স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

গরলে অমৃত।

মহারাজা যোগেশচন্দ্র মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া গঙ্গাদহে উপস্থিত হইলেন, তথায় শুনিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচার শুনিয়া হতাশচিত্তে সাঁওতাল রাজ্য মধ্যে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে গিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র রাজবাড়ীর যথাবিহিত প্রহরা নিযুক্ত করিয়া কাঞ্চন পাহাড়ীতে গমন করিলেন। সেখানে বুদ্ধি কি মাঙ্কক কাহাকেও না পাইয়া যে স্থানে তিনি কাঞ্চনমালা ও জয়াবতীকে রাখিয়াছিলেন, সেই পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন।

যোগেশচন্দ্র যখন যোগিনীর মুখে কাঞ্চনমালাসম্বন্ধীয় গুপ্তকথা শ্রবণ করেন, সেই সময় হইতেই তিনি কাঞ্চনমালার আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি হৃদয় ভরিয়া, প্রাণের প্রাণ দিয়া কাঞ্চনমালাকে ভালবাসিয়াছিলেন—সে ভালবাসা নির্ম্মল, নিঃস্বার্থ, স্বর্গীয়।

যখন তাঁহার কাঞ্চনমালা লাভের আশা ছিল, তিনি তখন তাঁহাকে যে পরিমাণে ভালবাসিতেন, তাঁহাকে পাইবেন না স্থির জানিয়াও সে ভালবাসার অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই; তবে পার্থক্যের মধ্যে সে পার্থীব প্রণয় এক্ষণে স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত হইয়াছে, কাঞ্চনমালার মুখ যোগেশের হৃদয়ের একমাত্র শান্তি।

আর সে সরলা কাঞ্চনমালা? সে হৃদয়ের বেগ, সে হৃদয়ের তরঙ্গ, সে হৃদয়ের বৈরাগ্য কেমন করিয়া বর্ণন করিব? যোগেশের মুখে যোগিনীর গুপ্ত কথা শ্রবণ করিয়া অবধি বালার হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়াছিল। তিনি পৃথিবীতে এক যোগেশচন্দ্র ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না; যোগেশচন্দ্র তাঁহার মস্তকের মণি, হৃদয়ের নিধি, অঞ্চলের রত্ন; সেই যোগেশকে তাঁহার হারাইতে হইল, অবলার নবীন সরল প্রাণে বজ্রাঘাত হইল! সেই অবধি যোগেশচন্দ্রকে দেখিলেই তাঁহার হৃদয়ের মূলদেশে আঘাত লাগিত, উরুদ্বয় থর থর করিয়া কাঁপিত, চরণে চরণ বাধিত। তিনি যেন যোগেশের নিকট কত অপরাধী, যোগেশের সহিত কথা কহিতে হইলেই তাঁহার কণ্ঠ ও তালু শুকাইত, যোগেশকে দেখিলেই তিনি অন্য দিকে চলিয়া যাইতেন। ফলতঃ অভাগিনী জীবন্মৃতা হইয়া ছিলেন

উদ্দেশ্যহীন জীবন অসার বংশের অঙ্গার। কাঞ্চনমালার জীবন তাঁহার নিকট সেইরূপ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু জয়াবতীকে পাইয়া অবধি তিনি আপন দুঃখ অনেক ভুলিয়াছিলেন। কি করিলে জয়াবতী সুখী হইবেন, জয়াবতী কি ভালবাসেন, কিসে তাঁহার মনোবিকার শান্তি হইবে, কাঞ্চনমালা একমনে কেবল সেই ভাবনা ভাবিতেন। ইদানীং জয়াবতীর বিরলবাস আর ছিল না বলিলেই হয়, তিনি প্রায় সর্ব্বদাই কাঞ্চনমালার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, সেরূপ প্রলাপ গীতও আর গাহিতেন না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাঞ্চনমালা

সভয়চিত্তে দেখিতেন, জয়াবতীর রোগোপশমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহ ক্ষয় হইতেছে।

এক দিবস অপরাহ্ণে জয়াবতী পর্ব্বত-শিখরে বসিয়া ঊর্দ্ধমুখে আপন মনে ভাবিতেছেন, মাতা যেরূপ নীরবে বসিয়া স্নেহপূর্ণচক্ষে শিশুর ভাব নিরীক্ষণ করেন, কাঞ্চনমালা সেইরূপে পার্শ্বে বসিয়া একদৃষ্টে জয়াবতীর ভাব দেখিতেছেন। জয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, শেষে আস্তে আস্তে নয়ন দুটি ঘুরাইয়া কাঞ্চনমালার প্রতি চাহিলেন, চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?"

কাঞ্চনমালা কি উত্তর দিবেন? তিনি অনেক ক্ষণ ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু জয়াবতীর চক্ষু তাঁহার মুখের উপরেই ঘুরিতে লাগিল; কাঞ্চন-মালা বুঝিলেন, জয়া এখনও উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছেন, শেষে তিনি সস্নেহে জয়ার হাত দুখানি ধরিয়া মধুর সম্ভাষণে বলিলেন—"বোন্, আমি তোমার দিদি হই"।

জয়াবতী আপন মনে "দিদি" "দিদি" দুইবার বলিলেন——বলিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন—এবারে অনেক ক্ষণের পর আবার কাঞ্চন-মালার প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কি বরাবরই এখানে আছি?"

কাঞ্চনমালা দেখিলেন, জয়াবতীর মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষের ভাব বিকৃত হইতেছে, তিনি জয়ার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন—"দিদি, এস, বেলা গিয়াছে, আমরা বাড়ী যাই।"

জয়াবতী বলিতে লাগিলেন——"দেখ, আমি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছি, এখানে তো ছিলাম না—কোথায় ছিলাম?—না—মনে হয় না—"

জয়াবতী আবার ভাবিতে লাগিলেন। জয়াবতীর ভাব দেখিয়া, কাঞ্চনমালার বিলক্ষণ ভয় হইতে লাগিল, তিনি আবার বলিলেন—"দিদি এস।" সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জয়াবতী আপন মনেই ভাবিতে লাগিলেন—ভাবিয়া ভাবিয়া বলিলেন—"বুঝেছি, যোগেশচন্দ্র আমায় এখানে এনেছেন, তুমি নাকি গা কাঞ্চনমালা ?"

কাঞ্চনমালা বিশেষ ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, "দিদি, আমার মাতা খাও, এস। জয়াবতী যেন সে কথা শুনিতে পাইলেন না, তিনি অনেক ক্ষণ আকাট হইয়া বসিয়া থাকিলেন, শেষে কম্পিত-কণ্ঠে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"উঃ হুঃ! তারা বাবাকে খুন করেছে!!" বালা মুর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। স্বরণী ও অন্যান্য সাঁওতালকন্যাগণের সাহায্যে কাঞ্চনমালা জয়াবতীকে গৃহে লইয়া গেলেন। সে রাত্রি যোগেযাগে কাটিল, কিন্তু কাঞ্চনমালা বুঝিলেন, জয়ার শেষ সময় উপস্থিত। পর দিবস জয়াবতী নিদ্রা যাইতেছেন, কাঞ্চনমালা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া করে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক একদৃষ্টে তাঁহার মুখের ভাব দেখিতেছেন, এমন সময় গৃহমধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির ছায়া পড়িল। কাঞ্চনমালা বদন তুলিয়া দেখিলেন, যোগেশচন্দ্র। যোগেশকে দেখিয়া কাঞ্চনমালা উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে জয়াবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি ধীরে ধীরে কাঞ্চনমালার অঙ্গুলির অগ্রভাগ ধারণ করিয়া বলিলেন—"দেখ, স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, যেন যোগেশচন্দ্র আসিয়াছেন—এ সময়ে যদি তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইতাম ?"

রুদ্ধকণ্ঠে গদগদ বচনে যোগেশচন্দ্র বলিলেন—"দিদি, এই যে আমি তোমার শিয়রে।"

শব্দ শুনিয়াই জয়াবতী মস্তক ফিরাইলেন, যোগেশের প্রতি চাহিলেন, যোগেশের চক্ষুর সহিত সে চক্ষু মিলিল, সুধাময় হাস্যে

তাঁহার বিম্বাধর উচ্ছ্বসিত হইল, কিন্তু তখনি অভাগিনীর নিশ্বাস বায়ু চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল !!

কাঞ্চনমালা ও যোগেশচন্দ্র মৃতদেহের দুই পার্শ্বে বসিয়া হেটমুণ্ডে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, কাহারও উঠিবার শক্তি নাই, মুখেও কথা নাই, এমন সময়ে বাহিরে একটি গোল হইয়া উঠিল। যোগেশ তাঁহার পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার পিতা মূর্চ্ছিতা যোগিনীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রোদন করিতেছেন। যোগিনীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে যোগেশ-চন্দ্র জানিতে পারিলেন—যোগিনীই তাঁহার গর্ভধারিণী, কাঞ্চনমালাই তাঁহার বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী। গণৎকার বৃদ্ধা রমণীর কথা সফল হইল—কাঞ্চনমালা, মহারাজা যোগেশচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিলেন—তাঁহার গরলে অমৃত হইল। বৃদ্ধ মাঙ্গক বুদ্ধির হস্তে স্বরণীকে প্রদান করিল—স্বরণী ও বুদ্ধি কাঞ্চনপা-হাড়ীর বাস উঠাইয়া মহারাজা যোগেশচন্দ্রের আবাসেই বাস করিতে লাগিল, তাহারাও উভয়ে উভয়কে বলিল, "আমাদেরও গরলে অমৃত।"

সম্পূর্ণ।

ভারতে বিদ্যালোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক সময়ে আর্য্যজাতি পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিকে ধন, মান, বিদ্যাবুদ্ধি, সভ্যতা, বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে অধঃকৃত করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, কালে তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিগণকে সেই ম্লেচ্ছেরই পদানত হইতে হইয়াছে এবং অবশেষে তাঁহাদিগকে আপনাদিগের মাতৃভাষা বিদেশীয়ের নিকট

শিক্ষা করিতে হইতেছে। ইহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়! অধুনাতন প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ সতত মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়া যে সমস্ত বিজ্ঞানসূত্র আবিষ্কার করিতেছেন, অন্বেষণ করিলে দৃষ্ট হইবে, সেই সমস্ত বা তদনুরূপ আবিষ্ক্রিয়া, পর্ণকুটীরনিবাসী, হবিষ্যাসী, ফলমূলভোজী ভারতীয় আর্য্যমহর্ষিগণ বহুকাল পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডিত্যাভিমানী ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্বে তাহাদিগের গুরু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে মধ্যাকর্ষণের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা নিউটন জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, ভারতীয় আর্য্যভট্ট তাঁহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মেকিয়াভেলী, ভল্‌তের প্রভৃতি প্রতীচ্য রাজনৈতিকগণ যে সকল নীতি অস্পষ্ট-স্বরে ইউরোপীয় রাজসভায় বিবৃত করেন এবং যাহা প্রায় অধুনাতন সমস্ত ইউরোপীয় রাজনীতির ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছে, সেই সমস্ত কথা অতি বিশদরূপে বহু দিন পূর্ব্বে কুরুমন্ত্রী কণিক উক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের একখানিও প্রকৃত ইতিহাস বিদ্যমান নাই। একটি হিরোদতস্ বা জিনোফন্ ভারতের হইয়া জন্মপরিগ্রহ করেন নাই; ভারতের জন্য অতীত সাক্ষিত্বের নিদর্শনস্বরূপ একটি এক্লোডাস্ কাহার কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের অন্ধতমসাচ্ছন্ন তর্কপথের আলোকবর্ত্তী হয় নাই। অতুল ভারতী কীর্ত্তি ভারতসন্তানগণের হস্তে পড়িয়া কেবল কল্পনামূলক অপ্রকৃত বর্ণনাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইতিবৃত্তপ্রণেতার ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন লেখনী প্রভাবে যাহা চির বিস্ময়জনক ব্যাপারে পরিণত হইতে পারিত, কালের নিবীড় আবরণে তাহা তৃণ-সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যগণের সভ্যতাও মনস্বিতা স্মরণ করিয়া এক্ষণে তৎসন্তানগণের ঈদৃশ শোচনীয় অধঃপতন দর্শনে কে না ব্যথিতচিত্ত হইবেন? কে বা না ইহাদিগকে অমানুষ-প্রকৃতি বলিয়া শতবার ধিক্কার প্রদান

করিবেন? কালের কঠোর শাসনে সকলই লয় পায়, নতুবা এক সময়ে যে ভারতবর্ষ বিদ্যা ও সভ্যতায় সমস্ত জগতের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল, আজ তাহার এইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া কেন হৃদয় মুর্ম্মুরদাহনে দগ্ধীভূত হয়। যে দেশে মনুর ন্যায় ব্যবস্থাপক, ব্যাস কালিদাসের ন্যায় কবি, গৌতম কি গাঙ্গেশ উপাধ্যায়ের ন্যায় দার্শনিক, পাণিনীর ন্যায় বৈয়াকরণ, জয়দেবের ন্যায় গীতকাব্য-রচয়িতা, আর্য্য ভট্ট কি ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় গণিত শাস্ত্রজ্ঞ, কণিকের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ, বৃহস্পতির ন্যায় উপদেষ্টা, চৈতন্যের ন্যায় ধার্ম্মিক, রাম যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রাজা, অর্জ্জুনের ন্যায় বীর, কর্ণের ন্যায় দাতা, ধন্বন্তরির ন্যায় চিকিৎসক, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সমাজ সংস্কারক, বিষ্ণু শর্ম্মার ন্যায় হিতোপদেশক, বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় স্থপতি-বিদ্যা-বিশারদ, ভীষ্মের ন্যায় সারগ্রাহী স্থিরপ্রতিজ্ঞ, লক্ষ্মণের ন্যায় সৌভ্রাতৃক, সীতা সাবিত্রীর ন্যায় সতী, খণা লীলাবতীর ন্যায় বিদ্যাবতী, রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশ যে এককালে কতদূর উন্নত ছিল, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়। সেই প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সন্তান সন্ততির মধ্যেই তাঁহাদিগের পূর্ব্বকালীন প্রতিভার লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। প্রত্যুত তাঁহারা তাঁহাদিগের সমস্ত জাতীয় গৌরব বিস্মৃতি-সাগরে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমুদায় কেমন জঘন্যভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিয়াছেন, এবং যাহারা সেই দেবোপম জাতির পাদপ্রান্তে উপবেশন করিতেও সমর্থ হইত না, আজি সেই প্রাচীন আর্য্যের সন্তানগণই কত শত সহস্র প্রকার পিশাচবৎ কুক্রিয়া করিয়াও ব্রাহ্মণোচিত মান সম্ভ্রম রক্ষণে কত প্রকার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন। এক্ষণে ভারতের এই শোচনীয় দুরবস্থা-দর্শনে কাহার না হৃদয় শোক দুঃখে জর্জ্জরিত হয়? প্রাচীন আর্য্য জাতির

প্রভুত পরাক্রমের সহিত বর্ত্তমান দুরবস্থা তুলনা করিলে যুগপৎ ঘৃণা, লজ্জা ও বিষাদে অবসন্ন হইতে হয় এবং সর্ব্বদাই মনে হয়, কেন পৃথিবী দ্বিধা হইয়া আজও ভারতকে রসাতলস্থ করে নাই। প্রাচীন গৌরবান্বিত আর্য্যগণের বসতিস্থান এই ভারতবর্ষের এতদ্রূপ দুরবস্থায় কালযাপন অপেক্ষা রসাতলস্থ হওয়া শত সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।—

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে,ইদানীং যেমন কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি স্বদেশের হিতসাধন ব্রতে ব্রতী হইয়া নানাবিধ অভাব দূরীকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ভারতবাসী ব্যক্তি মাত্রেরই তদ্রূপ দৃঢ় সংকল্প হওয়া উচিত। বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি কোন বিষয়েই আর্য্যজাতি কোন কালেও হীনপ্রভ ছিলেন না, তাঁহাদিগের সেই উন্নত অবস্থা এবং আমাদিগের অধুনাতন হীনাবস্থা স্মরণপূর্ব্বক সকলেরই উন্নতির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত এবং বিবেচনা করা উচিত, আমরা রত্ন প্রসবিত্রীর সন্তান, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ এতাদৃশ উন্নতি করিয়াছিলেন, আমরা তদ্রূপ কিছুই করিতে পারিতেছি না, অথচ যাহা ছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে হারাইতেছি। ইহা কি সাধারণ ক্ষোভের বিষয়। সর্ব্বথা সচেষ্ট হইয়া যাহাতে ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা বিদূরিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। যদি বল, যখন বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে, উন্নতি হইলেই পতন হয়, জীবন হইলেই মৃত্যু হয়, সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটিয়া থাকে, তখন ভারতের এইরূপ শোচণীয় দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া কেন মনকে বৃথা সন্তাপিত করি? কেনই বা পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব কথা লইয়া বৃথা বাগাড়ম্বর করি? তাহা হইলে প্রত্যুত্তর বলিব। অতি দূর সম্পর্কেও কৃতিত্ব দেখাইয়া মানব-চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন করা যায়, আভিজাত্য গৌরব কোন প্রকারে উদ্দীপ্ত করিতে পারিলে মনুষ্যকে উন্নীত করিতে পারা যায়। ধর্ম্ম বা বিদ্যার আলোচনায় ভারতবর্ষের এক ব্যক্তি বা এক প্রদেশ ও

চরম সীমা দেখাইয়া থাকিলে সেই মূলে স্বজাতীয়তা স্থাপন করিয়া ভারতের একতা সম্পাদন সম্ভবপর। একতা সংসাধিত হইলে ভারতের পূর্ব্বোন্নতির পুনঃপ্রত্যাশা অসম্ভব নহে। স্বীকার করি, বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় হয়, জীবন হইলেই মৃত্যু হইয়া থাকে, কিন্তু একবার এক জাতির উন্নতি হইয়া গেলে সেই জাতি আবার সৌভাগ্য-শিখরে আরোহণ করিতে পারে কি না, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, তিনিই তাহা অবগত আছেন, আপাততঃ তাঁহা না হইবার পক্ষে কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে নিয়মে একবার এদেশ মহৎ হইয়াছিল,সেই সকল নিয়মাবলী পুনর্ব্বার সমবেত হইলে আবার তাহা মহৎ হইতে পারে। ভারতের পুনরুন্নতি যে অসম্ভাবিত নহে, একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা তাহা সপ্রমাণ করিতেছি। প্রাচীন রোমকদিগের কীর্ত্তি-মন্দির ইতালীদেশ এককালে জগতীতলে সর্ব্বপ্রধানরূপে পরিগণিত হইয়াও দুরন্ত অসভ্য জাতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারিয়া তাহাদের ক্ষমতাধীন হইল; কতকাল তাহা অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। আজ কয় বৎসর হইল, তাহাও পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার ইতালী পুণ্যভূমি ইউরোপের সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইয়া সভ্য স্থান মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভারত-ভূমি কি চিরকালই এই অবস্থায় থাকিবে? আর কি ইহার উত্থানের সম্ভাবনা নাই? আর কি কখনও ইহা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে না? আর কি ইহার নাম সমস্ত জগতে প্রতিধ্বনিত হইবে না? হইার সুখ-সূর্য্য কি চিরকালের তরেই অস্তমিত হইয়াছে? আর কি তাহার পুনরুদয়ের সম্ভাবনা নাই? আর কি মহারাষ্ট্রীর তুঙ্গ শৃঙ্গ ভেদ করিয়া শিবজীর ভেরী নিনাদিত হইবে না? পঞ্চনদের পবিত্র-সলিল-কণবাহী সিন্ধু-তীরবর্ত্তী রণজিতের হুহুঙ্কারে আর কি সমগ্র জগত প্রকম্পিত হইবে না? তবে আর কেন আশা সঙ্কুচিত হৃদয়ে এই বিষয়ের প্রতীক্ষা করিতেছি? আইস প্রবল

প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা অথবা অতলস্পর্শ সাগরগর্ভে এই দুর্ব্বিসহ শোকভারাক্রান্ত দেহ বিসর্জ্জন করি।

শ্রীরা, বি, দাস।

মানব-প্রকৃতি।

তৃতীয় পল্লব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পীড়া কেন হয়? এই দেখিলাম, কেহ সুস্থ শরীরে বসিয়াছিল, সহসা শীতে কাঁপিতেছে, চীৎকার বা ছট্‌ফট করিতেছে; ইহার কারণ কি? হাঁচি আসিতেছে বা হাই উঠিতেছে, সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া নিবারণ করিতে পারি না কেন? প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইলে, প্রেত-বলের নিকট নরবল পরাস্ত হইলে আমার শরীর আমার বশ মানে না। রোগ কেবল ভূতের উৎপাত মাত্র। ভূত শান্তি করিতে পারিলেই রোগ শান্তি হয়, ইহা অসভ্য সাধারণের বিশ্বাস। অসভ্যদিগের চিকিৎসক ওঝা। কাফিরদিগের মতে রোগের তিনটি কারণ——শত্রুর যাদু জলদেবতার কোপ, অপদেবতার দৃষ্টি। গিনীদেশের ওঝারা রোগীকে নানা রঙ্গে চিত্রিত করে, তাহা হইলে অপদেবতা সন্তুষ্ট হইয়া ছাড়িয়া দেয়। সাইবিরিয়ার কাল্মক, কার্গিজ ও বাস্কির জাতি, ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণীমাত্রেই, বিশেষতঃ আবোর, কাছাড়ী, কোল প্রভৃতি অসভ্য জাতির মধ্যে, আণ্ডামান দ্বীপে, সামোয়ান প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, মাদাগাস্কার দ্বীপে, কারিব প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস লক্ষিত হয়। কাল্মক্ চিকিৎসকদিগের একমাত্র চিকিৎসা ভূত ঝাড়া। সর্দ্দারের পীড়া হইলে অপর কেহ তাহার নামটি গ্রহণ করে। তখন অপদেবতা সর্দ্দা-

য়কে ছাড়িয়া নামওয়ালাকে ধরে। রোম, গ্রীস, আসীরিয়া, বাবিলন প্রভৃতি প্রাচীন পৃথিবীর সভ্যতম জনপদেও এই বিশ্বাস ছিল। আমাজুলু, টঙ্গান ও আবিসিনিয়েরা বলে, অপদেবতার আক্রমণ হেতু ধনুষ্টঙ্কার রোগ হয়। কাহারও হিক্কা হইলে, ইয়াকুতেরা বলে, তাহাকে ভুতে পাইয়াছে। প্রসববেদনা ভূতের আক্রমণ বলিয়া কার্গিজেরা মনে করে। এজন্য প্রসববেদনা নিবারণ করিবার জন্য সকলে মিলিয়া অভাগিনীকে প্রহার করিতে থাকে। বিকারে প্রলাপ বকিলে আরাব ও টুপি জাতিরা বলে, রোগীকে ভুতে পাইয়াছে। কেহ পাগল হইলে টঙ্গা, সামোয়া ও সুমাত্রাদ্বীপের অধিবাসীরা বলে, তাহাকে ভুতে পাইয়াছে। ভুতে না পাইলে উন্মাদ কাহার সঙ্গে কথা কয়? কি হেতু শরীরের বল এত বৃদ্ধি হয়? ইউরোপে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই মত প্রচলিত ছিল। আমাজুলু ও সামোয়ানেরা বলে, পরিবারে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহারই প্রেতাত্মা ফিরিয়া আসিয়া পরিবারস্থ অন্যান্যের পীড়া উপস্থিত করে। সাহেব দেখিলে নব কালিডোনিয়ার অধিবাসীরা বলে, তাহাদের কৃষ্ণকায় পূর্ব্বপুরুষ রোগ উৎপাদনের জন্য মরিয়া সাদা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কোথায় ব্যথা হইলে আরাবেরা বলে, ভুতে তীর মারিয়াছে। দায়াকদিগের মতে অদৃশ্য অপদেবতার অদৃশ্য বর্শার অদৃশ্য আঘাতে লোকের রোগ জন্মে। লেপচা, কিরাত ধীমল, বোদো প্রভৃতি ভারতের প্রান্তবাসী অসভ্য-দিগের মতে অপদেবতার প্রকোপেই লোকের পীড়া হয়। নিগ্রোরা বলে, শত্রুর যাদু বা ভুতের দৃষ্টি ভিন্ন রোগ হয় না। জুলুরা বলে, পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষকে সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে তাহারা বংশাবলীর রোগ উৎপাদন করে। মৃত্যু বা যে কোন বিপদ সংসারে ঘটিতে পারে, কুকিরা বলে, সে সকল অপদেবতার কৃত। খন্দ জাতীয়েরা বলে, মানুষকে যে মরিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। দেবতাকে না

চটাইলে মানুষ চির দিন বাঁচিতে পারে। বয়োবৃদ্ধ মরিলেও মুসমানেরা বলে, কেহ যাদু করিয়া বুড়াকে মারিয়াছে। কান জাতীয়েরা বলে, কেহ গুণ না করিলে মানুষ হাজার বুড়া হইলেও মরে না। জলে ডুবিয়া, গাছ হইতে পড়িয়া, বিষ খাইয়া বা যুদ্ধে শত্রুর আঘাতে মরিলেও তাহারা যে অপদেবতার দৃষ্টি বা শত্রুর যাদুবলেই মরিয়াছে. এই বিশ্বাস লোয়াঙ্গো, টাহিটি, সাণ্ডুইচ্. অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ হাঁচিলে আমাদের দেশে "জীব" বলিয়া থাকে। ভাল কি মন্দ কোন দেবতার আবির্ভাবে যে অন্যান্য রোগের ন্যায় হাঁচিও হয়, ইহা নানা জাতির বিশ্বাস। কেহ হাঁচিলে ইংরাজ রমণীরা বলে, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন"। কাহাকেও হাঁচিতে দেখিলে খন্দেরা বলে, "তাহাকে ভুতে পাইয়াছে"। হোমার, আরিষ্টটল, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। ইহুদি নিগ্রো ও কাফির জাতির মধ্যে, কুর্দ্দিস্থান, ফ্লরিডা, টাহিটি, নবজিলাণ্ড এবং টঙ্গা দ্বীপেও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদিগের মধ্যে হাঁচি সয়তানের আবির্ভাবের লক্ষণ। এইজন্য কাহাকেও হাঁচিতে দেখিলে তাহারা "আল্লার" নাম গ্রহণ করে। কাহাকে হাঁচিতে দেখিলে জুলুরা বলে যে, কোন পিতৃপুরুষের আত্মা তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে। এইজন্য হাঁচি পাইলে জুলুরা বলে, "আমি ধন্য, পূর্ব্ব পুরুষের আত্মা আমাতে আসিয়াছে"। তাহারা এই বলিয়া পিতৃপুরুষের আরাধনা করিতে বসে ও তাহার নিকট স্ত্রী, গোরু বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রার্থনা করিতে থাকে। আমাদের ন্যায় জুলুদের মধ্যে হাঁচি পীড়া সারিবার লক্ষণ; কেহ হাঁচিলে বলে, স্বজাতিগণ আমাকে তোমরা অনুগ্রহ কর, আমার প্রার্থিত সৌভাগ্য মিলিয়াছে। শিশুকে হাঁচিতে দেখিলে অভিভাব-

কেরা বলে,"সুখে বাড়ীতে থাক,,। কাহার পীড়া হইলে প্রতিবাসিগণ জিজ্ঞাসা করে, সে হাঁচিয়াছে কি না? না হাঁচিয়া থাকিলে তাহারা রোগ কঠিন বলিয়া আশঙ্কা করে। জুলু দৈবজ্ঞেরা বড় অধিক হাঁচে, জানাইবার জন্য যে, তাহাদের শরীরে সর্ব্বদাই দেবতার আবির্ভাব। মন্মটপি নামক আফরিকার এক প্রদেশের রাজা যখন হাঁচে, অমনি সকল পারিষদ মিলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে। গিনি দেশে কোন সম্ভ্রান্ত লোক হাঁচিলে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই জানু পাতিয়া ভূমি চুম্বন করে এবং হাততালি দিতে থাকে। নিগ্রোঃ দিগের সন্তানেরা হাঁচিলে গৃহিণীরা "দূরহও" বলিয়া উঠে, যেন হাঁচি অপদেবতা ছাড়িবার লক্ষণ। নবজীলাণ্ডে কেহ হাঁচিলে উপস্থিত লোকের একটি ভুত ছাড়ান মন্ত্র পড়ে। সামোয়ানদিগের মধ্যে হাঁচিবার পর "বাঁচিয়া থাক" বলিবার প্রথা আছে। আমাদিগের ন্যায় টঙ্গানেরা হাঁচিকে মনস্থ কর্ম্মের বিঘ্নসূচক মনে করে। কেহ হাঁচিলে ফ্লরিডার লোকেরা অবনতমস্তকে তাহাকে অভিবাদন করে এবং অনেক ক্ষণ ধরিয়া বলে, "সূর্য্য তোমাকে রক্ষা করুন," "তোমার মঙ্গল করুন," "তোমাকে বড় করুন," ইত্যাদি। আমাদের দেশের ঠগেরা হাঁচিকে বড় ভয় করিত। য়িহুদিরা হাঁচিবার সময়ে বলে, "টোবিন্ চইন্" অর্থাৎ সুখের জীবন। জার্ম্মান ও ফরাসিদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

হাঁচির ন্যায় হাই তোলাও ভুতের আবির্ভাব বলিয়া জুলুরা মনে করে। আমরাও হাই তুলিবার সময়ে তুড়ি দেই ও দেবতার নাম করি। মুসলমান ও য়িহুদিরা হাই তুলিবার সময়ে ঈশ্বরের নাম করে এবং মুখ চাপিয়া ধরে, যেন শয়তান পেটের ভিতর চলিয়া যাইতে না পারে। জার্ম্মানির কোন কোন স্থানে হাই তুলিবার সময়ে মস্তকে ক্রুশের চিহ্ন আঁকিতে হয়। আইসলাণ্ডেও এই প্রথা।

ভুত প্রাপ্তির ন্যায় বাহ্য পদার্থের শরীর মধ্যে প্রবেশও রোগের কারণ বলিয়া কোন কোন দেশে সংস্কার আছে। আমাদের দেশে কাহারও দাঁতের পীড়া হইলে ব্যাধকন্যাগণ তাহার মধ্য হইতে কত কি বাহির করে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার আমাশয় রোগে রোগীর উদর হইতে হাড় ও সুতা বাহির করিতে দেখা গিয়াছে। কালিফর্ণিয়ায় কেহ পীড়িত হইলে একটি ডাকিনী আসিয়া তাহার সর্ব্ব শরীর চুষিতে থাকে, অবশেষে রোগীর দেহ মধ্য হইতে হাঁসের ডিমের মত একখণ্ড পাথর বাহির হয়। কাহারও বাতব্যাধি হইলে এস্কিমো ডাকিনীগণ ফুপার মধ্যে হইতে চর্ম্মখণ্ড প্রভৃতি বাহির করিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় পীড়িত শরীর হইতে হাড়ের টুকরা বাহির হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কোরাণের বয়েৎ ধোয়া জল বা ঔষধের নাম লেখা কাগজ ভস্ম করিয়া বা ধুইয়া খাইলে রোগ আরাম হয়, ইহা কোন কোন জাতির বিশ্বাস। খন্দ ও মলয় উপদ্বীপ-বাসী ওরাংলাউট জাতি বসন্ত দেবী না আসিতে পারে, এজন্য বাড়ীর চারি দিগে কাঁটা দিয়া রাখে। কুকীদিগের কাহারও পীড়া হইলে ডাক্তারকে ঔষধ খাইতে হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় পীড়িতের মস্তকে বা স্কন্ধে দড়ি বাঁধিয়া তাহার অপর অংশ কোন আত্মীয় আপন ঠোঁটে ঘসিতে থাকে; ঘসিতে ঘসিতে ঠোঁট হইতে রক্ত বাহির হইলে সে রক্ত পীড়িতের শরীরস্থ বিকৃত রক্ত বলিয়া অনুমান করা হয়। কেবল প্রার্থনা করিলে রোগ সারে ইংলণ্ডের কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা বিশ্বাস করে। আমাদের দেশে চণ্ডীপাঠ করা রোগ সারাইবার অমোঘ উপায়।

বন্য পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়া দিনান্তে সকল দিন অসভ্যদিগের উদর পূর্ণ হয় না। উপবাস বা গুরুপাক দ্রব্যে উদর পূর্ণ করিলে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন বড় সুলভ হয়। সভ্যদিগের নিকট স্বপ্ন অকিঞ্চিৎকর,

অসভ্যদিগের নিকট সেরূপ নহে। তুমি দেখিতেছ, উহার সমুদয় ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ, মৃত দেহের ন্যায় শরীরটা মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। অপর দিকে তাহার মন একটা হরিণের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া হরিণটা মারিল, তাহাকে কাটিল, তাহার মাংস রাঁধিয়া খাইতে যায়, এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কখন বা খাদ্যপূর্ণ কুটীর, শিশুপূর্ণ সংসার, ফল-পুষ্প-পূরিত কানন দেখিয়া আসিল। কে এ সকল দেখিয়া আসিল? আত্মা! দেহ যখন মৃতপ্রায় পড়িয়া, আত্মা তখন স্থানান্তরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল। সুতরাং আত্মা দেহ হইতে বিভিন্ন, জঙ্গম। আবার মৃত্যু ও নিদ্রায় প্রভেদ কি? নিদ্রিতাবস্থায় আত্মা কিছুক্ষণের জন্য দেহ ত্যাগ করিয়া এ দিক ও দিক দেখিয়া ফিরিয়া আসে। তখন মনুষ্য জাগিয়া উঠে। মৃত্যু হইলে আত্মা দেহ ছাড়িয়া যে যায় সে যায়, আর ফিরে না। তুমি দেহ কবরসাৎ বা ভস্মসাৎ কর, আত্মার তাহাতে ক্ষতি নাই। সে স্থানান্তরে আশ্রয় লইয়াছে। সে আত্মার নাম প্রেতাত্মা। প্রেতাত্মায় অসভ্য সাধারণের বিশ্বাস। নদ, নদী, বৃক্ষ, পর্ব্বত, গৃহ, সর্ব্বত্র প্রেতাত্মা বিচরণ করে। এপর্য্যন্ত এমন অসভ্য জাতি দেখা যায় নাই, যাহারা প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে না।

কেবল নিদ্রা ও মৃত্যু সময়েই কেন, জাগ্রদবস্থাতেও কখন কখন আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তাহাকেই লোকে মূর্চ্ছা রোগ কহে। আবার অনেক সাধ্য সাধনা করিলে আত্মা আপন আবাস গৃহে ফিরিয়া আসে। তখন রোগ সারিয়া যায়। কখন কখন স্বপ্নাবস্থায় মৃত আত্মীয় স্বজনের মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মীয় স্বজনের প্রেতাত্মা স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া থাকে। সেগুলি সর্ব্বথা পালনীয় এবং বিশেষ মঙ্গলপ্রদ। এজন্য স্বপ্নাদেশের জন্য উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিবার প্রথা আছে। স্বপ্নে প্রায় পিতা মাতাকে ও দেশের প্রধান ব্যক্তিদিগকে দেখিতে পাওয়া

যায়। এজন্য কোন কোন জাতি মনে করে, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষদিগের ও নীচ জাতির আত্মা মরিয়া যায়।

অসভ্যদিগের মধ্যে আর একটি বিশ্বাস, যখন আত্মা দেহ ছাড়িয়া অল্প বা বহুকালের জন্য স্থানান্তরে গমন করে, তখন অন্য আত্মা আসিয়া কখন কখন দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। এজন্য আমাদের দেশের লোকেরা মৃতদেহের দানব-প্রাপ্তির কথা বলিয়া থাকে। বেতালপঞ্চবিংশতিতে এই বিশ্বাসের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতি মনে করে, দেহের ভিতর দুইটি আত্মা আছে। নিদ্রার সময় একটি দেহের মধ্যে থাকে, অপরটি স্থানান্তরে ভ্রমণ করিতে যায়। গ্রীনলাণ্ডের লোকেরা বলে, দেহ যখন নিদ্রা যায়, আত্মা তখন যথা ইচ্ছা গমন করে। নবজিলাণ্ডের লোকেরা বলে, দেহের নিদ্রাবস্থায় আত্মা বেড়াইতে গিয়া যাহা দেখিয়া আসে, তাহার নাম স্বপ্ন। ফিজিদ্বীপের লোকেরা বলে, জীবন্ত মনুষ্যের আত্মা অন্যের নিদ্রাবস্থায় তাহার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কষ্ট দেয়। বোর্ণিও দ্বীপের লোকেরাও এইরূপ বিশ্বাস করে। দায়কেরা বলে, নিদ্রাবস্থায় আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া দেখিতে শুনিতে ও ভ্রমণ করিতে অন্যত্র যায় এবং স্বপ্নাবস্থায় যাহা দেখা যায়, তাহা প্রকৃতই ঘটে। ভারতবর্ষে কারেন জাতিও এইরূপ বিশ্বাস করে। প্রাচীন পৃথিবীর সভ্য পেরু-ভিয়দেরও এই বিশ্বাস ছিল। বাঙ্গালিরা বলে, নিদ্রাবস্থায় প্রাণপুরুষ বেড়াইতে যায়, এবং যাহা দেখে বা করে, স্বপ্নে তাহাই দেখা যায়। এই সময়ে প্রাণপুরুষ কোন কোন অভা-বও মোচন করিয়া লয়। এক জনের প্রাণপুরুষ নিদ্রাবস্থায় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের কলসীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সহসা কলসীর মুখে সরা চাপা পড়াতে আর বাহির হইতে পারে নাই।

সুতরাং দেহ আর জাগিল না। তখন লোকটি মরিয়াছে বলিয়া বাড়ীর সব হাঁড়ী কলসী ফেলিয়া দেওয়া হয়। জলের কলসী পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইবামাত্র প্রাণ-পুরুষ মুক্তি পাইয়া ছুটিয়া দেহ মধ্যে প্রবেশ করে। তখন লোকটি জাগিয়া উঠে। সেই অবধি ছিদ্রযুক্ত আবরণ জলের কলসীর মুখে চাপা দিবার প্রথা হিন্দু পরিবারে প্রচলিত হইয়াছে। পেরুর লোকেরা বলে, দেহ নিদ্রা যায়, আত্মার নিদ্রা নাই। সে অবসর পাইয়া বেড়াইয়া আসে। পশ্চিম আফ্রিকার যমুবান জাতি বলে যে, পিতৃপুরুষগণ নিদ্রাবস্থায় দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বপ্নযোগে উপদেশ দেয়। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানের যদি স্বপ্ন দেখে, কেহ তাহাকে বাঁধিয়া প্রহার করিতেছে, তবে জাগিয়া উঠিয়া বাঁধিয়া প্রহার করিবার জন্য আত্মীয়দিগকে অনুরোধ করে। মাদাগাস্কারের লোকেরা বলে যে, নিদ্রাবস্থায় হিতৈষী প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের উপদেশ দেয়। সিংহলের ব্যাধেরা বলে যে, আত্মীয় স্বজনের প্রেতাত্মা স্বপ্নযোগে দেখা দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকার মঙ্গঞ্জ জাতি যদি স্বপ্ন দেখে, কোন পূর্ব্বপুরুষ তাহাকে তাড়া করিয়াছে, তবে তাহার সন্তুষ্টির জন্য বলিদান করিয়া থাকে। বাসুট জাতিরও এই রীতি। টঙ্গানেরা বলে, সাধারণ লোকের আত্মা দেহের সহিত মরিয়া যায়। কিন্তু প্রধানদিগের আত্মা বাঁচিয়া থাকে এবং স্বপ্নে দেখা দিয়া পুরোহিত কুটুম্ব বা অন্যান্য লোককে উপদেশ দেয়। নাসামন জাতি কোন ভবিষ্যৎ কথা জানিতে হইলে পিতৃ পুরুষের কবর পার্শ্বে স্বপ্নাদেশের জন্য উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকে। অনেক বাঙ্গালীও এই অভিপ্রায়ে তারকেশ্বর ও বৈদ্যনাথের মন্দিরে হত্যা দিয়া থাকে। ইরিকোয়া, চিপোবা, মালাগাস্তি, বোর্ণিকা, কাফির জাতিরও এইরূপ বিশ্বাস।

নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিয়া যদি কেহ উঠিয়া বেড়ায় আমাদের দেশে

বলে তাহাকে নিশি ডাকিয়াছে। নিশি রাত্রির ভূত। অষ্ট্রেলিয়দের মধ্যে যদি কেহ স্বপ্ন দেখে, কেহ তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, সে জাগিয়া উঠিয়া এক খণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার ফেলিয়া দেয়। কারণ প্রে তাত্মা অগ্নির জন্য আসিয়াছিল। অগ্নি পাইলেই চলিয়া যাইবে। তাহারা বলে যে, কোইন নামে এক প্রকার ভূত মানুষের বেশে মানুষের মত গায়ে চিত্র করিয়া বেড়াইতে থাকে। এবং কাহাকে নিদ্রিত দেখিলে কখন কখন লইয়া পলায়। অভাগার বন্ধুবান্ধবেরা যদি চিৎকার করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হয়, তখন ভূত তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

ফিজিয়ানেরা মনে করে, যদি কেহ মূর্চ্ছা যায় বা মরিয়া যায়, সাধ্যসাধনা করিলে তাহার আত্মা ফিরিয়া আসিতে পারে। উত্তর গিনির নিগ্রোরা বলে যে, অকালে আত্মা চলিয়া গেলে মানুষ বৃদ্ধ হয়। অরিগণের অসভ্যেরা বলে, আত্মা যখন দেহ ছাড়িয়া যায়, তখন শীঘ্র শীঘ্র ওঝা ডাকাইয়া তাহাকে ফিরিয়া আনিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। নতুবা মানুষটী মরিয়া যাইতে পারে। তিব্বত ও তাতার দেশে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ প্রস্থানপর আত্মাকে ধরিয়া দেয়। কাহারও ইন্দ্রিয় বা স্মৃতি শক্তি শিথিল হইলে তাহারা মনে করে কোন দৈত্য তাঁহার আত্মাকে চুরি করিয়া থাকিবে। তখন লামা আসিয়া ভূত ঝাড়াইতে থাকে। তাহাতেও যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পীড়িত ব্যক্তিকে ভাল কাপড় পরাইয়া তাহার সঞ্চিত ধন রত্ন নিকটে দিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখে। তখন আত্মীয়গণ তাহার বাড়ীর চারি দিকে তিন বার প্রদক্ষিণ করে এবং নাম ধরিয়া আত্মাকে সাদরে ডাকিতে থাকে। লামা সেই সময় শাস্ত্র খুলিয়া নরক যন্ত্রণা বর্ণন করিতে থাকে। এইরূপ করিলে আত্মা না ফিরিয়া পারে না। ব্রহ্মদেশে কিরাত জাতির দেহ পীড়িত হইলে তাহার আত্মীয়গণ পলায়মান আত্মাকে ধরিতে ছুটাছুটি করে। তাহারা বলে, আত্মা বেড়াইতে গিয়া যদি ধরা পড়িয়া

আর না ফিরিতে পারে তবেই লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহাদের চিকিৎসকেরা যদি চেষ্টা করিয়া পূর্ব্ব আত্মাকে ফিরিয়া না আনিতে পারে তবে কোন জীবিত মানুষের আত্মা আনিয়া মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া দেয়, কিন্তু যাহার আত্মা ধরিয়া আনে সে মরিয়া যায়। চীনদেশে পলায়িত আত্মাকে ধরিয়া আনিবার আর এক প্রকার উপায় আছে। তাহারা মৃত ব্যক্তির একটি জামা ও একটি শ্বেত বর্ণের মুরগী বাঁশে বাঁধিয়া আকাশে উড়াইতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বাঁশ আস্তে আস্তে ঘুরিয়া আসিলে বুঝিতে হইবে, পলাইত আত্ম বাঁশের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কোন কোন জাতি ছায়াকে আত্মা বলিয়া মনে করে। ফিজিরা বলে মানুষের দুইটি আত্মা। প্রথম ছায়া, ইহা কৃষ্ণবর্ণ, মৃত্যু পরে ইহা নরকে যায়। অপরটি প্রতিবিম্ব, নদীজল বা দর্পণ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ যেখানে মরে দ্বিতীয় আত্মা সেখানে বাস করে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা ছায়াকে মানুষের জীবন বা আত্মা বলিয়া মনে করে। বাসুটেরা নদীপার হইবার সময় নদীজলে ছায়া পড়িতে দেয় না, কারণ কুম্ভীরে ছায়া ধরিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে। ফিজি, উত্তর আমেরিকার আলগন্‌কিন জাতি, এবং ব্রহ্ম দেশীয় কিরাত জাতি মনে করে মনুষ্যের দুইটি আত্মা। গ্রীশ ও চিন দেশের লোকদিগের মতে তিনটি এবং দাকোটা ও খন্দ জাতির মতে মনুষ্যের চারিটি আত্মা।

মনুষ্য জাতি আত্মার একমাত্র অধিকারী নহে, যবে যাহারা প্রতিবেশী, ভাষা যাহাদের মানুষের ভাষার ন্যায় বোধগম্য, কার্য্য যাহাদের মানুষের মত বুদ্ধি ও ভাবে চালিত, মনুষ্যের ন্যায় যাহারা সুখ দুঃখ, পীড়া অশান্তি, যৌবন বার্দ্ধক্য ভোগ করে, সেই জীব জন্তুকে মনুষ্য আপনার ন্যায় আত্মার অধিকারী মনে করিবে কিছুই বিচিত্র নহে। আবার

জীবজন্তুর ন্যায় উদ্ভিদগণেরও জন্ম.জরা, মৃত্যু, সুখ ও দুঃখের সময় আছে। সুতরাং তাহারাও কিয়ৎপরিমাণে আত্মার অধিকারী। য়ুরোপে.এলগার ওয়েসলি, ক্লার্ক ও ফিগেয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জীব ও উদ্ভিদ রাজ্যে আত্মার সত্ব. স্বীকার করেন, তখন বনবাসি প্রতিবেশীদিগের এ বিশ্বাস অতি সহজ বলিয়া অনুমিত হয়। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা রেটল স্নেক নামক অতি ভীষণ সর্পকে স্বর্গীয় দূত বলিয়া মনে করে। ইণ্ডিয়ানেরা ভালুককে ও কাফিরেরা হাতিকে বধ করিবার সময় তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কঙ্গোজাতির কেহ কোন জন্তু বধ করিলে আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে একবার তাড়া করে, তাহা হইলে হত্যাকারির উপর সেই জন্তুর আত্মার ক্রোধের শান্তি হয়। যেসো নিবাসি আইনো জাতি ভালুক মারিলে তাহার মৃতদেহকে পূজা ও প্রণাম করে। কারিও-কেরা ভালুক কি ব্যাঘ্র মারিলে তাহার চর্ম্ম আত্মীয় একজনকে পরাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে দেব সমাদরে নৃত্য করে এবং বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বলে তাহারা তেমন অন্যায় কাজ করে নাই, তাহাদের শত্রু রুসিয়ানেরা করিয়া থাকিবে। মৃতদেহ কাটিবার সময় তাহারা রুসদেশ নির্ম্মিত ছুরি ব্যবহার করে। গোলডি ও ডায়াক জাতি ভালুক কি কুম্ভীর মারিলে মৃতদেহকে রাজা, প্রভু, পিতামহ প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করে। সোসাইটি দ্বীপের লোকেরা মানুষের ন্যায় জীবজন্তু ও উদ্ভিদের আত্মা আছে বলে, ভায়কেরা ও ব্রহ্ম দেশের লোকেরা বলে, ধান গাছের আত্মা আছে। ধানগাছ শুখাইলে তাহার আত্মা ফিরাইয়া আনিবার জন্য কারেনরা এইরূপ মন্ত্র বলে—“এস ধানের আত্মা এস, মাঠে এস ধান গাছে এস, পশ্চিম থেকে এস, পাখীর ঠোঁট, বানরের মুখ ও হাতির কণ্ঠা থেকে এস, বাহার গোলায় থাক এস ইত্যাদি।” বৌদ্ধেরা এক সময় গাছের আত্মায় বিশ্বাস করিত। কোন কোন অসভ্য জাতি অচেতন পদার্থেরও আত্মা আছে বলিয়া মনে করে। বাঙ্গালি বাল-

কের দোয়াতে কালি ফুরাইলে আর কাহারও দোয়াত হইতে আনিবার জন্য কালির নাম ধরিয়া ডাকে এবং বালিকাগণ বঁটি, ছাতা, বেড়ি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রকে ভাবী সপত্নীর প্রাণবধে সাহায্য করিবার অনুরোধ করিয়া থাকে। জগৎ ভ্রমণশীল, এজন্য গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলিতেন, জগতের আত্মা আছে।

পাছে পরস্পরকে হিংসা করে এই ভয়ে উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা দুই খান জাল এক সঙ্গে ফেলে না এবং যে বর্শিতে একবার মাছ ধরিয়াছে, একমুঠা বর্শি অপেক্ষা তাহাকে অধিক মূল্যবান মনে করে। কাপ্তেন লিয়ন সাহেবের বাজাইবার একটি বড় অর্গান ও একটি ছোট বাক্‌স ছিল। এস্কিমো জাতিরা ছোট বাক্সটিকে বড় অর্গানের সন্তান মনে করিত। বুশমানেরা চাপমান সাহেবের বড়গাড়ীকে ছোট গাড়ির মা বলিত। কুক্ সাহেব টাহিটি দ্বীপের লোকদিগকে কয়েকটি পেরেক দিয়াছিলেন, তাহারা সেইগুলি মাটিতে বপন করিয়াছিল। ইহারা বলে, পাথরের আত্মা আছে। এবং পাথর ভাঙ্গিয়া গেলে মনে করে তাহার আত্মা স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে। টঙ্গানেরা বলে, কুড়ুল কি বাটালি ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাদের আত্মা দেবতাদের কার্য্য করিতে চলিয়া যায়। ইহাদের মতে ঘরেরও আত্মা আছে। মোহক জাতি হ্রদের এবং হিন্দুরা নদী, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির আত্মা আছে বলিয়া মনে করে। পাথর ভাঙ্গিলে ইহারা গঙ্গাজলে তাহার সৎকার করে এবং নুতন গৃহে প্রবেশ সময় গৃহের আত্মার পূজা করিয়া থাকে। আদীম নিবাসীদিগের ধর্ম্মমত পর্য্যালোচনা করিবার সময় আমরা আত্মা ও প্রেতাত্মার আকার, প্রকার, বেশ, ভুষা, খাদ্য ও বাসস্থান সম্বন্ধে অসভ্যদিগের বিশ্বাস সবিস্তার বর্ণনা করিব।

শ্মশান-রহস্য।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সংসার সমুদ্র। দিবারাত্র ইহাতে তুফান উঠিতেছে, সে তুফান কয় জন লোকে সহিতে পারে? বিশেষ বাল্যকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, আমি সে তুফান সহ্য করিতে পারিলাম না—ডুবিলাম, মজিলাম। আমার হস্তে বিষয় ভার আসিবামাত্র আমি পিতার বিশ্বস্ত ও শুভানুধ্যায়ী কর্ম্মচারিগণকে ছাড়াইতে লাগিলাম এবং তাহাদের স্থানে আমার সর্ব্বনাশরত চাটুকারগণকে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলাম—আপনার মাথা খাইলাম। ক্রমে ক্রমে আমার জমিদারির মধ্যে অত্যাচারের স্রোত বহিতে লাগিল, আপনার ন্যায্য গণ্ডা পরকে দিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম, শেষে নদীর মধ্যে চড়া পড়ে দেখিয়া পরস্বাপহরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। আহা ভাবিতে মনে শেল বিদ্ধ হয়—কত লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছি, কত জনকে কত যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছি। আমারই প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণের ৫০ বিঘা ব্রহ্মত্র জমি ছিল, ব্রাহ্মণ কায়ক্লেশে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এক দিবস আমার নুতন নায়েব আসিয়া আমার কর্ণে বিষমন্ত্র ফুংকার করিল। আমি মাতিয়া উঠিলাম,—ব্রাহ্মণের যথা-সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলাম। অনাথ ব্রাহ্মণ কত কাঁদিল, মাতা কুটিল,—তৃণজ্ঞানও করিলাম না, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া কি করিতেছি, তাহা একবার ভাবিয়াও দেখিলাম না। ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া এক দিন আমার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিল,—শুনিলাম না। ব্রাহ্মণ ক্ষোভে,ক্রোধে, নিরাশ্বাসে আমাকে অভিসম্পাত করিল, আমার দুর্ম্মতি ঘটিল, সভার মধ্যে ব্রাহ্মণকে পদাঘাত করিলাম। দরিদ্র ব্রাহ্মণ নয়ন জলে বক্ষ ভাসাইয়া অভিমানভরে উঠিয়া গেল,—কিন্তু সেই দিনই

শুনিলাম, ব্রাহ্মণ সমুদায় কষ্টের শান্তি করিয়াছে, উদ্বন্ধনে জীবন ত্যাগ করিয়াছে!!!

ব্রাহ্মণের পরিবারের মধ্যে স্ত্রী আর একটি যুবতী বিধবা কন্যা। ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর দুইটি অনাথিনী পথের কাঙ্গালিনী হইল; এই সময়ে আমার আর একটি চাটুকার আমার কর্ণে আর এক মন্ত্র উচ্চারণ করিল—আমি দ্বিতীয় সর্ব্বনাশে মন নিযুক্ত করিলাম। এক দিন বেশভূষা করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে বেড়াইতে গেলাম, যুবতী বিধবাকে দেখিলাম, সেই পত্রাচ্ছাদিত সুরভি সুকোমল কুসুম দেখিয়া মস্তক ঘুরিয়া গেল, মতিচ্ছন্ন ঘটিল। কত ভ্রূকুটি করিলাম, হাসিতে হাসিতে রসিকতার স্রোত ঢালিতে লাগিলাম, সতী বিধবা অভিমানে মরিয়া যাইতে লাগিল। শেষে কত প্রলোভন দেখাইলাম, কত কি করিলাম, কিন্তু সতীর মন হিমালয় পর্ব্বতাপেক্ষা অটল, সে মন টলাইতে পারিলাম না। পাপশিখ হৃদয়ে ক্রমাগত জ্বলিতে লাগিল, পাপের হাটে দুর্ম্মতি অনুচরের অভাব নাই, আমার পাপরত অনুচর দিবারাত্র সেই হৃদয় বহ্নিতে ইন্ধন প্রক্ষেপ করিতে লাগিল, অনল ধু ধু করিয়া জ্বলিল। এক দিন—উঃ হুঃ কি সর্ব্বনেশে দিন! প্রাণ ফাটিয়া যায়—সয় না,—সয় না—নিতান্ত অসহ্য!—পৃথিবীতে ধন-জালে যেন আর কেহ জড়ীভূত না হয়। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, পিশাচগণ মায়াবেশে জগতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া লোকের মন হরণ করে, কিন্তু এখন জানিলাম, অর্থই সেই পিশাচ। রাক্ষস! তোমার কুহক, তোমার মোহ জাল, তোমার সর্ব্বনেশে চাতুরী যে না জানিয়াছে জগতে সেই সুখী। তুমি দূরে হইতে মোহনকটাক্ষে লোকের অন্তরে যাদু মাখাইয়া দেও, ব্যাধের বংশীরবের ন্যায় দূর হইতে সুমধুর রবে মানবকে মাতাইয়া তোল, শেষে—তোমার বিষময় পরিণামের কথা আর কি বলিব,—আমিই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মধুর বংশীরবে আইল

হইয়া কুলবতী গোপাঙ্গনাগণ কুলত্যাগ করিত, যমুনা উজান বহিত। কিন্তু অর্থ, তোমার বংশীরবে অসংখ্য কুলবতী কুলত্যাগ করিতেছে, সাগর বক্ষ বিকম্পিত হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে। আহা হা আমাকে অর্থে কি অন্ধই করিয়াছিল, ভ্রমেও একবার সুপথ দেখিতে পাইতাম না, কি করিতাম কিছুই বুঝিতাম না, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কেবল পাপপথে প্রধাবিত হইতাম। যামিনী পোহাইত, হাস্যময়ী উষা পূর্ব্বদ্বারে বসিয়া মৃদু হাস্যে জগৎ হাসাইত, বনের পাখী আনন্দে ডাকিয়া উঠিত, সেই সুখের সময় যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহারা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আপনাপন কার্য্যের অনুসরণ করিত, ভিখারী নিজ উদরান্নের সংস্থানে বহির্গত হইত, কোলাহলময় সংসার কোলাহলে পুরিয়া যাইত। আর আমি?—ধনী, জমিদার, নিষ্কর্ম্মা—আমি তখন কি করিতাম?—ব্যভিচারে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়া সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ প্রাতঃকালে পাপময়ী শয্যায় অঘোর হইয়া পড়িয়া থাকিতাম, বেলা প্রহরেক হইলে পীড়িত মস্তক হস্তে চাপিয়া ঘূর্ণিত নয়নে বাহিরে আসিতাম, এবং পুনরায় নব নব ব্যভিচারে মন নিযুক্ত করিতাম। সন্ধ্যা আসিত, আকাশে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিত, শান্তি ধীরে ধীরে জগৎসংসারে পদার্পণ করিত। কিন্তু আমার বিলাস গৃহে এই সময়ে পাপের তুফান বহিতে আরম্ভ হইত, ব্যভিচার স্রোতে হৃদয় ভাসিয়া যাইত, গণিকার পাপ অঙ্কে মস্তক রাখিয়া সুরা-বিষে মজিয়া থাকিতাম।

সুরা বিষ——কথাটা ঠিক হইল কি?—যদি বিষ অপেক্ষা আরও কোন ভয়ানক বস্তু পৃথিবীতে থাকে, তবে সুরা তাই। ভালকে মন্দ করিতে, সুন্দরকে কুৎসিত করিতে, সুখীকে দুঃখী করিতে, মনুষ্যকে পশু করিতে এমন আর নাই। সংসার ছারখার করিতে, আত্মাভিমান বিসর্জ্জন করাইতে, সংসারীকে ভিখারী করিতে এমন আর নাই। মধুরকে নিরস করিতে, কোমলকে কঠিন করিতে, জ্ঞানীকে অজ্ঞান

করিতে এমন আর নাই। দাম্পত্য প্রণয় কুসুম অনলে নিক্ষেপ করিতে, পিতৃস্নেহে গরল মাখাইতে, ভ্রাতৃস্নেহ সমুদ্র জলে ভাসাইতে, এমন আর নাই। নর্দ্দমার কর্দ্দমে শয্যারচনা করাইতে, ইন্দুর চুঁচা ভক্ষণ করাইতে, গাত্রে চন্দন জ্ঞানে পুরীষ লেপন করাইতে, এমন আর নাই। গণিকার সংবাপাস্ত সম্মার্জ্জনী আহার করাইতে, বিট-রক্ষক কনষ্টেবলের উপাদেয় দণ্ডের আস্বাদন প্রদান করাইতে, থানার গারদ-বাসরে নিশা যাপন করাইতে এমন আর নাই। এ সুরা কোথায় ছিল? বাঙ্গালির দগ্ধ অদৃষ্ট ভঙ্গ করিবার জন্য কোথা হইতে এ সুরা বাঙ্গালায় আসিল? জানি না, কবে বঙ্গদেশ এ ডাকিনীর হস্তে নিস্তার পাইবে।—কিন্তু—যাক্—আমার নিজের কথা বলি—

এইরূপে দিন যাইত, ক্রমে সেই সর্ব্বনেশে দিন উপস্থিত। ৮ টা বাজিয়াছে, আমি একাকী একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া সুরাসাগরে সন্তরণ করিতেছি, এমন সময়ে আমার পাপহৃদয়ে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যার রূপরাশি উদিত হইল, আমার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আর একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহার কর্ণে কর্ণে আমার মনের বাসনা বিবৃত করিলাম, সে তৎক্ষণাৎ ঘাড় দোলাইয়া চলিয়া গেল। আমার সুরাপাত্র ক্রমাগত চলিতে লাগিল, মনও নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ভিত্তিস্থ ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া ৯টা বাজিল, তখনও আমার ভৃত্যের দেখা নাই; আমি বড়ই অস্থির হইয়া উঠিলাম, আসন পরিত্যাগ করিয়া একবার ঘর, একবার বাহির করিতে লাগিলাম; এইরূপ ভাবেও আর অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। আমি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে ভৃত্যের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় সে আসিয়া বলিল যে, সে বলপূর্ব্বক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়া আমার উদ্যানভবনে রাখিয়াছে। আমি ভৃত্যকে পুরস্কার প্রদান করিয়া পানের প্রাবল্যে স্খলিতচরণে সেই পিঞ্জরবদ্ধা বিহঙ্গিনীর গৃহে গমন করিলাম।

গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বিধবা বাম হস্তখানি বামস্কন্ধে হেলাইয়া বসিয়া আছেন, অবেণীবদ্ধ কেশরাশি কপোলে, বদনে ও পৃষ্ঠদেশে ঝাঁপিয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিক রক্তাভ নয়ন দুটি প্রগাঢ় লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাসে বিধবার বক্ষ ঘন ঘন কাঁপিতেছে, বদন খানিতে পৃথিবীর দুঃখ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বিধবা এই অবস্থায় বসিয়া আছেন, এমন সময় আমি পৈশাচিক হাসি হাসিয়া পৈশাচিক ভাষায় তাঁহাকে সম্বোধন করিলাম। আমার পদশব্দ শুনিবামাত্র তিনি গাত্রোত্থান করিলেন এবং আমাকে তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইতে দেখিয়া দুই পদ পিছাইয়া দাঁড়াইলেন ও গম্ভীর-বচনে বলিতে লাগিলেন—

"নিষ্ঠুর, দুরাচার, পিশাচ, যেখানে আছিস সেইখানে থাক, যদি আর এক পদ অগ্রসর হ'স, যদি আমার সতীত্ব-রত্ন হরণ করিবার জন্য তিলমাত্র চেষ্টা করি'স, তাহা হইলে এই দণ্ডে তাহার প্রতিফল পাইবি। পামর—ধিক তোর ধনে—ধিক তোর জমিদারিতে! অনাথিনী অবলার উপর বল প্রকাশ করাই কি তোর জমিদারির অমৃতময় ফল? পাষণ্ড! মনে করিস কি, সতীর অমূল্য সতীত্ব কখন দুরাচার লম্পটের উপভোগ্য হইতে পারে? সতীকে ধনের লোভ কি দেখাইবি? শত ইন্দ্রের বিভব সতীর চক্ষে বংশের অঙ্গার। যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিস, তবে এখনই আমাকে মুক্ত করিয়া দে—ভাবিয়া দেখ, কত ভীষণ পাপে আপনার হস্ত কলুষিত করিয়াছিস,—কত দরিদ্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছিস, আমার দরিদ্র পিতার—,"

এইমাত্র বলিয়াই সেই তেজস্বিনী বিধবার কমল চক্ষু দুটি আবার জল ভারাবনত হইয়া আসিল, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল; তিনি তখন কেবল দীন-নয়নে ব্যাকুলভাবে আমার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সুরায় আমাকে সে সময় এক কালে অঘোর করিয়া রাখিয়াছিল, আমি

বিধবার কথা শুনিলাম না, রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া সেই বিশুদ্ধ অনাঘ্রাত কুসুম অনলে নিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু হায়, হায়, এ হৃদয়-জ্বালা কি কখন নির্ব্বাণ হইবে—যেইমাত্র আমি বিধবার হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত হইলাম, অমনি একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দীপালোকে ঝকমক করিয়া উঠিল—বিধবা তড়িৎগতিতে গৃহ-পার্শ্ব হইতে আমারই শাণিত ছুরিকা হস্তে করিয়া করালবেশে দাঁড়াইলেন, আমি হতবুদ্ধি ও অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছুরিকা হস্তে করিয়া সতী বিধবা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"জানিলাম, তোর ও পাপ হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্র নাই, তোর ন্যায় রাক্ষসের নিকট দয়ার প্রার্থনা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু সতী জীবন থাকিতে কখনই সতীত্বে জলাঞ্জলি প্রদান করে না, এই দেখ;আমরা কেমন করিয়া সতীত্ব রক্ষা করি।—তুই ধনবান্, ক্ষমতাশালী, আমি কাঙ্গালিনী অবলা বিধবা, তাই আমার প্রতি অত্যাচার করিয়া তুই ইহলোকে নিস্তার পাইলি—কিন্তু দুঃখিনী চলিল, দেখিব—সেখানে কেমন করিয়া নিষ্কৃতি পাস। তোর পাপে ব্রহ্মহত্যা হইয়াছে, আবার আজ স্ত্রী হত্যা হইল—তোর পাপের চরম ফল ফলিল—"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে বিধবার হস্তস্থিত ছুরিকা আবার উঠিল, আবার দীপালোকে সে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা চকমক করিল, আমি চিত্র-পুত্তলির ন্যায় নিমেষশূন্যলোচনে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলাম, কিছুই বলিতে পারিলাম না ;—সতীর তেজ দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলাম। নিমেষ মধ্যে বিধবার হস্ত নামিল, শাণিত ছুরিকা সেই কোমল বক্ষে আমূল প্রোথিত হইল, স্বর্ণলতা জীবনহীন হইয়া ভূমিতে লুটাইল !!

ক্ষণকাল আমি নিশ্চল, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইয়া সেই মুদিত কমলের প্রতি বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিলাম ;—সে সময়ে মনে ঠিক অনুতাপ হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না তবে, ভয় সম্পূর্ণই হইয়াছিল। ক্ষণ

পরেই ভাবনা হইল, এ সর্ব্বনাশকর খুন কেমন করিয়া লুকাইব—কেমন করিয়া রাজবিচারে নিষ্কৃতি পাইব?—রাজবিচার!! রাজার ভ্রম প্রমাদ, প্রজার বিড়ম্বনা, বিচারকের সপিণ্ডকরণ। অন্য দেশের কথা বিশেষ বলিতে পারি না, তবে বঙ্গদেশের কথা বলিতে পারি, সেখানে যে ন্যায় বিচারের আশা করে, সে ঘোর মূর্খ। যেখানে রাজা স্বার্থের দাস, রাজপুরুষগণ তোষামোদের দাস, ধৃতিবিভাগ অর্থের দাস,—সেখানে ন্যায় বিচারের আশা! যেখানকার শাস্ত্রকলাপ জটিল তর্কজালের অধীন, তর্কজাল স্বাক্ষপাদের অধীন, বিচারক সাক্ষীর অধীন—সেখানে সুবিচারের আশা! পার্থিব বিচারে যদি ন্যায়ের সুক্ষমত্ব থাকিত, তাহা হইলে পাপার্জ্জিত ধনে কুচক্রী উৎকোচগ্রাহীর উদর পূর্ণ হইত না, নরঘাতক অর্থজঞ্জালে আপন পাপরাশি প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিত না, অনাথ দরিদ্রকে আপন ন্যায় স্বত্ব হারাইয়া নির্জ্জন কুটীরে দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইত না। কি বিড়ম্বনা!—পৃথিবীতে এই সমস্ত বিচার স্থানের নাম—ধর্ম্মাধিকরণ, এই সমস্ত বিচারকের নাম আবার ধর্ম্মাবতার!! যাহাদের কার্য্যকলাপে ধর্ম্মের গন্ধমাত্র নাই, তাহারাই পৃথিবীতে ধর্ম্মাবতার নামে অভিহিত!!

সেই হাস্যময়ী, প্রফুল্ল-কুসুমা, ছিন্ন বল্লরী আমার পদপ্রান্তে লুটাইতে লাগিল, রুধির স্রোতে কক্ষতল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, আমি হতভম্বের ন্যায় নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া সেই ভীম কাণ্ডের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া আমার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, সে ভয়ানক দৃশ্য আর দেখিতে পারিলাম না, সভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু তখনই বোধ হইল, সেই নির্জ্জন কক্ষে সহস্র সহস্র বিভীষণ মূর্ত্তি প্রবেশ করিতে লাগিল, কেহ কেহ সেই মুদিত কমলকে মণ্ডলাকারে ঘেরিয়া বসিল, অপর সকলে আমার মুখের উপর বিকট ভঙ্গিতে হস্ত দোলাইয়া তীব্রস্বরে বলিতে লাগিল—"দুরাচার, কোথায়

পলাইবি? তোর পাপের আচরণের প্রতিফল এখনই পাইবি,—ঐ দেখ্ ফাঁসিকাষ্ঠ তোর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।” আমি আর তথায় থাকিতে পারিলাম না, হস্তে নয়নদ্বয় আবরণ করিয়া প্রকৃত উন্মাদের ন্যায় সে কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলাম। তখন আমি একে সুরোন্মত্ত, তাহাতে এই সর্ব্বনাশকর ব্যাপার সম্মুখে ঘটিয়াছিল,—আমি সে সময়ে এক কালে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। যে দিকে নয়ন যাইতে লাগিল, সেই দিকেই ছুটিতে লাগিলাম, ও যাহাকে দেখিতে পাইলাম, তাহারই সম্মুখে “খুন, খুন” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। পাপ বুদ্ধির উত্তেজনায় প্রথমে যে ব্যাপার গোপন রাখব ভাবিয়াছিলাম, ধর্ম্মবলে নিমেষমধ্যে সে ঘটনা শত শত ব্যক্তির কর্ণগোচর হইল— ঘটনার অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যেই সেই শ্মশান-পুরীতে সব-ইন্সপেক্টার বাবুর শুভাগমন হইল।

(ক্রমশঃ)

দস্যু-কন্যা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৫০

সহসা কে আসি পশ্চাৎ হইতে
ধরিলা তস্কর-পতির বাহু,
চাঁদেরে গরাস করিবার কালে
বাধা পেয়ে যেন থামিল রাহু।

৫১

চাহিলা যুবক বিস্মিত-লোচনে;
হেরিলা তস্কর-পতির পাছে,
রূপের ভাণ্ডার, শোভার আধার
মোহিনী মূরতি দাঁড়ায়ে আছে।

৫২

উছলি পড়িছে রূপের কিরণ,
সোনার বরণ ভাতিছে তায়,
জগতের শোভা যেন এক হয়ে,
শরণ লয়েছে বালার পায়।

৫৩

সরলতাময় সুচারু আনন
সুঠাম গ্রীবায় হেলায়ে আছে,
পূর্ণ শশধর, ফুল্ল শতদল,
কিছার তুলনা তাহার কাছে।

৫৪

লম্বিত কুঞ্চিত চিকুরের রাশি
জঘন পরাশ শোভিছে তায়,
বিজলীর কোলে কাল মেঘমালা
পবন হিল্লোলে খেলিয়া যায়।

৫৫

মদনের আঁকা বাঁকা ভুরু দুলি
অমৃত নয়ন তাহার তলে,
বিশ্বের বিনাশ—বিজলী বিকাশ,—
থমকি থমকি নাচয়ে ছলে।

৫৬

সোহাগের খনি তরল অধরে
বিরাজে আদরে স্ফুরণ রেখা,
অন্তরাল হতে দন্ত-শ্রেণী তার,
রূপের গরবে দিতেছে দেখা।

৫৭

নিটোল কোমল তনু তনু খানি
শিরিষ কুসুম নবনী প্রায়,
সাহস না হয় পরশিতে তায়,
কি জানি কমল গলিয়া যায়।

৫৮
লুকাল ভীষণ মৃত্যুর মুরতি,
হেরিলা যুবক জীবিত আশা,
ঝঞ্ঝাময়ী ঘোরা নিশি অবসানে
হাসি হাসি যেন আসিলা উষা।

৫৯
সুচারু কমলকর পসারিয়া
ধরিয়া তস্কর-পতির কর,
কহিতে লাগিলা ললিতা ললনা
বীণার ঝঙ্কারে তুলিয়া স্বরঃ—

৬০
"ক্ষম অপরাধ পিত গো আমার,
শুনেয়াছি সব বিরলে বসি,
স্বকরে ঘাতিয়া যুবক-প্রবরে
কলঙ্কে রঞ্জিত কর না অসি।

৬১
"ভাবিয়া না পাই কোন্ অপরাধে
অপরাধী ইনি তোমার পায়,
হইয়ে সদয় সুবিচার-পতি
অবিচারে কেন বধ যুবায়।

৬২
"বীরের হৃদয় বীর-পক্ষপাতী,
মহতের সখা মহতে হয়,
তবে কেন আজ হইলে কুপিত
হেরিয়ে যুবার গুণ-নিচয়?

৬৩
"অভাগীর প্রতি স্নেহ ভাল বাসা
কণা মাত্র যদি থাকে তোমার,
কর ভিক্ষাদান যুবকের প্রাণ,
চরণে মিনতি এই আমার।"

৬৪

দস্যুপতি চিত, হ'ল প্রশমিত,
ভিজিল অন্তর সুধার ধারে,
সুন্দর মুখের সজল মিনতি,
হেলন করিতে ক জন পারে?

৬৫

রাখি কোষ মাঝে উলঙ্গ কৃপাণ
চাহিয়া বালার বদন প্রতি,
সুগম্ভীর-স্বরে—জলদ-নিস্বনে,
কহিতে লাগিলা তস্কর-পতি।

৬৬

তব অনুরোধে, আজিকার মত,
যুবার জীবন করিনু দান,
কালি দ্বিপ্রহরে করিয়া বিচার,
করিব ইহার যথা বিধান।

৬৭

আবার ক্ষণেক মৌন ভাবে ভাবি
বালারে চাহিয়া কহিলা তবে—
"বিচার অবধি যুবা অপরাধী
রাজবালা তব নিকটে রবে।

৬৮

যদি কোন মতে তব হাত হ'তে
পলাইয়া যায় যুবকাধম,
উত্তপ্ত শোণিতে সে কলঙ্ক তব
ধুইব নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা মম।

৬৯

প্রীতিফুল্ল-মনে, প্রফুল্ল নলিনী,
দস্যুপতি পদে পড়ে অমনি,
স্বহস্তে মোচন করিয়া বন্ধন
লইয়া যুবায় চলিলা ধনী।

মাসিক সমালোচক ও খেয়াল সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় রচনা প্রবন্ধাদি, সমালোচ্য গ্রন্থাদি ও কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

বেয়ারিং বা ইন্সফিসিয়েণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না। যাঁহারা পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উত্তর লেখা যাইবে না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা ডাকের টিকিটে মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় ৵০ আনা কমিসন দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যে টিকিট যেন কেহ না পাঠান। মনি অর্ডারে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর ডাকঘরে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন, তাঁহাদিগের নিকট পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪৲ টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে, সুতরাং বিনা মূল্যে দেওয়া এক কালে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্র ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

উকীলাবাদ, বহরমপুর।
১২৮৯ সাল, ১৫ই বৈশাখ। } শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী।

(৩য় খণ্ড।) (১০ম সংখ্যা।)

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল

সংযোজিত।

(সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচক।)

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১২৮৯ সাল মাঘ।

বহরমপুর,—অরুণোদয় যন্ত্রে
শ্রীভগবানচন্দ্র রায় দ্বারা
মুদ্রিত।

—০০—

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য।৵০ আনা।

মাসিক সমালোচক

ও

খেয়াল।

আদিম মনুষ্য।

ইয়োরোপ খণ্ড ২য় প্রস্তাব।

(২য় খণ্ডের ১ম সংখ্যার পর)

মগলাহরিণের ঠিক সমসাময়িক কালে, প্রাচ্য ইয়োরোপে চুম্‌কী পাথর ব্যতীত, বিবিধরূপ মানব শিল্পের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রমাণ সকল এবং মানবের সমকালজাত কতিপয় জন্তুর দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডেনমার্কের কিচেনমিড্‌লিঙ্গ ও ডরডনগুহাভ্যন্তরে শৃঙ্গ ও অস্থি-বিনির্ম্মিত কতকগুলি যন্ত্র (implement) বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে শেষোক্ত স্থানের গুহানিহিত অস্থিবিনির্ম্মিত শিল্পের কারুশীলতা অতি সুন্দর ও প্রশংসনীয়। কতকগুলি অস্থিজ শিল্প তীক্ষ্ণাগ্রবিশিষ্ট; কতক-গুলির কারুকার্য্য এত পরিপাটি-সম্পন্ন যে, তদবস্থা দৃষ্টে সে সকল বাস্তবিক যে অতি আদিমকালের তাহা সহজে অনুমেয় নহে। বস্তুতঃ কেবলমাত্র প্রস্তর দ্বারা, অস্থি সকল আশ্চর্য্যমসৃণ ও সূচাগ্রাবয়বে সংগঠিত হওন অসম্ভব মনে করণান্তর অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মহাবিপাকে পতিত হইয়াছিলেন। পরিশেষে এম্ লারটেট নামক জনৈক বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বহুল গবেষণা দ্বারা, উক্ত গুহাভ্যন্তরের অস্থিজ শিল্পের সহিত তৎগঠনোপযোগী প্রস্তর সকল অবলোকন করেন। সুতরাং সাধারণের সন্দেহের কারণ অনায়াসেই বিদূরিত হয়।

ফরাশিরাজ্যের দক্ষিণাভাগস্থিত লগারি ও ব্রন্‌কেল নামক স্থানে, প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আরো কতকগুলি শিল্পের আবিষ্ক্রিয়া সাধন করিয়াছেন। আধুনিক অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে শিল্পনিপুণতার যেরূপ সহজ জ্ঞান অবলক্ষিত হয়, প্রাগুক্ত শিল্প-নির্ম্মাণের সহিত তাহার যথেষ্ট সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে। সম্ভবতঃ এই সকল শিল্প, ম্যামথ ও বগলা হরিণের সমকালে পরিবর্দ্ধনশীল হইতে আরম্ভ করে। বগলা হরিণ, অশ্ব ও ষাঁড়ের কতিপয় প্রতিমূর্ত্তি, প্রস্তর ও অস্থির উপরে আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত আছে।

পেরিগর্ডের গুহায় ক্ষৌণীতত্ত্ববিদেরা প্রস্তরীভূত (Fossil) গজদন্ত বিনির্ম্মিত যে হস্তির অবয়ব, প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আদিম অনুকরণীয় (imitative art) শিল্পের মধ্যে অতি চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই। কথিত শিল্পের আবিষ্ক্রিয়ার অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে ডাক্তার ফলকনার একটি হস্তিশির আবিষ্কার করেন। এই হস্তিশিরস্থ গ্রীবাদেশে কতকগুলি রেখা বর্ত্তমান ছিল। হস্তি, সিংহ প্রভৃতি লোমশ পশুদিগের গ্রীবাদেশে লোম স্থানে রেখার চিহ্ন নিয়তই বর্ত্তমান থাকে। তদ্দৃষ্টে তিনি অনুমান করেন যে, উক্ত হস্তিশির বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ম্যামথ নামক জন্তুর করোটী স্বরূপেই যথাযথ ভাবে প্রমাণিত হয়। কিয়ৎকাল এই সিদ্ধান্ত লইয়া ভয়ানক বাক্‌বিতণ্ডার সূত্রপাত হয় বটে; কিন্তু পরিণামে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ সভায় অভ্রান্ত স্বরূপে গৃহীত হয়।

পূর্ব্বে যে সকল আদিম অনুকরণীয় শিল্পের বিষয় কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের বিনির্ম্মাণার্থে, অনেকে অনুমান করেন যে, প্রতীচ্য ইউরোপে অতি পুরাকাল হইতে লৌহের আবিষ্ক্রিয়া সাধন হইয়া থাকিবেক। কিন্তু ভূগর্ভ খনন ও গবেষণার দ্বারা এরূপ প্রমাণ হয় না যে, অতি পুরাকাল হইতে তথায় লৌহের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং

এরূপ বলা অসঙ্গত নহে যে, অনুকরণীয় শিল্প সকলের অস্তিত্বে বহুকাল পরে লৌহের আবিষ্কার সাধন হয়।

হিসয়েড (Hesoid) যিনি খৃষ্টের প্রায় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, তিনি বলেন যে লৌহের আবিষ্ক্রিয়া সাধন তাম্র ও টিন ধাতুর পারভবিক সময়ে অবশ্য হইয়া থাকিবে। যেহেতু ভূগর্ভ খনন দ্বারা তাম্র ও টিনের অস্তিত্ব যেরূপ সহজ ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, লৌহ সম্বন্ধে ঠিক তদ্রূপ নহে। ম্যামথ প্রভৃতি বিলুপ্ত জন্তুদিগের সমকালে, আদিম মনুষ্য কর্তৃক লৌহের আবিষ্কার হইয়া থাকিলে অবশ্যই উঁহাদিগের অস্থির সহিত যে কোন স্থানে লৌহ পাওয়া যাইত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের ভাগ্যে এরূপ আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়াজনিত যশঃ ঘটে নাই। হিসয়েডের সমকালে যে সকল প্রাচীন জাতি বিদ্যমান ছিল, তাঁহার বর্ণনানুসারে, তাহারা এক প্রকার পিত্তল ধাতু ব্যতীত তখনও লৌহের ব্যবহার করিতে পারে নাই। হিসয়েডের এই মত যে কত প্রামাণিক, তাহা প্রস্তাবের পরিশিষ্টে আলোচিত হইবে। কিন্তু পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা কবিকুণ্ড হোমার রচিত ইনিয়াদ নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বিশ্বাস করিতে সক্ষম হইবেন যে, বাস্তবিক হোমারের সমকালেও লৌহের আবিষ্কার সাধন হয় নাই। যেহেতু ইনিয়দে যুদ্ধোপযোগী যে সকল অস্ত্রশস্ত্রের বিষয় বর্ণিত আছে, তত্তাবতই প্রস্তর অথবা পিত্তল জাত।

ইতঃপূর্ব্বে ডেনমার্কের কিচেনমিডলিঙ্গের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় ভূগর্ভ নিম্নে রাশীকৃত শম্বুকের সহিত বিমিশ্রিত অস্থিখণ্ড ও চূম্‌কী প্রস্তরের ছুরিকা এক জন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বহুল গবেষণা দ্বারা সংগ্রহ করেন। সম্ভবতঃ সেগুলি বাল্‌টীকের প্রাচীনতীর সংগঠিত হওন কালে ঐরূপ অবস্থায় একত্রিত হইয়া থাকিবেক। তন্নিমিত্ত অনেকে অনুমান করেন যে, অতি আদিমকালে—বহু শতাব্দী পূর্ব্বে

তথায় মানবের আবাস-ভূমি ছিল। হেনরী ব্লানকোর্ড সাহেব বলেন,—

Indeed, from the description of the Fuegians given by Mr. Darwin in conjunction with such facts as are furnished by the shell-mounds themselves and the Danish Tumuli, wich professor Steenstrup considers to be of the same date, we may form ourselves a very fair idea of the early people of Denmark.

প্রসিদ্ধ সারজন লবাক সাহেব অনুমান করেন যে, এই প্রাচীন জাতীয় মনুষ্য সংখ্যায় অধিক ছিল না। ইহাদিগের কপালের অস্থি নিম্নে কিঞ্চিত অবনত; মস্তক ও মুখমণ্ডল গোলাকৃতি সম্পন্ন ছিল। বর্ত্তমান ল্যাপল্যাণ্ডার অধিবাসির অবয়বের সহিত ইহাদিগের অবয়বের বিস্তর সাদৃশ্য তিনি অনুমান করেন। কোন ধাতু বিষয়ক জ্ঞান ইহাদিগের আদৌ ছিল না। ইহাদিগের অস্ত্রাদি ও শিল্পের মধ্যে কাষ্ঠ, প্রস্তর ও অস্থি কেবলমাত্র অনুমানের উপযোগী। তিনি আরো বলেন যে কুক্কুর ব্যতীত ইহাদিগের অন্য কোন গৃহ-পালিত জন্তু ছিল না। কৃষি শিল্প বিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল।

হেনরী ব্লানকোর্ড সাহেব আরো স্থির করেন যে, প্রাগুক্ত জাতীয় মানবেরা মৎস্যধারণ, সামান্য সামান্য মৃগয়া এবং শম্বুক প্রভৃতির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।—খাদ্য সামগ্রী মধ্যে কস্তুরা, শুক্তি, ও মসেলই (mussel) প্রচুররূপে ব্যবহৃত হইত। মৎস্য জাতীয় আহার্য্য সামগ্রী মধ্যে হেরিং এবং ফ্লণ্ডার জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য বিশেষ ও জান্তব আহার্য্য মধ্যে মৃগ ও এক প্রকার ভল্লুকের প্রচলন ছিল। অনুসন্ধান দ্বারা তথায় মেষ, অশ্ব, বগলাহরিণ ষাঁড়, খরগশ প্রভৃতি জন্তুশ্রেণী অস্তিত্বের ভগ্নাবশেষ কোন কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। পক্ষিশ্রেণীর মধ্যে কেপার কেলজী জাতীয়দিগের আবাস প্রমাণীকৃত হয়। এই জাতীয় পক্ষীরা পাইন বৃক্ষের মুকুল আহার করিয়া থাকে। সুতরাং এতদ্দৃষ্টে সহজেই অনুভব হয় যে, প্রাগুক্ত

স্থানে উক্ত আদিম জাতির সমকালে পাইন বৃক্ষ যথেষ্টরূপেই জন্মিত— আবার ভূগর্ভে এই পাইন বৃক্ষের সঙ্গেই কতকগুলিন প্রস্তর শিল্প প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ওক, কার, পাইন প্রভৃতি বৃক্ষ শীত প্রধান স্থানেই জন্মিয়া থাকে। কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, গ্রীষ্ম মণ্ডলস্থ শৈলশ্রেণীতে এই সকল বৃক্ষের অভাব নাই। কিন্তু এই শৈল শ্রেণীর নিম্নভাগ উহাদিগের আদিম জন্মস্থান নহে। যেহেতু সাধারণতঃ উহারা শৈলশ্রেণীর ঊর্দ্ধদেশে নীহার-আবৃত শীতল স্থানেই জন্মিয়া থাকে। ওক, পাইন প্রভৃতি দুই একটি বৃক্ষ সৌখিন বাবুর বাগানে দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ইহাদিগের আদিম জন্মস্থান এই দেশে। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, সমশীতোষ্ণ প্রদেশের শীত প্রধান স্থান বিশেষে উহাদিগের বাহুল্য জন্ম।

ডেনমার্ক, স্কটলণ্ড, ও আয়ারলণ্ডের অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতি তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মণ্ডলী, প্রাগুক্ত কয়েক জাতীয় বৃক্ষ, ভূগর্ভ খনন দ্বারা ভূভাগের স্তরে স্তরে আবিষ্কার করিয়াছেন। এক এক জাতীয় বৃক্ষের পরবর্ত্তিকালে অন্য জাতীয় বৃক্ষ দ্বারা ভূভাগস্তর সংগঠিত। পতিত বৃক্ষ সমূহের নিম্নস্তরে কার জাতীয় বৃক্ষের চিহ্ন এত অধিকরূপে বর্ত্তমান যে, তদ্দৃষ্টে অনেকে অনুমান করেন, এক সময় এই জাতীয় বৃক্ষের দ্বারায় কানন পরিশোভিত ছিল; তদনন্তর ওক জাতীয় বৃক্ষের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে ভূভাগস্তরের সংগঠন ও বৃক্ষ সমূহের পরিবর্ত্তন হইতে যে কত দীর্ঘকালের প্রয়োজন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তবে এক এক জাতীয় বৃক্ষের প্রাধান্যকাল অনুমান একশতাব্দী কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ অনুমানের দ্বারা কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে।

অধ্যাপক ষ্টিনষ্ট্রিট সাহেব অনুসন্ধান দ্বারায় পাইনজাতীয় বৃক্ষের আধিক্য ভূভাগস্তরে খণ্ড খণ্ড অসম প্রস্তর শিল্পের আবিষ্কার করেন।

তদনন্তর ওক জাতীয় বৃক্ষের আধিক্য ভূভাগস্তরে পিত্তল জাত শিল্প প্রাপ্ত হয়েন। এবং বীচ জাতীয় বৃক্ষের স্তরে লৌহ জাত শিল্প আবিষ্কার করেন। সুতরাং প্রতীয়মান হয়, ত্রিবিধ উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বিলয়ের মধ্যবর্ত্তিকালে প্রস্তর, পিত্তল ও লৌহ এই ত্রিবিধ ধাতুর আবিষ্কার ইউরোপে আদিম প্রতিভার পরিচয় প্রদান ও আদিম মনুষ্যের উদ্ভবকাল জ্ঞাপন করেন। এবম্বিধ অবস্থা দৃষ্টে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, অন্যূন ত্রিংশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের প্রাচ্য বিভাগে মনুষ্যেরা প্রথম বসতি আরম্ভ করে। এইরূপ অবস্থা দৃষ্টে অনুমান ব্যতীত, আর কোন রূপে যথার্থ সময় বিনির্ণয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কেম কোন শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতের মতে ইহারও বহুকাল পূর্ব্বে ইয়োরোপে লোকে লোকারণ্য ছিল। কিন্তু কোন পুষ্ট প্রমাণ কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তন-ক্রিয়া স্বল্প সময়-মধ্যে সমাধান হওন কখন সম্ভবপর নহে। ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তর সমূহের পরিবর্ত্তন-ক্রিয়ার সূচনা ও সম্পাদন কাল অতি দীর্ঘায়তন-সম্পন্ন। পৃথিবীর এই পরিবর্ত্তনশীলতার কারণ ও বিভিন্ন স্তর সমূহের নাম ইত্যাদি প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠে সকলেই অবগত আছেন। আমাদিগের আলোচ্য ইয়োরোপের আনুষঙ্গিক কেবলমাত্র স্তন্যজীবী যুগ হওয়ায়, আমরা সংক্ষেপে তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইংরেজী টারসিয়ারী এজকে স্তন্যজীবী যুগ আখ্যায় আখ্যাত করা গেল।

প্রকৃতি তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রাচ্য ইয়োরোপে এই কালে প্রাকৃতিক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে।—এবং তজ্জন্যই বিবিধ জাতীয় জীবের অস্তিত্ব। ক্ষৌণীবিদ্‌দিগের মতানুসারে পূর্ব্ব তৃতীয়ক স্তর [miocine] কালে, ইয়োরোপের জলবাতাস আধুনিক সময় হইতে কথঞ্চিত উষ্ণ ছিল। উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর সংস্থান দৃষ্টে অনেকে

সিদ্ধান্ত করেন যে,এই স্তরের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে সংগ্র ইয়োরোপের সন্তাপ ১৬ ডিগ্রি ও পরবর্ত্তিকালে ১২ ডিগ্রি বর্ত্তমান ছিল। এই পরিমাণের সন্তাপ নিতান্ত উষ্ণজনক নহে। বরং ইহাকে যথেষ্ট শীতলাবস্থাপন্ন বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব তৃতীয়ক স্তর অপেক্ষা মধ্যতৃতীয়ব[Eocene] স্তরের জল বাতাস আরো অধিক পরিমাণে শীতল। এবং পরতৃতীয়ক স্তর কালে [pliocene period] এই শীতলতা ক্রমাগত সমাবস্থাপন্ন। তদনন্তর তুষারযুগে [pliostoceno or glacial epoch] শীতলতার অত্যন্ত আধিক্য।

এই সময়ে আলপস পর্ব্বত তুষার স্রোত (glacier) দ্বারা রোণ উপত্যকায় পরিপূর্ণ এবং জেনিভা হ্রদ ও জুরা পর্ব্বতশ্রেণী আবৃত হয়। মণ্টরোসা ও মণ্টব্লেনের দক্ষিণ ভাগ দ্বারা তুষারস্রোত প্রবাহিত হওন প্রযুক্ত, এওষ্টার উপত্যকা পরিপূরিত হয়। নর্থওয়েলস, ওয়েষ্টমোরলাণ্ড এবং স্কটলণ্ডের পর্ব্বত শ্রেণীতেও তুষার স্রোতের সঞ্চার হয়। জার্ম্মানির দক্ষিণভাগ ও রুসরাজ্য সমুদ্র সমতলের অনেক নিম্ন হইয়া পড়ে। এই সময়ে উল্লিখিত স্থান সমূহে মানব অধিবাসের কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপুষ্ট প্রমাণের (negative evidence) আশ্রয় অবলম্বন করতঃ অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই সময়ে ইয়োরোপে মনুষ্যের আবাস ভূমি হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ আধুনিক ইকুইমক্সের ন্যায় হিমমণ্ডিত স্থানেও আদিম মনুষ্যের আবাস ভূমি হইতে পারে। কিন্তু এবম্বিধ অনুমানকে সঙ্গত বিবেচনা করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাগুক্ত আদিম মনুষ্য পৃথিবীর অন্যত্র হইতে অগ্নির ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া তথাকার অধিবাসী হয়।

ডেনমার্কের কিচেনমিড্‌লিং,(Kitchen middling)ব্যতীত তথাকার ভূভাগের বহুনিম্নস্থ বোদমাটী [peat] নিয়াণ্ডার থাল, এঙ্গিস, ও গিব্রা

লটার প্রভৃতি স্থানের প্রস্তরীভূত পদার্থ (fossil bone) মনুষ্য ও তৎসম-সাময়িক চতুষ্পদ নিচয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। সম্ভবতঃ বহুকাল পূর্ব্বে উল্লিখিত স্থান সমূহের জল বাতাসের সমশীতোষ্ণতার জন্য মনুষ্য ও অন্যান্য স্তন্যজীবী প্রাণিগণের বাসের উপযোগী হয়। জল-বাতাসের এবম্বিধ সমশীতোষ্ণতা তুষার স্রোতের সূচনার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, এরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন। তদনন্তর, তাঁহারা অনুমান করেন যে আলপস প্রভৃতি পর্ব্বত শ্রেণীর তুষার স্রোতের সময়, অত্যন্ত হিমাতিশয্যবশতঃ, উল্লিখিত স্থান সমূহের মনুষ্য ও চতুষ্পদেরা বিনষ্ট হইয়া যায় অথবা পৃথিবীর অন্য খণ্ড, যে স্থানের জল বাতাস সমশীতোষ্ণ তথায় পলায়ন করে। কিন্তু বহু মৃত্তিকার নিম্নে যে সকল প্রস্তরীভূত জান্তবাস্থি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদূর্দ্ধ ভূভাগস্তর সমূহে তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সকল প্রাণীর বিলোপ সাধন সম্ভবনীয়। নতুবা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের জলবায়ু তাহাদিগের উপযোগী হইলে, তাহারা অবশ্যই জীবিত থাকিত। অনেকে অনুমান করেন যে, ইয়োরোপের তুষার স্রোতের আধিক্য কালে অনেকগুলি চতুষ্পদ আশিয়া খণ্ডে আগমন করে। আশিয়া খণ্ডের সন্তাপ ও জলবায়ুর অবস্থানুসারে উহাদিগের শারীরিক পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। প্রাচীন পৃথ্বী খণ্ডের সংস্থানদৃষ্টে ইহাঁরা অনুমান করেন যে, জল জমিয়া বরফ হইলে, তদুপরিভাগ দ্বারা এক-খণ্ডের প্রাণী অন্য খণ্ডে গমনাগমন করিতে সমর্থ হইত। ম্যামথ প্রভৃতি পুস্তি জাতীয় প্রাণীরা উষ্ণপ্রধান দেশবাসী। গ্রীষ্মকালে ইহারা ইয়োরোপ খণ্ডে বাস ও শীতের প্রারম্ভে জলজমাট বাঁধিলে আশিয়া খণ্ডে আগমন করিত। উপরোক্তরূপ সিদ্ধান্তকে ভ্রম প্রমাদ পরি-শূন্য কখনই বলা যাইতে পারে না। যেহেতু এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে তৎকালে ঐসকল প্রাণীরা হিমাতিশয্য সহিষ্ণু ছিল।

অপিচ (a priori) তর্কের দ্বারা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, ইয়োরোপখণ্ড অধুনাতন কালেও যেরূপ হিমমণ্ডলে অবস্থাপিত, পূর্ব্বতন কালেও তদ্রূপই ছিল। হিমমণ্ডলে জন্তুদিগের উৎপত্তি অসম্ভব। কারণ আদিম মনুষ্যের অথবা অন্যান্য শ্রেণীর প্রাণিবর্গের তদানীন্তন কালের বুদ্ধিবৃত্তি (১) এত দূর কৌশলসম্পন্ন নহে যে, তাহারা প্রকৃতির সহিত সম্মুখযুদ্ধে হিমরাশিকে পরাভব করতঃ তথায় বসতি করিবে। যেপর্য্যন্ত আদিম মনুষ্য অগ্নি অথবা উষ্ণ আবরণের আবিষ্ক্রিয়া করণে সক্ষম হয় নাই, সেকাল পর্য্যন্ত সুতরাং তাহারা অয়নান্তবৃত্তের (tropics) অধিবাসী ছিল। কাযেই অনুমান করা অন্যায় নহে যে, প্রতীচ্য ইয়োরোপের আদিম অধিবাসীরা, পৃথিবীর অন্য খণ্ড হইতে শিল্প-নৈপুণ্যে পারদর্শী হওনান্তর, তথায় গমন করে।

হেনরী ব্লানফোর্ড সাহেব প্রাগুক্ত মত প্রণালীর এক জন প্রধানতম নেতা। তিনি প্রাকৃতিক গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, আদৌ ইয়োরোপ খণ্ডের আদিম মনুষ্যেরা বহুপূর্ব্ববর্ত্তী কালে, আশিয়া খণ্ডের

---

(১) অধ্যাপক ডারউইন সাহেবের মতে উচ্চশ্রেণীর জন্তুমাত্রেরই স্মরণশক্তি, মনোযোগিতা, সংস্কার এবং কল্পনা ও যুক্তি প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থান নিবন্ধন—এই গুলির দ্বারায় জটিল বৃত্তি সমূহেরঅস্তিত্ব হয়। তিনি বলেন;—Hardly any faculty is more important for the intellectual progress of man than attention. Animals clearly manifest this power as when a cat watches by a hole and prepares to spring on its prey. তিনি স্থানান্তরে বলেন যে, It is most superfluous to state that animals have excellent memories for persons and places. স্থানান্তরে Animals may constantly be seen to pause, deliberate and resolve. It is a significant fact, that the more the habits of any particular animal are studied dy a naturalist, the more he attributes to reason and less to unlearned instinct.

দক্ষিণ পূর্ব্ব দ্বীপ সমূহ হইতে, তথায় যাইয়া বসতি করে। আশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব দ্বীপ সমূহ—বিশেষতঃ হিমালয় শেখরের উত্তর ও দক্ষিণাংশ যেরূপ প্রাচীন, তদালোচন করিলে, স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইবে যে, আশিয়া খণ্ডের নিকটে প্রভুত বিষয়ে সেই বহু পূর্ব্বতন কাল হইতে প্রাচীন গগণস্পর্শী আর্য্যসভ্যতার নিকট নিয়তই ঋণী ছিল। পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণের নিমিত্ত আমরা তাঁহার স্বীয় বাক্য উদ্ধৃত করিলাম।—

Man as formed by nature with undeveloped skill and intelligent, is an animal of the tropics. In India I believe, or in the Island of the south eastern Asia, in the country of the Negrits races will be found evidences of man's existence at a far earlier date than that of the pliestocine drifts of the western Europe.

আজিকালি পৃথিবীস্থ আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছেন, মৃত মহাত্মা ডারউইন সাহেব বিশ্বাস করেন যে, মনুষ্য কপিবংশ-সম্ভূত। তিনি এই বিষয়টী যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি সকল গভীর গবেষণা ও অধ্যাপনার প্রশংসনীয় ফল বটে। তিনি কেটারাইন caterine নামক একজাতীয় অতি উচ্চ শ্রেণীর কপিবংশের সহিত আদিম মনুষ্যের বিস্তর সাদৃশ্য অবলোকন করেন। (২) তন্নিমিত্ত তিনি অনুমান করেন যে,প্রাচীন পৃথ্বী

---

[২] প্রফেসার হাক্সিলী বলেন যে, মনুষ্যের সহিত উৎকৃষ্ট বানরের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও সৌসাদৃশ্য ; উৎকৃষ্ট জাতীয় বানরের সহিত নিকৃষ্ট জাতীয় বানরেরও তদ্রূপ সম্বন্ধ। সুতরাং বানরের সহিত মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগত সামান্য অসৌসাদৃশ্য জন্য মনুষ্যকে একটী পৃথক শ্রেণী [distinct order] ভুক্ত করা একবারেই সমীচীন নহে।

Man's place in nature–By professor Huxly. page 70:

খণ্ড ব্যতীত কোন সামুদ্রিক দ্বীপ ইহার যথার্থ জন্মস্থান নহে। পৃথীর তাবৎ বৃহৎ খণ্ডের জীবিত স্তন্যজীবীদিগের সহিত তৎপ্রদেশের বিলুপ্ত জাতিদিগের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। আফ্রিকার বর্ত্তমান গরিলা (gorilla) ও শিম্‌পান্‌জী (chimpanzee) নামক বানরের সহিত তৎপূর্ব্বকালবর্ত্তী বিলুপ্ত বানরদিগের ঘনিষ্টভাব অনুমান করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, শেষোক্ত দুই জাতীয় বানরের সহিত মনুষ্যের যেরূপ ঘনিষ্টভাব, তাহাতে বলা যাইতে পারে, আদিম মনুষ্যেরা প্রথমে আফ্রিকা খণ্ডের অধিবাসী। কিন্তু তিনি আবার এন্থ্রোপোমরফাশ বানরের আবিষ্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পূর্ব্বতৃতীয়ক স্তরকালে ইহারা ইয়োরোপে বর্ত্তমান ছিল। (৩)

স্তন্যজীবিযুগ অথবা ভুগণ্ডলের পূর্ব্বতৃতীয়ক স্তর কালে, ইয়োরোপ খণ্ডে প্রথম মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়া থাকিবার সম্ভব। যেহেতু উক্ত স্তর মধ্যে স্থূলচর্ম্মা ম্যামথ নামক জন্তুর দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। স্থূলচর্ম্মা জন্তুদিগের সমকালে ইয়োরোপ খণ্ডে মানব অস্তিত্ব আরম্ভ হয়। ক্ষৌণীবিদ্যাবিশারদ প্রেষ্টউভ সাহেব এবিবিলি নামক স্থানের ভূগর্ভ পর্য্যবেক্ষণ করতঃ সিদ্ধান্ত করেন যে, বাস্তবিক মনুষ্যগণ মামথ, হায়না, ও হিপোপোটেমাস প্রভৃতি তৎকালীয় প্রাণিমণ্ডলের সমসাময়িক। কিন্তু ডাক্তার বক্‌লাণ্ড সাহেবের গণনানুসারে, উক্ত জীবনিচয় (post pliocine) কালের। তিনি অনুমান করেন যে, প্রাগুক্ত প্রাণীরা মনুষ্য অভ্যুদয়ের পূর্ব্বতন কালেই বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে।—কেননা, পূর্ব্বতৃতীয়ক স্তরের সন্তাপও জল বায়ু প্রাণি মণ্ডলের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। ডাক্তার বক্‌লাণ্ডের এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। যেহেতু ইয়োরোপে কয়েকটী স্থানে ভূগর্ভ দ্বারা

(৩) Darwins descent of man-Chapter IV. page 156.

প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ব্বতৃতীয়ক স্তর কালেই তথায় মানবের অধিবাস আরম্ভ হয়।

ভূগর্ভনিহিত প্রস্তরাস্ত্রের দ্বারা আদিম মনুষ্যের কি প্রয়োজন সংসাধিত হইত, তাহার যাথার্থ অবধারণ করা কঠিন বটে। তবে পলিনেশিয় প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা অধুনাতন কালে যে সকল প্রয়োজন সাধনের জন্য প্রস্তরাস্ত্র ব্যবহার করিত,আদিম মনুষ্যের অভিপ্রায় তদ্রূপ থাকাই সম্ভব। যে সকল কর্ত্তিত বগলাহরিণ শৃঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় যে, তাহারা অস্থি, বৃক্ষ প্রভৃতি কর্ত্তন জন্য এবং ভূগর্ভ খনন দ্বারা তন্মধ্যে নিরাপদে বাস করিবার নিমিত্ত প্রস্তরাস্ত্রের ব্যবহার করিত। যে সময়ে মনুষ্যেরা স্বচ্ছন্দে বাস করণার্থে হিমাতিশয্যও সমসাময়িক হিংস্র চতুষ্পদের উপদ্রব নিবারণ করিবার নিমিত্ত গুহা প্রভৃতি খনন করিতে সমর্থ হইত, সেই কালে যে তাহারা অগ্নিবিষয়ক জ্ঞানে এককালীন অনভিজ্ঞ ছিল, এমত নির্দ্ধারণ করা যায় না। বিশেষতঃ প্রস্তরের সংঘর্ষণ হইতে অগ্নিকণা প্রকাশিত হওন একটী অলঙ্ঘনীয় সত্য। অস্থি, বৃক্ষ প্রভৃতির সহিত প্রস্তরের সংঘর্ষণ হইলে কোন স্থলে কেবলমাত্র উত্তাপের উদ্ভব, কোথাও বা অগ্নির উৎপত্তি হয়। অপিচ প্রস্তরকে সুচাবয়বে সংগঠন করিবার সময় অপর প্রস্তরের প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং উভয় প্রস্তরের পরস্পর সংঘর্ষণ কালে অগ্নিকণা কখনই প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে পারে না। কাযেই ইহা ন্যায়-সঙ্গত অনুমান যে, প্রস্তরাস্ত্রের সময় আদিম মনুষ্যেরা অগ্নির আবিষ্কার ও ব্যবহার শিক্ষা করে। সার জন লবাক বলেন যে, প্রস্তরাস্ত্রের পূর্ব্বে না হউক, অন্ততঃ সমসময়ে ইয়োরোপীয় মনুষ্যেরা অগ্নির আবিষ্কার করিয়া থাকিবে। প্রস্তরাস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি অনুমান করেন যে,

মৃত্তিকা খনন, শত্রু আক্রমণ, আহার্য্যপদার্থ কর্ত্তন ও হনন প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজন সংসিদ্ধির নিমিত্ত তাহা ব্যবহৃত হইত। [৪]

অস্ত্রশস্ত্র সকল বহুকাল ভূগর্ভে নিহিত থাকায় কর্ত্তিত বলিয়া অনুমিত হয়, এরূপ আপত্তি ন্যায়ানুমোদিত নহে। এতাবতা যে সকল জন্তুর সমকালে মনুষ্যের অস্তিত্ব ও প্রস্তরাস্ত্রের বিষয় উল্লিখিত হইল, তদ্দ্বারা শেষবৎসাধন (a posteriori ground) তর্কের আশ্রয়ী হইয়া অবধারণ করা অসঙ্গত নহে যে, একদিগে কর্ত্তিত অস্থি সমূহ ও অপর দিগে প্রস্তরাস্ত্র বহুকাল পূর্ব্ববর্ত্তী মানবীয় কৌশল (evidence of design) সপ্রমাণ করে। সুতরাং তাহা মনুষ্য-হস্ত নিষ্পাদিত বলা ভ্রমসংকুল নহে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

বিরাজমোহিনীর পত্র।

পবিত্র হৃদয়া শ্রীমতী রাজকুমারী দেবী

বিমলানন্দপ্রিয়াসু।

দিদি, বড় দাগা পেয়েছি ; সুখের প্রত্যাশায় সংসারের পথে পদার্পণ করে প্রাণে বড় দাগা পেয়েছি। কে জানিত, সংসার কেবল ছায়াবাজির রঙ্গভূমি, দুঃখের খনি, প্রতারণার বিলাস-কানন ? জানিলে ইহাতে আসিব কেন, আসিয়া ভুলিব কেন, ভুলিয়া মজিব কেন ?

---

(৪)—With these impliments, rude as they may seem to us, may have cut down trees, scooped them out into carals, grubbed up roots, attacked his enemies, killed and cut up his food, made hole in the ice in winter, prepored fire, wood &c. S. J. Lubbuck in his pre-historic times.

ভাবিয়াছিলাম, সযত্ন পালিতা উদ্যানলতার জীবনই সুখপূর্ণ, সুন্দর সুশোভন উদ্যানে সন্তর্পণে পরিরক্ষিত হইব, নিদাঘ-উত্তাপে শীতল সলিলে শান্তি লাভ করিব, আমার রূপগৌরবে সকলে মোহিত হইবে। ভাবিয়াছিলাম, যখন আপাদ কুসুম-ভূষণে সজ্জিতা হইয়া মৃদু মৃদু হাসিব, সুমন্দ মলয় হিল্লোলে মধুর মধুর দুলিব, তখন আমার আদরের সীমা থাকিবে না, সোহাগের সীমা থাকিবে না, যত্নের সীমা থাকিবে না। আমার বিমল পরিমলে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, আমার রূপ-শিখায় সকলের অন্তর উষ্ণ হইবে, সকলে আমায় ঘেরিয়া দাঁড়াইবে, আমি সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া সোহাগভরে "নাই" "নাই" বলিতে বলিতে দুলিতে থাকিব। ভাবিয়াছিলাম, যে কানন-লতা কানন মধ্যে অঙ্কুরিতা হইল, কাননেই শুকাইয়া গেল, যাহার কুসুমের আ ঘ্রাণ লোকে পাইল না, যাহার মধু ভ্রমরে খাইল না, যাহার রূপের আদর হইল না, তাহার জীবনে কাজ কি? দিদি, এইরূপ কতই ভাবিয়াছিলাম, সকল কথা বলিলে, তুমি আমাকে প্রেতিনী বলিয়া ঘৃণা করিবে, আমার দুঃখে দুঃখিনী না হইয়া হয় তো রাগ করিবে, তাই বলিতে ভয় হয়। কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন আর আমার ভয়কে ভয় নাই। এখন অনুতাপ-অনলে হৃদয় পুড়িয়া খাক হইতেছে, বিরাম নাই, শান্তি নাই। তাই দিদি, তোমার কাছে আসিয়াছি, আজ তোমার নিকট এ ক্ষীণ হৃদয়ের কবাট উদ্‌ঘাটিত করিব, এ হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে, স্তরে স্তরে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে যন্ত্রণা সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা আজ তোমায় একটি একটি করিয়া দেখাইব, ইহাতে আর কিছুই না হৌক, আমার ন্যায় অনেক ক্ষীণা, চঞ্চলা রমণী কুপথের কণ্টকী আবর্জ্জনা দেখিতে পাইবেন।

দিদি, সংসারে এক জন ভাল, এক জন মন্দ, এক জন সুখী, এক জন দুঃখী কেন হয়? কেন আজ তুমি অকালঙ্কার সুকুমার বালকবালি-

কায় অঙ্ক শোভা করিয়া, স্বামীসোহাগের শীতল সলিলে অবগাহন করিতেছ, আর আমি অভাগিনী প্রান্তরস্থিত বন্ধ্যাপাদপীর ন্যায় সূর্য্য-কিরণে ঝলসিত হইতেছি?—কেন আজ তুমি সর্ব্বসুখে সুখিনী, আমি সর্ব্বদুঃখে দুঃখিনী?—দিদি, ভাবিও না যেন, এ পোড়ামুখী তোমার সুখে চক্ষু দিতেছে; যদি হৃদয় খুলিয়া দেখাইবার হইত, তাহা হইলে দেখাইতাম, আমি এত দুঃখের মধ্যেও তোমার সুখে সুখ পাই, তোমার দুটি বালকবালিকা আমার দুটি চক্ষের দুটি তারা, তোমার স্বামী আমার ইষ্টদেব। যদি পাপিনীর প্রার্থনা করিবার অধিকার থাকে, যদি পিশাচীর প্রার্থনা স্বর্গদ্বারে উপনীত হয়, তাহা হইলে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যেন, তুমি এইরূপ পুত্রকন্যা ক্রোড়ে করিয়া চির দিন স্বামীসুখের বিমল জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইও।

আমি বলিতেছিলাম, এক জন ভাল, এক জন মন্দ কেন হয়? যখন আমরা প্রথমে পৃথিবীতে আসি, তখন তুমিও যে ভাবে আসিয়াছিলে, আমিও সেই ভাবে আসিয়াছিলাম; শৈশবে তোমার ক্ষুদ্র অন্তর টুকু যেমন বিমল ছিল, আমার অন্তরও তেমনি নিষ্কলঙ্ক ছিল। তবে পোড়া জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ দুস্তার প্রভেদ কেন হইল?—কেন দিদি, আজ তুমি সুখ-রাজ্যে স্বর্ণসিংহাসনে আনন্দময়ীরূপে বিরাজ করিতেছ, আর আমি হতভাগিনী মনের আগুনে মর্ম্মে মর্ম্মে পুড়িয়া মরিতেছি। দিদি, এ যে কেন হয়, তাহা তুমি বলিতে পারিবে না, বলা দূরের কথা, বোধ হয়, ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিবে না। তুমি সংসারের এক দেশ মাত্র দেখিয়াছ। যে রাজ্যে নিদাঘতাপ নাই, শীতের হৃদয়ভেদী কম্পন নাই, বর্ষার গম্ভীর জলদপটলের ঝঞ্জনা শব্দ নাই,—তুমি আজীবন কেবল সেই চিরবসন্ত বিরাজিত রাজ্যে বাস করিতেছ। পূর্ণিমা অন্তে যে কৃষ্ণপক্ষ আছে, কুসুমের ভিতর কীট আছে, সংসারের পথে কণ্টক আছে, তাহা তো তুমি জান না।—

প্রাতঃবাক্যে বলিতেছি যেন, কখনও জানিতে না হয় :—চিরসুখের বিনিময়ে আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

দিদি, তুমি ভাল হইলে কেন, আমিই বা মন্দ হইলাম কেন, তাহার কারণ শুনিতে চাও? আমি তো স্থির জানি, কুসঙ্গ ও কুদৃষ্টান্তই স্ত্রীলোকের অধঃপতনের কারণ। নিষ্ঠুর কীট-সহবাসেই সুন্দর সুরভি গোলাপ কুসুম বৃন্তচ্যুত হয়, হিমানি আগমনেই পদ্মফুল শুকাইয়া যায়, বর্ষার মেঘে চাঁদের বিমল কৌমুদী লুকাইয়া রাখে। গোলাপ, পদ্ম, চাঁদ—সুন্দর হইবে, অনঙ্কিত থাকিবে, লোকের প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীতে নারীহৃদয়ও ঠিক সেইরূপ। পুরুষের দুঃখ দলিত হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে, ক্লিষ্ট অন্তর প্রফুল্ল করিতে, অনন্ত দুঃখরাশির মধ্যে পুরুষকে সুখের মুখ দেখাইতে, রমণীর সৃষ্টি। পারিজাতের পরিমল, রসালের মধু, চাঁদের সুধা, মেঘের বিজলী দিয়া এই নারী-হৃদয় গঠিত। পুরুষ এই কোমল অন্তরের আশ্রয়, নেতা, উপদেষ্টা; পুরুষে যে দিকে সঞ্চালন করিবে, কোমলান্তরা রমণী সেই দিকেই চলিয়া পড়িবে।

আমার উপরের কথাগুলি কিছু আড়ম্বর-পূর্ণ হইল, না? তুমি আমার পত্রখানির এই স্থানটি পড়িতে পড়িতে হয় তো তোমার সেই তরল হিঙ্গুল-মণ্ডিত অধর প্রস্ফুরিত করিয়া, নয়ন-ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে বলিবে,—"ঝাঁটাখাগী, আবার বিজ্ঞানের শ্রাদ্ধ কর্ত্তে বসেছেন"।—কিন্তু দিদি, দোহাই তোমার, আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে, চিরকাল অজ্ঞান, লজ্জান বিজ্ঞানের বড় একটা ধার ধারি না।

আমার এ দশা কেন হইল, কে করিল, যদি সমস্ত স্থির হইয়া শুনিয়া যাও, তাহা হইলে তুমিও আমার সহিত বলিবে—পুরুষই স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ। দিদি, মনে পড়ে কি, আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলাম, তথাপি পিতা আমার বিবাহের

কোনই স্থিরতা করিলেন না? বোধ হয়, তুমি তোমার স্বামীর নিকট শুনিয়া থাকিবে, আজ কাল আমাদের দেশে কতকগুলি গোমুখ একত্রিত হইয়া, ইংরাজের অনুকরণ করিতে গিয়া, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বিকট চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই উষ্ণ-প্রধান দেশে কোন্ বয়সে বালাগণের অন্তরে পতি-সঙ্গ-লালসা উদয় হয়, তাহা কি সে পোড়ামুখো মিন্‌সেরা বুঝিতে যায়? আমাদের বাঙ্গালা সোনার দেশ ছিল. এখানকার স্ত্রীলোকে,—তোমরা যেমন শিখিয়াছিলে—শিশুকাল হইতেই সাঁজুতির ঘরে স্বামীকে পূজা করিতে শিখিত, স্বামীকে দেবতা বলিয়া জানিত, পরপুরুষের মুখ নিরীক্ষণ নরকের সোপান বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু আজকাল ইংরাজী ধরণের নব্য বাবুগণ তাহাদের সে ভাব দূর করিতে বসিয়াছে, বঙ্গের ধর্ম্মক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ব্যভিচারের বীজ রোপণ করিতেছে, অমৃতে গরল ঢালিতেছে। তুমি স্বর্ণপুরের রাম——বাবুর কন্যা উমাবতীকে দেখিয়াছ কি?—আহা মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী প্রতিমা; কিন্তু রাম——ইংরাজের অনুকরণ করিতে বসিয়া সেই ষোড়শী যুবতীকে অবিবাহিত রাখিয়া বিদ্যালয়ে পড়াইতে দিতেন। উমা কি ছাই ভস্ম শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা ভগবান জানেন, ফলে এক দিন প্রকাশ হইল, বিদ্যালয়ের শিক্ষক উমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে,—কুমারী উমাবতী ছয় মাস গর্ভবতী হইয়াছে! বল দেখি, দিদি, দোষ কার?—উমার না, তার পিতার ও পণ্ডিতের? তাতেই উপরে বলিতেছিলাম,—পুরুষই স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশের কারণ।

যাক্—আমি নিজের কথা বলি। সেই বিষম চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সেও আমি অবিবাহিতা; মনে মনে বিবাহের জন্য লালায়িত হইতে লাগিলাম। যখন একাকিনী নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতাম, তখনই মনে মনে স্বামী-সঙ্গ-সুখ অনুভব করিতাম, আবার কেহ মুখের উপর আমার

বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে কৃত্রিম কোপ প্রকাশের সহিত "যা" বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতাম। দম্পতী দেখিলে ভাবিতাম, কবে আমি অমনি করিয়া স্বামীর গলা ধরিয়া বসিব; স্বামী স্ত্রীর মান ভাঙ্গিতেছেন দেখিলে মনে করিতাম, কবে আমি অমনি করিয়া আমার নাগরকে কাঁদাইব; প্রতিবেশীর গৃহে জামাই আসিলে মনে মনে বলিতাম, কবে আমাদের গৃহে পিতার জামাইয়ের শুভাগমন হইবে। দিদি, তুমি আমার এ কথাগুলি শুনিয়া হয় তো বলিবে—"হতভাগী আইবুড়া বয়স হইতেই বেহায়া।" আমি শুদ্ধ নির্ব্বোধ পুরুষগুলার ভ্রান্তি ভাঙ্গিবার জন্যই এত কথা বলিলাম, যদি সকল স্ত্রীলোকে আমার ন্যায় লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারিত, তাহা হইলে রমণীরাজ্যে এরূপ মহামারি উপস্থিত হইত না।

তোমার হয় তো মনে থাকিতে পারে, আমার পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, এক দিন আমাদের গৃহে চকোরের চন্দ্র, চাতকের জলধর, রুক্মিণীর কৃষ্ণ, দিসৃদিমোনার ওথেলো উপস্থিত হইলেন,—সংক্ষেপতঃ আমার বিবাহ হইয়া গেল। দেখিলাম, আমার নাটের গুরু ইংরাজি ভাবে চুলুচুলু। আমি দেশের প্রথানুসারে, শ্বশুরগৃহে যাইয়াই অবগুণ্ঠনে বদন আবরণ করিলাম, বর্ষার কোকিলের ন্যায় কণ্ঠস্বর একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিলাম, অন্য পুরুষের পদশব্দ পাইলে চপলার ন্যায় মেঘের আড়ালে লুকাইতে শিখিলাম। আমরি মরি, বঙ্গবালার লজ্জা কি সুন্দর আভরণ! ব্রীড়াসঙ্কুচিতা বঙ্গনারীকে দেখিলে দুরন্ত লম্পটের মনও ভক্তিরসে গলিয়া যায়। লজ্জাবনতা রমণী যেন শৈবালাচ্ছাদিত অমল শ্বেতশতদল। যে রমণী-হৃদয়ে লজ্জা আছে, তাহাতে প্রেম আছে, মধুরতা আছে, ধর্ম্ম আছে, সতীত্ব আছে; যে হৃদয়ে লজ্জা নাই, সে হৃদয় আফ্রিকার মরুভূমি। তুমি লজ্জাবতী, সতী, বিমল-হৃদয়া, লজ্জার মা এ পাপিনী তোমায় কি শিখাইবে?

আমি কুক্ষণে আমার পাষণ্ড স্বামীর কথা শুনিয়াছিলাম, কুক্ষণে এই লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম—তাই চিরদিনের জন্য মজিয়াছিলাম।

আমি সকলকে লজ্জা করিয়া, অবগুণ্ঠনে বদন ঢালিয়া প্রকৃত বঙ্গ সতীর ন্যায়, সেই——

"নয়ন অমৃত নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজ পতি বিনা কভু, অন্যদিকে চায় না,,

ভাবে চলিতে লাগিলাম দেখিয়া; আমার নবজলধর হৃদয়চোর মনে মনে বিরক্ত হইতে লাগিলেন।

বলিয়াছি, তিনি ইংরাজি ভাবে ঢুলুঢুলু, তাঁহার মনের সাধ,—আমি লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করি, মস্তকের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করি, বিবির কেতায় বিবির সাজে বসিয়া, তাঁহার ইয়ারগণের সহিত রসিকতার তুফানে ভাসিয়া যাই। আমায় অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার জন্য স্বামী মহাশয় কতই উপদেশের প্রদীপ জ্বালিতে লাগিলেন, আমার অনুপম সুন্দর বদন মানবচিত্ত প্রফুল্ল করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, সে মুখ ঢাকিয়া রাখিলে পাপিনী হইতে হইবে বলিয়া নীতি-শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন, আমায় যে দেখিয়াছে, সেই মোহিত হইয়াছে বলিয়া আমার অন্তরে রূপগরিমা উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। রমণীহৃদয় সু-উর্ব্বরক্ষেত্র, তাহাতে যে বীজ বপন করিবে, তাহাই সহজে অঙ্কুরিত হইবে। আমার স্বামী আমার হৃদয়ে পাপের বীজ বপন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাতে পাপকণ্টকী অঙ্কুরিত হইতে লাগিল।

রমণীহৃদয়ের যতপ্রকার ক্ষীণতা আছে, তন্মধ্যে রূপগরিমা সর্ব্বপ্রধান। অমুক আমার চক্ষু দুইটি দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন, আমার মুখের ন্যায় সুন্দর মুখ তিনি আর কখন দেখেন নাই, শুনিলে তোমার ন্যায় জন কয়েক স্ত্রীলোক ব্যতীত, অনেকেরই মস্তক ঘুরিয়া যায়।

আমি যে দিবস আমার অদূরদর্শী নির্ব্বোধ স্বামীর মুখে শুনিলাম, তাঁহার হৃদয়বন্ধু যোগীন্দ্র বাবু আমায় অন্তরাল হইতে দেখিয়া আমার রূপের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, সেই দিন হইতে যোগীন্দ্র বাবু আমার হৃদয়ে পদার্পণ করিলেন, আমার মুখখানি তাঁহাকে আর এক দিন ভাল করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা হইল।

এখন হইতে আর পূর্ব্বেকার ন্যায় পুরুষের শব্দ পাইলেই গৃহমধ্যে লুকাইতাম না, স্বামীর বন্ধুগণ যখন আমাদের গৃহে আসিতেন, তখন এমন স্থানে দাঁড়াইতাম যে, তাঁহারা আসিলেই আমাকে দেখিতে পান; বিশেষ যখন যোগীন্দ্র বাবু আসিতেন, তখন তাঁহার মুখখানি অগ্রে দেখিয়া লইতাম, তাঁহার চক্ষুর সহিত আমার চক্ষু মিশাইতাম, আমার কুন্দদন্তশ্রেণী বিকাশ করিয়া একটু হাঁসিতাম, শেষে অবগুণ্ঠন টানিয়া সরিয়া যাইতাম। দিদি, কালামুখীর সকল কথা শুনিবে— আমার চক্ষে যোগীন্দ্র বাবুর মুখখানি বড়ই মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল!—

এই সময় ভাবনা হইল, যদি সংসারে সুন্দর কুসুম হইয়াই জন্মিয়াছি, তবে আর পত্রান্তরালে থাকিব কেন? এ শোভা, এ সৌন্দর্য্য যদি জগতের লোককে না দেখাইলাম, তবে আর এ রূপের রাশি বহিয়া ফল কি? কিন্তু দিদি, এ পোড়া মনে তখন উদয় হয় নাই যে, সুরভি গোলাপ কুসুমই পত্রান্তরালে অবস্থিতি করে, অসার শাল্মলী-পুষ্প পত্রহীন বৃক্ষে বসিয়া পথিককে বৃথা আহ্বান করিতে থাকে।

ইংরাজি ধরণে স্বামীর ইয়ার লইয়া আমোদ-তরঙ্গে ভাসিবার একটু প্রতিবন্ধকতা হইল; আমার বৃদ্ধা শাশুড়ী ও সতী ননদিনী সে পথে অনবরত কণ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আমার স্বামীর যতটুকু পরিচয় পাইয়াছ, তাহাতে বোধ হয় তোমার আর বুঝিবার বাঁকি নাই যে, তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল-চিত্ত; আমি চক্ষের ইঙ্গিতে তাঁহাকে যে দিকে

ইচ্ছা সেই দিকে চালাইয়া লইতাম, সুতরাং এক দিন তাঁহাকে বলিয়া শাশুড়ী ও ননদকে সংসার হইতে বহির্গত করিয়া দিলাম।

দিদি, চন্দ্রশেখর বাবু স্ত্রী-চরিত্রে যথার্থই বলিয়াছেন—"স্ত্রী হৃদয় চিরকাল বীর-পক্ষপাতী।" যে স্বামীতে তেজস্বিতা, স্বাতন্ত্র্য, পুরুষত্ব নাই, সে স্বামী কখনই স্ত্রী-হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। যে দিন আমার স্বামী আমার মনস্তুষ্টির জন্য, মাতা ভগিনীকে গৃহবহিষ্কৃত করিলেন, সেই দিন জানিলাম, তিনি আমার পোষা বানর;—বানরের উপর কোন্ স্ত্রীলোকে প্রেম বিলাইতে যায়? আমার মদন-মোহনকে নিতান্ত অপদার্থ জানিয়া সেই দিন হইতে মনে মনে ঘৃণা করিতে লাগিলাম।

১২৮৮ সালের দোল পূর্ণিমার রজনী। আমার কলির কামদেব আমায় একা ফেলিয়া ভিন্ন গ্রামে তাঁহার একটি বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রণ-রক্ষায় গমন করিয়াছেন, পূর্ণযুবতী আমি সৌধশিখরে একাকিনী বসিয়া চাঁদের কিরণ, দক্ষিণ পবন ও কোকিলের ধ্বনির সহিত হৃদয়ের যুদ্ধ বাধাইয়াছি, এমন সময়ে যোগীন্দ্র বাবু হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিলেন।—দিদি, আর লিখিতে পারি না, আমার অধঃপতনের সেই স্থান, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্ত এ পাপ স্মৃতিতে অঙ্কিত রহিয়াছে; মন পাপানলে দিবানিশি জ্বলিতেছে, তথাপি সে দগ্ধ স্মৃতি পুড়িয়া ছাই হইতেছে না। তোমরা সতী, পুণ্যবতী—পাপিনীর পাপের জ্বালা কিসে নির্ব্বাণ হয় বলিয়া দিতে পার কি? কিন্তু দিদি, আজ আর লিখিয়া উঠিতে পারি না, তুমিও এক দিনে সমস্ত পড়িয়া উঠিতে পারিবে না; পারিতো আর এক দিন এই পাপ জীবনের অন্যান্য কথা আরম্ভ করিব,—কথা অনেক আছে ইতি ২৩ শে চৈত্র।

পাপিনী

বিরাজমোহিনী।

দস্যু-কন্যা।

তৃতীয় স্তবক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১

মাধবীর মূলে বিশাল উপলে
যুবক যুবতী রয়েছে বসি,
উষাপতি যেন উষা ক্রোড়ে ধরি,
আকাশ হইতে পড়েছে খসি।

২

কানন উজলি শরদ জোছনা,
ছড়ায়ে পড়েছে কুসুম গায়,
যুবতী-কুন্তল হেলায়ে দোলায়ে
চটুল পবন চলিয়া যায়।

৩

নৈশ ফুলকুল নির্জ্জনে বিরলে
সৌরভ ভাণ্ডার খুলিয়া আছে,
বঙ্গসতী যেন, নিশা আগমনে
বিকাশে হৃদয় পতির কাছে।

৪

পবন-পরশে কম্পিতা কামিনী
ঝিরি ঝিরি ঝিরি ঝরিয়া যায়,
মানিনী মহিলা পতির তাড়নে
যেন রে বিষাদে ভূমে লোটায়।

যুবক যুবতী মুখোমুখি হয়ে
বসিয়াছে দোঁহে ভাবের ভরে,
সুধাকর যেন দুটি সুধা-মুখে
ঢালিয়াছে সুধা আদর করে।

৬

উভয়ের মুখে উভয়ের আঁখি,
উভয়ের প্রাণে পিপাসা ঘোর,
উভয়ের চখে উভয়ে সুন্দর,
উভয়ের রূপে উভয়ে ভোর।

৭

উভয়ে নীরব, একমন প্রাণে
সাঁতারে দুজন দোঁহার রূপে,
দুজনার গুণে মোহিত দুজনে,
দুজনে মগন প্রণয়-কূপে।

৮

চাঁদেতে জোছনা, বসন্তে কোকিল,
মানসে মরাল সৃজিলা যেই,
উভয়ে তুষিতে, এ দুখানি মুখ
বিরলে বসিয়া গঠিলা সেই।

৯

থাকিয়া থাকিয়া, চাহিয়া চাহিয়া
যুবার ভুবন-মোহন মুখে
কহিতে লাগিলা ধনী রাজবালা,
ঘাত প্রতিঘাত আঘাতি বুকে।

"যাও যাও, কথা রাখহ আমার,
যাও চলে যাও এখান হ'তে,
গভীর নিশিতে নিরাপদে পার
হইতে পারিবে বিজন পথে।

১১

"বিপদে উদ্ধার হইবার তরে
আনিয়াছি এই ধরহ অসি,
প্রাণের মমতা নাহি কি তোমার
এখনও এখানে রয়েছ বসি ?

১২

মরিবার তরে, ভুজঙ্গ বিবরে
সাধ করি হাত কি লাগি দেও ?
ধর উপদেশ, ছাড়হ এ বেশ,
তস্করের বেশ এনেছি, লও।

১৩

এ বেশ ধরিয়া করিলে গমন
দস্যু বলি সবে করিবে জ্ঞান,
অনায়াসে পার হইবে কান্তার,
বিষম বিপদে বাঁচিবে প্রাণ।

১৪

নীরবিলা বালা ; হাসিয়া যুবক
যুবতীর কর ধরিয়া করে,
সাদরে সম্বোধি আদরের ধনে,
কহিতে লাগিলা সুধার স্বরে।

১৫

ধন্য চারুশীলে, ধন্য তব মন,
জগতে এমন দ্বিতীয় নাই ;
পর উপকারে আপন জীবন
করিবে অর্পণ ভেবেছ তাই ?

১৬

"ভুলেছ কি ধনি, চারুচন্দ্রাননি,
তস্করের সেই কঠিন পণ,
বিচারের কালে না পাইলে মোরে,
লইবে নিষ্ঠুর তব জীবন ?

১৭

"রমণী-রতন ! এ অকৃতী জনে
হেন নরাধম করেছ জ্ঞান ?
অসার জীবন রক্ষিবার তরে
বিনিময় দিব তোমার প্রাণ ?

১৮

"তোমারই কৃপায়, অয়ি কৃপাময়ি,
এখনও এ দেহে রয়েছে প্রাণ,
তোমারই কৃপায় নিষ্ঠুর দস্যুর
বন্ধন-জ্বালায় পেয়েছি ত্রাণ।

১৯

যে ঋণে আমায় বান্ধিয়াছ সতি,
প্রাণ দিয়ে তাহা শোধিতে নারি,
জীবন-দায়িনি,—তোমার জীবন
বিপদে কখন ফেলিতে পারি ?

২০

"আছিল হৃদয় আঁধারে ডুবিয়া,
পদে পদে ঘোর বিপদ-মালা,
চন্দ্রমুখি, তুমি সে আঁধার প্রাণে
প্রীতি জোছনার দিয়াছ আলা।

২১

"হৃদয়ের দেবী তুমিই আমার,
শ্মশান-হৃদয়ে করিব ধ্যান,
নিশা অবসানে তোমার চরণে
দিব বলিদান আমার প্রাণ।

২২

"তন্ত্রের বিধানে সমাধি সাধন
জীবন পাতন করিয়া যাই,
ইষ্টদেবী তুমি, থেকো অনুকূল,
জন্মান্তরে যেন তোমায় পাই।"

২৩

নীরবিলা যুবা; পীড়িলা সাদরে
যুবতীর কর-কমল-রাজি,
কোমল পীড়নে শিহরিল তনু,
চাহিলা অবলা চমক ত্যজি।

২৪

ছল ছল আঁখি, চাহে বিধুমুখী
যুবার মদনমোহন মুখে;
তরল অধরে, কথা নাহি সরে,
ভাবের তুফান বহিছে বুকে।

২৫

অঞ্চলে নিবারি, নয়নের বারি,
চাপিয়া হৃদয়ে হৃদয়-জ্বালা,
যুবার নয়নে রাখিয়া নয়ন
কহিতে লাগিলা সরলা বালা।

২৬

"অবলা অন্তর, ক্ষীণ নিরন্তর,
না পারে চাপিতে মরম ব্যথা,
তাই হে যুবক, প্রাণের বেদন
জানিতে পেরেছ প্রাণের কথা।

২৭

"কিন্তু জেন সার, এ জীবনে আর,
পতি-সঙ্গ মম কপালে নাই,
বঙ্গের বিধবা আমি অভাগিনী,
বাড়া ভাতে মোর পড়েছে ছাই।

২৮

"বিধবার এই বিফল জীবন
শুষ্ক পত্র প্রায় পড়িয়া রবে,
কাটাইব কাল কাঁদিয়া কান্তারে,
জগতের তাহে কি লাভ হবে ?

২৯

"তোমার জীবন, রহিলে বরং
হবে উপকার বিবিধ মতে,
কাতরে মিনতি করি তাই পদে,
মাতা খাও, যাও এখান হতে।

৩০

"বিধবার প্রাণে কিসের ভাবনা,
অঙ্গারের প্রতি কে ফিরে চায় ?
ত্যজিলে জীবন, জন্মের মতন
যাতনার জ্বালা নিবিয়া যায়।

৩১

"নিবাইতে জ্বালা, সতী বঙ্গবালা
পতির চরণ করিয়া ধ্যান,
ফুল-শয্যা সম জ্বলন্ত চিতায়
হাসি মুখে শুয়ে ত্যজিতে প্রাণ।

৩২

"সে কুলে জনম, কুলের ধরম,
প্রতি বঙ্গসতী রাখিতে জানে;
দস্যুপতি হাতে, রজনী প্রভাতে
হাসি মুখে বলি দিব এ প্রাণে।

৩৩

"কাল বয়ে যায়, যাও যাও যুবা,
আর না থাকিতে পারি হেথায়,
বিপদ কাণ্ডারি, মুকুন্দ মুরারি
বিপদে হবেন তব সহায়।

৩৪

"তরল হৃদয়া বাচাল বালিকা,
বলি ঘৃণা যদি না হয় মনে,
কখন কখন করিহ স্মরণ
কাননের এই কাঙ্গালী জনে।

৩৫

"যেই ভাগ্যবতী, তোমা হেন পতি,
প্রাক্তনের ফলে লভিবে ভবে,
তাহার মঙ্গল সাধিতে সর্ব্বথা
মুক্ত আত্মা মম যতনে রবে।"

৩৬

বলিতে বলিতে চাপিলা বচন,
অন্তরের বেগ মিশাল প্রাণে ;
রমণীর ন্যায় বাসনা বিলয়
করিতে ধরায় কে আর জানে ?

৩৭

যুবক-হৃদয় পূর্ণ ভাব-বশে,
ভাবের উচ্ছ্বাসে রোধিল কথা,
সজল-নয়নে চাহে মনে মনে
কাননের সেই কামকী লতা।

৩৮

স্বরগীয় জ্যোতিঃ ভাতিছে বদনে
নেহারি নয়নে যুবক তায়,
আপনা পাসরি জগৎ বিস্মরি
পড়িল লুটায়ে বালার পায়।

৩৯

কহিতে লাগিলা গদগদস্বরে—
"দেবী তুমি, কভু মানবী নও ;
বনদেবী কিবা অপ্সরী, কিন্নরী,
কি ছলে হেথায় স্বরূপ কও।

৪০

"পরীক্ষা করিতে হৃদয় আমার
পাতিয়াছ ছল বুঝি হেথায়,
দেও অসি দেও, এখনই এ প্রাণ
দেই বলিদান তোমার পায় ।"

৪১

চরণের মূলে হেরিয়া যুবকে
সম্ভ্রমে যুবতী ধরিলা করে,
দুখানি দেহেতে হ'ল মিশামিশি,
মিশিল গোলাপ কমল পরে ।

৪২

উভয়ের তনু উঠিল শিহরি,
উভয় মস্তক ঘুরিয়া গেল,
উভয় শরীরে খেলিলা তড়িৎ,
আবেশে জড়িত উভয়ে হ'ল ।

৪৩

ঢাল ঢাল চাঁদ, খুব সুধা ঢাল,
সুধায় সুধায় মিশিয়া যাবে,
এই বেলা লও, চাই যদি সুধা,
হেন সুধাধার কোথায় পাবে ?

৪৪

জগৎ ভুলিয়া যুবক যুবতী
উভয়ের কোলে উভয়ে আছে,
এ হেন সময়ে দস্যুপতি আসি
প্রকাশ হইল তাঁদের কাছে ।

৪৫

"একি আচরণ রাজবালা তব—",
গম্ভীরে কহিলা তস্কর-পতি,
চমক ভাঙ্গিয়া ফিরায়ে বদন
ত্যজিয়া যুবায় সরিল সতী।

৪৬

দস্যুপতি প্রতি ফিরাল মস্তক,
ফণা তুলি যেন চাহিলা ফণী,
সারসীর প্রায় সমুন্নত দেহে
গ্রীবা হেলাইয়ে দাঁড়াল ধনী।

৪৭

কহিতে লাগিলা প্রশান্ত বদনে,
গম্ভীর অথচ মধুর-রবে,
"শুন দস্যুপতি, যুবকের প্রতি
মম আচরণ কহিব তবে—

৪৮

"মনে মনে এই করিয়াছি পণ,
বাঁচাইব এই যুবার প্রাণ,
শোণিতের তৃষা নিবাতে তোমার
করিব আমার জীবন দান।

৪৯

"আমার অসার জীবনের ভার
বহি প্রয়োজন কিছুই নাই,
দস্যুর আগার ত্যজিতে গোপনে
সাধিতেছিলাম যুবায় তাই।

৫০

"নীচাশয় যদি হইত যুবার,
এত ক্ষণ দেখা পেতে না তাঁর,
শত্রু মুখে ছাই দিয়া নিরাপদে
হইতেন তিনি কানন পার।

৫১

"শোণিত দর্শন না করিলে যদি,
নাহি হয় তব ন্যায় বিধান,
পায়ে ধরি পিতঃ, ছাড়হ যুবায়
বিনিময়ে লহ আমার প্রাণ।

৫২

"অথবা যদ্যপি নিতান্ত যুবায়
বধিতে বাসনা করিয়া থাক,
বসাও ও অসি আগে এ হৃদয়ে
অন্তিমের এই মিনতি রাখ।"

৫৩

বলিতে বলিতে তস্করের পদে,
পড়িলা আছাড়ি সরলা সতী,
আদরে অমনি ধরি স্নেহ-ভরে
তুলিলা তাহায় তস্কর-পতি।

৫৪

হাসি হাসি মুখে কহিতে লাগিলা,
"প্রাণের কুমারি কেঁদ না আর,
আসিয়াছে ভীম, শুনিয়াছি সব,
এই তো যুবক পতি তোমার।

৫৫

"বাল্য পরিণয় নিবারণ হেতু
রাখিয়াছিলাম তোমায় ঘরে,
বিদ্যা-শিক্ষা তরে যুবক-প্রবরে
অর্পিয়াছিলাম তাঁদের করে।

৫৬

"পিতা-মাতা-মুখ দেখিবে উভয়ে,
সংবাদ তাঁদের করেছি দান,
স্বামীর সোহাগে, প্রাণের কুমারী
চিরায়তী লয়ে জুড়াও প্রাণ।

৫৭

"বার্দ্ধক্য প্রবেশ করিয়াছে দেহে,
এখন করিব কাশীতে বাস,
আমার ধনের অধিকারী হয়ে;
করহ পুরণ মনের আশ।"

৫৮

দম্পতীর কর ধরি দুই করে
আদরে ভবনে চলিলা সুখে,
আনন্দে মগন হইলা কানন
আনন্দ রঞ্জিত সবার মুখে।

শ্রীচ, চ, প।

ধর্ম্ম, নীতি, সভ্যতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আদিম মানব-হৃদয়ের যে ভাবকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-স্বরূপে আরোপণ করা হয়,তাহা বাস্তবিক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নহে। অপিচ, অস্মদাদির বালকবালিকাদিগের হৃদয়ে যে ঐশ্বরিক বিশ্বাস পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও আজন্ম সিদ্ধসংজ্ঞায় নির্দ্দেশিত হইতে পারে না। এরূপ কথিত হইয়াছে যে, তাহাদিগের ঐশ্বরিক বিশ্বাস, পিতামাতার অনুকরণের ফল। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ী লোকের বালকবালিকার হৃদয়ে, তত্তৎ জাতীয়ধর্ম্মের প্রতি একরূপ আশ্চর্য্য স্বাভাবিক প্রবণতা জন্মিয়া থাকে। এরূপ প্রবণতা কি কৌলিক দেহ-স্বভাবের (hereditary tendency) ফল নহে? বাস্তবিক এইরূপ প্রবণতা বদ্ধমূল হওন মানব প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। কৌলিক দেহ-স্বভাব— পূর্ব্বপুরুষ প্রতিভার বৈচিত্র অংশলাভ করণ, মানব-প্রকৃতির উপরে অসাধারণ আধিপত্য প্রদর্শন করে। বিভিন্ন বংশজাত ও বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণের এক একরূপ বৈচিত্র অবশ্যই থাকিবে। মানব-প্রতিভা বিস্ফুরণোপযোগী ও পুরুষ পরম্পরাগত বৈচিত্র গ্রহণে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া মানব অত্যুন্নত সভ্যতাশৈলে উপবিষ্ট!

কেহ বলিতে পারেন যে, কৌলিকদেহের পুরুষপরম্পরাগত বৈচিত্র গ্রহণের সামর্থ্য স্বীকার করিলে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আজন্মসিদ্ধ এ কথা স্বীকার করায় প্রত্যবায় কি? আমরা বলি, যথেষ্ট প্রত্যবায় আছে। মনে কর, রামের মৃগীপীড়া থাকাবস্থায়, শ্যাম তাহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিল। শ্যাম মৃগীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। রামের পূর্ব্বপুরুষ মৃগীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন নাই। শারীরিক ক্রিয়াকলাপের ওজস্বিতার অভাবে অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, রামের মৃগীপীড়া হয়। শ্যাম তৎকালে তাহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করায় মৃগীগ্রস্ত হইল।

(১) কৌলিকদেহ-স্বভাব এইরূপ আশ্চর্য্যভাবে কার্য্য করে। শ্যামের পীড়াকে যাঁহারা আজন্মজাত বলিবেন, তাঁহারা তোমার আমার ঈশ্বরে বিশ্বাসকে আজন্ম সিদ্ধ বলুন, কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু রাম অথবা রামের পূর্ব্বপুরুষদিগের উক্ত পীড়া আজন্মসিদ্ধ বলায় যে প্রত্যবায় আছে, আদিম-মানবের ঈশ্বরে বিশ্বাস আজন্ম সিদ্ধ বলায় তদপেক্ষা সহস্রগুণে প্রত্যবায় হয়।

কৌলিকপ্রতিভা সঞ্চালনের অলঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারে শতবর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী ও আধুনিক মানুষের প্রকৃতিগত যে বৈচিত্র ও পার্থক্য জন্মে, তাহার গতি এত সূক্ষ্মশক্তি সম্পন্ন যে, তাহা সাধারণে অনুভব করণে অক্ষম। কোন আদিম-মানবের যদি সামান্য বিচারশক্তি স্বীকার কর, তবে সেই বংশজ বিস্মার্কের বিচারশক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। বুঝিতে পারিবে, আদিম-মানবের একটি সামান্য সহজমনোবৃত্তি, ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে (evolution theory) কৌলিক প্রতিভার আয়ত্ত্বে কেমন অপূর্ব্ব জটিলতায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ২।

---

(১) Theory and practice of medicine
By F. T. Roberts Vol. II. page 331.

(২) এ বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ তথ্য জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Galtons hereditary genius নামক পুস্তিকা অধ্যয়ন করুন। আমরা এ স্থলে ডারউইন হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"It is generally admitted that higher animals possess memory. attention, and even some imagination and reason. If those powers which differ much in different animals are capable of improvement, there seems no great probability in more complex faculties such as the higher forms of abstraction and selfcons ciousness *etc.*; having been evolved through the developement and combination of simpler ones. It has been urged against the views here maintained, that it is possible to say at what point in the ascending scale animals become capable of abstraction, but who can say at what age this occurs in our young children? we see at least that such powers are developed in children by imperceptible degrees.,

Darwin's Descent of man, part I, chap. II,

ঈশ্বরবাদীরা বলেন, পরমেশ-বিশ্বাস মানবমনের বিবেকশক্তি হইতে জন্মিয়া থাকে। বিবেককে তাঁহারা সহজমনোবৃত্তি মনে করেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমসংকুল। মনের যে ধর্ম্মটি পরিস্ফুট হইতে বহু দর্শন ও পৈতৃকপ্রতিভা আয়ত্ত করা প্রয়োজন, তাহা কি সহজমনোবৃত্তি?—মনোরাজ্যের আজন্ম সহচর? সকলেই মনের কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির মূলে, বিবেকের দোহাই প্রদান করেন। সুতরাং কোন বিষয় হইতে নিবৃত্তি অথবা কোন বিষয়ে প্রবৃত্তির কারণ যে বিবেক, তাহা কি স্বকীয় কিম্বা পূর্ব্বপুরুষদিগের তত্তৎ বিষয়ে প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তিমূলক ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা সংস্কারে নীত হয় না? আমাদিগের মতে ঈশ্বরবাদীর বিবেকশক্তি অন্যান্য জটিল মনোবৃত্তির ন্যায় একটি প্রধান জটিল মনোবৃত্তি। ৩।

আমরা স্বীকার করি, আদিম মানবের মনে বর্ত্তমান জ্ঞানরাশি পর্য্যালোচনোপযোগী একটি স্বাধীন মুলশক্তি অবশ্য বিদ্যমান ছিল। সেই শক্তিটি কি, তাহার যথার্থ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা কঠিন ব্যাপার! তবে এইমাত্র প্রতিপন্ন হয় যে, মানবমনে এমন শক্তি প্রথম হইতে বর্ত্তমান আছে, যদ্দ্বারা তিনি পদার্থপুঞ্জের জ্ঞান অর্জ্জন করণে সক্ষম।

এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে যত দূর আলোচিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, বাস্তবিক ঈশ্বরে বিশ্বাস অন্যান্য নিত্যস্বতঃপ্রবৃত্তির ন্যায় নহে। কতকগুলি সম্প্রীতিমূলক প্রবৃত্তি, পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন দ্বারা যে ভাবে মানবমনে বদ্ধমুল হইয়াছে, ঐশ্বরিক বিশ্বাসও সেই পথের পথিক।

পাশ্চাত্য দার্শনিকপ্রবর হার্বার্টস্পেন্সার মহোদয়, আদিম মানবের ঐশ্বরিক বিশ্বাস সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। সেগুলির

(৩) See Mr. Bain's Emotions and Will p. 481

সম্যক আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র প্রস্তাবের প্রয়োজন। আমরা এখন প্রাচীন সভ্যতার গৌরব স্থানীয় দর্শনশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য বিষয়ে কথঞ্চিত গবেষণা করিব। পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, আধুনিক সভ্যতার আলোচ্য বাহ্য উৎকর্ষকে কেমন অবজ্ঞা করা হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের দর্শনশাস্ত্রসমূহের পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়, কেবল ঈশ্বর নিরূপণ—জগতের আদিকারণের গবেষণা ও তদ্দ্বারা চিত্তমালিন্য দূরীভূত করণ, প্রাচীন ভারতের মুখ্য ও চরম লক্ষ্য। সাংখ্য প্রভৃতি যাবতীয় দার্শনিকেরা, অনন্তসৌন্দর্য্য-পরিশোভিত প্রকৃতি সন্দর্শনে যুগপৎ বিমোহিত, এবং ঐশীশক্তি গবেষণায় নিবিষ্টমনা। কেবল চার্ব্বাক দর্শন এই পথের পথিক নহেন।

বেদান্ত দর্শনের মতে প্রকৃতিস্থ পদার্থ মাত্রেই ব্রহ্মস্বরূপ সৎ হইতে জাত।—কি জড় পদার্থ, কি চেতন পদার্থ সবই ব্রহ্ম। পরিণাম ও বিবর্ত্তবাদ তর্কের দ্বারা এই বাক্যের প্রমাণ সমাধান করিয়াছেন। পরিণাম ও বিবর্ত্তবাদ গভীর চিন্তাশীলতার বিষয় বটে। ব্রহ্মরূপ আদি হইতে জগৎরূপ একটি পরিণাম অথবা ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ, এই সকল সিদ্ধান্তমূলক বচন পরিণামবাদের। ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ, এইটি স্বীকৃত হইলে, সুতরাং জগৎরূপে ব্রহ্ম ব্যাবৃত্ত অথবা ব্রহ্মই একমাত্র বিবর্ত্ত এই সকল বচন বিবর্ত্তবাদের। ভারতীয় দর্শনকারেরা আধ্যাত্মিকতায়—মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থান পরম্পরা চিন্তনে—বিনিষ্টমনা। সুতরাং এই সকল দার্শনিকের মতে আত্মাই যে দর্শনশাস্ত্রের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাযেই আধ্যাত্মিকতায় প্রাচীন ভারত অদ্বিতীয়। একমাত্র সৎপদার্থের অবধারণ, ভারতীয় দর্শনের ওড়ন ও পাড়ন।

কেবল ভারতবর্ষ নহে, প্রাচীন গ্রীকেরাও দর্শনশাস্ত্রের চরম লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা অথবা আত্মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদিচ প্রাচীন ভারতের ন্যায়, গ্রীকেরা, আধ্যাত্মিকতায় অধিকাংশ সময় প্রয়োগ

করেন নাই বটে; তথাপি ভারতের অনুকরণে তাঁহারাও কতিপয় দার্শনিক রত্নের আবিষ্কারকর্ত্তা। প্রাচীন ভারত অন্তর্জ্জগতে—— আধ্যাত্মিকতায় কালক্ষেপণ করিতেন বলিয়া যে বহির্জ্জগতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে এককালীন উদাসীন ছিলেন, এমত বলা যাইতে পারে না। তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, গ্রীকেরা অন্তর্জ্জগত সম্বন্ধে অল্প সময় প্রয়োগ করায়, গ্রীক প্রাচীন জগতে অসামান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

কিসিরো ও কিসারের সমসাময়িক দুই এক জন মনীষী দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা বহির্জ্জগতের উৎকর্ষ স্বীকার করিতেন না। সিনেকা বলেন, কোন্ উপায়ে হর্ম্ম্যরাজি বিনির্ম্মিত হইতে পারে, তাহার সহিত দর্শন শাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। যিনি যথার্থ দার্শনিক, তিনি কখন ভ্রমেও চিন্তা করেন না যে, কোনরূপ কৌশলে হর্ম্ম্যতলে অবস্থান করিতে হইবে। যে সকল ধাতুর প্রচলনকে, লোকে বাহ্য অভাব পরিপূরণ— বহিরুৎকর্ষের অদ্বিতীয় কারণ স্বরূপ মনে করেন, দর্শনশাস্ত্র সে বিষয়ে মানবকে কখন শিক্ষা প্রদান করে না। সমস্ত যান্ত্রিক কৌশল ও পার্থিব পদার্থ হইতে দর্শনশাস্ত্র আমাদিগকে স্বতন্ত্র হইতে শিক্ষা প্রদান করে। তাঁহার মতে যথার্থ জ্ঞানবানেরা, প্রকৃতি অনুসারেই জীবন ধারণ করেন। অর্ণবতরী প্রভৃতি বাহ্য পদার্থসমূহের আবিষ্ক্রিয়া, উল্লিখিত মহাত্মাদিগের নিকট ভয়ানক অবমানের বিষয়। তিনি আরো আক্ষেপ করেন যে, আদিম যুগে, যখন পর্ব্বত, গুহা, বৃক্ষতল প্রভৃতি ব্যতীত, মানবের অন্য কোন আশ্রয়ের উপায় ছিল না, সেই আদিম স্বর্ণযুগে তাঁহার সৌভাগ্য লক্ষ্মীর সঞ্চার হয় নাই।

তিনি বলেন যে, আমার সমসময়ে, বহির্জগতের উৎকর্ষ অনেক পরিমাণেই বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু সেই সকল উৎকর্ষ বস্তুঃঃ দার্শনিকের প্রয়াস জাত নহে,——নিম্নতমশ্রেণীর পরিশ্রমের বিষয়। এই বিষয়টি ভাসমান তৃণের অবস্থাপন্ন। কিন্তু দার্শনিক বিষয়টি

এতদাপেক্ষা অসংখ্যগুণে গুরুত্ব সম্পন্ন। হস্তসঞ্চালন দ্বারা বহিকৎ-কর্ম কিরূপে সাধন হইবে, তৎ চিন্তা দর্শনশাস্ত্রের বিষয় নহে। দর্শন-শাস্ত্রের বাস্তবিক চরম লক্ষ্য আত্মার অবস্থান পরম্পরা—শরীর বিশ্লিষ্ট হইয়া কিরূপে অবস্থান করিবে, সুতরাং আধ্যাত্মিকতাই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকের চরম লক্ষ্য। সিনেকার পরভবিক গ্রীক দার্শনিক মণ্ডলী, সকলেই একবাক্যে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মতগুলি পরিগ্রহণ করিয়াছেন। বোধ হয়, সিনেকা হিমালয়শিখরদেশে সমাসীন আর্য্যের অনুকরণে, বাহ্য উৎকর্ষের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারত ও গ্রীক দার্শনিকদিগের অনেক পরবর্ত্তীকালে যে সময়ে বাহ্য উৎকর্ষে পৃথিবীর হৃদয় বিভূষিত,——সেই সময়ে আর এক জন পাশ্চাত্য দার্শনিকের আবির্ভাব হয়। ইহাঁর নাম লর্ড বেকন। ইনি, সিনেকা, সক্রেটিশ, প্লেতো, আরিস্তল প্রভৃতি দার্শনিকপ্রবর মহাত্মাদিগের দর্শনশাস্ত্রসমূহের গবেষণার দ্বারা, খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয় সম্বন্ধে অন্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। পূর্ব্বতন দার্শনিকের অনুকরণে, তিনিও দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য যে, আধ্যাত্মিকতা, তাহা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু বাহ্য উৎকর্ষের সহিত দর্শনশাস্ত্র যে এক-কালীন সম্বন্ধ-পরিশূন্য, এ কথা স্বীকার করণে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার লিপি চাতুর্য্য হিতবাদ (utility) ও ক্রমোন্নতি (progress) দ্বারা ভূমিকায় আনীত হওন নিবন্ধন, দর্শনশাস্ত্র ও তদীয় মূল লক্ষ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী।

বেকন প্রাচীন দার্শনিকদিগের সহিত অনেক স্থলেই একমত হইতে পারেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা প্লেতোর সহিত তদীয় বাক্‌বিতণ্ডা, অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। প্লেতো বলেন, মনুষ্য দর্শনশাস্ত্রের জন্য সৃষ্ট; বেকন বলেন, দর্শনশাস্ত্রই মনুষ্যের জন্য সৃজিত।

প্লেতো, বোধ হয়, সেনেকার ন্যায় দর্শনশাস্ত্রের বিষয়, একমাত্র আধ্যাত্মিকতা স্বীকার করিতেন। বেকন বলেন, দর্শনশাস্ত্র মানবের পক্ষে চরম উপায় ; যাহারা সর্ব্বদা রোগ শোক দুঃখে জর্জ্জরিত—যাহাদিগের হৃদয় অহর্নিশি ঝলসিয়া যায়, এবং বস্তুতঃ যাহারা দার্শনিক হইতে অক্ষম ; তাহাদিগের রোগ শোক দুঃখ অপনোদন করণান্তর শান্তি লাভাশয়ে অগ্রসর হইতে হইলে, দর্শনশাস্ত্র চরম উপায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবে।

প্লেতোর বাস্তবিক প্রধান লক্ষ্য, মানুষ্যকে ঈশ্বরে লীন করা। তিনি বলেন যে, সামান্য অভাব পরিপূরণের সহিত মানবের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। মানব এইরূপ অভাব সকল অবহেলন করতঃ ঈশ্বরে লীন হইতে চেষ্টা করিবে অথবা ঈশ্বর লাভে ধাবমান হইবে। কিন্তু বেকন বলেন যে, মানুষকে উন্নত মানুষ নামে অভিধেয় করিতে হইলে যে সমস্ত অভাব তৎপ্রতিবন্ধকতা সাধন করে, দর্শনশাস্ত্র তাহাকেও উন্মোচন করিবে। অভাব সকলের ক্রমিক পরিপূরণ দ্বারা মানবের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

(ক্রমশঃ)

মাসিক সমালোচক ও খেয়াল সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

মাসিক সমালোচক সম্বন্ধীয় রচনা প্রবন্ধাদি, সমালোচ্য গ্রন্থাদি ও কার্য্য সম্বন্ধে পত্রাদি এবং মূল্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবেক।

ব্যারিং বা ইন্সফিসিয়েণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না। যাঁহারা পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা টিকিট না পাঠাইলে উত্তর লেখা যাইবে না।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমালোচক বিদেশে প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা ডাকের টিকিটে মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় ৵৹ আনা কাগমন দিতে হইবে। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট যেন কেহ না পাঠান। মান অডারে মূল্য পাঠাইলে বহরমপুর ডাকঘরে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দেবেন, তাঁহাদিগের নিকট পশ্চাদ্ধে হিসাবে ৪ টাকা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

বিনা মূল্যে কাগজ দিতে হইলে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটে, সুতরাং বিনা মূল্যে দেওয়া এক কালে রহিত করা গেল।

মাসিক সমালোচকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি ছত্র ৵৹ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

উকীলাবাদ, বহরমপুর।
১২৮৯ সাল, ১৫ই বৈশাখ।

শ্রীরামনাথ গোস্বামী।